সঞ্জীবচন্দ্র ঃ জীবন ও সাহিত্য

ডঃ ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

SANJEEB CHANDRA : JEEBAN O SAHITYA

By

Dr. Bhaskar Mukhopadhyay, M.A, P.H.D.

প্রথম প্রকাশ
২৮শে শ্রাবণ ১৩৫৯

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক
অরুণকুমার হেঁস
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

এই গ্রন্থ

পরমারাধ্যপিতৃদেব ৺সুনীতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

ও

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী শ্রীমতী অনিতা মুখোপাধ্যায়ের

শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত হ'ল।

ভূমিকা

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার প্রয়োজন ছিল।

বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিম প্রভাবপুষ্ট যুগ যাঁদের কাজেকর্মে তৈরি সঞ্জীব তাঁদের অন্যতম। এই কালপর্বের পুরো ও সঠিক পরিচয় নিতে হলে আরও অনেকের মতো এঁরও কথা ভালোভাবে জানা এবং বিচার করা চাই।

সঞ্জীব দুটি উপন্যাস, দুটি গল্প কাহিনী, একটি ছোটমাপের ভ্রমণ কথা, কয়েকটি ছোট বড প্রবন্ধ, কৃষক সমস্যা নিয়ে একটি ইংরেজি বই লিখেছিলেন। একটি উত্তেজক মামলার বিষয় নিয়ে অনেক খাটাখাটুনি করে প্রকাশ করেছিলেন উপন্যাসের ধরনের একটি বড় গ্রন্থ। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা কিছুকাল সম্পাদনা করেন, 'ভ্রমর' নামে আরও একটি ছোট সাহিত্য পত্র বের করেন। লেখক ও সম্পাদক হিসেবে তাঁর এই ভূমিকার মূল্য না-বাড়িয়ে না-কমিয়ে নির্ণয় করা একটা জরুরি কাজ মনে করে বেলুড় লালবাবা কলেজের অধ্যাপক ভাস্কর মুখোপাধ্যায়কে এই গবেষণায় প্রবর্তনা দেই। তিনি অনেক খুঁজে এবং পরিশ্রম করে অনেক তথ্য যোগাড় করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠার ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সঞ্জীবের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বেরও বিচার করেন। তার উপরে ভিত্তি করে এ-বই প্রকাশিত হল। আমার বিশ্বাস, পরবর্তী গবেষক ও সমালোচকেরা এই লেখাটির দ্বারা উপকৃত হবেন। সর্বত্র ভাস্করবাবুর সঙ্গে মতে নাও মিলতে পারে, আমারও মেলে নি, তাতে এ-লেখার দাম কমে না। সাহিত্য ইত্যাদির ব্যাপারে মতভেদকে আমি স্বাস্থ্যকর মনে করি।

সঞ্জীবচন্দ্র বড মাপের লেখক বা সম্পাদক ছিলেন না, কিন্তু 'পালামৌ'র মতো একটি অসাধারণ ভ্রমণকথা তিনি লিখেছিলেন যার জৌলসে শত বৎসরেও একটু ময়লা পড়ে নি। অথচ দ্বিতীয় একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখার কথা তাঁর মনেও হয় নি। হয়ত তিনি বুঝতেও পারেন নি অন্য লেখার চেয়ে কেন—কোথায় পালামৌ অনেক বেশি সার্থক। নিজের ব্যক্তিত্বের এবং শিল্পীসত্তার বৈশিষ্ট্য জেনে এ-জাতীয় লেখায় আত্মনিয়োগ তাঁর কাছ থেকে আশাও করা যায় না। কারণ যে নিবিষ্ট আত্মমগ্নতা থাকলে নিজেকে চেনা যায় সঞ্জীবচন্দ্রে তা ছিল না।

কোনো চাকরিতে বা বিশেষ ধরনের লেখায় দীর্ঘকাল আটকে থাকার মন তাঁর নয়। অনেক পরিশ্রমে ও একনিষ্ঠভাবে যখন বাংলার কৃষকদের নিয়ে বই লিখলেন, তাঁর স্বভাবসুলভ কাজ বলে মনে হয় নি। এ যেন অন্য মানুষ, অন্য লেখক। কিন্তু দেখি, ওর চেয়ে বেশি নিষ্ঠা ও শ্রম ব্যয় করলেন 'জালতাপচাঁদ'-এর মতো এক অপদার্থ ও উদ্দেশ্যহীন বিষয়ে লিখতে। তখন বুঝি এ-ই হলেন সঞ্জীবচন্দ্র, যিনি স্কুলে পরীক্ষা

দিতে না গিয়ে আড্ডাধারীদের সঙ্গে হুকো খেতেন, চাকরি বাঁচাবার চেয়ে গোলাপ বাগিচা বাঁচাতে যিনি বেশি উৎসাহ পেতেন। বঙ্কিমের তুল্য বিরাট অগ্রজের সব রকম সাহায্য সত্ত্বেও কোনো কাগজ তিনি টেকাতে পারেন নি, বোধ হয় চানও নি। সাহিত্যরচনার এরূপ সুযোগ ও পরিবেশের মধ্যে থেকেও কত সামান্যই না লিখেছেন। অথচ তাঁর ভাষার—কল্পনার জোর ছিল। 'পালামৌ'তে ছড়ানো অজস্র হীরে-মানিকে তার প্রমাণ আছে। অসামান্য চরিত্রগড়ার শক্তি ও যে ছিল, তার পূর্ণ পরিচয় না মিললেও আভাস আছে পিতম পাগলের মধ্যে। সঞ্জীব কিন্তু মানবচরিত্রসৃষ্টির অতন্দ্র নিষ্ঠায় ব্রতী হয়ে উপন্যাস লেখায় মন দিলেন না। অথবা সে-অর্থে মন দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবই ছিল না। তাঁর উপন্যাসে দেশকালের চিহ্ন নেই, বাস্তবতা একটা অপরিচিত শব্দ, ঘটনা বা চরিত্রে হেতুবাদের কোনো ভূমিকা নেই। 'কণ্ঠমালা'র কয়েকবছর পরে 'মাধবীলতা' লিখতে গিয়ে অনায়াসে তিনি ভাবতে পারেন, দ্বিতীয় বইটি প্রথমটির পূর্বকথা।

আসলে সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে ভারসাম্যের গুরুতর অভাব, যা তাঁর সাহিত্য সাধনা থেকে মাধ্যাকর্ষণকে প্রায় সরিয়ে দিয়েছে।

এইরূপ সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে, সঞ্জীব বিষয়ে পাঠকের অনেক কৌতুহল জমে ওঠে। সে কারণেও এই বইটি সমাদর পাবে, এরূপ ভরসা করি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্র গুপ্ত

নিবেদন

উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম যুগের সাহিত্য ও সম্পাদনার সামগ্রিক পরিমণ্ডলটি বুঝবার জন্য সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছি। বাংলা সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর জীবনী এবং সাহিত্য সৃষ্টির একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার ও মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছি। ফলে "সঞ্জীবচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য" গ্রন্থটি একই সঙ্গে তথ্যঘটিত ও মূল্যায়ণ ঘটিত হয়ে উঠেছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন ও রচনা সম্পর্কিত নানা তথ্য, পাণ্ডুলিপি, চিঠি, ডায়েরি, পারিবারিক দলিল, সরকারি গেজেট, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ও ভ্রমরের ফাইল, 'বেঙ্গল রায়ত' সহ অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ এবং সঞ্জীব-পৌত্র শ্রীজীবঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখ থেকে শোনা নানা স্মৃতি এবং অন্যান্যের লেখা সঞ্জীব স্মৃতিকথা আমরা সতর্কতার সঙ্গে সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছি।

বর্তমান গ্রন্থরচনার ব্যাপারে আমার পরম শ্রদ্ধেয় স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত [জাতীয় অধ্যাপক (ইউ. জি. সি), এম. এ (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), পি. এইচ. ডি , ডি. লিট, বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,—বাংলা বিভাগীয় প্রধান]—এর নির্দেশ তাঁর লিখিত ভূমিকা এবং তাঁর আশীর্বাদ আমার পরমা গৌরব এবং পাথেয়। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি গবেষক ও সুলেখক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের সহযোগিতা। বঙ্কিম সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত দলিল, পাণ্ডুলিপি, ডায়েরি, চিঠিপত্র ইত্যাদি দেখতে দিয়ে আমায় যে ভাবে সাহায্য করেছেন, তার মূল্য অপরিশোধ্য। প্রচ্ছদে সঞ্জীবচন্দ্রের ছবিটি এঁকে দিয়ে আমায় অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন সুলেখক ও শিল্পী শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার ভট্টাচার্য। নির্দেশিকা গঠনে শ্রীযুক্ত স্বদেশরঞ্জন গুহরায় (পরিমল রায়), অধ্যাপিকা নিবেদিতা ভট্টাচার্য, কুমারী মণীষিতা দত্ত, শ্রীযুক্ত শেখর দত্ত যে সাহায্য করেছেন, তার জন্য রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা আকাদেমিকে আর্থিক সাহায্য দেবার জন্যে। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই পুস্তক বিপণির শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দারকে এবং র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসনের শ্রীঅরুণকুমার হেঁস মহাশয়কে গ্রন্থটির প্রকাশ ও মুদ্রণের জন্যে। সর্বোপরি

আমার পরম কৃতজ্ঞতা রইল আমার আত্মীয়বন্ধু সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী শ্যামলী মুখোপাধ্যায়ের নিরন্তর প্রেরণা ছাড়া আমার এই গ্রন্থরচনা কোনদিনই সম্ভব হতো না। তিনি আমার কৃতজ্ঞতার অনেক উর্ধে।

"সঞ্জীবচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য" যদি পাঠকমনে সামান্যতম আসন করে নিতে পারে তবে আমি নিজেকে একান্ত ধন্য ও কৃতার্থ মনে করবো।

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন কথা : ব্যক্তিত্ব বিচার

বাংলা সাহিত্যে যে সব চরিত্র প্রতিভার অধিকারী হয়েও তাঁদের জীবৎকালে যথেষ্ট পরিমাণে খ্যাতির অধিকারী হতে পারেন নি সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। সঞ্জীবের মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পালামৌ সমালোচনায় প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

"কোন কোন ক্ষমতাশালী লেখকের প্রতিভার কি একটি গ্রহদোষে অসম্পূর্ণতার অভিশাপ থাকিয়া যায়, তাঁহারা অনেক লিখিলেও মনে হয় তাঁহাদের সবলেখা শেষ হয় নাই। তাঁহাদের প্রতিভাকে আমরা সুসংলগ্ন আকারবদ্ধ ভাবে পাই না, বুঝিতে পারি তাহার মধ্যে বৃহত্ত্বের মহত্ত্বের উপাদান ছিল, কেবল সেই সংযোজনা ছিল না যাহার প্রভাবে সে আপনাকে সর্ব সাধারণের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করিতে পারে। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা পূর্বোক্ত শ্রেণীর।"[১]

রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবের খ্যাতির অভাবের কারণ হিসাবে প্রতিভার 'গৃহিনী পণার' কথা বললেও আরও একটি কারণ তার খ্যাতির অভাবের জন্যে দায়ী। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোয় আকাশের একাদশীর চাঁদকে কারও চোখে পড়ে না। বঙ্কিম যে যুগে বাংলা সাহিত্যাকাশে দোর্দণ্ড প্রতাপ মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের মত বিরাজ করছেন সেই যুগে তাঁর অগ্রজের প্রতিভার স্নিগ্ধ রশ্মিরেখা যে সকলের গোচরে আসবে না তা তো জানা কথাই। ফলে সঞ্জীবের জীবন সম্পর্কে আমাদের কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ের উদ্ঘাটন করতে হলে অতি সামান্য তথ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সুবিধা এই তিনি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ। তাই বঙ্কিমের জীবনের তথ্যের অনুসঙ্গে সঞ্জীবের জীবনের একটি কাঠামো আমরা দাঁড় করাতে পারবো আশা করি। তা ছাড়া স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী রচনা করে সঞ্জীব সম্পর্কে যেমন বহু কথা আমাদের জানিয়ে গেছেন, তেমনি চট্টোপাধ্যায় বংশ এমন কি নিজের জীবন সম্পর্কেও বহুতথ্য রেখে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিরাট প্রতিভার সহযোগী হবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই ছিল। সেই সামান্য সংখ্যক প্রতিভাধরদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। বঙ্কিম নিজের প্রতিভার গুণে বুঝেছিলেন সঞ্জীবের প্রতিভার মূল্য। আর সেই প্রতিভার যোগ্য সম্মান না হওয়াতে তিনি নিজেও যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। তাই সঞ্জীবের সংক্ষিপ্ত জীবনীর প্রারম্ভেই বলেছেন—

"প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃত কার্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাহাদের কার্য দেশ কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাছায়, কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না, কেন না অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।"

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন বঙ্কিমের উদ্ধৃত সিদ্ধান্তের যোগ্য নিদর্শন। সঞ্জীবচন্দ্র যে বংশে জন্মেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম জীবনী'তে তার বিস্তারিত বংশ পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো—
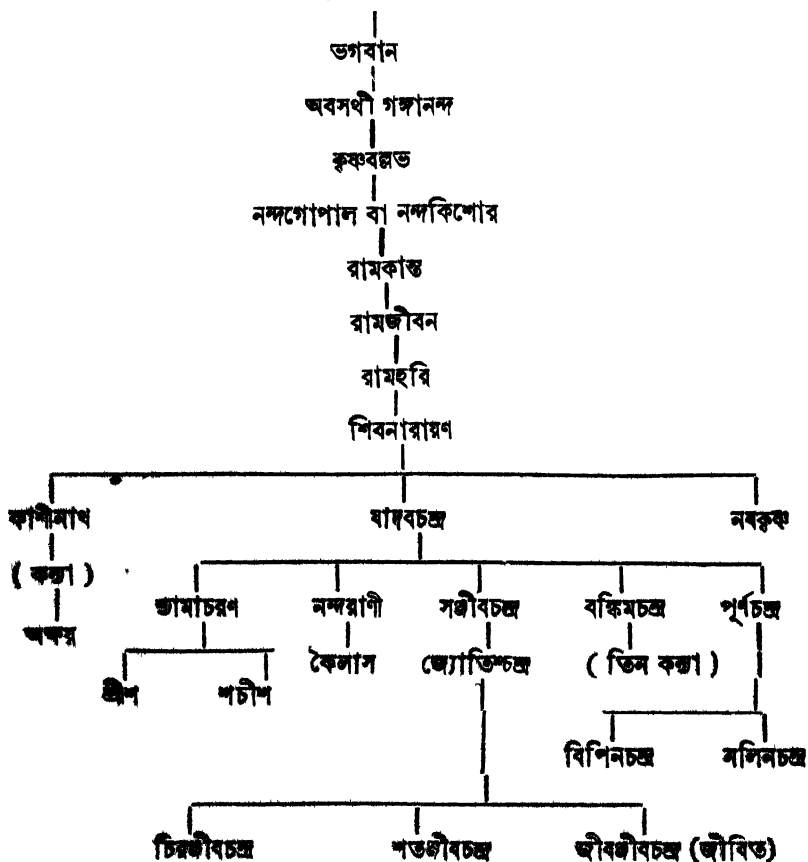
"অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলায় অন্তপাতীঃ দেশমুখো গ্রামে। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাঁটাল পাড়া গ্রামে নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।" (সঞ্জীবনী সুধা—বঙ্কিমচন্দ্র)

এই বংশে দুজন অবসথী—সর্বেশ্বর ও গঙ্গানন্দ। অবসথ নামে যজ্ঞঅনুষ্ঠান করলে ঐ উপাধির অধিকারী হওয়া যেত। আবার অবসথ কথাটির আর একটি মানে টোল। আগে বিশিষ্ট অধ্যাপকদেরও অবসথী বলা হত। অতএব দেখা যাচ্ছে চট্টোপাধ্যায় বংশে ধর্ম ও বিদ্যার চর্চা কোন হাল আমলের ব্যাপার নয়।

চট্টোপাধ্যায় বংশ প্রথমে কুলীন ব্রাহ্মণ থাকলেও রামজীবন রঘুদেব ঘোষালের কন্যা মোহিনী দেবীকে বিবাহ করে "ভঙ্গ" হন। ফলে কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রচণ্ড গোঁড়ামো থেকেও এঁরা অনেক পরিমানে মুক্ত ছিলেন। রামজীবনের পুত্র রামহরি রঘুদেবের সম্পত্তি পেয়ে কাঁটাল পাড়ায় বসবাস শুরু করেন। এই বংশের গৃহ দেবতা রাধাবল্লভও ঘোষাল পরিবার থেকেই এসেছিলেন। (মানসী ১৩২১ সাল বৈশাখ ৩৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। রামজীবনের পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র শিবনারায়ণ এবং তার পুত্র যাদবচন্দ্র। মামলা মোকর্দ্দমা ও জ্ঞাতি শত্রুতার জন্যে রামহরি ও শিবনারায়ণ দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শিবনারায়ণ নির্বিরোধ ও শান্ত স্বভাবের মানুষ হলেও অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, স্বাধীনতাপ্রিয় ও নির্ভীক মানুষ ছিলেন।

শিবনারায়ণের পুত্র যাদবচন্দ্র ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সমবয়সী (১৭৭৫ খৃঃ) ছিলেন। যাদবচন্দ্র ৮৬ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে পুত্র পূর্ণচন্দ্র লিখছেন—

"আমাদের পিতৃদেব প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সেকালে প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। ঐ গল্পগুলি এখানে বিবৃত করিতে আমার সাহস হয় না, কেননা ঐগুলি অলৌকিক ঘটনায় জড়িত। তবে এই রূপ ঘটনাতে বুঝা যায় যে সাধারণের ধারণা ছিল, পিতৃদেব বাল্যকালে হইতেই দেবভক্ত ছিলেন এবং দেবতাও তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বোধ হয় এই ভক্তির জন্যই ভগবান তাঁহাকে অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই এক মহাপুরুষের দ্বারা দীক্ষিত করিয়াছিলেন।"[২]

পরে তিনি আপন কর্মগুণে প্রথম ভারতীয় ডেপুটি কালেকটরদের অন্যতম হয়েছিলেন। তাঁর তেজস্বিতা ও কর্মদক্ষতার জন্যে তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

"যাদবচন্দ্রের ন্যায় রাশভারী লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। তথাপি তাঁহার রস পরিগ্রহ সকল বিষয়েই সমান ছিল।"[৩]

যাদবচন্দ্রের জীবনে সন্ন্যাসী ও রাধাবল্লভের যে বিপুল অলৌকিক প্রভাব ছিল তা তাঁর পুত্রেরা সকলেই বিশ্বাস করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে যে সব

অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই, সম্ভবত তিনি তা তাঁর পিতার প্রভাবেই পেয়েছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তবতার প্রাধান্য ও অলৌকিকতার অভাব থাকলেও নিজে তিনি অলৌকিক শক্তিতে যে বিশ্বাসী ছিলেন তার প্রমাণ পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে পেয়েছি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জ্যোতিষচন্দ্র নদীয়া জেলার মেহেরপুরে পুলিশ ইন্সপেকটরের চাকরী নিয়ে গিয়ে আবার অন্যত্র বদলীর খবর জানালে স্নেহময় পিতা পুত্রকে উপদেশ দিয়ে নিচের চিঠিখানি লিখেছিলেন—(সঞ্জীবচন্দ্রের পত্রগুলি বঙ্কিম সংগ্রহশালা, কাঁটালপাড়ায় রক্ষিত আছে)।

প্রাণাধিকেষু,

······যেখানেই যাও ভয় ভূতা আছেই, তাহাতে ভয় পাইও না। যিনি অভাবনীয় কৌশলে তোমার চাকরী দেওয়াইছেন, তিনি অচিন্তনীয় কৌশলে তোমায় রক্ষা করিবেন। তিনি এখন তোমার সহায়, কাজেই এখন তোমার কোন ভাবনা করিবার কারণ নাই। তোমার বড় ভয়, এই জন্য তিনি তোমায় ভয়নক স্থানে লইয়া গিয়াছেন। সেইখানে তোমার ভয় ছাড়াইবেন।···············

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুত্রদের মধ্যে যাদবচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকেই সম্ভবত বেশী স্নেহ করতেন, কারণ তিনি তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশ সঞ্জীবচন্দ্রকেই দিয়ে যান। যাদবচন্দ্রের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী গৌরমনি নিঃসন্তানা অবস্থায় মারা যান। দ্বিতীয়া পত্নী দুর্গাসুন্দরীর পাঁচটি সন্তান—শ্যামাচরণ, নন্দরাণী, সঞ্জীব, বঙ্কিম, ও পূর্ণ। এঁর সম্পর্কে শচীশচন্দ্র বলেছেন—

"বঙ্কিমের মাতা সাতিশয় স্থূলাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। কিন্তু এমন মাধুর্যময়ী, এমন করুণাময়ী শান্ত মূর্ত্তি জগতে কচিৎ দৃষ্ট হয়।"[8] ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

সঞ্জীবচন্দ্রের জন্ম ও বাল্যকাল সম্পর্কে আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য বঙ্কিমের সঞ্জীবজীবনীটি। তিনি লিখছেন—

"কাঁটালপাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি। তিনি কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, পরমারাধ্য ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইহার জন্ম। যাহারা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক যে তাঁহার জন্মকালে, তিনটি গ্রহ রবি, চন্দ্র রাহু তুঙ্গী এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ্নাধিপতি ও দশমপতি অস্তমিত। দেখিবেন ফল মিলিয়াছে কি না।"

দুঃখের বিষয় সঞ্জীবচন্দ্রের সঠিক জন্ম তারিখটি বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি।

সঞ্জীবচন্দ্রের বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আমরা নির্ভরযোগ্য বিশেষ কোন তথ্য পাইনি। এ সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্রের কনিষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীবচন্দ্র কিছু

কথা বলেছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের বিবাহ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহের আগেই হয়। অর্থাৎ তাঁরও ১১/১২ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। রানাঘাটের কাছে হালিশহরে এই বিবাহ হয়। পাত্রীর নাম ছিল নবকুমারী। সঞ্জীবচন্দ্রের অপেক্ষা নবকুমারী দেবী ৫/৬ বৎসরের ছোট ছিলেন। একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের জন্মের ৩/৪ বৎসর আগে এক কন্যা সন্তান হয়ে শৈশবেই মারা যায়। ১৮৬০ সালে জ্যোতিশচন্দ্রের জন্ম হয়। আর কোন সন্তান হয় নি। এই পুত্রের প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ ছিল।

সঞ্জীবচন্দ্রের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও এটুকু জেনেছি নবকুমারী দেবী ছিলেন অত্যন্ত নির্বিরোধী ও শান্ত প্রকৃতির। সম্ভবত স্বামীর কোন কাজে প্রতিবাদ করা বা স্বামীকে প্রভাবিত করা তাঁর স্বভাব ধর্মে ছিল না। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন তিনি বৈধব্য যাপন করেছিলেন। তাঁর পৌত্রেরা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই যত্নে শৈশবে তাঁরই কোলে লালিত হয়েছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হয়তো তাঁর মাধবীলতা, জ্যোৎস্নাবতী (মাধবীলতা), দামিনী, পার্বতী (রামেশ্বরের অদৃষ্ট) ইত্যাদি শান্ত চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে এঁর চরিত্রকেই অবচেতন ভাবে ক্রিয়াশীল করে তুলেছিলেন। এটা আমাদের অনুমান মাত্র।

সঞ্জীবের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে বঙ্কিমের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি গ্রামের এক বেত্রপাণি পণ্ডিতের কাছে সঞ্জীবের লেখাপড়া শুরু। মেধাবী অথচ অমনোযোগী ছাত্রের যা হয় তাই তাঁর ক্ষেত্রেও হয়েছিল। উপরি লাভের আশায় তিনি লেখাপড়া অপেক্ষা গুরুর হাট বাজার করাই বেশী পছন্দ করতেন। ফলে গ্রামে তাঁর তেমন লেখাপড়া শেখা সম্ভব হয় নি। এর পর বঙ্কিম ও সঞ্জীব মায়ের সঙ্গে মেদিনীপুর যান এবং ঐখানকার স্কুলে সঞ্জীব ভর্তি হন। সেই সময় মেদিনীপুরে যাদবচন্দ্র ডেপুটি কালেকটর ছিলেন। এর পরেই আবার কিছুদিন বাদে তাঁরা কাঁটালপাড়ায় ফিরে আসেন। এই সময় স্কুল অথবা কলেজে ভর্তি হওয়ার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। ফলে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় এসে হুগলী কলেজে ভর্তি হলেন। এই সময় রামপ্রাণ সরকার নামে একজন গুরু মহাশয় অর্থাৎ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন, বঙ্কিম তাঁর কাছে বর্ণপরিচয় ও সঞ্জীব কলেজের পড়া শিখতেন। তবে এই গুরু মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বেশী ছিল না, ফলে বঙ্কিমের বর্ণপরিচয় যেমনই হোক না কেন সঞ্জীবের লেখাপড়া যে বেশীদূর অগ্রসর হয়নি তা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন,

"সৌভাগ্যক্রমে আমরা আটদশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুরে গেলাম। সেখানে সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুর ইংরেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানে তিন-চারি বৎসর কাটিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও সাল তারিখের বা সঠিক সময়ের কোন হিসাব দেননি। তবে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বঙ্কিমের বাল্যকালের কথা প্রসঙ্গে একটি হিসাব দিয়েছেন,

"অনুমান ১৮৪৫। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র জননী ও অগ্রজ সঞ্জীবের সহিত মেদিনীপুর যান এবং এবার তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়।"[৫]

মেদিনীপুরের উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি ও বনভূমি সঞ্জীব ও বঙ্কিমের কিশোর মনের কবি-প্রকৃতিকে নিশ্চয়ই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। মেদিনীপুরের এই ইংরেজী স্কুলটি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৪০ সালে এই স্কুল জেলা স্কুলে পরিণত হয়ে পরে কলেজিয়াট স্কুল নামে খ্যাত হয়। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এফ. টিড। ঐ সময়কার বিত্তালয় পরিদর্শকের মতে টিডের শিক্ষা পদ্ধতি ও বিত্তালয় পরিচালন ছিল অত্যন্ত সুষ্ঠ। ১৩ বছর বয়সে সঞ্জীব এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। এই সময়কার একটি ঘটনা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন—

"একদিন টিড সাহেব ক্লাস পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময় তাঁহার যে এক বেলার মধ্যে বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন।"[৬]

সঞ্জীব ও বঙ্কিমের সৌভ্রাত্ব যে আজীবন অটুট ছিল, তার সূচনা বাল্যকালেই দেখা গিয়েছিল। অগ্রজ হলেও সঞ্জীব ছেলেবেলার থেকেই বঙ্কিমের খেলার সাথী মনের দোসর ছিলেন। বরং অগ্রজ হওয়া সত্ত্বেও সঞ্জীব বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা ও ভয় করতেন। ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন, আর বঙ্কিমও পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসতেন সঞ্জীবকে বেশী। তাই জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত বঙ্কিম তাঁর আজীবনের সখাকে ছাড়তে পারেন নি।

মেদিনীপুরে যে সব শিক্ষকের কাছে সঞ্জীব শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁর মধ্যে ছিলেন টিড ও সিনক্লিয়ার সাহেব, বৈকুণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন জানা ইত্যাদি। রাজনারায়ণ বসু ঐ স্কুলের (১৮৫১ খৃঃ) প্রধান শিক্ষক হয়ে গেলেও সঞ্জীব বা বঙ্কিম কেউ তাঁর কাছে পড়েন নি। বিত্তালয়ে সঞ্জীব আপন প্রতিভা ও মেধা বলে যে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হবেন তা বলা বাহুল্য। এই সময়ের কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখছেন—

"সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা দিলে, তাঁহার বিত্তোপার্জনের পথ সুগম হইত, কিন্তু বিধাতা সেরূপ বিধান করিলেন না। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম, সঞ্জীবচন্দ্রকে আবার হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল, জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষা বিলম্ব পড়িয়া গেল।"[৭]

এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র কোন সাল তারিখ উল্লেখ না করলেও বঙ্কিমের সঙ্গেই সম্ভবত সঞ্জীব একইসঙ্গে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। তা যদি হয়, তবে সময় ১৮৪৯ সালের অক্টোবর মাস। পূর্ণচন্দ্রের বিবরণ থেকে জানতে পেরেছি বঙ্কিমের জন্মে এই সময়

একজন গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সম্ভবত ঐ শিক্ষকের কাছে সঞ্জীবও কিছুদিন পড়েছিলেন। বঙ্কিমের কথায় তার সমর্থন পাওয়া যায়। "সঞ্জীবনী সুধায়" বঙ্কিম লিখছেন—

"এই সকল ঘটনাগুলিকে গুরুতর শিক্ষা বিভ্রাট বলিতে হইবে। আজি এ স্কুলে, কাল ও স্কুলে, আজি গুরু মহাশয়, কালি মাষ্টার আবার গুরু মহাশয়, আবার মাষ্টার, এরূপ শিক্ষা বিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্যোপার্জন করিতে পারে না। যাঁহারা গবর্ণমেন্টের উচ্চতর চাকরী করেন, তাঁহাদের সন্তানগণকে প্রায় সচরাচর শিক্ষাবিভ্রাটে পড়িতে হয়। গৃহকর্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থব্যয় এবং আত্মসুখের লাঘবস্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় হইতে পারে না।"

সন্দেহ নেই সঞ্জীবের বাল্যজীবনের এই শিক্ষা বিভ্রাট যে খুব ক্ষতি করেছিল তার প্রমাণ পরীক্ষায় বারবার অকৃতকার্যতা, যদিও সঞ্জীব মেধায় কারো চেয়ে কম ছিলেন না, অথচ বঙ্কিম এই অবস্থার মধ্যেই নিজের লেখাপড়া সম্পর্কে অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠ ছিলেন। অপর পক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন খেয়ালী এবং আত্মভোলা প্রকৃতির। নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি তিনি কখনও কঠোর হতে পারেন নি। এই প্রকৃতির মানুষরা অভিবাভকহীন হয়ে পড়লে প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে যেতে সময় লাগে না। আর এই কারণেই বঙ্কিম অনুজ হয়েও চিরদিন তাঁর অভিবাভক হয়েই কাটিয়ে যান। জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তার বহু প্রমাণ আমরা পাব। সঞ্জীবচন্দ্রের লেখাপড়া সম্পর্কে যে বঙ্কিম গোড়া থেকেই চিন্তিত ছিলেন তার প্রমাণ তিনি সঞ্জীবের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন।

"পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্তনে বিদ্যাশিক্ষার অতিশয় বিশৃংখলতার সম্ভাবনা, আর দিকে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকদের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদেও তাঁহাকে পড়িতে হইল। এই সময় পিতৃদেব বিদেশে, আমাদিগের সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি উপলক্ষে বিদেশে। মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্তা Lord of himself, that heritage of woe!"

এর ফল যা হবার তাই হলো। কুসংসর্গে পড়ে সঞ্জীব লেখাপড়া ছাড়লেন। নামে তিনি হুগলী কলেজের ছাত্র। কিন্তু পরীক্ষার দিন তিনি নিশ্চিন্তমনে সতরঞ্চ খেলছেন। বালক অভিভাবক বঙ্কিম যখন মনে করিয়ে দিলেন পরীক্ষার কথা, সঞ্জীবের কুসঙ্গীরা (যাদের বঙ্কিম 'বানর সম্প্রদায়' বলেছেন, তারা) সংখ্যাগুরুত্বের জোরে প্রমাণ করলো যে বঙ্কিম অতি দুষ্টবালক, এবং মিথ্যা করেই পরীক্ষার কথা বলে তাদের তাড়াতে চাইছে এবং গোয়েন্দাগিরি করে সেই কুসঙ্গীদের কীর্তিকলাপ মায়ের কাছে নালিশ করবে। লেখাপড়াটাও নাকি বঙ্কিমের ভাণ। সঞ্জীব অনুজের কথা অপেক্ষা বন্ধুদের কথা বেশী বিশ্বাস করলেন এবং পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তার ফলে উঁচু ক্লাসে প্রোমোশন না পাওয়ায় তিনি ভগ্নোৎসাহ হয়ে কলেজের পড়া

ছেড়ে দিলেন। এইখানে হুগলী কলেজের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। হুগলী স্কুল ও কলেজ একই বাড়ীতে ছিল। স্কুলের দুটি বিভাগ—জুনিয়ার ও সিনিয়ার। জুনিয়ারে ৪টি শ্রেণী ও সিনিয়ারে ৩টি শ্রেণী। স্কুল রেকর্ডে মোট ৯টি শ্রেণী ছিল বলে উল্লেখ করা আছে—বোধ হয় কোন কোন শ্রেণীতে একাধিক বিভাগ ছিল। বঙ্কিমের বাল্যকালের ইতিহাস হতে জানা যায়, তাতে মনে হয় জুনিয়ার বিভাগের শেষ পরীক্ষা দিয়ে সিনিয়ারে ওঠা সঞ্জীবের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই সময় যাদবচন্দ্র বর্ধমানের ডেপুটি কালেকটর ছিলেন। বঙ্কিম লিখছেন—"তখন রেল হয় নাই।" অর্থাৎ সময় নিঃসন্দেহে ১৮৫৩ সালের আগে। সঞ্জীবের বয়স তখন ১৬/১৭ বছর। যাদবচন্দ্র সঞ্জীবকে নিজের কাছে এনে রাখলেন, কলেজে ভর্তি হওয়া বা পড়াশুনার জন্যে কোন পীড়াপীড়ি করলেন না। ছেলের লেখাপড়ার ভার ছেলের উপরই ছেড়ে দিলেন। বন্ধনভীরু সঞ্জীবচন্দ্র বিদ্যালয়ের ও পরীক্ষার বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে বিপুল উদ্যমে পড়াশুনো শুরু করলেন। বোধ করি সঞ্জীবের জীবনের ইতিহাসে এই বন্ধন মুক্তির কালগুলিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠসঞ্চয় কাল। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

"সহসা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিল। যে আগুন এতদিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল, তাহা জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া চারিদিকে আলো করিল। এই সময়ে আমাদিগের সর্বাগ্রজ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ব্যারাকপুরে চাকরি করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেন্টের একটি উত্তম ডিষ্ট্রিক্ট্ স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন যে, সকলেই আশা করিল যে তিনি পরীক্ষায় যশোলাভ করিবেন, কিন্তু বিধিলিপি এই যে পরীক্ষায় তিনি চিরজীবন বিফলযত্ন হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল, শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না। তারপর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয় গেলেন না।"

সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হলেও তাঁর প্রকৃত শিক্ষা যে হয়েছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও দেখবো ছেলেবেলার শিক্ষা সম্পর্কে বঙ্কিমের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"ক্লাসে কখনও থাকিতাম না।······কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে মা সেকালের বড় উপর আরও একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয় নি, নীতিশিক্ষা কখনও হয় নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি, বলা যায় না। বাল্যে প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে বসিয়া আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি তাহাই অধিক প্রয়োজনীয় এবং এই শিক্ষাই উত্তরকালে অধিক উপকারে আসিয়াছিল।"[৭]

এই স্মৃতিচারণে বঙ্কিম যেমন নিজের কথা বলেছেন, তেমনি, তার মধ্যে সঞ্জীবের

নিজের কথাও একইভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বঙ্কিম অপেক্ষা সঞ্জীবের প্রকৃতির শিক্ষা বেশী পরিমানে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্কুল কলেজের শিক্ষা বঙ্কিমকে যতখানি বাঁধতে পেরেছিল সঞ্জীবকে বাঁধা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব হয় নি। ফলে দেশকালের ও পুঁথিপত্রের ঊর্দ্ধে সঞ্জীবের প্রতিভা নিজস্ব পথটুকু সহজেই আবিষ্কার করে নিতে পেরেছিল। অথচ জীবন অথবা সাহিত্য কোন পথেই সঞ্জীবের একনিষ্ঠ সাধনা ছিল না, সে পথ আপন খেয়ালে আপন রীতিতে ও নিজস্ব গতিতে আলো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

প্রকৃতির শিক্ষা সঞ্জীবের কি ভাবে শুরু হয়েছিল তার পরিচয় বঙ্কিমই দিয়েছেন—

"বিনা সাহায্যে, কিন্তু নিজ প্রতিভাবলে, অল্পদিনে ইংরেজি সাহিত্যে বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষালাভ করিলেন। কলেজে যে ফল ফলিত ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন। তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে, এখন ইহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।"

সঞ্জীবচন্দ্রের ছাত্রজীবন শেষ, কর্মজীবন শুরু। যাদবচন্দ্র সঞ্জীবকে বর্ধমানের কমিশনারের আপিসে একটি সামান্য কেরানীর কাজ জুটিয়ে দিলেন যদিও চাকরীটি সামান্য কিন্তু ভবিষ্যতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রজকে এতই ভালবাসতেন যে সঞ্জীবের পক্ষে সামান্য কেরানীগিরিব চাকরী তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। তিনি নিজে তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের নতুন ল' ক্লাসে পড়বার জন্যে ১৮৫৬ সালের ১৭ই এপ্রিল হুগলী কলেজ ছেড়েছেন। তখন আইনের ক্লাসে ভর্তি হবার জন্যে কোন পাশ না করলেও চলত। তিনি সঞ্জীবকে চাকরী ছেড়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পডবার পরামর্শ দিলেন। চাকরীর বন্ধনের চেয়ে সঞ্জীবের কাছে পডাশুনা নিশ্চয়ই বেশী প্রিয় ছিল। ১৮৫৬ সালের শেষের দিকে সঞ্জীব প্রেসিডেন্সী কলেজে আইনের ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেলেন। বঙ্কিমের উৎসাহে তিনি প্রথমদিকে নিশ্চয়ই খুব মন দিয়ে আইন পড়েছিলেন—পরবর্তী কালে যার ফল ফলেছিল—'বেঙ্গল রায়ত' রচনায়। কিন্তু তখন আইনের ক্লাস তিন বছরের জন্য তিনটি। হুগলী কলেজে আইনের ক্লাস না থাকায় দুই ভাইকে কলকাতায় অর্থব্যয় করে পড়াশুনো করতে আসতে হয়, সংসার সচেতন বঙ্কিম মধ্যবিত্ত পিতার পক্ষে ঐ খরচকে অপব্যয় বলে মনে করতে লাগলেন। ফলে দুই বছর পরে বঙ্কিম চাকরী করতে গেলেন, আইন পড়া আর শেষ করলেন না, কিন্তু ক্ষতি হল সঞ্জীবের। বঙ্কিমের সতর্ক পাহারা ও নিরন্তর উৎসাহ না থাকায় সঞ্জীব আইন পড়া সম্পর্কে হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এখানে একটি মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন—

"সঞ্জীবের প্রাপ্ত সার্টিফিকেটাদিতেও দেখা যায় যে সঞ্জীব তিন বৎসর ল' কলেজে ১৮৫৯ সালে বি. এল পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতিপত্র পাইয়াছিলেন, এমন কি

২৫ টাকা ফিও জমা দিয়াছিলেন।"[৮]

বঙ্কিমও এই তথ্য সমর্থন করে গিয়েছেন—'তিনি শেষ পর্যন্ত রহিলেন, কিন্তু পড়াশুনায় আর মনোযোগ রহিল না।' তিনি শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। সম্ভবত তিনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু পাশ করতে পারেন নি, বঙ্কিম বলছেন—

"পরীক্ষার সফলতা বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই, পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন।"

এই সময় সঞ্জীবচন্দ্রের বয়স ২৫ বছর।

বাল্যে ও যৌবনে সঞ্জীবচন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য কেমন ছিল তার কিছু কিছু আভাস সমকালের কেউ কেউ দিয়ে গেছেন। সঞ্জীব চরিত্রে যেমন বঙ্কিমের ঠিক বিপরীত ছিলেন, সম্ভবত স্বাস্থ্যও তাই। বাল্যের ক্রীড়া কৌতুকপ্রিয় সঞ্জীবের স্বাস্থ্য ভালোই ছিল। অথচ বঙ্কিমের স্বাস্থ্য ছেলেবেলায় খুবই খারাপ ছিল, প্রায়ই তিনি অসুস্থ থাকতেন, স্বাস্থ্য সচেতন সঞ্জীবের বঙ্কিমের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকতেন। বঙ্কিম অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনো করতেন কিন্তু সঞ্জীব সকাল সকাল শয্যাগ্রহণ করতেন। কিশোর বঙ্কিম তখন নববিবাহিত। প্রথমা পত্নী মোহিনী দেবী তখন কাঁটালপাড়ার পাশের গ্রাম নারায়ণপুরে বাপের বাড়ী থাকতেন। প্রায়ই রাত্রে বঙ্কিম বালিকাবধূর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে চুপি চুপি শ্বশুরালয়ে চলে আসতেন, আবার ভোর হবার আগেই বাড়ী ফিরে পড়ার টেবিলে পড়তে বসতেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখছেন—

"সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমকে পড়িতে দেখিয়া শুইতে যাইতেন। আর ভোরে আসিয়াও পাঠনিমগ্ন দেখিতেন। আশ্চর্য হইয়া তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন—বঙ্কিম কি সারারাত জেগে পড়েছে?"[৯]

নিয়মিত পড়াশুনা করা সঞ্জীবের প্রকৃতির মধ্যে ছিল না। শুধু পড়াশুনো কেন, কোন বিষয়েই তাঁর কোন নিয়মিতি ছিল না। প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সঞ্জীবের জীবনে কোন সাধনা ছিল না বলেই তিনি তাঁর প্রতিভাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

কবি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত করলে আমরা সঞ্জীবচন্দ্রের আকৃতি ও প্রকৃতির সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারবো। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' লিখছেন—

"তাহার পরদিন বর্ধমান যাই, এবং সেখানে এক উকিলবাবুর বাসায় থাকি। তাঁহার সঙ্গে সমস্ত বর্ধমান দেখিয়া আসিয়া বলিলাম যে আমি সঞ্জীববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তিনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে সঞ্জীববাবু এরূপ দেমাকি লোক যে বর্ধমানে এমন কেহ নাই যে আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কাছে যাইবে। তিনি নিজে কবুল জবাব দিলেন—'হেবো না অবধড়'। পরদিন

প্রাতে আমি জজ ফিলড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, দেখিলাম রাস্তার পার্শ্বে বৃহৎ হাতা শোভিত একটি বাঙ্গলোর বারাণ্ডায় একজন তেজঃপুঞ্জ গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি ব্রাহ্মণ অনাবৃত দেহে বেড়াইতেছেন। মূর্তিখানি দেখিয়া কোচয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ লোকটি কে' ? সে বলিল 'সঞ্জীববাবু'। আমি প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। গাড়ীখানি হাতায় লইয়া টিকেট পাঠাইয়া দিলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম কি জানি, তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য। কার্ড পাইবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিয়া চির পরিচিতের মত আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। আমি মনে ভাবিলাম, এই কি সেই দেমাকি সঞ্জীববাবু। দুই ঘণ্টা কাল দুজনে কি আনন্দে কথোপকথন করিলাম, এবং তিনি কি আদরই করিলেন। সেদিন শনিবার ছিল। তিনি বলিলেন, বঙ্কিমবাবু আমাকে দেখিতে বড়ই উৎসুক। বলা বাহুল্য, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তদপেক্ষা শতগুণ বেশী উৎসুক ছিলাম। সঞ্জীববাবু আমাকে তখনই কয়েদ করিয়া, সন্ধ্যার ট্রেনে তিনি লইতে চাহিলেন। আমি অসম্মত হইলে তিনি বলিলেন যে সে রাত্রির ট্রেনে তিনি নৈহাটী যাইবেন, এবং পরদিন তাঁহাদের এক জায়গায় নিমন্ত্রণে যাইবার কথা আছে, তাহা বারণ করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন। আমি বলিলাম 'পরদিন প্রত্যাবর্তনপথে অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে আর একদিন থাকিয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি।' তিনি বলিলেন—'আমি সে ওজর শুনিব না। আমি নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া ট্রেনের সময়ে হুগলী স্টেশনে আসিয়া আপনার অপেক্ষা করিব। যদি না যান, অভদ্রতার একশেষ হইবে।' উকিলবাবুর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে প্রায় এগারটা হইয়াছিল। তিনি না খাইয়া বসিয়া আছেন। আমি ফিরিয়া গিয়া যখন বলিলাম যে সঞ্জীববাবুর বাড়ীতে বিলম্ব হইয়াছে, তখন তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—'আপনি একজন না মস্ত কবি, তাই সঞ্জীববাবুর কাছ কল্কে পাইয়াছেন।' পরদিন প্রাতের ট্রেনে হুগলী স্টেশনে পৌঁছিয়া সঞ্জীববাবুকে দেখিলাম না। তৎ-পরিবর্তে দেখিলাম, অক্ষয়দাদা আমার অপেক্ষা করিতেছেন। সঞ্জীববাবুর অপেক্ষা করিবার কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি বলিলেন,—চাটুজ্যেদের দেমাকের খবর রাখ না, তাই মনে করিয়াছিলে যে সঞ্জীববাবু স্টেশনে আসিবেন। এখন নৈহাটী যাওয়া হইবে না, সোজা পথে আমার বাড়ী চল। তোমার বৌ ঠাকুরাণী রাঁধিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাই করিলাম এবং আর একটি মধ্যাহ্ন পরম আনন্দে কাটাইয়া অপরাহ্ণ চারিটার সময় গঙ্গা পার হইয়া নৈহাটী চলিলাম।...গাইতে গাইতে নৌকা নৈহাটীর ঘাটে পৌঁছিল এবং আমরা বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। রেলের লাইন পার হইবামাত্র সঞ্জীববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের ওলাওঠা হইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রাতে স্টেশনে যাইতে পারেন

নাই বলিয়া আমার কাছে যথেষ্ট ক্ষমা চাহিলেন। তিনি আমাকে দক্ষিণ হস্তে আদরে জড়াইয়া একটি ঘরে লইলেন, এবং ফরাস বিছানায় বসাইয়া বঙ্কিমবাবুকে খবর দিলেন। শুনিলাম, সেটি বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা। একটি শিবালয়ের সঙ্গে লাগান একটি হল এবং তাহার অপর পার্শ্বে দুটি কক্ষ। হলের চারিদিকে প্রাচীরের কাছে কাছে দুই চারিখানি কৌচ ও কুসনওয়ালা চেয়ার, ফরাস বিছানার উপর ছিল। প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানি ছবি এবং হলের এক কোণায় একটি হারমোনিয়াম। আমি কক্ষের সজ্জা দেখিতে দেখিতে সঞ্জীববাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। অক্ষয়বাবু পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, একটি একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশ, চক্ষু দুটি নাতি ক্ষুদ্র, নাতি বৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল। নাসিকা উন্নত, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাসিযুক্ত, তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাড়া—অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, মুখও ঈষৎ দীর্ঘ এবং সুগঠিত অঙ্গে বাহু পর্যন্ত একটি সামান্য পিরান এবং পরিধানে নয়নসুকের ধুতি। দেখিবামাত্রই মূর্তিখানি সুন্দর সতেজ এবং প্রতিভান্বিত বোধ হয়। সঞ্জীববাবু হাসিয়া বলিলেন—'বলুন দেখি লোকটি কে?' আমি ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর না দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন—'সত্য সত্যই বলুন দেখি আমি কে? আমি হাসিয়া বলিলাম 'বঙ্কিমবাবু'। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন'? আমি উত্তর করিলাম 'শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।' সকলে হাসিয়া উঠিলেন এবং বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'বটে! আমার গোঁফের উপরেই আপনার প্রথম নজর পড়িয়াছে?' আমি বলিলাম—'পড়িবার নয় কি?' আবার সকলে হাসিলেন, এবং সঞ্জীববাবু বলিলেন—'দেখা যাক কার জিৎ হয়।' তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—ছোকরাদেরই চিরকাল জিৎ হইয়া থাকে। সত্য সত্যই আপনি যে এত ছেলেমানুষ আপনার লেখা দেখিয়া ও পত্র পড়িয়া মনে করি নাই।' সঞ্জীববাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনি ইহার কবিতা পড়িয়াছেন, ইংরাজী পত্র দেখেন নাই। আমি এমন সুন্দর ইংরাজী অতি অল্প বাঙ্গালীরই দেখিয়াছি।' আমি অক্ষয়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—'দাদা শুনিলেন কি'? এঁর মুখে আমার ইংরাজীর প্রশংসা। তাঁর সাক্ষাৎ আমি কলমটি ধরিবারযোগ্য নহি।' অক্ষয়বাবুকে দাদা ডাকিতে শুনিয়া বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন—'বটে। অক্ষয় আপনার দাদা, অক্ষয় আমার নাতি, এবং অসাধারণী আমার নাতবৌ। অতএব তুমিও আমার নাতি। এত ছেলেমানুষকে আর আপনি বলা যায় না'। অক্ষয়বাবুর কাগজের নাম 'সাধারণী', তাই বঙ্কিমবাবু তাঁহার স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন—'অসাধারণী'। ইহার পর অনেক গল্প চলিল। সঞ্জীববাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিয়া বলিলেন—

'বঙ্কিম। তুমি এর কবিতার ও ইংরাজীর প্রশংসা করিলে, কিন্তু এঁর কথা শুনিয়া অবাক হইয়াছি এর বাড়ী চাটগাঁ বলিতেছেন, অথচ কথায় বাঙ্গাল দেশের গন্ধমাত্র নাই, ঠিক আমাদের মত বলিতেছেন।"[১০]

আমাদের উদ্ধৃতি এখানে নিঃসন্দেহে কিঞ্চিত অতিরিক্ত হয়েছে। তবু সঞ্জীব-বঙ্কিমের সারস্বত পরিমণ্ডলটির একটি জীবন্ত চিত্র আমরা এখানে পেলাম। তাছাড়া সঞ্জীব সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য আমরা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকেই পাচ্ছি।

১। সঞ্জীবের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য—অনাবৃত দেহের তেজঃপুঞ্জ মূর্তিটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সঞ্জীব দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বঙ্কিমের চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁর উন্নত দেহটি ছিল সুগৌর। সঞ্জীব বঙ্কিম উভয়েই সুপুষ্ট গোঁফ রাখতেন। তাঁর চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপও খুব স্পষ্ট ছিল।

২। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রকৃতির আর একটি দিক এখানে স্পষ্ট—তিনি যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অথবা স্পেশাল সাব রেজিষ্টার ছিলেন তখন উকিল মোক্তার আমলারা তাকে বেশ ভয় করে চলতেন। তার কারণ সম্ভবত তাঁর ন্যায় নিষ্ঠা। বঙ্কিমের মত তিনিও বিচারক হিসাবে কোনদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি। সাহিত্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঞ্জীব খুব প্রাণ খোলা ব্যবহার করলেও অধস্তন কর্মচারী ও জ্ঞাতিদের সঙ্গে তিনি গাম্ভীর্যময় দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। ফলে তাঁকে অনেকেই বাইরে থেকে দেমাকি বা অহংকারী বলে মনে করতো।

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঞ্জীবের সম্পর্ক অন্যান্য ভাইদের থেকে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ছিল। বঙ্কিমের সঙ্গে বসে তিনি মদ্য পান করতেন বন্ধুর মত। ('আমার জীবন'—৪০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৪। যে সময়ের ঘটনা নবীনচন্দ্র উল্লেখ করেছেন সেই সময় (১৮৭৫-৭৬ খৃঃ) সঞ্জীবচন্দ্র বর্ধমানে স্পেশাল সাব রেজিষ্টার। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনী প্রসঙ্গে বলেছেন—'বর্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকিবার সময়ই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে'।

৫। নবীনচন্দ্রের উল্লেখিত ঘটনায় সঞ্জীবচন্দ্রের মজলিসী স্বভাব ও ব্যবহারের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

সঞ্জীবচন্দ্রের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিটিও আমরা উল্লেখ করবো। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"এই সময়ে কিম্বা ইহারই কিছু পূর্ব হইতে আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশী কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত, আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না। এক একদিন দেখিতাম সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশী

হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে সে লেখাগুলি কথা কাহার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া, এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে। তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরও কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।"[১১]

১৯৩৮ সালে, ১৩৪৫ সনের ২১শে শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যে বক্তৃতা করেছিলেন তার অনুলিপি গ্রহণ করেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। ২৪শে শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট ১৯৩৮) আনন্দবাজার পত্রিকায় 'শান্তিনিকেতনে বঙ্কিম শতবার্ষিকী : সাহিত্য সম্রাটের প্রতি কবিগুরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি' এই শিরোনামে লেখাটি প্রকাশিত হয়। সেখানে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন—

"ছেলেমানুষ হলেও বঙ্কিম আমাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর কাছে যথেষ্ট প্রীতি ও স্নেহ পেয়েছি।

তাঁর দাদা সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন মজলিসী মানুষ। একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। মাটিতে তাকিয়া নিয়ে উপুড় হয়ে বিশাল দেহটি নিয়ে তিনি বিরাজ করতেন। আমাদের দেখলে আনন্দে হাস্যে স্নেহে আদরে সর্বভাবে স্বাগত করতেন। তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। কিন্তু তাঁর মধ্যে গিন্নীপনা ছিল না বলে তিনি তাঁর শক্তির অনুরূপ সম্পদ রেখে যেতে পারেন নি।

বঙ্কিম ছিলেন অন্যরূপ। তিনি ঋজু অল্পবাক, দুরারাধ্য শুদ্ধ সাধক।"

সঞ্জীবচন্দ্রের আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে এমন সার্থক সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কেচ আর কারও রচনায় আমরা পাই নি। "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে তিনি প্রায় একই কথা বলেছেন।

আমরা আগেই বলেছি সঞ্জীবচন্দ্রের ছাত্রজীবন ২৫ বছর বয়সে শেষ হলেও কর্মজীবন তার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই 'সঞ্জীবনী সুধা'র ভূমিকায় লিখছেন—

"তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে, এখন ইহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্ধমান কমিশনারের অপিসে একটি সামান্য কেরানীগিরি করিয়া দিলেন। কেরানীগিরিটি সামান্য। কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্য। তাঁহার সঙ্গে যে যে সে অপিসে কেরানীগিরি করিত, সকলেই পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিল। ইনিও হইতেন, উপায়ান্তরে হইয়াছিলেন। কিন্তু পথে আমি একটি প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলাম। তিনি যে একটি ক্ষুদ্র কেরানীগিরি করিবেন ইহা আমার অসহ্য হইত। তখন নূতন প্রেসিডেন্সী কলেজ খুলিয়াছিল, তাহার ল'ক্লার্স তখন নূতন।"

আমরা আগেই বলেছি এই সময়টি হচ্ছে ১৮৫৬-৫৯ সাল। তাহলে দেখা যাচ্ছে

সঞ্জীবচন্দ্র ২০/২২ বছর বয়সেই প্রথম চাকরীটি গ্রহণ করেন। এর আগে কোন চাকরী সঞ্জীবচন্দ্র পেয়েছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। জীবন ও জীবিকা শুরু হতেই ছন্দপতন। আইন পরীক্ষায় পাশ করা হল না, তখন সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়াতেই থাকেন। তখনও সাহিত্য চর্চা শুরু করেন নি। অলস দিনগুলি সংসারের মধ্যে স্ত্রী, নবজাত পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রকে (১৮৬০ সাল) নিয়ে এবং বাইরে আত্মীয় প্রতিবেশী গান বাজনা যাত্রা কথকতা ও ফুলের বাগান করে কাটছে। ১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৬০ সাল এক বছর সঞ্জীব বাড়ীতে কাটিয়েছিলেন এই সময়ের কথা 'সঞ্জীবনী সুধায়' বঙ্কিম লিখছেন—

"তখন উদারচেতা মহাত্মা এ সকল ফলাফল কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া কাঁটালপাড়ায় মনোহর পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন।"

সঞ্জীবচন্দ্রের এই পুষ্পোদ্যানটি ছিল অতি বিখ্যাত। অতন্দ্র প্রহরীর মত সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর সাধের বাগানটি পাহারা দিতেন। পরবর্তী কালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর স্মৃতিকথায় এই ফুলের বাগান নিয়ে খুব মজার স্মৃতিকথা লিখছেন—

"আমরা প্রায় ফুল ছিঁড়িতাম। ফুল ছিঁড়িলেই কেহ না কেহ আসিয়া আমাদের ভয় দেখাইত, তোমাদিগকে ধরিয়া সঞ্জীববাবুর কাছে লইয়া যাইব। সঞ্জীববাবু আমাদিগকে কি শাস্তি দিতেন জানিতাম না, কিন্তু সেই অবধি আমরা জানিতাম যে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুরের পুত্রেরা বড দুষ্ট লোক, ছেলেপিলে ধরিয়া মারেন, সেই অবধি আমরা অনেকবার সুযোগ হইলে রায়বাহাদুরের বাড়ী বড় একটা যাইতাম না।"

তারপর যৌবনে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় যখন প্রথম চট্টোপাধ্যায় বাড়ীতে গেলেন তখনকার স্মৃতিচারণে তিনি বলছেন—

"তিনি (বঙ্কিম) জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রাহ্মণ'? রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন 'হাঁ' তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, নৈহাটী বাড়ী, ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি. এ. পাশ করিয়াছ আমাদের এখানে আসনা কেন? আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, 'সঞ্জীববাবুর ভয়ে'। তাহারা সকলেই ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন, আমার ভয়, কেন?' 'শুনিয়াছি কামিনী গাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন'।"[১২] হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল।

যাই হোক পরের ঘটনা সম্পর্কে বঙ্কিম লিখছেন—

"পিতাঠাকুর মনে করিলেন পুত্রের পুষ্পোদ্যানে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা অর্থ উপার্জন করা ভাল। তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহা করিতেন। তখন উইলসন সাহেব নুতন ইনকমটেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতে ছিল। পিতাঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনের একটি

আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।" এই আসেসরিকেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্ভবত সাবরেজিষ্টরি বলেছেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন—

"৬০-৬১ সালে পিতা (গঙ্গাচরণ) যখন জাহানাবাদে মুনসেফ, বঙ্কিমবাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র, তখন জাহানাবাদে সাবরেজিষ্টার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুইজনে বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যাইতেছেন বলিয়া সঞ্জীববাবু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারির নিকট বঙ্কিমবাবুর জন্য একটি বাটী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন।"[১৩]

হুগলীর জাহানাবাদ রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর থেকে ৫-৬ মাইলের মধ্যে। আবার গড়মান্দারণ (দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের পটভূমি) জাহানাবাদের কাছেই। এই সময় জাহানাবাদ থেকে বঙ্কিম বিষ্ণুপুরের পথে গড়মান্দারণ থেকেই সম্ভবত দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনী কিংবদন্তী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

জাহানাবাদের প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের স্মৃতিকথায় জানতে পারলাম বঙ্কিমের প্রতি সঞ্জীবের অন্তরঙ্গতা ছিল অকৃত্রিম। এমন কি পরবর্তীকালে সঞ্জীবকে নিয়ে বড় ভাই শ্যামাচরণের সঙ্গে বঙ্কিমের বিরোধ পর্যন্ত হয়েছিল, যার ফলে তিনি কাঁটালপাড়া ছেড়ে গিয়েছিলেন (চিঠিটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে)। শতদোষ থাকা সত্ত্বেও তিনি মেজদাদা সঞ্জীবকে যতই শাসন করুন, কিন্তু শেষদিনটি পর্যন্ত বঙ্কিম সঞ্জীবকে ছাড়েন নি। তাঁর সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্যের বোঝা নিজের কাঁধে বহন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

"কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল। তারপর পদটা এবলীশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন যে পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন।"

এখানে একটি সময়ের উল্লেখ করা যায়। কাঁটালপাড়ায় যাদবপুর শিবমন্দিরের গায়ের লেখা থেকে জানা যায় ১৭৮৪ শকাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১২৬৯ সনে বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার দিনেই শ্যামাচরণ যাদবচন্দ্রকে দিয়ে নবনির্মিত পঞ্চরত্ন মন্দিরে এক শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করান—

'শিবঃ সমন্দিরো যাদবেশ শর্মানা'। যাদবচন্দ্র একটি পুষ্করিণীও সেই দিনেই প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দিনেই ইঃ বিঃ রেলওয়ে নৈহাটীর পথে চলে। নৈহাটী স্টেশনের কাছেই এই রথতলাটি এখনও বর্তমান। বঙ্কিমচন্দ্রের সঞ্জীব জীবনীর এই অংশ থেকে শ্যামাচরণের সঙ্গে সঞ্জীবের অসদ্ভাবের কারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৮৬২ সালের জুন মাসে তাঁর পুষ্পোদ্যান ধ্বংস হওয়ায় ইংরেজী 'বেঙ্গল রায়ত' রচনায় মনোযোগী হলেন। রচনাকাল ১৮৬৩। প্রকাশকাল ১৮৬৪। ১৮৬৫ 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়, তার আগে বঙ্কিম বারুইপুর থেকে বাড়ীতে আসেন, সেই সময় সঞ্জীবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, দুর্গেশনন্দিনী পড়েও শোনান এবং সঞ্জীব তা ছাপাবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ১৮৬৪ সালের শেষের দিকেই সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ পান। সেই সময় বাংলার গবর্ণর ছিলেন স্যার জন পিটার গ্রান্ট। তিনি নীলকরদের অত্যাচারে নিতান্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি এই অত্যাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকজন দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেন। এই সময়েই তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ পত্র দেন। সঞ্জীবচন্দ্রের নিয়োগ স্থল হল কৃষ্ণনগর।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম কর্মজীবনের (১৮৬৪ সালের আগে) সঠিক হিসাব পূর্বোল্লিখিত স্মৃতিকথাগুলি ছাড়া সরকারী নথিপত্রে কিছু পাওয়া যায় না। যাদবচন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণই ১৮৫৬ সালে প্রথম সরকারী কর্মচারী অর্থাৎ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কাজে যোগ দেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৯ সালে ঐ একই পদে নিয়োজিত হন। পাকাপাকি ভাবে সরকারী কাজে সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬৪ সালে যোগদান করেন। এই কর্মপ্রাপ্তির কারণরূপে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বেঙ্গল রায়ত'কেই দায়ী করেছেন। ঐ গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৬৪ সালের মে মাসে। তখনকার বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট তার কর্মচারীদের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল তার থেকেই সঞ্জীবচন্দ্রের কর্মজীবনের সঠিক হদিশ আমরা পেয়েছি। **Civil List of Bengal Government** প্রতি তিনমাস অন্তর সরকারী কর্মচারীদের যে তালিকা প্রকাশ করতো তার থেকেই আমরা সঞ্জীবচন্দ্রের কর্মজীবনের একটি সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়েছি।

১৮৬৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর সঞ্জীবচন্দ্র প্রোবেশনারি ২য় শ্রেণীর সাবর্ডিনেট অর্থাৎ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কাজে যোগদান করেন। তাঁর কর্মস্থল হয় নদীয়া। নদীয়া জেলার সদর অফিস তখন কৃষ্ণনগর। এইখানে সেই সময় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বাড়ী তৈরী করে বাস করতেন। সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে দীনবন্ধুর হৃদ্যতা বহুপূর্বেই ছিল, দীনবন্ধু তখন নদীয়া বিভাগে ডাক বিভাগের পরিদর্শক।

১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্র নদীয়া বিভাগে কর্মরত ছিলেন। সরকারী নথিভুক্ত কোন ছুটির হিসাব না থাকলেও মাঝে মাঝে যে কাজ কামাই করে তিনি বাড়ী চলে আসতেন তার প্রমাণ কয়েকজনের স্মৃতিকথায় আমরা পেয়েছি। তাছাড়া ছুটির দিনগুলিতে বাড়ী আসতে কোন বাধা ছিল না—কারণ কৃষ্ণনগর থেকে নৈহাটী কয়েক ঘন্টার পথ।

এই কৃষ্ণনগরে তাঁর জীবন খুব সুখের ছিল। বঙ্কিম লিখছেন—

"এক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন, তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন। ইঁহাদের পরস্পরের

আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিল, উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরে অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মা ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন, দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপ-কথনে তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছলিত হইত। কৃষ্ণনগর বাসকালেই সঞ্জীব-চন্দ্রের জীবনে সর্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল। শরীর নীরোগ, বলিষ্ঠ, অভিলষিত পদ, প্রয়োজনীয় অর্থাগম, পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ, ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্য, পারিবারিক সুখ এবং বহু সৎ সুহৃদ সংসর্গসঞ্জাত অক্ষুণ্ণ আনন্দ প্রবাহ। মনুষ্য যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময় পাইয়াছিলেন। দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন।”

বঙ্কিম লিখেছেন সঞ্জীব কৃষ্ণনগরে দুবছর ছিলেন। অর্থাৎ ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণনগরে কাজ করেছিলেন। এই সময় চট্টোপাধ্যায় পরিবারে একটি গুরুতর ঘটনা ঘটে যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৮৬৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে যাদবচন্দ্র একখানি উইল তৈরী করেন। এতে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি যেমন ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন, তেমনি প্রকারান্তরে তিনি ছেলেদের পৃথকও করে দিয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত যাদবচন্দ্রের পুত্রেরা কর্মোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে থাকলেও বাড়ীতে পৃথগন্ন ছিলেন না। যাদবচন্দ্র তাঁর দানপত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণকে কয়েক বিঘা জমি দেন বাড়ীর উত্তরদিকে। পরে তিনি সেখানে বাড়ী তৈরী করেছিলেন। তিনি বাড়ীর দক্ষিণদিকে সমপরিমাণ জমি বঙ্কিমচন্দ্রকে দান করেন, যদিও বঙ্কিম সেখানে কোন বাড়ী তৈরী করেন নি। সঞ্জীবচন্দ্রকে তিনি তাঁর বাড়ীর দোতলার দক্ষিণ দিক দান করেন এবং পূর্ণচন্দ্রকে বাড়ীর উত্তর দিকটি দান করেন। ফলে বাড়ীটি সম্পূর্ণতঃ সদর বাড়ী সহ সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রর অধিকারে আসে। পূর্ণচন্দ্র তখন সবেমাত্র ৬০ টাকা বেতন সাবরেজিষ্ট্রারের কাজে ঢুকেছেন। তাই যাদবচন্দ্র তাঁকে তাঁর পরিবারভুক্ত করে রাখেন। এই দানপত্র সম্পাদনের পরেই চার ভাই যাদবচন্দ্রের কাছে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। তাতে তাঁরা চুক্তি করলেন সম্পদে বিপদে সকলেই পরস্পরকে সাহায্য করবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দানপত্রই তাঁদের ভ্রাতৃবিচ্ছেদের কারণ হয়েছিল। অভিমান বশে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়া ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমের এতই পক্ষপাতী ছিলেন যে তাঁকে বাড়ীতে রাখার জন্যে পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পূর্ণচন্দ্রের সহায়তায় বসতবাড়ীর কিছু অংশ বঙ্কিমকে দানপত্র লিখে দেন। অবশ্য এই দানপত্র যাদব-চন্দ্রের দানপত্রের আট বছর পরে (১৮৭৪ সালে) রচিত হয়েছিল। এই দানপত্রের কাগজখানি হুগলী স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের কাছে ১৮৭৪ সালের ১লা মে ক্রয় করা হয়েছিল। কিন্তু দলিল সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সম্পাদিত হয়। এই দানপত্রের সমগ্র দলিলটি নিচে উদ্ধৃত করা হল।—

“বহু জনমান্য শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওলদে শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবনে

৺শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া হাবেলিসহর, লিখিতং শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কস্য বসত বাস্তু দান পত্রমিদং সন ১২৮১ লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে সদর রেজিষ্টারী নৈহাটী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪-পরগণা এলাকা হাবেলিসহর পরগণা সাকিন কাঁটালপাড়া গ্রামে আমাদের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটী যাহা আছে তাহার চৌহদ্দি পূর্ব সীমানা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুরের বাড়ী উত্তর সীমানা শ্রীনীলমনি চট্টোপাধ্যায় ও সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় দিগের বসতবাটী ও গলির রাস্তা, পশ্চিম সীমানা শ্রীরাখাল দাস চট্টোপাধ্যায়ের বসতবাটী ও অক্ষয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের জমিন, দক্ষিণ সীমানা সদর রাস্তা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন কমবেশী দুই বিঘা জমিনের উপর বসতবাটী আছে, ইতিপূর্বে পিতা ঠাকুর মহাশয় সন ১২৭২ সালের ২১শে মাঘ লিখিত দানপত্রের দ্বারা আমাদিগের দুই ভ্রাতাকে ভদ্রাসন বাটী সমুদয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ঐ ভদ্রাসনের দক্ষিণের অন্দরমহল (খানা) চৌহদ্দি পূর্ব সীমা সদর মহল উত্তর সীমানা আমি শ্রীসঞ্জীব আমার অন্দর মহল পশ্চিম সীমানা রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের বসতবাটী ও অক্ষয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের জমিন দক্ষিণ সীমানা সদর রাস্তা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন কমবেশী ছয় কাঠা জমিন মায় দোতলা পোক্তা ইমারত দোহারা যাহার মূল্য আন্দাজী পাঁচ হাজার টাকা হইবে, যদি চ পিতাঠাকুর মহাশয় আমাদিগের দুই ভ্রাতাকে উক্ত ভদ্রাসন দান করিয়াছেন তথাপি আমাদের মানস যে উক্ত ভদ্রাসন তুমি ও আমরা দুই ভ্রাতা বসবাস করিতে পারি—অতএব আমাদের সুখাবস্থায় ও স্বচ্ছন্ন সময়ে উল্লিখিত চৌহদ্দিস্থিত জমিন মায় ইমারত তোমাকে দান করিলাম। কিন্তু সদরবাটী ও পূজার দালান ও দক্ষিণ পূর্বভাগের দোতলা ও একখানা দোহারা ঘর সমস্ত ও পশ্চিমভাগে যে যে ঘরে সদরের কার্য নির্বাহ হইতেছে তাহাও নীচে উপরে গলির পথ যাহাতে আমাদের যাতায়াত হইয়া থাকে ও জল যাইবার পথ সকল তিন ভ্রাতার সমানাংশে এজমালীতে রহিল আর তোমার অন্দর মহল অর্থাৎ যাহা তোমাকে দান করা হইল ঐ মহলের উপরের পূর্বঘরের পূর্বাংশের নূতন বারান্দা যাহা তোমা কর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে ঐ বারান্দা হইয়া আমাদিগের তিন ভ্রাতার সদর ও মফঃস্বল বাড়ীতে যাতায়াতের পথ নিরূপিত আছে, ঐ পথ নিবারিত হইবেক না এবং তুমি 'কোন বাধা জন্মাইতে পারিবা না, ফলতঃ ঐ বারান্দা তুমি স্বয়ং প্রস্তুত করাইয়াছ, এজন্য ইহার স্বার্থ তোমার থাকিল আর ইহাও প্রকাশ থাকে যে এই দান পত্রের লিখিত দ্বিতীয় চৌহদ্দিস্থিত জমিন মায় ইমারৎ অর্থাৎ এক্ষণে তুমি যে মহলে বাস করিতেছ সেই মহল তোমাকে দান করা গেল ও ঐ মহল তোমার নিজ চিহ্নিত হইল। এতদর্থে অত্র দানপত্র লিখিয়া দিলাম। তুমি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ করিতে রহ, ইতি সন ১২৮১ তাং ১২ই আশ্বিন।" (বঙ্কিম সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত)

এই দানপত্র হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র তখনকার মত পিতৃগৃহ ছেড়ে গেলেন না। এমনকি পরবর্তী কালে যখন পারিবারিক অশান্তি তীব্রতর হয় বঙ্কিম যাদবচন্দ্রকে ১৮৭৯ সালের এক পত্রে লেখেন—

"মেজদার দানপত্র যদি আপনি আপনার দানপত্রের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করেন, তবেই বাড়ী যাইব, নতুবা নয়।"

এইসব ঘটনা থেকে সঞ্জীব বঙ্কিমের সম্পর্কও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাংসারিক ক্ষুদ্রতায় সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিম অপেক্ষা বেশী জড়িয়ে পড়েছিলেন। কর্মবিমুখ গৃহাকাঙ্ক্ষী সঞ্জীব অধিকাংশ সময়েই বাড়ীতে থাকতেন। সাংসারিক ও গ্রাম্য ক্ষুদ্রতার মধ্যে তিনি প্রায়ই লিপ্ত হতেন। তাঁর আর্থিক অবস্থাও ছিল অস্বচ্ছল। তার উপর তাঁর কয়েকটি মহৎ দোষও ছিল। সদালাপী হওয়ার ফলে মদের খরচও ছিল তাঁর বেশী। বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার ধুম প্রায়ই হত। তাঁর জন্যেই সংসার ভাঙে। তাঁর অমিতব্যয়িতা, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে খরচ করা, অভাব মাত্রই ঋণ করা এবং সেই ঋণে পিতা ও বঙ্কিমচন্দ্রকে টেনে আনা, জামাকাপড়ে বেহিসেবি বাবুআনা করা ইত্যাদি দোষ তার চিরদিনই ছিল। আবার দানের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। যেখানে পয়সা দিলে চলে, সেখানে তিনি টাকাটাই ফেলে দিতেন। সঞ্জীব কখনো ট্রামে (তখন ঘোড়ায় টানা ট্রাম ছিল) চড়তেন না, প্রথম শ্রেণীর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীতে বড়মানুষের মত যাতায়াত করতেন। তার উপর ছিল মাঝে মাঝে বেহিসেবী রাগারাগি করা, বেফাঁস কথা বলে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করা ইত্যাদি। বঙ্কিমের একটি চিঠি তার সাক্ষ্য দান করছে—প্রসঙ্গত তার উল্লেখ করা যাবে। এইসব দোষসত্ত্বেও তিনি অনেকের কাছেই খুব প্রিয় ছিলেন। বিশেষ বঙ্কিম সঞ্জীবের ছেলেমানুষি চিরদিন সহ্য করেছিলেন তার কারণ সঞ্জীবচন্দ্রের সহস্র দোষের উপরে ছিল উদার স্বচ্ছ মনটি। ভালবাসা প্রকাশে এবং রাগের প্রকাশে তাঁর মনের স্বচ্ছতা কখনও ম্লান হয়নি। সর্বোপরি ছিল তাঁর রসগ্রাহী রসিক মন। তাঁর সাহিত্য তার জলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর ব্যঙ্গ রসিকতা সম্পর্কে হরপ্রসাদের স্মৃতিকথাটি এখানে স্মর্তব্য—

"সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারী ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৭৪ সালে ডিষ্ট্রিকট অ্যাকট পাশ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজ সাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন সঞ্জীববাবুও একজন কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল রাস্তায় নাম দিতে হইবে, সংকল্প হইল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ সাহেব বলিলেন, আর ৭৫ টাকা চাই কারণ বাঙ্গালা নামগুলো কে বুঝিবে? ওগুলো ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া দিতে হইবে। 'বৌমার গলি' বলিলেই কেহই চিনিবে না। Daughter in law's Lane বলিতে হইবে। জজ সাহেবের

কথায় কেহ আস্থা করিতেছে না, অথচ তিনি বারবার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, '৭৫ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০ টাকা দেওয়া দরকার'। জজ সাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন কেন'? সঞ্জীববাবু বলিলেন, 'আদালতের সম্পর্কে যতলোক আছে, সকলেরই নামই ইংরাজীতে তর্জমা করিতে হইবে। মনে করুন কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উহাকে Black footed friend বলিয়া তর্জমা করিতে হইবে'। সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জজ সাহেব টুপি লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, 'সঞ্জীব ভাল কাজ করিলে না। বাড়ী গিয়া উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস'। সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজ সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সঞ্জীববাবু তিন-চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ম্যাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজ সাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাশ করিতে না পারিবার কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।"[১৪]

আমরা আবার সঞ্জীবচন্দ্রের কর্মজীবনের কথায় ফিরে যাব। তিনি কৃষ্ণনগরে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ সাল থেকে ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। তার পর তিনি সেটেলমেন্ট অফিসার হয়ে ছোটনাগপুরের লোহারদাগা সাবডিবিসনে বদলী হয়ে গিয়েছিলেন। এই লোহারদাগা ছোটনাগপুর জেলায় অবস্থিত হলেও পালামৌয়ের সীমানায় বলে সাধারণ ভাবে তিনি ঐ অঞ্চলকে পালামৌ বলেছেন। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে লোহারদাগার লাতেহার পাহাড় পালামৌ পর্বত শ্রেণীরই দক্ষিণ-পূর্ব অংশ। এইজন্যে সঞ্জীবচন্দ্র লোহারদাগাকে পালামৌ বলে বর্ণনা করেছেন। ১৮৬৬ সালের এপ্রিল অথবা জুন মাসে তিনি লোহারদাগা পৌঁছলে তিনি অবশ্যই সেপ্টেম্বর মাসে বা তার আগেই ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে আসেন।

Civil List of Bengal—(Oct. 1866) Page 110. The Subordinate Executive Officer, Sixth Grade on Rupees 200 per mense, List No. 177.

সঞ্জীবচন্দ্রের নাম, কর্মস্থল লোহারদাগা, ঐ পদে নিয়োগের তারিখ ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে (Remark) স্তম্ভে লেখা আছে—"Settlement Officer, on leave তা হলে দেখা যাচ্ছে সঞ্জীবচন্দ্র পালামৌতে ৪।৫ মাসের বেশী থাকেন নি। সম্ভবত পূজার আগেই তিনি বাড়ী চলে এসেছিলেন। বন্ধুপ্রিয়, স্বজনপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন ঐ সময়ের মধ্যেই নিশ্চয়ই নির্বাসিত যক্ষের থেকেও করুণ হয়ে উঠেছিল। বিশেষত একমাত্র পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রের বয়স তখন মাত্র ছ বছর। জ্যোতিশ্চন্দ্রের জন্মের আগে একটি কন্যা সন্তান হয়ে কয়েক বছর বাদে

মারা যায়। সঞ্জীবের স্নেহবুভুক্ষু পিতৃহৃদয় পুত্রের অদর্শনে কেমন ব্যাকুল হয়েছিল তার পরিচয় পালামৌতে আছে। পুত্রঅন্ত প্রাণ সঞ্জীবচন্দ্র সেই নির্জন বাস ত্যাগ করে দেশে ফিরে গেলেন। তিনি ছুটি নিয়েই এসেছিলেন। ছুটি ফুরোবার পর আবার পালামৌ গেলেন বটে, 'কিন্তু যেদিন পৌঁছিলেন সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আর পালামৌয়ে গেলেন না"। (সঞ্জীবনীসুধা)। সেই সামান্য সময়ের পালামৌ বাসের স্মৃতি থেকে বঙ্গবাসী যে বঞ্চিত হয়নি তার পরিচয় 'পালামৌ' আলোচনা প্রসঙ্গে পাব।

সঞ্জীবচন্দ্রের চাকরী ভাগ্য সত্যই ভালো ছিল। বিনা নোটিশে চাকরী থেকে চলে আসা সত্ত্বেও তাঁর চাকরী যায় নি। এবার তিনি ১৮৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে যশোহরে বদলী হলেন। স্ত্রী পুত্র নিয়েই সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু যশোহরের জলবায়ু তাঁদের কারো পক্ষেই উপযুক্ত হয় নি। সপরিবারে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে এলেন। এই সময় তাঁর পদোন্নতি হয়েছিল। তিনি ২য় শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হন। বেতন ২০০ টাকা থাকলেও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বেশী পেতেন। কিন্তু চিরকালের কাঁটালপাড়া তাঁকে অমোঘ আকর্ষণে টানতো। তাই তিনি শীঘ্রই কাঁটালপাড়ায় ফিরে এলেন। যশোহরে থাকার সময় ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ডেপুটি থাকাকালীন অবস্থায় একই সঙ্গে সরকারের রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স হয়েছিলেন, বেতন না বাড়লেও আয় নিশ্চয় বেড়েছিল। ১৮৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কাঁটালপাড়ায় যশোর থেকে ফিরে এলে সরকার তাঁকে ১৮৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে পাবনা জেলায় বদলীর আদেশ দেন। সঞ্জীবচন্দ্র স্বাস্থ্যের কারণে দূরে যেতে আপত্তি জানিয়ে দরখাস্ত করলে সরকার তাঁর পাবনায় বদলীর আদেশ প্রত্যাহার না করে কয়েকমাসের জন্যে সাময়িকভাবে 'স্থানাপন্ন'রূপে (Officiating) তাঁকে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও রেজিষ্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স রূপে কাজ করতে দেন। এই সময় তাঁর বেতন বৃদ্ধি হয়ে ৪০০ টাকায় ওঠে। এই বেতনই তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ বেতন। শ্রীরামপুরে তিনি বাড়ী থেকেই যাতায়াত করতেন।

কিন্তু এপ্রিল মাসে (১৮৬৮) তাঁকে পাবনায় যেতেই হয়। এই সময় তাঁর বেতন কমে যায়। কমে যাওয়ার কারণ একটি সরকারী নোটিশেই বোঝা যাবে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও রেজিষ্ট্রার পদের জন্যে যে পৃথক বেতন দেওয়া হত, সরকার তা প্রত্যাহার করে সরকারী কর্মচারীদের একই বেতনে যৌথ দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। নোটিশটি নিম্নরূপ—

"All District Magistrates in the Regulation Provinces and Deputy Commissioners in the Non-Regulation Provinces are Registrars within their respective Districts. All Officers-in-

charge of a Sub-Division are Sub-Registrars within their respective Districts." (Civil list of Bengal—1st April 1868, page 135)

এই নোটিশের ফলে তাঁর কাজ যেমন বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি বেতনও কমে গিয়েছিল। এতদিন তিনি যেমন রেজিষ্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স বা সংক্ষেপে রেজিষ্ট্রার ছিলেন, এবারে ঐ নোটিশের ফলে ডেপুটিরা সব সাবরেজিষ্ট্রার হয়ে গেলেন, অর্থাৎ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্রেই পদাধিকার বলে সাবরেজিষ্ট্রার হলেন। বিশেষ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্পেশাল সাবরেজিষ্ট্রার করা হত। সঞ্জীবচন্দ্রের ক্ষেত্রেও কিভাবে তাই হয়েছিল পরে আমরা আলোচনা করবো।

১লা এপ্রিল ১৮৬৬ সালের সিভিল লিস্টে দেখতে পাই সঞ্জীবচন্দ্রের পদ ও বেতন সম্বন্ধে লেখা আছে,—

Pubna – Deputy Magistrate and Deputy Controller—Sunjeeb Chandra Chatterjee—Rs. 200/- P. (Probetionary) of a Sub-Magistrate 1st Class. Is also Sub-Registrar of Assurances—(Page 59).

অর্থাৎ পাবনায় যাওয়ার পর থেকেই তাঁর পদের সঙ্গে যে সাবরেজিষ্ট্রার যুক্ত হয়েছিল তাই বাকী কর্মজীবনে অচ্ছেদ্য হয়েছিল। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে তিনি এক মাসের প্রিভিলেজ লিভ নিয়েছিলেন। কারণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরীতে পাকা হতে তাঁকে যে দুটি পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল, তার জন্যেই ঐ ছুটি তিনি পান। পরীক্ষা দেবার পর তাঁকে আর পাবনায় ফিরে যেতে হয় নি। ১৮৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে আলিপুরে তাঁর বদলীর আদেশ আসে। বাড়ী থেকে কলকাতায় যাতায়াত করার সুবিধা ছিল না, তিনি আবার কিছুকাল কাঁটালপাড়ায় থাকতে পেরেছিলেন। কিছুদিন বাদে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। প্রথম পরীক্ষায় তিনি পাশ করলেও দ্বিতীয় পরীক্ষায় পাশ করেন নি। পাশ না করার কারণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পূর্বোক্ত কাহিনী অর্থাৎ সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রিয়তা। এ সম্পর্কে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র কিছুই বলেন নি। সম্ভবত তিনি ঐ কথা বলার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। এই সময় আলিপুরের সেসন জজ ছিলেন এফ. আর. বর্ফোর্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছুকাল শত্রুতা ছিল। সঞ্জীবের সঙ্গে শত্রুতাও সম্ভবত ইনিই করেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ সালের আগস্ট মাসে। কিন্তু পরীক্ষায় দুর্ভাগ্য তাঁকে ত্যাগ করে নি। প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের মতে দ্বিতীয় পরীক্ষা ভাল হওয়া সত্বেও বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারীর জন্যে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন না। 'দেমাকি চাটুজোদের কর্মক্ষেত্রে শত্রুর অভাব ছিল না। রাজেন্দ্র মিত্র নামে একজন

কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্রের মত কর্মনিষ্ঠ ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল। অনেক সময়ই ওপরওয়ালা সাহেবও হ'ত তোষামোদ প্রিয়। তাদের দিয়ে ঐ সব কর্মচারীর দল তাদের শত্রুদের সর্বনাশ করার চেষ্টা করতো। সঞ্জীবের ক্ষেত্রেও ঐ ধরণের কোন ঘটনা ঘটে থাকবে। উকিল আমলারা যে সঞ্জীবচন্দ্রকে দেমাকি বা বা অহঙ্কারী বলে মনে করতো নবীনচন্দ্র সেনের স্মৃতিকথায় থেকে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। তাই সঞ্জীবচন্দ্র পরীক্ষায় পাশ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও ঐ রকমের কোন কর্মচারীর শত্রুতায় শেষ পর্যন্ত তাঁর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পাকা চাকরী আর হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ওপরওয়ালা বড় সাহেব অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটকে ঐ পরীক্ষা ফলের কারসাজি সম্পর্কে জানাতে। সঞ্জীবচন্দ্র জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী কর্মচারী হিসাবে গবর্ণমেন্টের দোষ-ত্রুটির যে বিবরণ দিয়েছেন এখানে তা লক্ষণীয়।—

> "কথাটা অমূলক কি সমূলক, তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও গবর্ণমেন্টের এমন একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরাণী যদি কোন কৌশল করে তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প।"

যাই হোক, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী আর পেলেন না বটে, কিন্তু ওপরওয়ালার কাছে লেখা লেখিতে ফল মন্দ হয় নি। তাঁরা দুদিক রক্ষা করলেন। অর্থাৎ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী না দিলেও সমতুল্য আর একটি চাকরী সঞ্জীবচন্দ্রকে দেওয়া হল। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে লিখছেন—

> "সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটিগিরী আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকরী দিলেন। বারাসাতে তখন একজন স্পেশিয়াল সব-রেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেন্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য বিবরণ সব ঠিক দিলেও বেতনের কথা যা লিখেছেন সরকারী নথিপত্রের সঙ্গে তা মেলে না। এই সময় সঞ্জীবচন্দ্রের বেতন হয় একশত টাকা। অন্য কোন ভাতা বা সুযোগ সুবিধা দিয়ে বাকীটা পূরণ করে দেওয়া হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। ঐ পদ সম্পর্কে বেঙ্গল সিভিল লিস্ট ১৮৭০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত যে বিবরণ দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে বেতন একশত টাকা ছিল। পদ স্পেশাল সাবরেজিষ্ট্রার হলেও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ও ডেপুটি কণ্ট্রোলারের স্থানাপন্ন (officiating) থাকতে হয়েছিল। একই সময় ঐখানে উমাচরণ গাঙ্গুলী একই বেতনে ঐ একই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

লেখালিখির জন্যেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক ১৮৭০ সালের অক্টোবর মাস থেকে তাঁর বেতন আবার দুশো টাকা হয়। ঐ সালেই ৫ই ডিসেম্বর তিনি দুশো টাকা বেতনে হুগলীতে ঐ একই পদে বদলী হলেন। ১৮৭০ সালের ৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৮৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনি হুগলীতেই ছিলেন। এপ্রিল মাসে তিনি

আদমসুমারীর কাজে কলকাতায় প্রেরিত হলেন। বেঙ্গল সিভিল লিস্ট ১লা এপ্রিল ১৮৭২ সালে ২২০ পৃষ্ঠায় তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে—

"—Sunjeeb Chandra Chatterjee Special Sub-Registrar at Hooghly-Salary Rs. 200/- On special duty in the Census Office."

কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর বর্ধমানে বদলীর আদেশ আসে। ঐ সরকারী নথিতে ১লা জুলাই ১৮৭২ সালে তাঁর কর্মক্ষেত্ররূপে বর্ধমানের নাম উল্লেখ করে ২০৭ পৃষ্ঠায় মন্তব্য লেখা হয়—On duty in Charge of the Cencus Office at Calcutta. বর্ধমানে বদলীর আদেশ বলবৎ থাকলেও ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি সেন্সাসের কাজে নিযুক্ত থাকেন। এই সময় হুগলীতে তাঁর স্থানাপন্ন হয়েছিলেন তাঁর অনুজ পূর্ণচন্দ্র।

এখানেও আমরা লক্ষ্য করছি সরকারী নথির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা মিলছে না। না মেলা স্বাভাবিক কারণ বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে যা লিখছেন তা তাঁর স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করে লিখেছেন। বঙ্কিম লিখছেন—

"যখন তিনি বারাসাতে, তখন প্রথম সেনসস হইল। এ কার্যের কর্তৃত্ব Inspector General of Registration এর উপর অর্পিত। সেনসসের অঙ্ক সকল ঠিকঠাক দিবার জন্য হাজার কেরাণী নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্যের তত্ত্বাবধানের জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন। এ কার্য শেষ হইলে পরে সঞ্জীবচন্দ্র হুগলীর Special Sub-Registrar হইলেন।"

আগের সরকারী নথির হিসাব অনুযায়ী দেখেছি তিনি যখন বারাসাতে ছিলেন তখন তিনি সেন্সাসের কাজ করেন নি। হুগলীতে কিছুদিন কাজ করার পরই তিনি সেন্সাসের কাজের দায়িত্ব পান।

হুগলীতে তাঁর কেমন কেটেছিল সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

"ইহাতে তিনি সুখী হইলেন। কেন না, তিনি বাড়ী হইতে আপিস করিতে লাগিলেন।"

আমরা আগেই বলেছি সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন মজলিসী মানুষ। কাঁটালপাড়ার সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ীর যোগ। আত্মীয় বন্ধু প্রিয় মানুষটির বাড়ীতে থাকতে পেয়ে অবশ্যই সুখী হয়েছিলেন। কাঁটালপাড়া থেকে গঙ্গাপার হয়ে ওপারে হুগলীতে যাতায়াত করতেন।

সরকারী নথি অনুসারে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্সাসের কাজে নিযুক্ত থাকার সময়ই (এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ১৮৭২) তিনি বর্ধমানে বদলী হন জুলাই মাসে। এই সময় সাব রেজিষ্ট্রারদের বেতনহার কমান হয়। বর্ধমানে বদলীর আদেশ হবার কারণই যাতে তাঁর বেতন না কমে। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে লিখছেন—

"কিছুদিন পরে হুগলীর সাব-রেজিষ্ট্রারী পদের বেতন কমান গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়

হওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায় তিনি বর্ধমানে প্রেরিত হইলেন।"

১৮৭২ সাল বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় কাল। ১৮৭২ সালে এপ্রিল মাসে (১লা বৈশাখ ১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র ভবানীপুর থেকে বঙ্গদর্শন প্রকাশ করলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই সঞ্জীবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল কিনা আমাদের জানা নেই। না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ ঐ সময়ই তিনি সেন্সাসের কাজে ব্যস্ত। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আগেই ছিল—বঙ্গদর্শন প্রকাশের সঙ্গে তা সৃষ্টিশীলতার পথ খুঁজে পেল—এরূপ অনুমান করা চলে।

১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি যখন সেন্সাসের কাজ শেষ করে বর্ধমানে চলে এলেন তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটল। 'যাত্রা' প্রবন্ধটি তিনি বর্ধমানে থাকতেই সম্ভবত লিখেছিলেন। সরকারী নথি অনুযায়ী বর্ধমানের কার্যকাল ১৮৭৩ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৮৭৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ বর্ধমানেই তিনি সবচেয়ে বেশী সময় কর্মরত ছিলেন, মোট কার্যকাল ৬ বছর ৩ মাস। সেন্সাসের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বর্ধমানের কাজে যোগ দেননি। ১লা জানুয়ারী ১৮৭৩ সালে প্রথমে তিনি ছ সপ্তাহের জন্যে ছুটি নেন, পরে ঐ ছুটি ফুরোলে আরও ছ সপ্তাহ ছুটি নিয়েছিলেন। মার্চ মাসের শেষের দিকে তিনি বর্ধমানের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময় বেতন ২০০ টাকাই থাকে। ঐ ছ বছরে তাঁর বেতন বাড়েনি। কারণ সরকারী নথি লিখছে—

"Paid by Fixed salary Rs. 200—(Civil List of Bengal From January 1874 to January 1879)".

ঐ ছ বছরের কার্যকালে তিনি বরাবরই স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন। ছুটিতে বাড়ীতে যাতায়াত থাকলেও তিনি নিজে ১৮৭৮ সালের ১৯শে জুন থেকে ছ মাসের জন্যে ছুটি নিয়েছিলেন। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ছুটি ফুরোলে বর্ধমানের ফিরে গিয়েই যশোরে বদলী হবার আদেশ পেলেন।

বর্ধমানের কর্মজীবন সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের স্মরণীয় কাল। এই সময়েই তিনি তাঁর জীবনের স্মরণীয় ফসল তুলেছিলেন। এই বর্ধমান বাসকালেই তিনি বাংলা সাহিত্যের যে সেবা করেছিলেন তাতেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্পর্কে লিখছেন—

"বর্ধমানে তিনি খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকিবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ সম্বন্ধ ঘটে।"

১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৯ সাল বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশ কালের প্রথম বর্ষের শেষের দিক থেকে ষষ্ঠ বর্ষের শেষ পর্যন্ত। এরই মধ্যে ১৮৭৪ সালের গোড়ার দিক থেকে ১৮৭৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি ভ্রমর পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। ১৮৭৭ সাল থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। এই

সমরকার যে সমস্ত রচনা আমরা পেয়েছি তাদের মধ্যে আছে— বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'যাত্রা', বৃত্রসংহার (২য় খণ্ড) সমালোচনা ; 'বৈজ্ঞিক তত্ত্ব', 'মাধবীলতার' প্রথমাংশ' এবং ভ্রমরে প্রকাশিত রচনার মধ্যে আছে 'দামিনী', 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'কণ্ঠমালা', 'সৎকার' ইত্যাদি এবং ভ্রমরের অন্যান্য রচনা (সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কেবলমাত্র 'পালামৌ' ও জাল প্রতাপচাঁদ' এই সময়ের পরে লেখা। এই সময় তাঁদের পরিবারে কয়েকটি ঘটনা ঘটে। বর্ধমানে বাসকালেই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রের বিবাহ দেন মহাধূমধাম করে। এতে তাঁর প্রচুর টাকা ঋণ হয়ে যায়, যা পরবর্তী জীবনে চরম দুঃখের কারণ হয়েছিল।

বর্ধমানে থাকার সময় তিনি সহকর্মীদের উপর নিজের কাজের দায়িত্ব দিয়ে মাঝেমাঝে বাড়ী চলে আসতেন এবং বিনা ছুটি মঞ্জুরিতেই কয়েকদিন বাড়ী থেকে যেতেন। ১৮৭৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন মালদহে বদলী হলেন, তখন স্নেহময় পিতা সঞ্জীবচন্দ্র পিতামহ যাদবচন্দ্র জ্যোতিশ্চন্দ্রের (তখন বয়স মাত্র ১৪ বৎসর) বিবাহের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অথচ ঋণ ছাড়া উপায় নেই। কারণ উদার প্রকৃতির সঞ্জীবচন্দ্র কন্যাপক্ষের কাছ থেকে পণ নেওয়ার কথা কল্পনাই করতে পারতেন না। তাই যাদবচন্দ্রের পরামর্শক্রমে সঞ্জীবচন্দ্র মালদহে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ১৬০০ টাকা ঋণ করে দেবার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিটি আমরা পাইনি। কিন্তু তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র যে চিঠিটা লিখেছিলেন তা আমরা পেয়েছি। চিঠিটিব অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তাতে আমরা সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবো।—

To
Babu Sanjib Coandra Chatterjee.
সেবক শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র শর্মণঃ
প্রণামো শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

আপনি যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর বাঙ্গালায় লিখিলাম ইহার কারণ এই যে আবশ্যক হইলে বা উচিত বিবেচনা করিলে পিতা ঠাকুরকে পড়িতে পাঠাইয়া দিবেন।

১। শ্রীযুক্ত (যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) আপনাকে যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে ১৬০০ টাকা কর্জ করিতে বলিয়াছেন। কর্জ পাওয়া আশ্চর্য নহে। আপনি না পান শ্রীযুক্ত আজ্ঞা করিলে অনেকে কর্জ দিবে। কর্জ করিলে আপনার বর্তমান পাঁচ হাজার টাকার ঋণের উপর ৭০০০ টাকা হইবে। ইহা পরিশোধের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে আপনি কত করিয়া মাসে কর্জ শোধ করেন? কোনমাসে কুড়ি টাকা কোন মাসে কিছুই না। .অন্ত ২০ বৎসর অবধি আপনি ঋণগ্রস্ত। কখনও ঋণের বৃদ্ধি ব্যতীত পরিশোধ করিতে পারেন না।……যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন

না মনে জানিতেছেন তাহা গ্রহণ করা পরকে ফাঁকি দিয়া টাকা লওয়া হয়। আপনি যদি এখন ১৫০০ টাকা কর্জ করেন, তবে ঋণ গ্রহণ করাকে বঞ্চনা বলিতে হইবে।

২। এই ৭০০০ টাকার ঋণ পরিশোধ হইবে না ইহার পরিণাম কি হইবে? মহাজন ছাড়িবে না, তাহারা নালিশ করিয়া ডিক্রি করিবে। এমন কোন সম্পত্তি আমাদের নাই যাহা বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় হইতে পারিবে। সুতরাং আপনি যে পরিমাণে পরামর্শের কথা লিখিয়াছেন, তাহা অন্যায় হইল কি প্রকারে? এমন সর্বনাশ যাহাতে ঘটিবার সম্ভাবনা সে ঋণ কেন করিবেন? ইহা জানেন যে ডিক্রি হইলে একখানি ওয়ারেন্ট বাহির হইলেই আপনার চাকুরীটি যাইবে এরূপ নিয়ম হইয়াছে।

৩। আপনি যদি এই ঋণ বৃদ্ধি করেন তবে যতীশের যাবজ্জীবনের জন্য যে কি গুরুতর অনিষ্ট করিবেন তাহা বলা যায় না। যতীশ সে সবেরই দায়িক।

…আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি আপনাকে ঋণ করিতে দিবেন না। কিন্তু স্বয়ং ঋণ করিয়া যতীশের বিবাহ দিবেন। আপনার কাছে বিশেষ ভিক্ষা এই যে কোন মতে তাহা করিতে দিবেন না। তিনি যদি ঋণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি যে ঋণ করিতেছেন তাহা কে পরিশোধ করিবে? তিনি বলিবেন যে আমার ২২৫ টাকা পেনশন আছে, আমি তাহা হইতে পরিশোধ করিব। তখন বুঝাইয়া দিবেন যে তাহা ভ্রম মাত্র। আজি নয় বৎসর হইল আমরা পৃথক হইয়াছি। তখন শ্রীযুক্তের ৮০০০ টাকা দেনা ছিল। এক্ষণে ৩৬০০ টাকা আছে, অতএব এই ৯ বৎসরে ৪৪০০ টাকা মাত্র পরিশোধ হইয়াছে। আমাতে দাদাতে ঋণ পরিশোধার্থে এই নয় বৎসর ৪৪০০ টাকা দিয়াছি। অতএব নয় বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত পেনশন হইতে একটি পয়সাও কর্জ শোধ করেন নাই। অতএব ভবিষ্যতে করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

অতএব তিনি এক্ষণে ঋণ করিলে পরিশোধ করিবে কে? তিনি বলিবেন পুত্রগণ। কিন্তু পুত্রগণের মধ্যে মধ্যম নিজের দেনাই পরিশোধ করিতে অশক্ত, পিতৃঋণের এক পয়সাও পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই। কনিষ্ঠও তদ্রূপ, তাহার যে আয় তাহাতে কোন মতে সংসার নির্বাহ হয়, ঋণ পরিশোধ হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠ এক পয়সাও দিবেন না, ইহা নিশ্চিত বাকী আমি কেবল একা দায়ে ধরা পড়ি। অতএব তিনি যদি এখন যতীশের বিবাহের জন্য ঋণ করেন, তবে আমার ঘাড়ে ফেলিবার জন্য। উহা আমার প্রতি কতবড় অত্যাচার হইবে তাহা তাঁহাকে আপনি বুঝাইবেন।

যতীশের বিবাহে আপনি বা শ্রীযুক্ত একপয়সাও ঋণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে বলিবেন যতীশের কি বিবাহ দেওয়া হইবে না? আমার বিবেচনায়

যতীশের বিবাহ দুই বৎসর পরেও ভাল, তথাপি ঋণ কর্তব্য নহে। নিতান্ত যদি বিবাহ দেওয়া কর্তব্য (কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই), অক্ষয় সরকারের কাছে আমার চারিশত টাকা পাওনা আছে, সে দিবে না সত্য বটে, কিন্তু গঙ্গাচরণকে ধরিতে পারিলে সে দিতে পারে, সেই চারিশত টাকা আদায় করুন। আর আপনি ২০০ টাকা দিতে পারেন শ্রীযুক্ত ২০০ টাকা আমিও দুই শত টাকা দিব। এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ দিন ঋণ করিতে পারিবেন না। এই সকল টাকা সংগ্রহ করিতে দুই-তিন মাস লাগিবে। অতএব এই ফাল্গুন মাসে বিবাহ হইতে পারে।

প্রণতঃ বঙ্কিম ৩০ কার্ত্তিক।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই পত্রের মাধ্যমে আমরা সঞ্জীব জীবনের কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পেয়েছি।

১। সঞ্জীবচন্দ্রের ঋণের পরিমাণ ৭০০০ টাকা (১৮৭৪ সালে) এবং সেই ঋণ কত দিনের এবং তা শোধ করার পরিমাণ।

২। যে ক্ষেত্রে ঋণ না করলে চলে সে ক্ষেত্রে সঞ্জীবের ঋণ করার প্রবণতা।

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সঞ্জীবের নির্ভরতা ও বঙ্কিমের স্নেহময় শাসন।

৪। পিতা ও ভাইদের আয় ও পারস্পরিক সম্পর্ক।

৫। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও তাঁর পিতা গঙ্গাচরণ সরকারের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক।

৬। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পত্তি নিলাম হওয়া (পরে আলোচ্য) ও চাকরী ছাড়ার অন্যতম কারণের ইঙ্গিতও এই পত্র থেকে পাওয়া গিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ চিঠি পাওয়ার ফল কি দাঁড়িয়েছিল আমরা জানি না, তবে ঐ চিঠির ২৭ দিন পরেই জ্যোতিশ্চন্দ্রের বিবাহ (১২৮১ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৮৭৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর) হয় শালিখার জমিদারের কন্যা মোতিরাণীর সঙ্গে। সেই মহাধুমধামের বিবাহে সঞ্জীবচন্দ্রেরা চারভাইই উপস্থিত ছিলেন। ধনী আত্মীয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের যে বিপুল পরিমাণ ঋণ হয়েছিল তার ফলে তাঁর শেষ জীবন যে অশেষ কষ্টে কাটে তার ইতিহাস বড়ই করুণ।

বঙ্কিমচন্দ্র সাধ্যমত এই সময় থেকে সঞ্জীবচন্দ্রকে সাহায্যের চেষ্টা করেন। আমরা সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র অধ্যায় দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় বঙ্গদর্শন প্রেসের আয়ের জন্যে একদিকে যেমন বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপতে থাকেন তেমনি বঙ্গদর্শনের সর্বস্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে দান করেন। বর্ধমান বাসকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গদর্শন সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন (১৮৭৭) বাইরের কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন জ্যোতিশ্চন্দ্র, যাদবচন্দ্র হিসাবপত্র রাখতেন। সম্পাদনা করতেন সঞ্জীবচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত কাজের উপর নজর রাখতেন। পরিবারের অনেকেই এই পত্রিকায় লিখতেন। আপাতত কোন অভাব অশান্তি না থাকলেও ভাইদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্যেই

সংসার ভাঙে। পুত্রহীন বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবী (বঙ্কিমের স্ত্রী) জ্যোতিশ্চন্দ্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। যাদবচন্দ্রের এই আদুরে বড় নাতিটি ছিলেন অতিমাত্রায় বাবু। বিলাস ব্যসন ও খাওয়া দাওয়ার ধুম বাড়ীতে লেগেই থাকতো। তার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট শাসনও করতেন। সেই শাসন পুত্রস্নেহান্ধ সঞ্জীবচন্দ্রের মনঃপুত ছিল না। ঐ সময় বঙ্কিমের বড জামাই রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছেলেদের নিয়ে থাকতেন। সরল প্রকৃতির সঞ্জীবচন্দ্রকে আত্মীয় স্বজনেরা বোঝাতেন জ্যোতিশ্চন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমের শাসন রাখালচন্দ্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে রূঢতারই নামান্তর। এই সময়কার একটি ঘটনা ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বর্ণনা করেছেন—

"১৮৭৯ সনে সঞ্জীবচন্দ্র বর্ধমান হইতে যশোহরে বদলী হইবার মুখে দিন কয়েক বাড়ী ছিলেন। একদিন বৈঠকখানায় পার্শ্বে মুক্ত বাতাসে গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন—বাবা তো বলেন দৌহিত্র, পৌত্র হিন্দু মুসলমানের একত্র বসবাস বইতো নয়। তবে আমি তো বঙ্কিমকে ছাড়িতে পারি না। বিশেষতঃ দানপত্র করিয়া দিয়াছি। এই সময়ে বঙ্কিমের অন্তপুরস্থ মহিলাগণ, রাজলক্ষ্মী দেবী ও তাঁহার মা ও মাসী আর শরৎকুমারী তখন ছাতের উপর পায়চারী করিতেছিলেন। বায়ুপ্রবাহে কথাগুলি কিছু রূপান্তরিত হইয়া তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। ক্রমে বঙ্কিমও শুনিলেন। রাখালের এই বাড়ী থাকা কাহারও মনঃপূত নয়, মেজদাদাও এইরূপ মনে করেন। তবে কি মেজদাদার দানপত্রই আমার একমাত্র অধিকার স্বত্ব ? বঙ্কিম মনে পীড়াবোধ করিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই চুঁচুড়ায় জোড়াঘাটে বাসা ঠিক করিয়া সপরিবারে তথায় বাস করিতে চলিয়া গেলেন।"[১৫]

আমরা আগেই বলেছি ১৮৭৮ সালের ১৯শে জুন তারিখে বর্ধমান বাসকালে সঞ্জীবচন্দ্র ছমাসের ছুটি নেন। ডিসেম্বর মাসে কাজে যোগ দেবার পরেই তাঁর যশোরে বদলী হবার আদেশ আসে।

১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে যশোহর চলে যেতে হয়। যশোরের কার্যভার গ্রহণের আগে তিনি কিছুদিন ছুটিতে বাড়ী থাকেন। এই সময়েই বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়, যার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়া ছেড়ে চুঁচুড়ায় চলে যান। সরকারী নথি অনুসারে দেখছি Civil List of Bengal, 1st April 1879, তাঁর পদ বেতন ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে লিখছে—

Sunjeeb Chandra Chatterjee special Sub-Regsstrar in Jessor—Rs. 200/- paid by Fixed Salaries.

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

"বর্ধমানেও স্পেশিয়াল সব রেজিষ্ট্রারের বেতন কমিয়া গেল। এবারে সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল।"

বর্ধমানে সাব রেজিষ্ট্রারের বেতন কমে গেলেও যশোরে তাঁর বেতন একই ছিল,

যদিও পদোন্নতির কোন আশা আর ছিল না। সঞ্জীবচন্দ্র যশোরে কর্মরত ছিলেন ১৮৮১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। বেতন বরাবরই ২০০ টাকা থাকে। যশোর বারবারই তাঁর দুর্ভাগ্যের স্থল। একদিকে গৃহের প্রতি আকর্ষণ অন্যদিকে বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা। সঞ্জীবচন্দ্র যশোরের কাজে রীতিমত অনিয়মিত হয়ে পড়লেন। বিনা নোটিশে প্রায়ই বাড়ী চলে আসতেন। ওখানে থাকার সময় প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বর হত। কাজে অবহেলার চূড়ান্ত হয়েছিল। ১৮৮০ সালের ১৫ই জুলাই তিনি ছ মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে আসেন। এজন্য তাঁর পিতার অনুরোধ অনেকখানি দায়ী। যাদবচন্দ্রের কোষ্ঠীতে ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যু লেখা ছিল, তিনি অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। পুত্রেরাও তা বিশ্বাস করতেন। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে নিজের কাছে ঐ সময় এনে রাখেন। ১৮৮১ সালের ২৫শে জানুয়ারী যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ঐ সময় সঞ্জীবচন্দ্র আরও তিন মাসের ছুটি চান। যশোরে সেই সময় তাঁর স্থানাপন্ন ছিলেন ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছমাস ও তিন মাস মোট ন মাসের ছুটি ফুরিয়ে আসে ১৪ই এপ্রিল ১৮৮১ সালে। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র আর কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাননি কোনদিন। তিনি চাকরী ছাড়লেন। তিনি তাঁর ডাইরীতে স্বহস্তে লেখেন—
১৫ই এপ্রিল ১৮৮১ খৃঃ

"From this day I am no longer in service. My leave expired yesterday and sent in my resignation on that day."

সঞ্জীবচন্দ্র কেন চাকরী ছাড়লেন সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

"তাঁহার যাওয়ার পরে যশোরে বার্টন নামা একজন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, সেই ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই রেজিষ্ট্রার। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন তাহাই করা। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।"

সরকারী নথি অনুযায়ী দেখতে পাই ইঃ জেঃ বার্টন দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর। ১৮৮০ সালের গোড়ার দিকে যশোরের স্থানাপন্ন (Officiating) ম্যাজিষ্ট্রেট ইঃ এইচঃ রাডকের (Ruddock) স্থানে স্থানাপন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট কালেকটর হয়ে আসেন। সঞ্জীবচন্দ্রের কাজের ত্রুটির অভাব ছিল না, তিনি যশোর এসেই সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করলেন। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি এবং পিতার অনুরোধ এই দুই ব্যাপারে তাঁর দীর্ঘদিনের ছুটি নেবার কারণ দাঁড়ায়। যাই হোক সঞ্জীবচন্দ্র চাকরী ছাড়লেন, একরকম বাধ্য হয়েই। চাকরী সম্পর্কে তাঁর কোন মোহ ছিল না, নিষ্ঠাও ছিল না। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করেই তিনি ছাড়লেন বটে, কিন্তু তখন তিনি আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত। চাকরী না ছাড়লে মহাজনদের নালিশে ডিক্রি

নিলামের ওয়ারেন্টে তাঁর চাকরী এমনিতে চলে যেত, সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ১৮৭৯ সালের ১৫ই নভেম্বরের চিঠিটি সাক্ষ্যদান করছে।

বন্ধনভীরু সঞ্জীবচন্দ্র চাকরীর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করলেও সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন নি সহজে। চাকরী ছাড়ার পর তিনি আট বৎসর জীবিত ছিলেন। এই আট বছরের জীবন বড় ভয়ঙ্কর। পাওনাদারেরা টাকার দাবিতে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। টাকা শোধ না হওয়ায় তারা তাঁর নামে মামলা রুজু করে। সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তিই তাতে চলে যায়। তাঁর সাধের বঙ্গদর্শন প্রেস ১৮৮১ সালে বিক্রয় হয়ে যায়। এরপর তাঁর স্থাবর সম্পত্তিও একে একে বাঁধা পড়তে থাকে। সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র জীবিত পৌত্র শ্রীজীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম: এ: বি: এল. (বর্তমান বয়স ৮০ বৎসর) বলেন তাঁর স্থাবর সম্পত্তি উত্তরপাড়ার জমিদার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের খুড়তুত ভাই সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে মাত্র ৪০০ টাকায় বাঁধা রাখেন। পরে ঐ সম্পত্তি পূর্ণচন্দ্র ক্রয় করে নেন। ঋণের দায়ে সঞ্জীবচন্দ্র সব সময় তাঁর সম্ভ্রম বজায় রেখে চলতে পারেন নি। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল তিক্ত। উভয়ে ছিলেন অত্যন্ত হিসাবী। সঞ্জীবচন্দ্রকে তাঁরা কেউ কোন সাহায্য করতেন না অন্তত সে রকম কোন নথিপত্রে তার প্রমাণ আমরা পাইনি। সঞ্জীবচন্দ্রের এই দুঃখকষ্টের একমাত্র সমভোগী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে দেখাশুনা করে গেছেন। তার সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর চিঠিপত্রগুলি।

আমরা আগেই দেখেছি ১৮৭৪ সালেই সঞ্জীবচন্দ্রের ঋণের পরিমাণ ছিল সাত হাজার টাকা। সুদ ও নতুন ঋণ নিয়ে এর পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিমধ্যে তাঁর চাকরী ত্যাগ ইত্যাদি ঘটনায় চিন্তিত হয়ে মহাজনরা তাঁর নামে নালিশ করে নিলাম ডিক্রি জারি করে। স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক হয়। অথচ খাতককে না পেলে সম্পত্তি ক্রোক করা চলে না। তাই সঞ্জীবচন্দ্র কিছুদিনের জন্যে বাড়ী থেকে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন। তখন বাড়ী থেকে পালিয়ে তাঁকে চুঁচুড়ায় ভুবন সাহার হোটেলে একটি চালাঘরে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। বাড়ীতে সকলকে বলে গিয়েছিলেন তিনি কাশী চলে গেছেন। স্ত্রী পুত্র যাতে প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে সেইজন্য কয়েকটি চিঠি পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রকে লেখেন। কাঁটালপাড়ায় রক্ষিত এই চিঠিগুলির অংশবিশেষ থেকে এই সময়কার প্রকৃত চিত্র আমরা দেখতে পাব। চিঠিগুলির তারিখ নেই তবে ডাকঘরের ছাপ থেকে মনে হয়েছে ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লেখা। এই সময় 'মাধবীলতা' পুস্তকাকারে ছাপা হচ্ছে। এই সময়ই তিনি 'পালামৌ' ও 'জাল প্রতাপচাঁদ' রচনা করেন। দুঃখভারক্লিষ্ট জীবনের ছাপ ঐ গ্রন্থদুটিতে যে বর্তমান তা গ্রন্থসমালোচনায় আমরা আলোচনা করেছি। কাশী যাবার নাম করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে স্ত্রী পুত্র চিন্তায় কাতর হবেন ভেবে তিনি জ্যোতিশ্চন্দ্রকে সঠিক খবর জানাবার জন্যে লেখেন—

"প্রাণাধিকেষু,

আমি ৮-১০ দিনের নিমিত্ত যাইতেছি, কোন ব্যস্ত হইও না। আমি হয়তো চুঁচুড়ায় থাকিব। ভুবন সার হোটেলের নিকট রঞ্জনের কোন স্থান পাই তবে সেইখানেই থাকিব। আর যদি বর্ধমান কি বৈদ্যনাথ অথবা ভাগলপুর যাই ৮-১০ দিনের অধিক থাকিব না। এখানে রাষ্ট্র হওয়া আবশ্যক যে আমি কাশী গিয়াছি, তাহাই আমি কাশী যাইব বলিয়াছি। ইতি—

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠি লেখার কয়েকদিন বাদেই তিনি চুঁচুড়া ছেড়ে ভাগলপুরে চলে যান। স্নেহময় পিতা ঋণের দায়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও স্ত্রী পুত্রের জন্যে চিন্তিত থাকতেন। তাই পুত্রকে লিখলেন—

"প্রাণাধিকেষু,

কল্য বিকালে চুঁচুড়া হইতে রওনা হইয়া অদ্য ভাগলপুর পৌঁছিয়াছি। তুমি আপত্য (আপত্তি) করিবে বলিয়া তোমায় পূর্বে সম্বাদ দিই নাই। এখানে কীর্তির নিকট জানিলাম, হাজার টাকার অধিক মূল্যের ডিক্রি হইলে Movables ঘটিবাটি ক্রোক নিলাম হইতে পারে। অতএব সাবধান। আলিপুরে তোমার রাধানাথ জ্যাঠাকে পাঠাইয়া সম্বাদ জানিবে। যে পর্যন্ত তাহা নিশ্চয়ঃ জানা না যায়; সে পর্যন্ত সদর দরওয়াজা বন্ধ রাখিবে। আমি এখানে অল্প দিন থাকিয়া ফিরিয়া যাইব।"

এই সময় মহাজন তাড়িত সঞ্জীবচন্দ্র কোন এক জায়গায় বেশীদিন থাকতেও পারতেন না। তা ছাড়া ঋণ পরিশোধের জন্যে টাকার সন্ধানে সম্ভবমত জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল। এই সময় তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিকে শেষ অবলম্বনের মত আঁকড়ে, ধরতে চেয়েছিলেন। এমন অবস্থায় গ্রন্থরচনা করলে সাহিত্যে গৃহিনীপনা থাকা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তাঁর জীবনের প্রকৃত অবস্থা জানতেন না, তাই ঐ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি যে অবস্থার মধ্যে সাহিত্য রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক দস্তয়ভস্কি বা নুট হ্যাম্পসুনের মিলটাই বেশী চোখে পড়ে। আর এর থেকে বুঝতে পারি তাঁর সাহিত্যের উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের উৎস কোথায়। মাধবীলতা উপন্যাস কি ভাবে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল তারও কিছুটা আভাস আছে একটি পত্রে। জ্যোতিশচন্দ্রকে লিখছেন—

"প্রাণাধিকেষু,

অদ্য আমি ভাগলপুর হইতে বাঁকিপুর চলিলাম। পৌঁছিয়া পত্র লিখব।..... সদর দরওয়াজা বন্ধ রাখিবার আর প্রয়োজন কি? অদ্য মাধবীলতা শেষ করিয়া বীণাযন্ত্রে Manuscript পাঠাইলাম। প্রুফ আসিলে দেখাইয়া দিবে। ইতি—

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে মানুষকে পেটের দায়ে কলম ধরতে হয়, তাঁর প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ থাকা স্বাভাবিক। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে, বিশেষ করে শেষ জীবনে এই ধরণের ঋণ ভারের উৎপীড়ন প্রতিমুহূর্তে তাঁকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। এই জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁর একমাত্র আশ্রয়। ঐ পরিবারের বঙ্কিমচন্দ্রের আয় ও যেমন সবচেয়ে বেশী ছিল, তেমনি তিনি তাঁর স্বভাব মহত্ত্বে সকলকে যথাসাধ্য দেখাশুনা করতেন। জ্যেষ্ঠ্য শ্যামাচরণ পীড়িত হয়ে পড়লে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবকে ঝিনাইদহ (১৮৮৫ খৃঃ বা ১২৯২ সন) থেকে লেখেন—

"শ্রীচরণেষু

আপনি মঙ্গলবার যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা আমি বৃহস্পতিবারে পাইয়াছি। আর বুধবার যে পত্র লেখেন তাহা শুক্রবার পাইয়াছি। এরূপ বিলম্বের কারণ আপনার চিঠি সময়ে পোষ্ট হয় না। তিনটার মধ্যে চিঠি পোষ্ট করিতে হয়। দাদার পীড়া মারাত্মক নহে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না।......যতদিন না নিঃশেষ আরাম হন ততদিন কলিকাতায় রাখিবেন। বোধকরি তাঁহার চিকিৎসার ব্যয় তাঁহাকে কিছুই বহন করিতে দেন নাই। ব্যয় আমার ব্যয়ে হওয়া কর্তব্য। টাকার প্রয়োজন হইলে উমাচরণকে বলিবেন, সে সরবরাহ করিবে। দাদার নিঃশেষ আরোগ্য সম্বাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ইতি
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১০ই মাঘ।"

এই চিঠিতে সঞ্জীবচন্দ্রের স্বাভাবিক গাফিলতির জন্যে বঙ্কিমের মৃদু তিরস্কারটি লক্ষণীয়। এই সময়ের আগে থেকেই সংসারে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ভাইয়েরা তাঁদের মনোমালিন্য বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ পাক তা চাইতেন না। বাহ্যত তাঁদের স্বাভাবিক মেলামেশা ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিকথায় এই সমন্বকার কিছু পরিচয় আছে।

১৮৮২ সালে পিতার সপিণ্ডকরণের সময় সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে শ্যামাচরণের রীতিমত মনোমালিন্য হয়। শ্যামাচরণ কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ী আসতে না পারায় তাঁদের কুলপুরোহিত ভাটপাড়ার আনন্দ শিরোমণির পুত্র মধুসূদন স্মৃতিরত্নের সঙ্গে পরামর্শ করে সঞ্জীব বাড়া থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সপিণ্ডকরণের অধিকার ও দায়িত্ব না দিয়ে কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে ঐ দায়িত্ব দেন। বঙ্কিম এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সপিণ্ড-করণের খরচ বাবদ জ্যেষ্ঠের নাম করে পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমের কাছে একশ টাকা চাইলে তিনি উত্তর দেন, 'জ্যেষ্ঠের কাজ জ্যেষ্ঠ করুন, আমার যা করতে হয় আমি নিজেই করবো।' ক্ষুব্ধ সঞ্জীবচন্দ্র পুত্রকে লেখেন,

"প্রাণাধিকেষু,

প্রয়াগ সিং যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত। আমার ইচ্ছা ছিল যে নিমন্ত্রণে

না যাওয়া হয়, শিরোমণি আমাদের আত্মীয় ছিলেন সত্য। কিন্তু এক্ষণে আর আত্মীয়তা নাই। বড়বাবু আমাকে অপমান করিবার মতলব করিলে স্মৃতিরত্ন তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন। তিনি জানিয়া শুনিয়া শাস্ত্রের বিপরীত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। আমি নিমন্ত্রণে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম তাহা কেবল টাকার অপ্রতুলতা প্রযুক্ত। তোমার উচিত বোধহয় তুমি অবশ্য যাইবে, কিন্তু ২ টাকা দেওয়া নয়, ৫ টাকা দিবা। আমার সময় ভাল থাকিলে আমি অধিক দিতাম।

আশীর্বাদক,
শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

এই সময় সঞ্জীবচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকলেও সাহিত্যে তাঁর কিছু সুনাম হয়েছিল। সাহিত্য সভা ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে যোগদানও করতেন। ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে সাবিত্রী লাইব্রেরীর বার্ষিক সভায় সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সভাপতি ছিলেন শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য উপস্থিতদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারও ছিলেন।

কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করে, বাঁধা দিয়ে এবং রাধাবল্লভের সেবাইতের পাওনা বাবদ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহায়তায় পাওনাদারদের উৎপীড়ন থেকে সঞ্জীবচন্দ্র কতকটা মুক্ত হলেন বটে, কিন্তু যা অবশিষ্ট রইল তা সঞ্জীবের প্রেতচ্ছায়া মাত্র। সেই কর্মোদ্যম ও সৃষ্টিশীলতার লেশমাত্র রইল না। পরনির্ভর জীবনে জমে উঠল গ্লানির বোঝা। নয়নের নিধি একমাত্র পুত্রকে তিনি কাছ ছাড়া করতে চাননি কোন দিন। কিন্তু তাঁরও সংসার বড় হচ্ছে। পুত্র কন্যারা একে একে জন্মাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র আর পারছিলেন না। সঞ্জীবচন্দ্র ও জ্যোতিশচন্দ্রের দুটি সংসার প্রতিপালন করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। কয়েকটি চিঠিতে তার আভাস আছে। একটি ছিন্নপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখছেন—

"শ্রীচরণেষু,
জ্যোতিষের নিজ পরিবার···প্রতিপালন···কিন্তু আপনার ভার তাহার উপর আমার দিবার ইচ্ছা নাই।"

অন্য একটি পত্রে বারবার টাকা চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করলে তিনি বিরক্ত হয়ে জ্যোতিষচন্দ্রকে তিরস্কার করে লেখেন—

"কল্যাণীয়েষু,
তোমার পত্র পাইয়াছি, তুমি একশত টাকা বেতনের চাকরী করিতেছ। এক্ষণে আমার নিকট কোন সাহায্য প্রত্যাশা করা অন্যায়। যাহারা ঐ বেতনের চাকরী করে তাহারা সকলেই আপন আপন পরিবার বিনা কষ্টে প্রতিপালন করিয়া থাকে। আমি এমাসে কোন খরচ পাঠাই নাই ও পাঠাইব না, তোমার

পিতার জন্য কোন চিন্তা নাই। তিনি মনে করিলেই আমার নিকট আসিয়া থাকিতে পারেন। ইতি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬ই অক্টোবর, ১৮৮৭"

সঞ্জীবের জীবনের শেষ তিন-চার বছর অকর্মণ্য জীবনের নানা আধিব্যাধি তাঁকে ঘিরে ধরে। একটি ফুলের বাগান ছিল, যদিও সে বাগানের সৌন্দর্য প্রথম জীবনের ফুলের বাগানের মত ছিল না, তবু অতন্দ্র প্রহরীর মত তিনি সেই ফুলের বাগান পাহারা দিতেন। গ্রামের অকর্মণ্য লোকের সঙ্গে গাল-গল্প করে এবং নাতি-নাতনিদের দেখাশুনা করে দিন কাটাতে লাগলেন। এই সময় জ্যোতিষচন্দ্রের চাকরী হয় মেহেরপুরে পুলিশ ইন্সপেকটরের। তিনিও তাঁর পিতার মত বেহিসেবী খরচ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে নিয়ে কিরকম বিব্রত হতেন তার প্রমাণ আগের চিঠি থেকেই বুঝতে পারি। আবার কিভাবে চললে চাকরীতে উন্নতি হবে সে সম্পর্কেও তিনি জ্যোতিষচন্দ্রকে স্নেহপূর্ণ উপদেশ দিতেন তার প্রমাণও আমরা অন্যান্য চিঠিপত্রে পেয়েছি, কাঁটালপাড়া বঙ্কিম সংগ্রহশালায় তা রক্ষিত আছে। সঞ্জীবচন্দ্র মাঝে মাঝে বিশেষ দিনে ডাইরী লিখতেন তাও ওখানে আছে তার অংশ বিশেষ আমরা এখানে উদ্ধৃত করব।

১৮৮৬ সালের পর থেকে সঞ্জীবচন্দ্র প্রায়ই অসুস্থ হতেন প্রায়ই তাঁর জ্বর হত। মাঝে মাঝে রক্ত প্রস্রাবও হত। শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে স্মৃতিকথা লেখার সময় লিখছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার ভবানীচরণ দত্ত লেনের বাসায় (যেখানে রবীন্দ্রনাথও যেতেন) ১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গিয়ে একদিন দেখেন,—

"সরস্বতী পূজার দিন কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া সন্ধ্যার পর দেখা করিতে গেলাম। উপরের বৈঠকখানায় পীড়িত শ্যামাচরণ বাবু শয্যাগত, নিচে রাখালের ঘরে এক পার্শ্বে সঞ্জীববাবু রুগ্ন শয্যায়, কাছে বঙ্কিমবাবু।"[১৬]

বঙ্কিমচন্দ্র কর্তব্য হিসাবে সব ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করলেও সঞ্জীববাবুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা অনেক বেশী ছিল। তিনি কর্মহীন উপায়হীন উপার্জনহীন সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে সর্বদা বড়ই চিন্তিত থাকতেন। ১৮৮৬ সালের মে মাসের একটি ছিন্ন পত্রে সঞ্জীবচন্দ্রকে তিনি লিখছেন—

"দুই এক বৎসর বাঁচিলেও বাঁচিতে পারি। দুই দিনেই জীবন......ফুরাইতেও পারে। আপনাকে একথা......তাৎপর্য এই যে আমার এই অবস্থায় আপনার সংসার চালানোর কি উপায়......হইতে আপনার ও যতীশের...উচিত। পূর্ব হইতে কিছু উপায় হইতে পারে। আরও যদি কিছুদিন...আমার চাকরী এই... উপর আবার চাকরী চলিবে...তাহা হইলেও আপনাদের...উপায় চিন্তা করা কর্তব্য ...আমি এক্ষণে হাওড়ায় আছি...রবিবার।"

সংসারের যখন এমন অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্র নিজের খরচে শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে নিয়ে ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমভারতের তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এই সময়ে সঞ্জীবচন্দ্র যে ডাইরী রেখেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করলে সেই সময়ের চিত্রটি আমরা সহজে কল্পনা করে নিতে পারবো।—

"১৮৮৭, ৯ই মার্চ, ২৫শে ফাল্গুন ১২৯৩ বুধবার—
সকাল ৭-৪৫ মিনিটের সময় আমি ও দাদা একসঙ্গে নৈহাটী হইতে রওনা হই। কলিকাতা হইতে বঙ্কিমও আমাদের সহিত মিলিত হয়। ৪ মাসের রিটার্ণ টিকিট করিয়া আমরা তিনজন সেকেণ্ড ক্লাসে চড়িয়া আগরা রওনা হইলাম। প্রত্যেকের ভাড়া ৫৯৷৩৷ অনিলার অসুখ ছিল—ভাবিয়া ভাবিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। আমি যে চিরকালের জন্য যাইতেছি, বাড়ীতে তাহা কেহ সন্দেহ করে নাই।"

সঞ্জীবচন্দ্রের পলাতক মনের একটি ছবি এখানে সুপরিস্ফুট।

"১০ই মার্চ-সকালে মোকামা পঁহুছিলাম। হোটেলে উঠিলাম, সকলেই আমাদের দেখিয়া উৎফুল্ল।
১১ই মার্চ—বিন্ধ্যাচলের পাণ্ডারা আসিয়া বড় জ্বালাতন করিতেছে। এই খানে নানা প্রকারের সন্ন্যাসী দেখিলাম।
১৬ই মার্চ—আগ্রায় পঁহুছিয়া গাড়ীতে সমস্ত সহরটি ঘুরিয়া আসিলাম। তাজমহল দেখিলাম। কালীবাড়ীর দ্বারিক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। দাদা এবং বঙ্কিম দুইজনেরই একটু অজীর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয় জুম্মা মসজিদের পার্শ্ববর্তী ইন্দারার জলটা ভালো নয়। মথুরা যাইবার কথা হইলে আমি আপত্তি করিয়া বলি, যদি পেটের অসুখ হয় আগ্রায় ভাল ডাক্তার পাওয়া যাইবে, তাহাতে দাদা উত্তর করেন—মরিতে হয় মুক্তি স্থানেই মরিব। এ মুসলমানের জায়গায় কেন মরিতে যাই।
১৮ই মার্চ, ৫ই চৈত্র—মথুরা ষ্টেশনে বেলা ১ টায় পঁহুছিলাম। আমি বলিলাম যে মথুরা বৃন্দাবন এক্কায় যাইতে ভীষণ রৌদ্র বঙ্কিম সহ্য করিতে পারিবে না। দাদা ইহাতে বড়ই বিরক্ত হন, তিনি বৈকালটা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই। আমি কেন অন্য কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বলেন নাই। সকাল হইতেই দাদার মেজাজটা একটু রুক্ষ দেখাইতেছিল।

মথুরায় এই সমস্ত কথার আলোচনা হইল, রাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। দাদা বলেন, তোমারই দোষ। তুমি রৌদ্রের কথা কেন বলিলে?

বৈকালে বড়বাবুর খুবই ক্ষুধা হইয়াছিল। তিনি ২।৩ বার জিজ্ঞাসা করেন রান্নার দেরী কত? এবং যখন শুনিলেন যে বাজার হইতে জিনিষপত্র আসিলে সন্ধ্যাবাতি জ্বালিয়া রান্না চড়ান হইবে, তখন বড়বাবু রাগ করিয়া শুইয়া থাকেন। রান্না তৈয়ারী হইলে তিনি খান না, বঙ্কিম খায় না। আর আমি তাহাদের

ছাড়িয়া খাইতে পারিলাম না। তিনজনেই অনাহারে থাকিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

১৯শে মার্চ রবিবার ৬ই চৈত্র—বড়বাবুর মেজাজের কোন পরিবর্তন নাই। বঙ্কিমের সে ভাব অসহ্য বোধ হইল। বঙ্কিম অনুতাপ করিতে লাগিল যে কয়শত টাকা খরচ করিয়া দাদার সঙ্গে আসিয়াছি ফলে কেবল অশান্তিই ভোগ হইতেছে। বঙ্কিম তো দাদার মনে কোন পীড়া দেয় নাই। তবে দাদা তাহার সঙ্গে কথা বলেন না কেন? আমি ভাবিলাম যে আমিই এই অশান্তির কারণ তাই আমি মথুরা হইতেই তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু বঙ্কিম তাহাতে স্বীকৃত হইল না এবং অবশেষে আমি যাইব আশঙ্কা করিয়া তাহার চোখে জল পড়িতে লাগিল। বঙ্কিমের যে আমার জন্য এত মায়া তাহা আমি পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। সন্ধ্যার সময় বড়বাবু বঙ্কিমকে নিয়া বিশ্রাম ঘাটে আরতি দেখিতে যায়। উভয়েই খুব তৃপ্তির সহিত দেখিয়াছে। বড়বাবু শ্রীকৃষ্ণের পায়ে ফুল দিয়াছিলেন।

২০শে মার্চ, ৭ই চৈত্র—সন্ধ্যার সময় বৃন্দাবন পঁহুছিলাম। রথযাত্রার জন্যে শেঠের বাড়ীতে যে মেলা হয়, সেখান দিয়া যাইতে বড়বাবুর শিশুর ন্যায় কান্না আসিল যে রথ যাত্রা দেখা হইল না। শেঠের বাড়ী রঙ্গনাথের বাড়ী ও লালাবাবুর বাড়ীর কিশেনজী দর্শন করিয়া আমরা চন্দন চৌবের সঙ্গে দেখা করিয়া একখানা চিঠি দিলাম, অমনি আমাদের বাসা ঠিক করিয়া দেওয়ার ধূম পড়িল। কিন্তু আমরা যে কে তাহা কেহ জানতে পারিল না। কিন্তু ময়মনসিংহের উমাচরণ ভট্টাচার্য দেখিয়াই বঙ্কিমকে চিনিয়া ফেলিল। আর অমনি ভয়ানক শোরগোল পড়িয়া গেল। দলে দলে লোক দেখিতে আসিল, বিছানা আনা হইল। একটা সিপাহী পর্যন্ত দরজায় রাখা হইল যেন লোকজন সর্বদা বিরক্ত না করে আর রাত্রিতে আমাদিগকে পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী মারহাটী ও বাঙ্গালী প্রথায় প্রায় ৫০।৬০ পদ দিয়া ভোজনে আপ্যায়িত করা হইল।

২১ মার্চ, ৮ই চৈত্র—গত রাত্রিতে গুরু ভোজনের পর সকলেরই পেট একটু গোল হইল। উমাচরণ কিছু চুড়ান দেন। বঙ্কিম ও দাদা ঠিক সময়েই আহারে বসেন কিন্তু আমি বেলা ১ টার সময় আহার করিতে যাই।

২২শে মার্চ, ৯ই চৈত্র—বঙ্কিম ও দাদা গোপীনাথ ও গোবিন্দজীর মন্দির দর্শন করিতে যান। বঙ্কিম লালাবাবুর মন্দির দেখিতে যায় কিন্তু দাদা যান না। দেখিতেছি দাদার হরিভক্তি ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। একজন হিন্দুস্থানী গোঁসাই বলিলেন প্রথমে গোবিন্দজী, গোপীনাথ এবং মদন মোহন কি কোন কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে শ্রীরাধা ছিলেন না। This Shows ভাগবত Ommission of রাধা। আরতির পর গোবিন্দজীর মন্দির দর্শন করিলাম। দেখিলাম পূজারীরা সবাই বাঙ্গালী।

দাদার অমতে আমরা বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিলাম। মথুরায় ঘণ্টা দুই

অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

২৩শে মার্চ, ১০ই চৈত্র—বৃন্দাবন হইতে মথুরা যাইবার রাস্তায় দাদা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল 'কোথায় যাওয়া হইতেছে'। চন্দন চৌবে আমাদের সঙ্গে ছিল সে বলিল 'মথুরায়'। দাদা বলেন, 'হাট্‌রাসে চল'। চৌবে বলেন, 'বাবু হাটরাস যে এখান হইতে ২৫ক্রোশ দূরে। যেতে চান তো মথুরা থেকে রেলে যাবেন।

বড়বাবুর একি ছেলেমি? তিনি যেন আমাদের সববিষয়ই বিরক্ত। প্রথমে তিনি বৃন্দাবনে থাকিতে চাহেন নাই এবং যখন বলা হয় যে বঙ্কিমের একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, দাদা বলেন তিনি জয়পুর একাই কোন যাত্রীর সঙ্গে যাইবেন। বৈকালে দাদা ঘুমাইতেছিলেন। বঙ্কিম আমাকে বলে 'দাদাকে একা জয়পুরে কিছুতেই পাঠান হইবে না, আমিও সঙ্গে যাব, তাতে যা হয় হোক'। বড়বাবু উঠিয়া খুব বিরক্তির সহিত চাকরদের ঘরে গিয়া এমন ভাবে বসিয়া রহিলেন যেন তাহাকে খবুই অপমান করা হইয়াছে। আমি বলিলাম ; দাদা কি হয়েছে? দাদা বলিতে লাগিলেন ; এই মাত্র বঙ্কিম বলিল আমি এখনই ওকে তাডাই দিতে পারি। কেন ভাই তোমরা একসঙ্গে আমাকে অপমান করিয়া তাডাইয়া দিবে, আমি তো ইঙ্গিতমাত্রই চলিয়া যাইতে পারি, আমি তো আর গরীব নই।' আমি দাদার এই অলীক অভিযোগের রচনায় বড়ই বিস্মিত হইয়া বঙ্কিমকে ডাকিলাম, বঙ্কিম আসিয়া ক্রোধে চীৎকার করিয়া উঠিল।

২৪শে মার্চ, ১১ই চৈত্র—বঙ্কিম ও আমি এলাহাবাদে নামিলাম, দাদা গাড়ীতে অন্যত্র গেলেন আমি ঘনশ্যাম মুখার্জ্জির হোটেলে গেলাম, বঙ্কিম অন্যত্র গেল। যাহা কিছু খাইলাম বমি হইয়া সব পড়িয়া গেল, একটু রক্ত পড়িয়া ছিল। চন্দন চৌবে এই ৩।৪ দিন খুব খিদমত করিয়াছে।

২৫শে মার্চ ১২ই চৈত্র—হোটেলে বসিয়াছি, দেখিলাম মুরলী (বঙ্কিমচন্দ্রের চাকর) সব জিনিস পত্র লইয়া আসিয়াছে এবং সঙ্গে বঙ্কিমও আসিয়া ঢুকিল। ভাবিয়াছিলাম বঙ্কিমের সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হইবে না। বৈকালে খুর্দ্দাবাগে আমরা একটা ভাডাটে বাসায় যাই। হোটেলের ম্যানেজার ১।০ চার্জ করিয়া বসিয়াছিল। বঙ্কিম তখনই তাহাকে উহা মিটাইয়া দেয়। বঙ্কিমের নাম যাহাতে প্রকাশ না হইয়া পড়ে খুব চেষ্টা করা সত্ত্বেও দেখিলাম যে সর্বত্র জানাজানি হইয়া গিয়াছে।

২৬শে মার্চ—অসংখ্য যুবক ও বালক বঙ্কিমকে দেখিতে বাসায় ভিড় করিয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য-এর ভাই বৈকুণ্ঠও আসিয়াছিল।

২৭শে মার্চ খসরুবাগে যাই। প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বঙ্কিমকে দেখিতে আসেন।

৩০শে মার্চ—একটি ব্রহ্মচারিণী আসে তাহার চেহারা দেখিয়া [illegible] বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার পিতার সম্পত্তি গভর্ণমেন্ট কিরূপে বাজেয়াপ্ত [illegible]রিয়াছে এবং সে উহা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিয়াছে শুনিয়া আমার চোখে জল আসিল।

বঙ্কিম তাহাকে ২ টাকা দেয়।

৩১শে মার্চ ১৮ই চৈত্র—বঙ্কিম বাড়ী হইতে চিঠি পায় যে নীলাব্জুর একটি ছেলে হইয়াছে। তাই ২রা এপ্রিল রওনা হইবে স্থির হয়। আরও জানা গেল দাদা বাড়ী গিয়া পঁহুছিয়াছেন।

২রা এপ্রিল ২০শে চৈত্র—বঙ্কিমকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া নিজের জন্য কেবল আলুভাত রান্না করিয়া নিলাম। বৈকালে ৫৷৷০ টাকার একখানা ছোট্ট সুন্দর বাসায় চলিয়া গেলাম। রাত্রিতে বৈকুণ্ঠবাবু ও গিরিশবাবুকে আমাদের পরিবারের ইতিহাস বলি। রাত্রিতে রক্তপ্রস্রাব হইয়াছিল।"

এই ঘটনার পর তিন ভাই তিন স্থানে পৃথকভাবে চলে গেলেন। অদ্ভুত ভুল বোঝাবুঝি ভ্রাতৃবিরোধের কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ী চলে আসার পর সঞ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদ প্রয়াগে তিন মাস থেকে গিয়েছিলেন। কেন তিনি প্রয়াগে ছিলেন তা জানা না গেলেও অনুমান করা যায় পাওনাদারদের হাত এবং পারিবারিক অশান্তি এড়ানোই এই প্রবাসবাসের কারণ। সঞ্জীবচন্দ্র ভেবেছিলেন আর বাড়ী ফিরে যাবেন না। বৈরাগ্য গ্রহণ করে প্রয়াগেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। এই সময়কার একটি বর্ণনা দিয়েছেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,—

"বৈকুণ্ঠবাবু গিরিশবাবু, আশুবাবু প্রভৃতির সহিত বেশ একটু আসর জমাইয়া লইয়াছিলেন। দাড়িটাড়িই রাখিয়াছিলেন। বোধ হয় চেলাটেলাও ক্রমে জুটিত, কিন্তু অতদিন পর্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই, কারণ ১৭ই জুলাই তিনি যখন ভাত ডাল রান্না করিয়া খাইতে বসিয়াছেন, দেখিতে পাইলেন, পুত্র যতীশ ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিন কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল, আবার মায়া আসিয়া অধিকার করিল, তিনি তাহাদের সমভিব্যাহারে বাড়ী রওনা হইলেন, তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের অবসান হইল। ...সঞ্জীববাবু ফেরেন ১৮ই জুলাই।"[১৭]

এই সময় পর্যন্ত জ্যোতিষচন্দ্র পুলিশের চাকরী পান নি। সঞ্জীবচন্দ্রকে এলাহাবাদে একা রেখে বাড়ী ফিরে এলে বঙ্কিমচন্দ্রকে আত্মীয়দের কাছে অপ্রিয় কথা শুনতে হয়েছিল। এই ব্যাপার নিয়ে জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমালিন্য চরমে ওঠে। কারণ সঞ্জীবচন্দ্রের এলাহাবাদের ঠিকানা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই জানতেন। সম্ভবত পাওনাদারদের ভয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বারণ করেছিলেন অন্য কাউকে ঠিকানা বলতে। এই সময় সঞ্জীবচন্দ্রকে মেদিনীপুর থেকে লেখা একটি চিঠিতে বঙ্কিমের তিক্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়,—

"শ্রীচরণেষু,

পাড়ার [illegible] আমি আপনাকে পশ্চিমে হইতে আসিতে দিই নাই, সেই জন্য আপনি [illegible] নাই। আমার বিশ্বাস আপনি নিজে থাকিতে চাহেন, আমি থাকিতে দিই নাই। আমার পরিণামে যে এই পুরস্কার হইবে তাহা আমি

বহুদিন হইতেই জানি। জানি বলিয়াই এবং এইরূপ পুরস্কার কাঁটালপাড়ায় পাই বলিয়াই অনেকদিন পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ করিয়াছি। এ সকল রচনা প্রথম বড়বাবুর··· ।"

মেদিনীপুরে থাকাকালেই বঙ্কিমচন্দ্র খবর পান সঞ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসেছেন। এই খবরে তিনি খুশী হলেও আত্মীয়বিরোধের তিক্ততার আভাস ঐ সময়কার একটি চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। ঐ চিঠিতে আরও জানা যায় সঞ্জীবচন্দ্র রাগ করে এলাহাবাদে থেকে গেলেও রাগ যে কার উপর ছিল তা আমরা বুঝতে পারি না। এই রাগ স্ত্রী নবকুমারীর উপর হওয়া সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের ছিন্নপত্রটিতে আছে—

"শ্রীচরণেষু,

আপনি বাড়ী আসিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আসিবেন তাহা জানিতাম। জানিতাম কেননা আমি দেখিয়াছি, আপনার মনে রাগ ভিন্ন বৈরাগ্য উপস্থিত হয় নাই, রাগ পড়িয়া যায়, বৈরাগ্য ভিন্ন সংসার ত্যাগ হইতে পারে না, এজন্য আমি যতীশের মাতাকে বলিয়াছিলাম যে চারিমাস অপেক্ষা কর, কেননা টিকিটের মেয়াদ চারমাস। চারি মাসে না আসেন তখন ব্যস্ত হইও। যাহা হউক আসিয়া ভালই···

অনেক দুঃখ পাইয়াছেন, ইহাই প্রমাণ যে বৈরাগ্যের অনেক দেরী, মমতা পরিত্যাগই বৈরাগ্য। যাহা হউক আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে এখন আমার বোধ হইতেছে যে আপনার ঠিকানা বলিয়া দিতে নিষেধ না করিলে ভাল হইত। কেননা আমি ঠিকানা বলিতে অস্বীকৃত হইয়া অনেকের কাছে শত্রু হইয়াছি। অন্ততঃ বড়বাবু ঐরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন,

চিরণ প্রভৃতির···অবস্থা তাহাও আমারই দোষ বলিতে হইবে, কেননা আমি মাঝে ত্রিশ টাকা মাত্র দিয়াছি কিন্তু আমারও দোষ বড় নাই কেননা আমি আপনাকে টাকা পাঠাইয়াছি। আমি বিদেশ যাত্রার পর তাহাকে কিছু দিই নাই বটে...সে খুচরা ১০।২০ টাকা নিতে নারাজ এককালীন বেশী দিতে হইবে। আমি টাকার সাশ্রয় করিবার জন্য বাড়ীর ত্রিশ টাকা বরাদ্দ করি নাই। কিন্তু অনেকের সেই বিশ্বাস এবং সেই জন্য আমি নিন্দিতও হইয়াছি। বড়বাবুর কাছে অনেক গালি খাইয়াছি। কপালী যে তাহার ভাইকে ২৫ টাকা দেয় সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার চরিত্র শোধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, বড়বাবু··· তিনি আমাকে সম্প্রতি লিখিয়াছেন তাহার সহিত শত্রুতাই করাই ভায়েদের কার্য, তিনি মরিলে আমরা কি করিব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি কোন উত্তর দেই নাই।"

···জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও নিজ গ্রামের লোকের উপর বঙ্কিম তিক্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সদালাপী সঞ্জীবচন্দ্র বিদেশ ও বৈরাগ্য থেকে ফিরে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজে

আত্মনিয়োগ করেন। কারণ ইতিমধ্যে ফুলের বাগানের প্রতি সেই আকর্ষণ নেই। গ্রামের নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা হবে, তিনি আগ্রহ ভরে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখলেন। অভিমানী বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর থেকে সেই চিঠির উত্তরে তীব্রতিক্ত ভাষায় লেখেন—

Midnapore, 1887,
17th Aug, ২রা ভাদ্র।

"শ্রীচরণেষু,

কাঁটালপাড়ায় স্কুল বা কলেজ বা University যাইই হৌক তাহাতে আমি কোন সাহায্য করিব না। কাঁটালপাড়ার পূজায় আমি টাকা দিব না। এ বৎসর আমি ও আমার পরিবার পূজার সময়ে মেদিনীপুরেই থাকিব। সুতরাং কলিকাতাতেও পূজা করিতে পারিলাম না।

যেখানে বরদা ভট্টাচার্য্যের মত ব্যক্তি আমাকে জুয়াচোর বলে, যে স্থানে রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথের মত লোক আমার পিতাকে জালসাজ বলে, যে দেশে বসন্ত ও চণ্ডী ভট্টাচার্যের মত লোকের সঙ্গে দলাদলি এবং যেখানে বড়বাবুর মত সহোদরের মুখ দর্শন করিতে হয়, সে দেশের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না। সেখানে আমার দুর্গোৎসব হইবে না।

ইতি
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

এই সময় জ্যোতিশ্চন্দ্রের পুলিশ ইন্সপেক্টারের চাকরী হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। তিনি তাঁকে চাকরী জীবনের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে একখানি পত্র লেখেন। এই বছরই বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ কন্যা উৎপলা অসশ্চরিত্র স্বামী সতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অসদ্ব্যবহারে আত্মহত্যা করেন। বাড়ীতে বিষাদ করুণ শোকের ছায়া নেমে আসে। সেই অবস্থায় সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমের শোকের সঙ্গী দুঃখের বন্ধু ছিলেন। তিনি পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রকে একটি পত্রে লেখেন—

"বঙ্কিমের নিকট এই সময় ২।৪ দিন থাকা দরকার তাই হঠাৎ আমাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে।"

অন্য একখানি পত্রে পুত্রকে লেখেন,

"তোমার সেজকাকা আশ্চর্য মানসিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। বোধ হয় আমি উপস্থিত থাকায় শোক করিতে পারেন নাই, তাই আমি সারিয়া আসিয়াছি। তোমার সেজ খুড়ির অবস্থা বড় মন্দ।"

সঞ্জীবচন্দ্রের স্বাস্থ্য এই সময় প্রায়ই খারাপ হত। তবু জমি জায়গা দেবত্র ইত্যাদি থেকে যেটুকু আয় হত সেটুকু সাধ্যমত জোগাড় করে আনতেন। ঐ সংক্রান্ত মামলাও দেখাশুনা করতেন সেই সময়। পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র তখন কর্মক্ষেত্র মেহেরপুরে। তাঁর স্ত্রী মোতিরাণী ও পুত্র চিরঞ্জীব সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে থাকতেন। পিতাপুত্রের মধ্যে

সপ্তাহে প্রায় দুখানি করে চিঠি আদান প্রদান থাকতো। এই সময়ের বহু চিঠি, যেগুলি জ্যোতিশচন্দ্র পেয়েছিলেন, যার সংখ্যা প্রায় একশটি প্রায় সবকটিই জ্যোতিশ্চন্দ্রের পুত্র শতঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্কিম সংগ্রহশালায়' দান করেছেন। চিঠিগুলি তখনকার দিনে এক পয়সা দামের ছোট পোষ্টকার্ডের একপিঠে লেখা। প্রায়ঃ প্রতিটি চিঠিতে সঞ্জীবচন্দ্রের জ্বর হওয়া অথবা শরীর খারাপ হওয়ার খবর আছে। চিরঞ্জীবচন্দ্র তখন শিশু, তাঁর খবরও প্রায় সব চিঠিতে আছে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও টাকার জন্যে সঞ্জীব এখানে ওখানে যেতেন। চিঠিতে লেখার তারিখ না থাকলেও ডাকঘরের ছাপ থেকে কিছু কিছু তারিখ উদ্ধার করা গেছে। নৈহাটি ডাকঘরের ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৮৭ তারিখের ছাপ থেকে জানা যায় সঞ্জীবচন্দ্র বর্ধমানে গিয়েছিলেন। তাতে লিখছেন—

"প্রাণাধিকেষু,

আমি বর্ধমানের জজ আদালতে একটা সাক্ষ্য আদায় করিতে গিয়াছিলাম। তাহাই তোমায় পত্র লিখিতে পারি নাই। আমার শরীর এখন ভাল। জ্বর প্রায় হয় না, তবে পাকশক্তি একেবারে গিয়াছে। একবেলা আহার করিলে ভাল থাকি দুই বেলা আহার করিলে সঙ্গীন হয়। হাতে টাকা না থাকায় কলিকাতায় যাইতে পারি নাই। কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই।.........

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

এই অবস্থার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র সহায়। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে টাকা পয়সা বিশেষ দিতেন না, কারণ তিনি জানতেন সেই টাকা উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যয়িত হবে না। সেই কারণে এই সময় থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের ভরণ পোষণের সমস্ত ব্যবস্থা তিনি যে ভাবে করেছিলেন নিচের চিঠিটি থেকে বুঝতে পারবো। কীট দষ্ট এই পত্রটির কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও আমাদের বুঝতে কষ্ট হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

"শ্রীচরণেষু,

জ্যোতীশের নিজ পরিবার......প্রতি পালন...কিন্তু আপনার ভার তাহার উপর আমার দিবার ইচ্ছা নাই। তাহা পূর্বপত্রে লিখিয়াছিলাম। এবং এক্ষণে সবিস্তারে বিবেচনা করিয়া লিখিতেছি—

স্বর্গীয় কর্তা মহাশয় জীবিত থাকিতে তাঁহার ১। আহার, ২। পরিধেয়, ৩। চিকিৎসা এই তিন প্রকারের ব্যয় আমরা নির্বাহ করিতাম। আপনার সম্বন্ধেও আমি তাহাই করিতে চাহি। অতএব ইহার বন্দোবস্ত আমি নিম্নলিখিত ভাবে করিলাম—

১। নিত্য প্রয়োজনীয় ঘৃত ময়দা কিনিয়া দিয়া আসিবে। ১৷৷০ সের দুগ্ধ বরাদ্দ থাকিতে পারে তাহার মূল্য মাস মাস আমি দিব......

২। বস্ত্র......তা এবং শয্যা গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি যখন যাহা নিজের প্রয়োজনীয়

হইবে উমাচরণকে বা আমাকে জানাইলে পাঠাইয়া দিব।

৩। আপনার নিজ চিকিৎসার বিল ডাক্তারকে আমার কাছে পাঠাইতে বলিয়া দিলাম।

কর্তার প্রতি যাহা করিতাম আপনার প্রতি তাহা করিতে চাহিতেছি ইহাতে আপনার অনভিমত হইবে না বিবেচনা করি।

······দ্বারা লেপের খোল পাঠাইয়া দিয়াছি পৌঁছ সংবাদ দিবেন।

ইতি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩ই পৌষ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবস্থা যে ঠিকমত চলেছিল তার সমর্থন জ্যোতিষচন্দ্রের স্ত্রী মোতি রাণীর একটি চিঠিতে আছে। প্রয়োজনীয় অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। ডাকঘরের ছাপ ১৮৮৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী—

"সেজকাকা আসিয়াছিলেন। বাবার ঘি, ময়দা লুচি ঠিক করিয়া দিয়াছেন দুগ্ধ রোজ করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধে গ্রামস্থ লোককে লুচি করিয়া খাওইয়াছেন।"

অসুস্থ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রায়ই জ্বর হত। সকলের ধারণা ছিল ম্যালেরিয়া জ্বর। এই অবস্থায় অসুস্থ শরীরে সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে টাকার জন্যে ডায়মণ্ডহারবারের লক্ষ্মণপুরে 'রাধাবল্লভ জীউর' তালুকে যান। সঙ্গে তাঁদের কর্মচারী নীলমনি থাকে। জ্যোতিশ্চন্দ্র তখন কাঁটালপাড়ায়। তাঁকে সঞ্জীবচন্দ্র ২৩শে ফাল্গুন ১২৯৫ (১৮৮৯ খৃঃ) লেখেন—

"প্রাণাধিকেষু,

গতকল্য রাত্রে ৮টার সময় লক্ষ্মণপুর পৌঁছিয়াছি। Diamond Harbour Post Office হইয়া লক্ষ্মণপুরের ঠিকানায় লিখিলে তোমায় পত্র পাইতে পারিব। কিন্তু অধিক বিলম্বে পৌঁছাবে। এখানে Post Peon প্রায় আইসে না। চিরণকে Tonic একটা অধিক অবশ্য খাওয়াইবে। তুমি নিত্য পত্র লিখিবে, আমি তাহা পাই না পাই তাহা স্বতন্ত্র কথা, ইতি ২৩শে ফাল্গুন

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

স্নেহময় পিতা ও পিতামহ সঞ্জীবচন্দ্রের অন্তর সদাসর্বদা পুত্র ও পৌত্রের চিন্তায় ব্যাকুল থাকতো। তাঁর বাৎসল্যরস পূর্ণ হৃদয়ের আন্তরিক পরিচয় এই চিঠিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

লক্ষ্মণপুরে থাকবার সময়ই তিনি রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েন, চিঠিতে অসুস্থ মানুষের বিকৃত হাতের লেখা ঐ অবস্থার সাক্ষ্যবহন করছে। সম্ভবত ১লা মার্চ তিনি শেষ চিঠি লিখেছিলেন লক্ষ্মণপুর থেকে জ্যোতিশ্চন্দ্রকে। চিঠির তারিখ নেই। নৈহাটী ডাকঘরের ছাপ ৩রা মার্চ, ১৮৮৯।

ডায়মণ্ডহারবার

"প্রিয়তমেষু,

অদ্য নীলমনি Money Order করিয়া কিছু টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত ডায়মণ্ডহারবার যাইবে

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

এই চিঠি লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই সঞ্জীবচন্দ্র রীতিমত অসুস্থ শরীরে কাঁটাল পাড়ায় ফিরে আসেন।

উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাড়ী প্রতাপ চ্যাটার্জি লেন থেকে ২১শে মার্চ (১৮৮৯) তারিখের চিঠিতে লেখেন

"ঈশ্বর না করুন, যদি মধ্যম বাবুকে কলকাতায় বিপিন ডাক্তারকে দেখাইবার এবং এখানে অর্থাৎ কলিকাতায় থাকিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বাসায় আসিলেই চলিবে। কোন ওজর আপত্তি না করেন। তৃতীয় বাবুর অভিপ্রায় তাই। বড়বাবুর অবস্থা কিরূপ লিখিবা।"

এই সময় অর্থাৎ এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন থাকতেন। তিনি পূর্ণচন্দ্রের পুত্র বিপিনচন্দ্রকে লেখেন—

"প্রিয়তমেষু,

মেজবাবুর রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। ব্যয় জন্য কুণ্ঠিত হইবে না। আমার কাঁটালপাড়ায় যাওয়া দুর্ঘট। Subarban Police Court এর চার্জ আমার নিকট, Confession or Dying Declaration লিখিতে হয়, কোথাও যাইতে বাসনা করি না। তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে তখন বিবেচনা করা যাইবে।

ডাক্তার যেরূপ বলিয়াছে আমার সেরূপ বোধ হয় না। কোন চিন্তার বিষয় নাই। মেজাবাবুর ওরূপ জ্বর হইয়া থাকে। এক্ষণে কেমন থাকেন আগামীকালই আমাকে সম্বাদ দিবে।

আমার নিজের ব্যবস্থা, এক আধ Dose China দিবে। China এই অবস্থায় বলকারক।

পু......আমি রবিবার কাঁটালপাড়া যাইব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমবাবু হোমিওপ্যাথি চর্চা করতেন তার পরিচয় এই চিঠিতে রয়েছে। তিনি সম্ভবত রবিবার অর্থাৎ ১৪ই এপ্রিল সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে কাঁটালপাড়ায় আসেন, তাঁদের মধ্যে সেই শেষ দেখা। ১৮ই এপ্রিল ১৮৮৯ সাল, ৫ই বৈশাখ ১২৯৬ সন বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে সঞ্জীবচন্দ্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে পরিবারস্থ অন্যান্যদের কী অবস্থা হয়েছিল তার তার বর্ণনা দিয়েছেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।—

"শ্যামাচরণের কর্ণেও এই সংবাদ পৌঁছল তিনি উদাসভাবে বলিলেন, 'দিন কয়েকের অগ্র পশ্চাৎ যাত্রী, বস্তুত অল্পদিন মধ্যে তিনিও মহাপথ যাত্রী হইয়া মধ্যম ভ্রাতার অনুসরণ করিলেন।

ক্রমে ভ্রাতৃবিয়োগের সম্বাদ বঙ্কিমের কর্ণে পৌঁছিল। এবার পাহাড়াও ভাঙ্গিল। তিনি ভুমিতে গড়াগড়ি দিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। মেজদাদাকে মাঝে মাঝে যে মৃদু ভৎসর্না করিতেন সেই কথা মনে করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

—কালবিলম্ব না করিয়া তিনি কাঁটালপাড়ায় চলিয়া আসিলেন। মেজদাদার চিতাশয্যার পার্শে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুঝাইলেন,' পলা গিয়েছে, মেজদাদাও গেলেন, আমিতো স্থির আছি, তুই ও স্থির হ।"[১৮]

—বঙ্কিমচন্দ্র যে ছিলেন তার প্রমাণ পাই ১৮৯৩ সালে' সঞ্জীবনী সুধা নামে সঞ্জীবচন্দ্রের যে রচনাবলী প্রকাশ করেছিলেন, তাতে যেমন সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী শ্রদ্ধাসহকারে রচনা করলেন তেমনি তার জন্যে যে টাকা ব্যয় করেছিলেন তা তো জ্যোতিষচন্দ্রের কাছ থেকে নিলেন না, উপরন্তু বইটির সর্বস্বত্ব তাঁকে দান করলেন। এই সময় তিনি জ্যোতিশ্চন্দ্রকে লেখেন—

"যে খরচ আমি করিয়াছি এবং অন্য লোক সাহায্য করিয়াছে, তাহা হইতে ২০০ টাকা আমার সাহায্য ধরিয়া টাকা শোধ করিয়া যাহা পাওনা হয়, তাহা তোমারই থাকিবে।"

: পাদটীকা :

১। রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩শ খণ্ড, শতবর্ষ সং)—১১৬ পৃঃ
২। নারায়ণ (১৩২২ ভাদ্র) ৩। বঙ্গদর্শন (নবপর্যায় ১৩১৯ ভাদ্র)—৩১৩ পৃঃ
৪। বঙ্কিমজীবনী (১৩২২)—১৮ পৃঃ ৫। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৬১)—৪৯ পৃঃ
৬। বঙ্গদর্শন (১৩১৮ শ্রাবণ)—১৫৩ পৃঃ ৭। সাধনা (শ্রাবণ ১৮৯৪)
৮। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৬১)—৫৯ পৃঃ পদটীকা ৯।
১০। আমার জীবন (নবীনচন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড ১৩৮১)—৪০৬-৪০৮ পৃঃ
১১। জীবন স্মৃতি (রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খণ্ড—শতবর্ষ সং)—১১৫ পৃঃ
১২। নারায়ণ—(১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৈশাখ ১৩২২),—৫১৯—৫২১ পৃঃ
১৩। বঙ্গভাষায় লেখক : পিতাপুত্র (১৩১১)—৫৪২ পৃঃ
১৪। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়া—নারায়ণ (বৈশাখ ১৩২২)—৫২৫—৫২৬ পৃঃ
১৫। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৬১)—২৭৪—২৭৫ পৃঃ
১৬। সমালোচনী (১৩০৯) পৌষ
১৭। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র —৩৩৫—৩৩৬ পৃঃ ১৮। ঐ (১৯৬১)—৩৪৮ পৃঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র

সঞ্জীবচন্দ্র যখন বর্ধমানে কর্মরত সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূচনা করলেন (১২৭৯ সন, ১৮৭২-৭৩ খৃঃ)। বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণে সঞ্জীবচন্দ্রও কলম ধরলেন। ব্যক্তি জীবনের মজলিসি মেজাজটি উজাড় করে দিতে তিনি কার্পণ্য করলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করলেন চার বছর (১২৭৯-১২৮৩ সন)। এই সময় সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সাহিত্যিক সঙ্গ যথেষ্ট পরিমানে হলেও তিনি লিখেছেন কম। তবে লেখার প্রস্তুতি-পর্ব এই সময় বেশ ভাল ভাবেই সাধিত হয়েছিল তা তাঁর রচনাগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। ১২৭৯-১২৮০ সালে, এই দু-বছরে তিনি একটা মাত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন, প্রবন্ধটির নাম 'যাত্রা', বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৭৯ ও '৮০ সালের দুটি সংখ্যায় দুটি পযাযে প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটির মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হলেও বাংলা সাহিত্য জগতে তা কোন সাড়া জাগায়নি। তিনিও তখন পর্যন্ত সাহিত্য ব্যবসায়ী হবেন কি না তার কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকার কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করেন, তার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ কিছু কম নয়। এই রকম সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বঙ্গদর্শনের সঙ্গে আর একটি ছোট পত্রিকা প্রকাশ করতে পরামর্শ দিলেন। এতদিনে সঞ্জীবচন্দ্র যেন মনের মত একটি কাজ পেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়কার একটি বর্ণনা দিয়েছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত—

> "১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল, কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শনের ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনে দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন, তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিকপত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদনা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামার্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল,

এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন, আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ সচরাচর তিনি করিতেন না। এই সংগ্রহ-এ (সঞ্জীবনী সুধা) যে দুটি উপন্যাস (দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট) দেওয়া গেল তাহাও ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক কাজ তিনি নিয়মিত অধিক দিন করিতে ভালবাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল।"

ভ্রমর পত্রিকার সূচনা কি ভাবে হয়েছিল তা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রর পরিচয় থেকে জানতে পারলাম। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরে প্রকাশিত রচনা কেবলমাত্র রামেশ্বরের অদৃষ্ট, দামিনী এবং কণ্ঠমালাকে ভ্রমরে প্রকাশিত তাঁর বলে চিহ্নিত করলেও তিনি বলেছেন, 'প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন'। আমরা ভ্রমরের সম্পূর্ণ সূচী উদ্ধৃত করছি।

১। ভ্রমর। মাসিক পত্র। ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১২৮১ (১ম সংখ্যা)
ভ্রমর-১। রামেশ্বরের অদৃষ্ট-৩। নিদ্রা-২৪। জলে ফুল-২৮। স্ত্রীজাতি বন্দনা-৩০। (সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা চিহ্ন।) ২। ১ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ (২য় সংখ্যা)। দামিনী-৩১। জলজ সুন্দরী—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, ৫৫। নূতন জীবের সৃষ্টি-৫৬। ভারত ভাণ্ডারি-৬০। ৩। ১ম খণ্ড, আষাঢ় ১২৮১ (৩য় সংখ্যা)। বৃষ্টি-৬১। কণ্ঠমালা-৬৪। জলে আলো—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ-৮৩। ৪। ১ম খণ্ড, শ্রাবণ ১২৮১ (৪র্থ সংখ্যা)। কণ্ঠমালা-৮৫। একঘরে-৯৮। ভারত ভাণ্ডারি-১০৭। ৫। ১ম খণ্ড, ভাদ্র ১২৮১ (৫ম সংখ্যা)। কণ্ঠমালা-১০৯। অনন্তা-১২৯। ৬। ১ম খণ্ড, আশ্বিন ১২৮১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা)।কণ্ঠমালা-১৩৩। দুর্গাপূজা-১৫২। প্রভাতে যামিনী-১৫৩। মূল্য প্রাপ্তি। ৭। ১ম খণ্ড, কার্ত্তিক ১২৮১ (৭ম সংখ্যা)। বঙ্গে দেবপূজা-১৫৭। কণ্ঠমালা-১৬৫। ৮। ১ম খণ্ড, অগ্রহায়ণ ১২৮১ (৮ম সংখ্যা)। বঙ্গে দেবপূজা (প্রতিবাদ)-বঃ-১৮১। স্বপন—জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-১৮৭। কণ্ঠমালা-১৯১। মূল্য প্রাপ্তি-২০৪। ৯। ১ম খণ্ড, পৌষ ১২৮১ (৯ম সংখ্যা)। বঙ্গে দেবপূজা (প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর) -২০৫। সংস্কার-২১৩। কণ্ঠমালা-২২১। ১০। ১ম খণ্ড, মাঘ ১২৮১ (১০ম সংখ্যা)। খাদ্যাখাদ্য-২৩৫। কণ্ঠমালা-২৪৩। ১১। ১ম খণ্ড, ফাল্গুন ১২৮১ (১১শ সংখ্যা)। কণ্ঠমালা-২৫৯। বাহুবল-২৭৪। সংস্কার-২৮০। ১২। ১ম খণ্ড, চৈত্র ১২৮১ (১২শ সংখ্যা)। সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর আপস-২৮৩। চন্দ্রালোক—শ্রীবঃ-২৯১। কণ্ঠমালা-২৯৭। বাঙ্গলার শূরবংশ-৩০৫। ১৩। ২য় খণ্ড, বৈশাখ ১২৮২ (১৩শ সংখ্যা)। ভ্রমরের আত্মকথা-১। বঙ্গে পাঠক সংখ্যা-২। কণ্ঠমালা-৫। নক্ষত্রের প্রতি-১৯। যাত্রা-২০। ১৪। জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ (১৪শ সংখ্যা)। কীর্ত্তন-২৫। কণ্ঠমালা-৩৫। কাতরা ময়ূরী—রাজকৃষ্ণ মিশ্র-৪৭। ১৫। আষাঢ় ১২৮২ (১৫শ সংখ্যা)। আমি-৪৯। কীর্ত্তন-৫৫। আর্যজাতির চিত্রপট—লালমোহন শর্মা-৫৯। শরৎশশী—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-৭১। ১৬। ভ্রমর। নূতন পর্যায়। মাসিক পত্র।

প্রথম খণ্ড-ভাদ্র ১২৮৫ (১ম সংখ্যা) ভ্রমর (নলিনীগণ কর্তৃক অভ্যর্থনা)-১। বাল্য বিবাহ-৬। ভূতের সংসার-১৮। নবাব পিঁপড়ে-২৩।
১৭। প্রথম খণ্ড, আশ্বিন ১২৮৫ (২য় সংখ্যা) অকাতরে বিবাহ-২৫। হৃদয় উচ্ছ্বাস—ঈশানচন্দ্র দত্ত-৩৪। বিধবা-৩৭। আনার বল্লী-৪১।
(১৬ ও ১৭ সংখ্যার উল্লেখ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সাময়িক পত্রের তালিকায় নেই। ঐ দুখানি পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্কিম সংগ্রহশালায় পাওয়া গেছে।)

সঞ্জীবচন্দ্র যে এক কাজ বেশীদিন করতে ভালবাসতেন না তা ভ্রমর প্রকাশের শেষদিকে লক্ষ্য করলে ভালভাবে বোঝা যায়। অনিয়মিতি, অর্ধসমাপ্ততা তাঁর জীবনে চিরকালই দুষ্টগ্রহের মত লেগে ছিল। যাই হোক, তবু তাঁর ভাগ্য কয়েকটি ব্যাপারে সুপ্রসন্ন ছিল—প্রথমত বঙ্কিমচন্দ্রের মত যোগ্যতম মানুষের ভাই ছিলেন তিনি, তাই যাতে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদাই সেইসব কাজে তাঁকে লাগিয়ে দিতেন। দ্বিতীয়ত পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন প্রথম ভারতীয় ডেপুটি কালেকটরদের অন্যতম, তাঁর সুপারিশে ভাল চাকরি পেতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। তিনি নিজে তা রাখতে পারলে শেষপর্যন্ত অনেক উন্নতিও করতে পারতেন। দেখা যাচ্ছে ভ্রমর পত্রিকার সম্পাদন কালেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের চরম সুযোগ লাভ করেছিল। এই সময় তিনি নিয়মিত লিখতেন। ভ্রমরের অধিকাংশ লেখাই ছিল তাঁর, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই একথা বলেছেন। কিন্তু সমস্যা, সে যুগে পত্রিকায় প্রায়ই লেখকের নাম থাকতো না বললেই চলে। পরবর্তী কালে পুস্তকাকারে প্রকাশ হলে অথবা অন্য কোন লেখকের নির্দেশক্রমে জানা যেত কোন্ লেখাটি কার। কোন নির্দেশ না থাকলে কালে লেখকের নাম হারিয়ে যেত। পরবর্তীকালে লেখকের পরিচয় 'অজ্ঞাত' নামেই চিহ্নিত হত। ভ্রমর পত্রিকায় সঞ্জীবচন্দ্র ছাড়া বাকী যে যে লেখার লেখকের নাম পাওয়া গিয়েছে তার পরিচয় আগে নেওয়া যাক—১। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বৃষ্টি' ও 'বঙ্গে দেবপূজা' এবং 'চন্দ্রালোক' রচনা তিনটি আমাদের পরিচিত, ২। গোপালকৃষ্ণ ঘোষের দুটি কবিতা, ৩। জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা, ৪। রাজকৃষ্ণ মিশ্র, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং ঈশানচন্দ্র দত্তের তিনটি কবিতা ছাড়া বাকী লেখার সবকটি সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে ধরে না মিলেও অধিকাংশ রচনাই যে সঞ্জীবচন্দ্রের তা আমরা ধরে নিতে পারি। তার মধ্যে অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে যে সমস্ত রচনা সঞ্জীবচন্দ্রের বলে আগেই চিহ্নিত হয়েছে তাদের মধ্যে আছে—১। কণ্ঠমালা, ২। রামেশ্বরের অদৃষ্ট, ৩। দামিনী এবং ৪। সৎকার। আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি সম্পাদকের মন্তব্য বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিও সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সঞ্জীবচন্দ্রের গান রচনার কথা 'পিতা পুত্র' প্রবন্ধে বললেও তিনি কবিতা রচনা করতেন কিনা সে সম্পর্কে আমাদের কিছু জানাননি। ভ্রমর নামে দুটি রচনা এখানে আছে। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার ভ্রমর নামে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের হওয়াই স্বাভাবিক।

কবিতাটি ১ম খণ্ড ভাদ্র (১২৮৫) সঞ্জীবচন্দ্রের না হওয়াই স্বাভাবিক। এর পরে রচনার অভ্যন্তরীণ বিচার ছাড়া বাকী রচনাগুলিকে সঞ্জীবচন্দ্রের বলে গ্রহণ করার অন্য কোন প্রমাণ তেমন কিছু আমাদের হাতে নেই। অচিহ্নিত রচনাগুলি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভ্রমরের কোন্ রচনাগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের এ সম্পর্কে আমাদের হাতে অবশ্য একটি দুর্বল প্রমাণ আছে। প্রমাণটি নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ভ্রমরের সম্পূর্ণ ফাইলটি একসঙ্গে বাঁধান অবস্থায় আছে। এটি দান করেছিলেন সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র ৺শতঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে এটি পেয়েছিলেন সঞ্জীবপুত্র ৺জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। জ্যোতিশ্চন্দ্রও এটি পেয়েছিলেন সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। যে সমস্ত রচনা সঞ্জীবচন্দ্রের বলে শতঞ্জীবচন্দ্র চিহ্নিত করেছেন তাদের শিরোনামের পাশে 'স' বলে যে অক্ষরটি লেখা আছে তা সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের হাতের লেখা বলেই মনে হয়। অবশ্য একটি অক্ষর দেখে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না তা আমরা স্বীকার করি। শতঞ্জীবচন্দ্র বাঁধান ভ্রমরের প্রথম পৃষ্ঠার আগের পৃষ্ঠায় নিজের হাতে লিখেছেন—

"ভ্রমর মাসিক পত্রিকা। ইহাতে এক বৎসরের একত্রে বাঁধান আছে। পিতামহ ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহাতে পিতামহ সঞ্জীবচন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তক আছে—১। কণ্ঠমালা, ২। রামেশ্বরের অদৃষ্ট, ৩। দামিনী, ৪। এক ঘরে, ৫। ভারত ভাণ্ডারি, ৬। বাহুবল, ৭। সৎকার, ৮। যাত্রা, ৯। কীর্তন, ১০। আর্য জাতির চিত্রপট, ১১। বাল্য বিবাহ, ১২। অকাতরে বিবাহ, ১৩। আনার বল্লী, ১৪। দুর্গাপূজা, ১৫। স্ত্রী জাতি বন্দনা।

৺বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত—'বৃষ্টি', 'বঙ্গে দেবপূজা'। পিতা ৺জ্যোতিশ্চন্দ্র লিখিত—১। জলে ফুল, ২। স্বপন, ৩। প্রভাত কামিনী, ৪। ভ্রমর, ৫। বিধবা।"

শতঞ্জীবচন্দ্র যে রচনাগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের বলে উল্লেখ করেছেন তাদের অভ্যন্তরীণ বিচারে দেখা গেছে সঞ্জীবের বহু বিষয়ে জ্ঞান, ভাষার তির্যকতা, বাৎসল্যরসের প্রাবল্য, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক স্পর্শ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি ঐ সব অস্বাক্ষরিত রচনাগুলিতে খুবই স্পষ্ট। অন্যপক্ষে বঙ্কিমের মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত রচনাকে আমাদের সঞ্জীবচন্দ্রের বলে মনে হয়েছে তাদেরও একটি পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।—১। ভ্রমর, ২। নিদ্রা, ৩। নূতন জীবের সৃষ্টি, ৪। অনন্তা, ৫। খাদ্যাখাদ্য, ৬। সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর আপোস, ৭। বাঙ্গালার শূর বংশ, ৮। ভ্রমরের আত্মকথা, ৯। বঙ্গে পাঠক সংখ্যা, ১০। আমি, ১১। ভূতের সংসার, ১২। নবাব পিঁপড়ে।

ভ্রমর পত্রিকায় অস্বাক্ষরিত রচনাগুলির মোট ২৩টি রচনা আমরা নতুন করে সঞ্জীবচন্দ্রের বলে গ্রহণ করতে পারি। ভ্রমর কার্যত ১২৮২ সালের আষাঢ় মাসে

বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে ১২৮৪ সালে তিনি বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করেন।

বঙ্গদর্শন সম্পাদকরূপে সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম দুবছর তাঁর কর্মে যথেষ্ট নিষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। অথচ প্রথম দুবছর সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম ছাপা হয়নি। কেবল কোষাধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রের নাম ছাপা থাকতো। তবে তিনিই যে বঙ্গদর্শনের ৫ম বর্ষ থেকে ৯ম বর্ষ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য আমাদের নিশ্চিত করেছে। বঙ্কিম লিখছেন—

"আমি ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর তিনি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন।"

তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে যে স্বত্বাধিকার দান করেছিলেন তাতে সাক্ষী ছিলেন তাঁদের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বত্বাধিকার দানের দানপত্রটি নীচে দেওয়া হল।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্তবাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীচরণেষু,

লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

সাং কাঁটালপাড়া।

অত্র কার্যঞ্চাগে আমি বঙ্গদর্শন নামে যে সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, অদ্য হইতে তাহাতে আমার যে কি স্বত্ব, অধিকার তাহা আপনাকে দান করিলাম। অদ্যকার তারিখের পূর্বে উক্ত পত্রে মৎপ্রণীত যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পুনঃ প্রকাশ বা পুনঃ মুদ্রিত করিবার যে অধিকার তাহা পূর্ববৎ আমার রহিল। তদ্‌ভিন্ন উক্তপত্রের গ্রাহকদিগের কাছে বাং ১২৭৯ হইতে বাং ১২৮২ সাল পর্যন্ত কয় বৎসরের বাবত যে টাকা পাওনা আছে, তাহাতেও আমার হক বজায় রহিল। ইহা ভিন্ন বঙ্গদর্শনে আমার আর কোন স্বত্বাধিকার রহিল না। আপনি উহা প্রকাশ করিবেন বা করাইবেন। উহা প্রকাশ করিতে বা উহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে আমার কোন অধিকার রহিল না। এতদর্থে দানপত্র লিখিয়া দিলাম।

ইতি

তাং ১২ই ফাল্গুন বাং ১২৮৩ সন

সাক্ষী—স্বাক্ষর

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বাক্ষর—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র কেন সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্গদর্শনের স্বত্বাধিকার দান করলেন তাঁর কারণ সন্ধানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন,—

"তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয় তিনি ঝঞ্ঝাট

ভালবাসিতেন না, এবং সঞ্জীববাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল।"[১]

তবে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের ভার সঞ্জীবচন্দ্রকে দান করলেও প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদর্শনের সম্পূর্ণ দেখাশুনার ভার বঙ্কিমচন্দ্র নিজের হাতে রেখেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন,—

"তখন দিন কতক তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) সাব-রেজিষ্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু এখানে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়, কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইলেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল।"[২]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনার যোগ্যতা সম্পর্কে মোটেই সন্দিহান ছিলেন না। কারণ ১২৮১-৮২ সালে ভ্রমর পত্রিকার সম্পাদনা কার্যের মাধ্যমে সঞ্জীব আপন যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শন সম্পাদনা সম্পর্কে লিখছেন—

"পূর্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে, বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাহারা পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' তাঁহার সম্পাদকতা কালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনিও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'পালামৌ', 'বৈজিক তত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।"

বঙ্গদর্শন কিভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে আসে সে সম্পর্কে কবি নবীনচন্দ্র সেন যে স্মৃতিচারণ করেছেন তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

"পরদিন প্রাতে বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। বঙ্গদর্শন অল্প দিন পূর্বে বঙ্কিমবাবু, অক্ষয়বাবুর ভাষায় গলা টিপিয়া মারিয়াছিলেন। উহা পুনঃ প্রচারিত করিবার চেষ্টা করা আমার এইবার বিদায় লওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ বঙ্গদর্শনের সহিত বঙ্গসাহিত্যে এবং আমাদের হৃদয়ে যেন একটা নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে আমি বঙ্গদর্শনের পুনঃ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন।— "বটে, বঙ্গদর্শন বন্ধ করাটা তোমাদের বড়ই প্রাণে লাগিয়াছে। লাগিবারই কথা কিন্তু কি করিব? আমি একে ত দাসত্ব ভারে পীড়িত, তাহার উপর স্বাস্থ্যের

এবং পরিশ্রম শক্তির সীমা আছে। ইদানীং বঙ্গদর্শনের প্রায় তিন ভাগ লেখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাজেই আমি আর পারিলাম না। তাহা ছাড়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা দেশ আমার শত্রু হইয়া উঠিতে ছিল। শুনিয়াছি, কোন কোন গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্যন্ত সংকল্প করিয়াছিল। গালাগালির ত কথাই নাই। সার জর্জ কেম্বেলের পর বোধ হয় আমি এ বাঙ্গলায় গালাগালির প্রধান পাত্র। তোমরা বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচার করিতে চাহ আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হইব না।' আমরা তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলাম, অনেক অনুনয় করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না। তিনি অক্ষয় কি সঞ্জীববাবুকে সম্পাদক প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত দিনটা তর্কে বিতর্কে ও পরামর্শে কাটিয়া গেল। অক্ষয়বাবু বলিলেন, তিনি বৈতনিক সম্পাদক মাত্র হইতে পারেন। কার্যাধ্যক্ষ তিনি হইবেন না। সঞ্জীববাবু কার্যাধ্যক্ষ হইতে স্বীকার করিলেন। তখন অক্ষয়বাবু মাসিক দুই শত টাকা বেতন চাহিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—' 'এত বেতন চলিবে না, কারণ বঙ্গদর্শনের দুই শত টাকার অধিক আয় কখন হয় নাই। তখন স্থির হইল যে সঞ্জীববাবু উভয় সম্পাদক ও কার্যাধ্যক্ষ হইবেন, এবং এইভাবে বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচারিত হইবে।"*

নবীনচন্দ্রের স্মৃতিকথা থেকে দুটি খবর আমরা জানতে পারলাম— ১। কিভাবে সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সমস্ত দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ২। বঙ্গদর্শনের আয় কি পরিমাণ ছিল।

সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৭৩ সালে কাঁটালপাড়াতে বঙ্গদর্শন প্রেস স্থাপন করেছেন, বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় বর্ষ থেকে কাঁটালপাড়াতেই ছাপা হত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভাইদের নিয়ে বাড়িতে একটা সভা করে পরিবারের প্রায় সকলকে নিয়ে যাদবচন্দ্রকে সভাপতি করে ঐ ছাপাখানার উদ্বোধন করেছিলেন। ভ্রমরও ঐখান থেকে প্রকাশিত হত। বঙ্গদর্শনের গ্রাহক সংখ্যা দ্বিতীয় বৎসরেই দেড় হাজারে উঠেছিল।[৪] বঙ্গদর্শন সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রায় দু বছর খুব ভালভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ১২৮৬ সনে অর্থাৎ ১৮৭৯-'৮০ সালে সঞ্জীবচন্দ্রের কর্মক্ষেত্রে বদলির আদেশ আসে। ১৮৭৯ সালের মার্চ মাসে বর্ধমান থেকে যশোরে বদলী হবার আদেশ হয়। সেই সময় রুটিরুজির তাগিদেই সঞ্জীবের বঙ্গদর্শন দেখাশোনা করা সম্ভব হয়নি। যশোরে বদলি হয়ে জুলাই মাসে দীর্ঘ নয় মাসের ছুটি নিয়ে তিনি কাঁটালপাড়ায় ফিরে আসেন এবং আবার বঙ্গদর্শনের প্রকাশে মন দেন। কিন্তু আগের উৎসাহ তাঁর ক্রমশ কমে আসতে থাকে। সপ্তম বর্ষে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ অনিয়মিত হতে শুরু করে। বঙ্গদর্শনের ছাপার ও কাগজের মানের অবনতি ঘটতে থাকে। ছাপার ভুলভ্রান্তি এই সময় বেশী পরিমাণেই লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য লেখক সম্প্রদায় একই থাকার ফলে রচনার মান যে কমে গিয়েছিল তা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তখন বঙ্গদর্শনের কাজকর্ম ভালভাবে দেখতে পারছিলেন না। লেখার মান নিয়ে এবং

প্রকাশের অনিয়মিতির জন্যে তাঁর অসন্তোষ যথেষ্ট মাত্রায় যে ছিল তার প্রমাণ কয়েকটি চিঠিপত্রে পেয়েছি। ১২৮৮ সালে (১৮৮১-৮২) বঙ্গদর্শন রীতিমত অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এই সময় সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে দুটি বড় ঘটনা ঘটে— ১। পিতৃবিয়োগ ও ২। কর্মত্যাগ। কর্মক্ষেত্রে অশান্তিই তাঁর সম্পাদনা কার্যকে অনিয়মিত করে তোলে। এর উপর তাঁর ঋণের মাত্রাও এত বেশী হয়ে পড়ে যে তখন তাঁকে পাওনাদার এড়াবার জন্যে প্রায়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াতে হত। তাঁর নিজস্ব সম্পত্তিও সব বাঁধা পড়ে এবং পাওনাদারদের মামলায় ডিক্রী হয়ে সব কিছুই ক্রোক নিলামে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র সাধ্যমত সাহায্য করেও তাঁকে মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারেননি। এই সময় পারিবারিক অশান্তিও চরমে ওঠে, প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া অন্য দুই ভাই কার্যত তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেননি। বঙ্গদর্শনের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা যথেষ্টই ছিল। ১৪ই জুলাই ১৮৮১ সালে তিনি বঙ্গদর্শনের কোষাধ্যক্ষ জ্যোতিশ্চন্দ্রকে লেখেন—

> "বঙ্গদর্শন অচল হইলে আমাকে জানাইও। টাকা বা Matter সম্বন্ধে যাহা উপকার করিতে পারি করিব। আমাকে হাওড়ায় পত্র লিখিবে।" .

বঙ্গদর্শন পত্রিকা সেকালে বিদগ্ধ পাঠকের কাছে কতখানি আদৃত ছিল তার প্রমাণ সমকালের বহু রচনায় ও পত্রপত্রিকায় বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র একবছর বঙ্গদর্শন বন্ধ করে রাখার পর আবার যখন সঞ্জীবচন্দ্রের উপর প্রকশের দায়িত্ব দিলেন তখন 'সাধারণী' পত্রিকা ১২৮৪ সালের ১১ই বৈশাখ রহস্য করে লিখেছিল—

> "মহতের মহত্ত্ব এই যে তিনি ইচ্ছামত আত্মসম্বরণ করিতে পারেন। তাই আমাদের সুপরিচিত বুড়ো দাদা অরণ্যে যাইতে যাইতে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিলেন। তবে এবার কেবল পরের জন্য। এবার আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি। হাসিতে অনুরোধ করি, এবার পরের জন্যই যেন আবার তেমনি করিয়া সূর্যমুখীর শয়ন গৃহ সাজাইয়া রাখেন। আবার যেন তেমনি করিয়া কুন্দকমলে ঘটকালি করেন—আমরাও তেমনি করিয়া বঙ্গদর্শনকে ভয় করিব, ভক্তি করিব এবং ভালবাসিব।"

এমনকি সরকারী রিপোর্টেও বঙ্গদর্শনের প্রশংসা ছিল। ১৮৮০-৮১ সালের Periodical Literature সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টার ছিল—

> "Amongst the periodicals, Bangadarsan is the most practical, patriotic and humanitarian in spirit—The "Bandhob" which is less practical than Bangadarsan is the most didactic, descriptive and rhetorical, while the Bharati the most unpractical of the three, is at once the most morbidly sentimental and most deeply meta-physical the spirit".

বাহুল্য এই সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র।

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধের' অনেকগুলি প্রবন্ধ, 'কমলাকান্তের' কিছু রচনা, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', তাঁর নিজের রচনা 'মাধবীলতা', 'বৃত্রসংহার' (২য় খণ্ড সমালোচনা), 'বৈজিকতত্ত্ব', 'জাল প্রতাপচাঁদ', এবং 'পালামৌ' প্রভৃতি প্রধান রচনাগুলিও প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কি কি রচনা তাঁর সম্পাদনাকালে প্রকাশিত হয়েছে তার যথাযথ পরিচয় নিচে দেওয়া হল। পৃষ্ঠাচিহ্ন ইত্যাদি মূল বঙ্গদর্শন থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

বঙ্গদর্শন। মাসিক পত্র ওসমালোচনা। ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। বৈশাখ ১২৮৪। ১। বঙ্গদর্শন-১। ২। কৃষ্ণকান্তের উইল—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৩। রাষ্ট্রবিপ্লব-১৩। ৪। জৈনমত সমালোচনা—শ্রীরামদাস সেন-১৯। ৫। বুড়া বয়সের কথা-২৮। ৬। কেন ভালবাসি—শ্রীনঃ-৩৪। ৭। আমাদের গৌরবের দুই সময়-৩৬। ৮। শৈশব সহচরী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-৪৬। ৯। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-৪৮। কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৭৭। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৷০। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র।

আখ্যা পত্র—বঙ্গদর্শন। মাসিক পত্র ও সমালোচনা। ৫ম খণ্ড। ১২৮৪ সাল। কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০।

সূচীপত্র-বিষয়-পৃষ্ঠা—১। আমাদের গৌরবের দুই সময় ৩৬, ৭৫। ২। আমার মালা গাঁথা ১৪১। ৩। আর্যগণের আচার ব্যবহার ৩১৪। ৪। ইউরোপে শাক্যসিংহের পূজা ৪৫৮। ৫। কমলাকান্তের পত্র ৩৫৮, ৫১৮। ৬। কালবৃক্ষ ৫২৬। ৭। কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব ২৯৮, ৩৫৯। ৮। কৃষ্ণকান্তের উইল ৩, ৬৭, ১৩৬, ১৭৫, ২১৫, ২৭৮, ৩২২, ৩৭৫, ৪০১, ৪৬৫। ৯। কেন ভালবাসি ৩৪। ১০। খদ্যোত ৯২। ১১। জটাধারীর রোজনামচা ৪৮১, ৫৩৩। ১২। জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্তের সমালোচনা ২৮৭, ৩৯০। .৩। জৈনমত সমালোচনা ১৯। ১৪। ডাহির সেনাপতি নাটক ৩৩১। ১৫। তর্কতত্ত্ব ৪৬০। ১৬। তর্ক সংগ্রহ ২৭৩, ৩৫৫, ৫৪৯। ১৭। নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ ২৫৮। ১৮। পাঞ্জাব ও শিখ সম্প্রদায় ২৫৫, ৪৯৬। ১৯। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৪৮, ৯৪, ৪৩৬। ২০। বঙ্গদর্শন ১। ২১। বঙ্গে উন্নতি ২২৫। ২২। বঙ্গে ধর্মভাব ১৫৩। ২৩। বাঙ্গালার সাহিত্য ১৯০। ২৪। বাহুবল ও বাক্যবল ৮৬, ২৩৭। ২৫। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ১৪৫। ২৬। বুড়া বয়সের কথা ২৭। ২৭। বৃত্রসংহার ৪৫০, ৫২৯, ৫৪২। ২৮। বেদ ও বেদব্যাখ্যা ৪১২। ২৯। বেদবিভাগ ১০৮। ৩০। বৈজিক তত্ত্ব ৩৩৭, ৪২১, ৩৩৭, ৪২১, ৫৬০। ৩১। বোম্বাই ও বাঙ্গালা ১২৬, ২০৩। ৩২। ভারতে একতা ৪৯। ৩৩। ভুলনা ও কুহুস্বর

আখ্যাপত্র : বঙ্গদর্শন। ষষ্ঠ বৎসর। ১২৮৫ সাল। কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৭৯। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ।।০।

সূচীপত্র বিষয়-পৃষ্ঠা।

আখ্যাপত্র-বঙ্গদর্শন। শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। সপ্তম বর্ষ। ১২৮৭ সাল। কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১৮৮১। মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ।।০। সূচীপত্র—বিষয় পৃষ্ঠা।

আখ্যাপত্র বঙ্গদর্শন। শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। অষ্টমবৎসর। ১২৮৮ সাল। কলিকাতা। জনসন প্রেসে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৮২। মূল্য ডাক মাশুল সমেত। সূচীপত্র—বিষয়—পৃষ্ঠা।

আখ্যাপত্র : বঙ্গদর্শন। মাসিক পত্র ও সমালোচনা। শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। নবম বৎসর। ১২৮৯। Calcutta Printed by Sarachchandra Deva/ At the Vina Press/ 37, Machuabazar Street/ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৮৩।

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালে বঙ্গদর্শনে ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষে সম্পাদক হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্রের নাম থাকতো না, কেবল সঞ্জীব পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর নাম কোষাধ্যক্ষ হিসাবে চিহ্নিত হত। সূচীপত্র থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি অধিকাংশ লেখায় লেখকের কোন নাম থাকত না। বঙ্কিমচন্দ্র, রামদাস সেন, ইত্যাদির নাম ছাপা হত, তাও সব সময় নয়। বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনাগুলি কার লেখা এখন তা নির্দেশ করা কঠিন। তবে পঞ্চম খণ্ড থেকে নবম খণ্ড পর্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক সমালোচনা প্রকাশ হয়েছিল তার একটি তালিকা আমরা নিচে উদ্ধৃত করছি। সবগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা না হলেও অনেকগুলি যে তাঁর লেখা তা আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার অনেকগুলি আমাদের পরিচিত। ১২৮৪ সন থেকে ১২৯৮ সন পর্যন্ত সমালোচিত পুস্তকের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল।

বৈশাখ ১২৮৪। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত গ্রন্থাবলী।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪। মাধবিকা (পত্রিকায় লেখকের নাম নেই)। বাঙ্গালা শিক্ষা—সিদ্ধেশ্বর রায়। সভ্যতার ইতিহাস—শ্রী কৃষ্ণদাস। সুধীরঞ্জন—দ্বারকানাথ অধিকারী।

পৌষ ১২৮৪। চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রকরণ—গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস মালা—শশিচন্দ্র দত্ত। ভারত উদ্ধার অথবা চারি আনা মাত্র—রামদাস শর্মা।

বৈশাখ ১২৮৫। হেলেনা কাব্য—আনন্দচন্দ্র মিত্র। বীনা (মাসিকপত্র)।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫। সুশিক্ষিত চরিত—মধুসূদন সরকার। নলিনী—অধরলাল সেন। টকলি কোলজিকাল চার্ট—হরিশচন্দ্র শর্মা।

আষাঢ় ১২৮৫। নিশীথ চিন্তা—রাজকৃষ্ণ রায়। মানসকুসুম—কেশবচন্দ্র ঘোষ। পরিচারিকা (মাসিক পত্র)। হঠাৎবাবু—লেখকের নাম নেই। প্রাইমারি গ্রামার—মথুরানাথ বর্মা। কবিতা—যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শূরবালা সুরবালা—স্বর্ণলতা। কুসুমকলিকা—প্রসন্নকুমার ঘোষ। কুমারী কার্পেনটারের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ইণ্ডিয়ান পিলগ্রীম—যোগচন্দ্র দত্ত।

শ্রাবণ ১২৮৫। সার সংগ্রহ—আবদুল হামিদ খাঁ। ভগিনী বিলাপ—মহেন্দ্রনাথ দাঁ। তত্ত্বদর্শন—পূর্ণচন্দ্র মিত্র।

অগ্রহায়ণ ১২৮৫। শরীর পালন—যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। জাতীয় উদ্দীপনা—লেখকের নাম নেই। প্রকৃতীতত্ত্ব—শ্রীরাম পালিত। দুঃখিনী—হরিশচন্দ্র সরকার। ভূবণ মোহিণী প্রতিভা—লেখকের নাম নেই। কবিতা নিকর—বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য। কুসুম বিকাশ—লেখকের নাম নেই।

ফাল্গুন ১২৮৫। বাল্য উদারাময়—গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত। মানব সংস্কার—সেখ আবদুল লতিফ।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭। হিন্দী ব্যাকরণ—হৃষীকেশ শাস্ত্রী।

শ্রাবণ ১২৮৭। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব—রজনীকান্ত গুপ্ত। চিকিৎসক—শ্রীশচন্দ্র রায়।

চৈত্র ১২৮৭। শম্ভুবংশ চরিত—বনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী। ভারত মহিলা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কৃষি শিক্ষা—কালীময় ঘটক। কুসুমারিন্দম—ইন্দ্রনারায়ণ পাল। সদানন্দ—লেখকের নাম নেই।

বৈশাখ ১২৮৯। সামুয়েল হানিমানের জীবনী—মহেন্দ্রনাথ রায়। প্রায়শ্চিত্ত—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯। সভার কার্যনির্বাহ বিষয়ক বিধি। বন প্রসূন—মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। দুই শিকারী—লেখকের নাম নেই।

আষাঢ় ১২৮৯। মেঘেতে বিজলী বা হরিশচন্দ্র—রাধানাথ মিত্র। প্রবাহ (মাসিক সন্দর্ভ)। রাজউদাসীন—শাক্য সিংহ ও রামমোহন রায়। যাবনিক পরাক্রম—নীলরতন রায়চৌধুরী।

অগ্রহায়ণ ১২৮৯। ঊষা হরণ বা অপূর্ব মিলন—রাধানাথ মিত্র। মায়াবতী—রাধানাথ মিত্র। সতী বাসনা—ঈশানচন্দ্র সেন। বসন্তোপহার (সংগ্রহ)।

মাঘ ১২৮৯। শরীর রক্ষণ—অন্নদাচরণ খাস্তাগির। কুসুম কানন—অধরলাল সেন। হৃদয় প্রতিধ্বনি—পুলিনবিহারী দত্ত। তৃণপুঞ্জ—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। পদ্য ব্যাকরণ—লেখকের নাম নেই। যাদবনন্দিনী—লেখকের নাম নেই। সুধাধাম বিনাশ—মহিমচন্দ্র গুপ্ত। পদ্য কুসুমাবলী—লেখকের নাম নেই। দুঃখ সঙ্গিনী—লেখকের নাম নেই।

চৈত্র ১২৮৯। রাজস্থান—যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাবলী গদ্য ও পদ্য—রাজকৃষ্ণ রায়।

উপরের যে তালিকা দেওয়া হল তা বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। তা ছাড়া পৃথক প্রবন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ সমালোচনা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে 'বৃত্রসংহার', 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'সর্পবিষ চিকিৎসা', 'নব বার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ', 'ডাহির সেনাপতি নাটক', 'বাঙ্গালাসাহিত্যে লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ', 'ভার্গব বিজয়', 'চিত্তমুকুর' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্গদর্শনের স্থান তার প্রকাশকালের স্থায়িত্ব দিয়ে বোঝা যাবে না। বঙ্গদর্শনের থেকে অন্যান্য অনেক পত্রিকাই অনেক বেশীদিন স্থায়ী হয়েছিল। ১৮১৮ থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা দুশোরও অধিক। তার মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির সহায়ক হযেছিল তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল। নাম, সময় ও সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের সামযিকপত্রের তালিকা অনুসরণ করলে আমরা বুঝতে পারবো।

সমকালীন পত্রিকাগুলির দিকে তাকালে আমবা দেখতে পাব, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের যে অগ্রগতি ঘটেছিল তার প্রধান বাহন ছিল এই সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি, এবংনিঃসন্দেহে বঙ্গদর্শন পত্রিকা সাহিত্যের বাহন হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন নাম দুটি অভিন্ন হলেও সঞ্জীবচন্দ্রের দান বঙ্গদর্শনে কিছুমাত্র স্বল্প ছিল না। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে সঞ্জীব প্রতিভার প্রধান উৎস ছিল বঙ্গদর্শন পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্পাদনা কালেই তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটেছিল, এমনকি বঙ্গদর্শন বন্ধ হবার পর সঞ্জীবচন্দ্র সাহিত্য রচনার জন্যে আর কলম ধরেননি বললেও ভুল হয় না।

বঙ্গদর্শন পত্রিকা সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে কিভাবে লয়প্রাপ্ত হয় তার বিবরণ দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীব জীবনীতে—

"সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।"

আমরা লক্ষ্য করেছি বঙ্গদর্শন অষ্টম বর্ষে (১২৮৮ সন) কলকাতার জনসন প্রেসে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল এবং ৯ম বর্ষে (১২৮৯) কলকাতায় ৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বীণা প্রেসে শরৎচন্দ্র দেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় থেকে অবস্থা কোন দিকে যায় সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

"কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কর্মচারী এমন ছিল যে তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়

যতদিন বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, তিনি উদারতা এবং চক্ষুলজ্জাবশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকাকড়ি 'মুণ্ডুরিবাটা' হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল।"

১৮৭৪ সালেই সঞ্জীবচন্দ্রের ঋণ ছিল ৭০০০ টাকা (জীবনী প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি দ্রষ্টব্য)। এরপর ঋণের বোঝা দিন দিন বেড়েই চলতে থাকে। সঞ্জীবচন্দ্রের নিজস্ব সম্পত্তির সঙ্গে বঙ্গদর্শন প্রেস বাঁধা পড়ে ও পরে ডিক্রি নিলামে বিক্রয় হয়ে যায়। বঙ্গদর্শনে 'মাধবীলতা' প্রকাশকালে তাঁর জীবন ঋণের দায়ে কি দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল তার আলোচনা সঞ্জীব জীবনী প্রসঙ্গে আমরা করেছি। এই অবস্থার মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র যেমন বঙ্গদর্শনের অপমৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর নিজের জীবনও ক্রমক্ষয়িত অপমৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন।

পাদটীকা

১। নারায়ণ—১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা—বৈশাখ, ১৩২২, ৫২৫ পৃষ্ঠা।
২। " " " " "
৩। আমার জীবন—নবীনচন্দ্র গ্রন্থাবলী (১৩৮১)—৪০৯ পৃষ্ঠা।
৪। দ্রষ্টব্য—কেশবচন্দ্র সেনের ১৮৭৪ সালের সুলভ সমাচার।

হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দামোদার মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, তাদের অন্যতম। বঙ্গদর্শন অথবা বঙ্কিমের বান্ধব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত না হয়েও যাঁরা বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের অমোঘ প্রভাবের ফল বহন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী, মীর মোসররফ হোসেন, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। আমরা বর্তমানে বঙ্কিম প্রভাবিত লেখক গোষ্ঠীর কয়েকজনের উপন্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করে তাঁদের মধ্যে সঞ্জীবের স্থান নির্ণয় করবো। এই কয়েকজন কথা সাহিত্যিকের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীব নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ নিম্নের তালিকায় গ্রন্থ প্রকাশের কালের তুলনামূলক আলোচনা করলে আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে, যেহেতু সমকালের সাহিত্য প্রকাশে পারস্পরিক প্রভাব অনস্বীকার্য। সঞ্জীবের প্রকাশ কালের সমসাময়িক পাঁচজন কথা সাহিত্যকে উপন্যাসমূহের প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমিক তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দলবল নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে যখন অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁর উপন্যাসের মৌলিক গতি প্রকৃতি কালগত প্রভাবের ফলশ্রুতি হলেও তার মধ্যে বিশেষ যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা লক্ষ্য করি তা হল, প্রথমত: বিষয় বা ভাব অথবা অসাধারণত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ। দ্বিতীয়তঃ কথা সাহিত্যেব কাঠামো গঠনে সামাজিক ন্যায়নীতির উপর গুরুত্ব দান। (তার জন্যে সচেতন ভাবে মানুষের জৈব প্রেরণাকে কোথাও কোথাও কঠোর ভাবে তা শাসন করলেও গভীর ভাবে মানুষের অন্তর্লোকের প্রবর্তনাকে গোপনে যেন স্বীকার করেছেন)। তৃতীয়তঃ মননশীলতার সমতা রক্ষার প্রচেষ্টা। এই তিন বৈশিষ্ট্যের জন্যে বঙ্কিমের উপন্যাসে গদ্যময়ক বাস্তবতার অভাব ও রোমান্সের অসাধারণত্বের প্রতিষ্ঠা, মানবজীবনের উপর প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাব রচনা, ছোটমানুষের জীবনের নাট্যিকরণের প্রতি অনাগ্রহ আপন গভীর অনুভূতি ও চেতনা উপন্যাসের কাহিনী ভাব ও চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা, সামাজিক ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে প্রধান চরিত্র সমূহের অনুশোচনা ও পাপবোধের চিত্রগঠনই প্রধানত লক্ষ্য করা যায়। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বঙ্কিম উপন্যাসের [illegible] উল্লেখ করে বলেছেন—

[illegible] কল্যাণের সঙ্গে মিলিত করেন নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থার [illegible]।"[৬]

[illegible] 'সীতারাম' পর্যন্ত মোট চৌদ্দখানি উপন্যাসে বঙ্কিমের [illegible] বৈশিষ্ট্য যেমন সাধারণভাবে দেখা যায় তেমনি তাঁর [illegible] এবং শিল্পী মনের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে [illegible] কটি, ডিকেন্সের ইংরেজী নভেল পড়ে বহির্বাঙ্গে অর্থাৎ [illegible] তৎকালীন বাংলা কাহিনী ও সংস্কৃত কথা

কালানুক্রমিক তালিকা :-

খৃষ্টাব্দ	সঞ্জীবচন্দ্র	বঙ্কিমচন্দ্র	পূর্ণচন্দ্র	হরপ্রসাদ	রমেশচন্দ্র	দামোদর
১৮৭৩	রামেশ্বরের অদৃষ্ট, কণ্ঠমালা, দামিনী	ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রজনী	মধুমতী		বঙ্গবিজেতা	মৃন্ময়ী
১৮৭৪		বিষবৃক্ষ				
১৮৭৫						
১৮৭৬		কৃষ্ণকান্তের উইল, রাধারাণী				
১৮৭৭			শৈশব সহচরী		মাধবীকঙ্কন	বিমলা
১৮৭৮	বৃত্রসংহার (সমালোচনা)					
১৮৭৯	বৈজিক তত্ত্ব (প্রবন্ধ)	রাজসিংহ				
১৮৮০					জীবনসন্ধ্যা	
১৮৮১	পালামৌ (ভ্রমণ) সংকার (ইত্যাদি প্রবন্ধ)					মা ও মেয়ে দুইভগিনী
১৮৮২	মাধবীলতা	আনন্দমঠ				
১৮৮৩	জাল প্রতাপচাঁদ	দেবী চৌধুরাণী	—	কাঞ্চনমালা		জয়চাঁদের চিঠি

সাহিত্যের দ্বারা তিনি প্রায় কিছুই প্রভাবিত হন নি। অপরপক্ষে বঙ্কিমের গভীর জীবন চেতনা স্ফুটে নেই, সেক্ষেত্রে বঙ্কিমের শিল্পীমন অনেকবেশী গভীর কাব্যরসিক। (দুই) ঐতিহাসিক রোমান্স ও সামাজিক পারিবারিক উপন্যাস দুই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে রোমান্স রসের অতিলৌকিকতা বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। এর পেছনে যুগ প্রবৃত্তি অধিক কার্যকরী। য়ুরোপীয় চিত্ত মুক্তির সংস্পর্শে এসে নতুন শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ স্বাতন্ত্র্যবোধকে আকাশস্পর্শী করে তুলেছিল অথচ নিজেদের জীবন ছিল, বিবর্ণ ও সংকীর্ণ। তাই তাঁর অন্তরে ইতিহাসের মুখ্য পুরুষ নারীর জীবনের অসাধারণত্ব—বীরত্বে প্রেমে হিংসায় অত্যুজ্জ্বল বর্ণময় পোষাক পরিচ্ছদ অস্ত্রশস্ত্রের বিচিত্র সৌন্দর্যে যার প্রকাশ, তাই বঙ্কিম ও তাঁর অনুবর্তিদের আকৃষ্ট করেছে। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি সম্পর্কে অভিযোগ যে ইতিহাসের সত্যতার অভাব। মিশ্র ঐতিহাসিকতা স্বীকার করে নিয়েও আমরা তাদের মধ্যে ঔপন্যাসিকতার কোন অভাব দেখি না। (তিন) সমাজ সমস্যার নানাদিক নিয়ে সামাজিক পারিবারিক উপন্যাস গঠিত হলেও তা বিতর্কমাত্র এবং প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তা ঘটনাগত চাঞ্চল্য ও বর্ণনার বর্ণালীতে রোমান্সধর্মী হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে এই যুগের কোন উপন্যাসকেই গভীর অর্থে বাস্তব জীবন ধর্মী উপন্যাস বলা চলে না। বাস্তব জীবনের খণ্ড বিচ্ছিন্ন ছবি অনেকের উপন্যাসে রেখায়িত হলেও তা আধুনিক কালের বাস্তব জীবন বোধে উদ্বুদ্ধ নয়। (চার) বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্যের প্রধান বিষয় সুসম কাহিনী নির্মিতি। একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যার কেন্দ্রে কাহিনীর আবর্তনের প্রতিটি ভাগ সুচিহ্নিত। বঙ্কিম-উপন্যাসে ঘটনাবাহুল্যে উপকাহিনী ও নাটকীয়তা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। এই বর্ণাঢ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অলৌকিকতা ও অপূর্ব কবিত্ব। ফলে কাহিনী ও চরিত্রের পরিস্ফুটনে প্রকৃতির ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী ভাবে প্রাধান্যলাভ করেছে। (পাঁচ) বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি আকারে বৃহৎ না হলেও তার মধ্যে মহাকাব্যের বিস্তার ও উদাত্ততা লক্ষণীয়। লেখকের নিজস্ব গভীর জীবনবোধ ও গঠনরীতির বৈশিষ্ট্য একটি ত্রিমাত্রিকতা (Three Dimension) সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর গোষ্ঠীর জীবনবোধের উচ্চ কল্পনা জীবনের খণ্ড বিচ্ছিন্ন দিকগুলিকে মুহূর্তের প্রতীতিতে দেখতে সক্ষম ছিল না, তাই তাঁদের হাতে সার্থক ছোট গল্প সৃষ্টিও সম্ভব হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুখানি সামাজিক পারিবারিক উপন্যাস (বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল) ব্যতীত বাকী বারোখানি উপন্যাসে রেনেশাঁস সুলভ রোমান্টিসিজিম, আশাবাদ ও অতীত বর্তমানের পাশাপাশি অবস্থান, সর্বোপরি মোহিতলাল মজুমদার-এর দৃষ্টিতে বঙ্কিম উপন্যাসের সেক্সপীয়রীয় প্রাকৃতবাদের (Naturalism) সাক্ষাৎ বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবণতা। সে যাই হোক বঙ্কিমের উপন্যাসের রোমান্স ইতিহাস অথবা সমাজ পরিবার, সমস্যা ও তত্ত্ব যা কিছু দেখা দিক না কেন, শেষ পর্যন্ত

তাঁর সহৃদয় প্রতিভা তাকে রস পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেছে। আমরা বঙ্কিমের প্রতিটি উপন্যাস ধরে তার সুদীর্ঘ আলোচনা করবো না, আমাদের উদ্দেশ্যও তা নয়।

উনবিংশ শতকে বঙ্কিমের প্রতিভার বিরাট আলোর নীচে বাকী সব জ্যোতিষ্কেরা ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন। ম্লান হবার কারণ কেবলমাত্র প্রতিভার স্বল্পতা নয়, প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিম কথা সাহিত্যে যে যুগের অর্থাৎ প্রেরণার সৃষ্টি করলেন তাঁর গোষ্ঠীর বাকী সকলেরই সেই পথেই পরিক্রমা। তাঁদের মধ্যে যাদের নিজস্বতা অর্থাৎ প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখা গেল তাঁরাই কেবলমাত্র চিরকালের খাতায় সুচিহ্নিত হয়ে আছেন। বঙ্কিম যুগের অগ্রগামিতার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ বাঙ্গালী যতই আত্মস্থ করেছে, ততই সে ভারতীয় শৌর্যবীর্যের স্বপ্নকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে, এর ফলে বাধা প্রাপ্ত রোমান্টিকতা রোমান্টিসিজিমের ফেনিল ভাবোচ্ছ্বাসে যে সব চরিত্র অঙ্কন করেছে তা স্বল্প ক্ষমতাবানদের হাতে রূপকথার উত্তর পুরুষ হয়ে উনিশ শতকের নবীন যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদকে ভাবাতিশয্যতার অন্ধকারে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সঞ্জীবচন্দ্রের ক্ষমতার খুব অভাব না থাকলেও তাঁর অসতর্কতা ও উৎকেন্দ্রিকতা মাঝে মাঝে তাঁর যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানবাদী মনকে কাহিনী ও চরিত্রগঠনে সম্পূর্ণরূপে কাজে না লাগিয়ে ভাবালুতায় তাদের কিভাবে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে গেছে তা আমরা তাঁর কথা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বিষদভাবে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করব।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্তই এই যুগের ফেনিল ভাবোচ্ছ্বাসের ভাবালুতা থেকে মুক্ত, যদিও তাঁর সামাজিক পারিবারিক উপন্যাসদ্বয় (সমাজ ও সংসার) এই দোষের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পায়নি। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক রোমান্স জাতীয় উপন্যাস রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালেন। ঐতিহাসিক তথ্য সর্বস্বতাই যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় তার প্রমাণ প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (প্রথম খণ্ড ১৮৬৯ ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪) নামে বৃহৎ আকারের গ্রন্থদ্বয়, বিনোদ বিহারী গোস্বামীর 'পূর্ণশশী', হারানচন্দ্র রাহার 'রণচণ্ডী', কেদারনাথ চক্রবর্তীর 'চন্দ্রকেতু' ইত্যাদি উপন্যাস। ঐতিহাসিক কালের বাস্তব সত্য অপেক্ষা যা ঘটেছিল এবং যা ঘটা উচিত ছিল তারই সার্থক মিলন ঘটিয়ে দেওয়াই ঐতিহাসিক রোমান্স রচয়িতার কাজ। রমেশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪) এবং মাধবী কঙ্কনে (১৮৭৭) তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে না পারলেও, 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যায়' (১৮৮০) ইতিহাসের বাস্তবের সঙ্গে তাঁর কালের মানুষের জীবন সত্য বোধের ধ্যান ধারণা আবেগ অনুভূতির আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের শিল্পীমনে রোমান্সের যে সহজ সম্পর্ক ছিল তাতে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে কষ্ট কল্পনা ও কৃত্রিমতার আভাস খুব কম। যুগের ভাবাদর্শকে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে তিনি সংযত

অথচ সহজ আবেগে দেশপ্রেম ও নরনারীর প্রেমকে রোমান্সের মধ্যে স্থাপন করলেও তার মধ্যে কোথাও বিরোধ দেখা দেয়নি। শিবাজী ও প্রতাপের কর্মাদর্শের মধ্যে তিনি আধুনিক যুগের দেশপ্রেমের আদর্শকে পাঠকের বোধের নিকটতম করে তুলেছেন। প্রেমের চিত্রে নারী চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক আবরণেও সর্বকালের বাঙ্গালী বধূ ও প্রেয়সী। ঐতিহাসিক চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা যেখানে বিচারকের তিনি যেখানে তাঁর সুগভীর জীবনদৃষ্টি নিয়ে চরিত্রের প্রতিটি কোণকে আলোকিত করেছেন, সে ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের সৃষ্টি কোন বিচার বীক্ষনের গভীরে প্রবেশ না করে কিছুটা যেন ভক্তির ভাবে বিগলিত—অন্তত শেষ দুখানি উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

সামাজিক পারিবারিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের কৃতিত্ব খুব বেশী না হলেও সমাজ (১৮৮৬) সংসারে (১৮৯৩) নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবনের খুঁটি নাটি চিত্র শিল্প-সম্মত উপায়ে অঙ্কন করেছেন। সেখানেও রোমান্স সুলভ নাটকীয়তার অভাব নেই। এই সব উপন্যাসে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রবণতা যে কখনো অসঙ্গত হয়নি এমন কথা বলা যায় না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৭৩-৭৪ (১২৮০) সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সালে সঞ্জীবের তিনখানি উপন্যাস—রামেশ্বরের অদৃষ্ট, 'কণ্ঠমালা', ও 'দামিনী', বঙ্কিমচন্দ্রের পাঁচ খানি উপন্যাস—ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়; চন্দ্রশেখর, 'রজনী', 'বিষবৃক্ষ', পূর্ণচন্দ্রের 'মধুমতী', রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা'; তারকনাথের 'স্বর্ণলতা', ও দামোদরের 'মৃন্ময়ী' এই বারখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। লক্ষণীয় সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস ও রোমান্স উভয় প্রকার রচনাই লেখক ও পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল। আরও লক্ষ্য করার বিষয় সামাজিক উপন্যাস রচনার প্রবণতাই প্রবল। যদিও লেখকদের মানসিকতায় রোমান্স রসিকতার অভাব নেই। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' বিশুদ্ধ সামাজিক পারিবারিক উপন্যাস। বঙ্কিমের ইন্দিরা ও রজনী এবং সঞ্জীবের দামিনী, রামেশ্বরের অদৃষ্ট এবং কণ্ঠমালা কোন ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত না হলেও গ্রন্থগুলির সামাজিক পারিবারিক আবহ মণ্ডলে ঐতিহাসিক রোমান্স রসের অবতরণ ঘটেছে।

বঙ্কিম যুগে সামাজিক উপন্যাস রচনায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর স্বর্ণলতার নাম সর্বাগ্রগণ্য। ইংরেজী ম্যানার্সমূলক চরিত্র সৃষ্টিতে তারকনাথের দক্ষতার পরিচয় আছে। বঙ্কিমের বিষবৃক্ষের জন্যে যেখানে পরিশীলিত পাঠকের প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে তারকনাথের স্বর্ণলতার Real Ordinary Life এর ছবি বুঝবার জন্যে পাঠকের বৈদগ্ধের প্রয়োজন ছিল না—রচনার সহজ আবেদনটি সমকালে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ধন্য হয়েছিল। "গদাধর চন্দ্রের" "ভুড়ও খাব টামাকও খাব" এবং "নীল কমলের" রঙ্গরস সে কালের বাঙ্গালী পাঠককে সহজ হাস্যরসের আনন্দে মাতিয়ে তুলেছিল। তবে অগভীর পারিবারিক জীবনের চিত্র হিসাবে এর মূল্য চিরন্তনতায় উত্তীর্ণ হয় না। এই উপন্যাসটির পরিচয় প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

"উনবিংশশতকের শেষ পাদের বাঙ্গালী মানসিকতায় যে বাস্তব দুঃখ ও দৈব নির্ভরতার বিপরীত জাতীয় উপাদান মিশ্রিত ছিল, উপন্যাসে তাহারই সার্থক প্রতিফলন হইয়াছে।······বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য অনেকটা রোমান্সের স্তর ভেদ ও রোমান্সে বাস্তবের সংমিশ্রণে কলাবাদের আপেক্ষিক অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[৪]

মাঝে মাঝে চিন্তাশীলতা ও ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের ভঙ্গীর সঙ্গে সঞ্জীবের উপন্যাসিক চরিত্রের আপাত মিল দেখতে পাওয়া গেলেও সঞ্জীবের গভীর রস বোধ ও দার্শনিকতার সামান্য পরিচয়ও তারকনাথের মধ্যে দেখা যায় না। তবে ব্যবহারিক বাস্তব চরিত্র সমস্যাকে অগভীর ভাবে অঙ্কন করার স্বল্প ক্ষমতাসৃষ্ট কথা-সাহিত্যের নতুন ধারা প্রবর্তনে তারকনাথের দান স্বীকার করতে বাধা নেই।

বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধুমতী (১৮৭৩) উপন্যাস নামে প্রকাশিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আধুনিক ছোটগল্পের কোরক রূপে অভিহিত হতে পারে। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলার প্রভাব থাকলেও ডঃ শিশির কুমার দাসের মতে,

"পরবর্তীকালে স্মৃতি বিভ্রম নিয়ে বহু গল্প রচিত হয়েছে। পূর্ণচন্দ্র এ বিষয়ে অগ্রণী।"[৫]

যুগের প্রভাবে কিভাবে পূর্ণচন্দ্রের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে তাঁকে এই ছোট কাহিনী রচনা করতে প্রবৃত্ত করেছিল তা বুঝতে পারলে সঞ্জীবের দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট রচনায় যুগ প্রভাবের অনুধাবন করতে পারবো। উনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছে তাতে মানবচেতনা প্রকৃত পক্ষে মানুষের শক্তি ধর্ম তথা সমগ্র মানবিকতাই জাগিয়ে চলেছে। তার বহু বিচিত্র রূপের মধ্যে রয়েছে এক অখণ্ড অবিচ্ছেদ্যতা। নৈরাশ্য অথবা নৈরাশ্যভেদী কোন ভরসা যেকোন পরস্পর বিরোধী শক্তি সব কিছু মিলে জীবনের অনুভব যা মানবমনে অতল অনপনেয় রহস্য, তাকে খুঁজে পাওয়ার যে প্রয়াস তাই এই যুগের কথা সাহিত্য রচনার মূল প্রেরণা। এ যুগের সঞ্জীব বঙ্কিম ও পূর্ণচন্দ্রের ছোট কাহিনীগুলিতে আমরা জীবন সম্পর্কে সেই গভীর রহস্য বোধের প্রকাশ বারবার লক্ষ্য করেছি। জীবনের দুরপনেয় জটিলতার প্রতি তিন জনেরই লক্ষ্য, তবে তার স্বরূপ উদঘাটনে রচনাভঙ্গী ও দৃষ্টি ভঙ্গীর পার্থক্য অবশ্যই আছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিপুল পাণ্ডিত্য তাঁকে মূলত প্রাবন্ধিকরূপে চিহ্নিত করলেও বঙ্গদর্শনে তাঁর কাঞ্চনমালা (১৮৮২) এবং আরও পরে "বেনের মেয়ে" নামে যে উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয় তাতে তিনি বঙ্কিমের আদর্শ অনুকরণে বাংলার ইতিহাসের ভিত্তি.ত কাহিনী রচনা করেন। তাঁর ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের জ্ঞান ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচনা করলেও তাঁর সাহিত্যে রুচি জ্ঞানের বিতর্ককে জীবনের উপর স্থান দেয়নি। বঙ্কিম যুগের ধারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে হরপ্রসাদ বহন করেছিলেন।

মৌলিক সৃষ্টি ক্ষমতার, অধিকারী না হওয়া সত্বেও যুগচেতনা সম্বন্ধে হরপ্রসাদ ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন।

অক্লান্ত আখ্যান লেখক দামোদর মুখোপাধ্যায় বহু উপন্যাস রচনা করলেও তিনি বঙ্কিমের কাহিনী গঠনের দ্বারাই মূলত প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই গল্পখোর পাঠকের কাছে তিনি স্বভাবতই ছিলেন আদরণীয়—কিন্তু গভীর জীবন দৃষ্টির ও সমাজবোধের একান্ত অভাব এবং বঙ্কিমের স্থূল অনুকরণ তাঁকে সার্থক সৃষ্টির রাজপথে কোন দিনই পরিক্রমা করতে সম্ভব করে নি। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার উপসংহার 'মৃন্ময়ী' (১৮৭৪) রচনা করে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। আমরা সঞ্জীবের রামেশ্বরের অদৃষ্ট আলোচনা প্রসঙ্গে দেখব তিনি সম্ভবত কপালকুণ্ডলাকে বাঁচাবার প্রেরণা রামেশ্বরের অদৃষ্ট থেকেই পেয়ে ছিলেন। সে যুগে বঙ্কিমের অক্ষম অনুকরণ করেছিলেন আরও স্বল্প খ্যাত ও অখ্যাত লেখকের দল, এখানে তাদের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক।

বঙ্কিম যুগের উপন্যাস ও রোমান্সের মধ্যে আধুনিক পাঠকের কাছে রমেশচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের আসন অনেক বেশী আদরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। রমেশচন্দ্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কতখানি তা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের উপর প্রভাব কতখানি তাই আলোচ্য। সন্দেহ নেই সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে 'বেঙ্গল রাইয়ত' রচনা করেন। যদিও রচনাটি ইংরেজী তবু তার মধ্যে তাঁর গবেষক সুলভ তথ্যানুসন্ধিৎসা এবং বাংলার কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক নামে প্রবন্ধ রচনার উৎস ছিল ঐ প্রবন্ধটি। বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন,—

> "কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিত হইযাছিল। তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড সম্বন্ধ রাখেন নাই।"[৬]

সঞ্জীবের সাহিত্য সাধনার প্রবৃত্তি বঙ্কিমের মন্তব্যে সুস্পষ্ট। সাহিত্য ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমানে থাকলেও নিজস্ব অন্তপ্রেরণায় সাহিত্য রচনার কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলা সঞ্জীবের মধ্যে ছিল না। বঙ্কিমের সঞ্জীব পরিচয়ে জানতে পারলাম ১২৭৯ সালে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হবার পরই সঞ্জীব কিছুদিনের জন্যে উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন। প্রত্যক্ষত বঙ্কিমের প্রেরণায় ও বঙ্কিমের প্রভাবে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেও সাহিত্যের অন্তর্লোকে সঞ্জীব একক ও অদ্বিতীয়। বহিরঙ্গে সঞ্জীব-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব খুব স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হলেও সাহিত্য প্রবৃত্তিতে ও ব্যক্তিত্বে তিনি বঙ্কিম হতে এতই স্বতন্ত্র ছিলেন যে তাঁর রচনা শতাব্দীর অন্তেও স্বাতন্ত্র্যে আমাদের আকৃষ্ট করেছে।

সঞ্জীব মোটেই অক্লান্ত লেখক ছিলেন না। বরং তাঁর জীবনের সব কাজের খেয়ালীপনা ও উৎকেন্দ্রিকতার মতই সাহিত্য সাধনা ছিল তাঁর ক্ষণিক বিলাস।

ফলে পাঠকের জন্যে যে সাহিত্য রচিত হয়, সমাজের জন্যে সাহিত্যিকের সুমহান দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে, সঞ্জীব তা সম্পূর্ণত ভুলে গিয়েছিলেন। বঙ্কিম যেখানে পদে পদে পাঠককে সম্বোধন করেছেন সঞ্জীব সেক্ষেত্রে ভুলেও পাঠকের নামোল্লখ মাত্রও করেন নি। তিনি আপন মনে গান গেয়েছেন। যার খুশি হয়েছে সে শুনেছে, যদিও সে গান অলকার অলীক বৈভবে পরিপূর্ণ।

কথা-সাহিত্যে সঞ্জীবের উপর বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর পাঁচখানি গ্রন্থের (রামেশ্বরের অদৃষ্ট, দামিনী, কণ্ঠমালা, মাধবীলতা ও জাল প্রতাপচাঁদ) আলোচনায় বিস্তৃতভাবে দেখান হবে। এখানে সাধারণ ভাবে বঙ্কিমের যে প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে যুগ প্রবর্তনার কথা ভুলে গেলে চলবে'না।

এক।—পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি রোমান্স প্রবণতা এই যুগের বিশিষ্ট আত্মমুক্তির পথ ছিল। বঙ্কিম সেই রোমান্সের জগতে ইতিহাসের পথ ধরে প্রবেশ করলেন। সঞ্জীব রোমান্স রচনা করলেন বটে বঙ্কিমী ভঙ্গীতে, কিন্তু ইতিহাসের সত্যকে কল্পনার রঙে রাঙ্গিয়ে নিলেন না। 'জাল প্রতাপচাঁদ'-এ ইতিহাস আছে, কিন্তু সঞ্জীব তাঁর কঠোর গবেষণায় তার মধ্যে কল্পনার খাদ মেশালেন না। অথচ রাজা ইন্দ্রভূপ (মাধবীলতা) অথবা রাজা মহেশচন্দ্র (কণ্ঠমালা) কোন বিশেষ স্থান কালের সত্য রাজা না হয়েও ঐতিহাসিক রোমান্সের রাজা হয়েই দেখা দিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন লেখক হওয়া সত্ত্বেও নারীর কল্প সৌন্দর্যলোক গঠনে প্রকৃতির বিচিত্র রূপলীলা বর্ণনায়, ভয়াল রহস্যময় আবহ মণ্ডল রচনায়, আকস্মিক অভূতপূর্ব যোগাযোগ সৃষ্টিতে, পুরুষ চরিত্রের অলৌকিক কার্যকলাপে, নারীর পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণে, আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনে চরিত্রের রহস্যময় বিষাদ বৈরাগ্যে অন্তর্লোকের চিত্র অঙ্কনে এবং সর্বোপরি কাব্যময় ভাষা নির্মাণে তিনি প্রত্যক্ষত বঙ্কিমের প্রভাবে প্রভাবিত বলে মনে হয়। কিন্তু অভিনিবেশসহ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিনি বঙ্কিমের এই সব প্রভাব স্বীকার করেও আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

দুই।—বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রায়ই তাঁর সমস্যামূলক কাহিনীর অন্তে একটি কাব্যিক ন্যায় বিচার (Poetic Justice) করবার চেষ্টা করেছেন সঞ্জীবও তেমনি কাহিনীর শেষে একটি কাব্যিক বা সামাজিক ন্যায় বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। বিয়োগান্ত কাহিনীতে তিনি যেখানে শিল্প সৌন্দর্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন, সেক্ষেত্রে মিলনাত্মক আখ্যানে তা বালক ভুলান রূপকথায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমের যে সুগভীর সমাজদৃষ্টি ছিল সঞ্জীবের মধ্যে তার বিদ্যুতি আভাষ দেখা গেলেও তার দৃঢ় মূলের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় না। ফলে সামাজিক সমস্যার অপ্রতুলতা সঞ্জীবের আখ্যান সমূহে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক পারিবারিক সমস্যাগুলি যেমন গভীর তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন সঞ্জীবের সেই সমাজ দৃষ্টির অভাব তাঁর আখ্যানগুলিকে যে সমাধানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে তাতে সামাজিক ন্যায় বিচার হয়েছে খুবই আপাত ও তরল।

তিন।—বঙ্কিমের উপন্যাস সমূহ আকারে খুব বড় না হলেও ঘটনার জটিলতা ও আকস্মিকতা খুব বেশী দেখা যায়। সঞ্জীবের ছোট বড় সব উপন্যাসেই ঘটনার জটিলতা মূল কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে প্রায় অস্পষ্ট ও শিথিলবদ্ধ করে ফেলেছে। জীবনের অসাধারণ রহস্যময়তার প্রতি সঞ্জীব ও বঙ্কিমের উভয়ের দৃষ্টি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই রহস্যময়তা গঠন করেছেন নিয়তির অমোঘ নির্দেশের মধ্যে প্রবেশ করে; ফলে অলৌকিকতা অবশ্যম্ভাবীভাবে বঙ্কিমের উপন্যাসের নিয়ন্ত্রনী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈবশক্তি জ্যোতিষগননা, সাধুসন্তের সমাগমে, দেবদেবীর মূর্তির উপস্থিতিতে, নিয়তির প্রতি অচঞ্চল বিশ্বাসে এবং ভবিষ্যৎ স্বপ্নে বঙ্কিমের উপন্যাসে রোমান্সের আবহমণ্ডল রচিত হয়েছে। সঞ্জীব দৈবশক্তির যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে স্বপ্ন থাকলেও তা মূলত মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যানের সমতুল্য ভাবে নিয়তির অমোঘ নির্দেশ বলে মেনে নেওয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র ইঙ্গিত নয় ভবিষ্যদ্বাণী নিয়তির নির্দেশ বলে মেনে নেওয়া চলে। যেমন পিতম পাগল (মাধবীলতা) প্রলাপোক্তিতে বলেছিল 'চুডাধন রাজা হবে'। শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। দামিনী গল্পেও এই ধরণের ইঙ্গিত আছে—'দামিনীর দীপ ভাসিয়া গেল' প্রকৃত পক্ষে জীবন দীপ শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে হারিয়ে যাবার নির্দেশ করে। এই ধরণের ইঙ্গিতময় আকস্মিকতা সৃষ্টি করার রীতি বঙ্কিমের মধ্যেও দেখা যায়। এ ব্যাপার সঞ্জীব বঙ্কিমের কাছে ঋণী।

চার।— ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত বঙ্কিমী রীতির প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর সীতারাম দুর্গেশ-নন্দিনী ইত্যাদি গ্রন্থের দৈবলীলার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,—

"এই সব ক্ষেত্রে জ্যোতিষ গণনার যে অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা উপন্যাস বা রোমান্সে অচল, এই জাতীয় জ্যোতিষ রূপকথায় মানানসই হইত।"[৭]

সঞ্জীব জ্যোতিষ রূপকথা রচনা করেন নি বটে, তবে পরিবেশ রচনায়, অসঙ্গতি পূর্ণ কাহিনী গঠনে ভাষার কল্পলোকের মায়া সৃষ্টিতে তিনি প্রায়ই আমাদের রূপকথার কল্পনার রাজ্যে নিয়ে গেছেন। আসল কথা বঙ্কিম সঞ্জীব উভয়েই কল্পনার অবাধ মুক্তির জন্যে যে বিরাট আকাশে ডানা মেলেছেন তা অনেক সময়ই বাস্তবতার বাস্তবাস্তবের সীমারেখাহীন রূপকথার দেশ হয়ে উঠেছে। 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রভাব সবচেয়ে বেশী অনুভূত হয়। মাটির নিচে যে অদ্ভুত কলাকৌশলপূর্ণ ঘরের বর্ণনা আছে তার সঙ্গে বঙ্কিমের আনন্দমঠের মাটির তলায় সন্তান সম্প্রদায়ের দেব মন্দিরের বর্ণনা তুলনীয়। কোন সমস্যা সমাধানে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত রীতি ব্যবহার করেছেন তাও অনেক সময় আমাদের বিশ্বাসের উপর আঘাত হানে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতটি স্মর্তব্য—

"বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চাঙ্গের রোমান্স সামাজিক উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনা করলেও কখনও কখনও তিনি সম্ভব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া রূপ কথার রাজ্যে উপনীত হইয়াছেন। শৈবলিনী যে ভাবে প্রতাপকে উদ্ধার করিয়া গঙ্গাবক্ষে

তাহাদের জীবনের মৌলিক সমস্যার আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছে তাহা আমাদের মনের উদ্যত অবিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিতে পারে না।”[৮]

সঞ্জীবচন্দ্রও তাঁর জাল প্রতাপচাঁদ ব্যতীত অন্য সব উপন্যাস বা আখ্যানে বারবার সম্ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন। পরবর্তী অংশে আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব।

পাঁচ।—বঙ্কিম তাঁর পাত্র পাত্রীগুলিতে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ঔজ্জ্বল্য দান করেছেন। এই সব চরিত্র কাহিনীর উপযোগীও বটে। কিন্তু সঞ্জীবের প্রবণতা বঙ্কিম অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই কাহিনী ও চরিত্রের সমতা বজায় রেখে চলেনি। এই মন্তব্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ কণ্ঠমালার মহারাজ মহেশচন্দ্র ও মাতঙ্গিনী এবং মাধবীলতার পিতম ও ব্রহ্মচারী, দামিনীর রমেশ প্রভৃতি চরিত্র। ঐ সব চরিত্রগুলির ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টির প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ সব চরিত্র লেখকের বর্ণনায় বা উপস্থাপনায় আবদ্ধ থেকেছে, কার্যকারিতায় জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। সে ক্ষেত্রে বঙ্কিমের সাফল্য অসাধারণ। শুধু তাই নয় অসৎ চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমের কয়েকটি চরিত্রের সমতুল করে সঞ্জীব কয়েকটি চরিত্র এঁকেছেন। যেমন বঙ্কিমের শৈবলিনী ও রোহিনীর চরিত্রের স্খলনের আপাত রূপটি শৈল (কণ্ঠমালা) চরিত্রের মাধ্যমে ফোটাবার চেষ্টা আছে। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমের উদার শিল্প দৃষ্টি তাদের জন্যে পাঠকের সহানুভূতি যথেষ্ট পরিমানে দাবী করলেও সঞ্জীবচন্দ্রের শৈলের ভ্রষ্টাচার ও নিষ্ঠুরতা আমাদের কোন সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে না। তবে বিষাদ করুণ চরিত্রগুলি বঙ্কিমের ঐ ধরণের চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমের চরিত্রগুলি অপেক্ষা সঞ্জীবের চরিত্র রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টির সমগোত্রীয়। অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়শই তাঁর সব উপন্যাসে এক বা একাধিক মহাপুরুষ চরিত্র অঙ্কন করেছেন, একমাত্র মহারাজ মহেশচন্দ্রের (কণ্ঠমালা) মধ্যে ঐ ধরণের কিছু বঙ্কিমী প্রভাব থাকলেও তা বঙ্কিমের মহাপুরুষ চরিত্রের তাত্ত্বিক সার্থকতায় পৌঁছয় নি। তবে ছোট মানুষের চরিত্র সৃষ্টিতে সঞ্জীবচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের মতই বিপুল সার্থকতার দাবি রাখেন। এই ধরণের চরিত্র সৃষ্টিতে সঞ্জীবের বাস্তব দৃষ্টি ও হৃদয়ের সহানুভূতি বঙ্কিম অপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল। গ্রাম্য সাধারণ মানুষের চরিত্রাঙ্কনে তিনি শরৎচন্দ্রের সার্থক পূর্বসূরী। দামিনী ও মাধবীলতায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্তমান।

ছয়।—দেশপ্রেম, তত্ত্বপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় এবং নীতি প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে সঙ্গত ভাবে স্থির বিশ্বাসে ও অদম্য সাহসে পরিচালিত করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের সেই প্রবণতাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন। দেশপ্রেম, তত্ত্ব ও নীতি বঙ্কিমী রীতিতে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর আখ্যান সমূহে আনয়ন করেছেন, যেমন ‘আনন্দমঠের’ সন্তান সম্প্রদায়ের অনুকরণে কণ্ঠমালার মহাকুলীন সম্প্রদায় গঠন, যার কোন বাস্তব ও তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই, ফলে তা কোন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় হয়ে না উঠে কেবল সুভাষিতাবলীর অন্তর্গত হয়ে রয়েছে।

সাত।—উপন্যাসের গঠনগত কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ শিল্প সচেতন শিল্পী। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন যে দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতারাম পর্যন্ত প্রতিটি গ্রন্থেই বঙ্কিমচন্দ্র যে কথামুখ ব্যবহার করেছেন তার প্রতিটি ক্ষেত্রে শিল্পগত কারণ বর্তমান। তিনি কোন উপন্যাসে পাশ্চাত্য রোমান্স-এর ভঙ্গীতে কাহিনীর মধ্যভূমি হতে কথামুখ শুরু করেছেন আবার কোথাও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের 'আসীৎ শূদ্রকো নাম রাজা' রীতিতে লিখেছেন, "হরিদ্রা গ্রামে এক ঘর বড় জমিদার ছিলেন। জমিদারের নাম কৃষ্ণকান্ত রায়।" সঞ্জীবও অনুরূপ ভাবে কোথাও কাহিনীর মধ্যভূমি হতে কথামুখ শুরু করেছেন আবার কথনও বা "একদা সিংহশত গ্রামে একজন ধনবান রাজা বাস করিতেন।" কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মত তাঁর উপন্যাসগুলিকে খণ্ডে বিভক্ত না করে পরিচ্ছেদ পরম্পরায় শুরু হতে শেষ পর্যন্ত ভাগ করে গিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বগ্রন্থের পরিচ্ছেদের নামকরণ অথবা ইঙ্গিতবাহী উদ্ধৃতি ব্যবহার না করলেও খণ্ড বিভক্তির মধ্যে কাহিনীর উত্থান-পতন অত্যন্ত শিল্প সম্মতভাবে বহমান। এ ব্যাপারে সঞ্জীবের অসতর্কতা ও উদাসীনতা তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। উপসংহারে বঙ্কিমের যে পূর্ণতা দেখি সঞ্জীবের ক্ষেত্রে সেই পূর্ণতার অভাব এবং উৎসাহের ভাটা লক্ষণীয়।

আট।—ভাষা নির্মাণে সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর সকলের ভাষাই বঙ্কিমী ভাষারীতির অনুসারী। তবে এই ভাষারীতির যে পার্থক্য সহজে একজন হতে অপরজনকে পৃথক করে প্রকৃত পক্ষে তা ব্যক্তিত্বের পার্থক্য। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বঙ্কিমের ব্যক্তিত্ব ও ভাষার সম্পর্কে নির্দেশ করতে সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন—

> "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা মূলত Extrovert, বহির্মুখী। তাঁর ভাষা পেশীবহুল উপন্যাসগুলির প্যাটার্ন নাটক ও এপিক মিলিয়ে গঠিত। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মূলত Introvert, অন্তর্মুখী। তাঁর ভাষার প্রধান লক্ষণ নমণীয়তা।"[৯]

ডঃ সুকুমার সেন সঞ্জীবের ভাষারীতি প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন এই প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়—

> "বাঙ্গালা গদ্য রীতিতে ইতি রবীন্দ্রনাথের এক অগ্রদূত বলিয়া ইহার দাবি থাকিবে।"[১০]

উপরোক্ত দুই মন্তব্য হতে আমরা সহজেই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি রবীন্দ্রনাথের এক অগ্রদূত সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা বঙ্কিমের তুলনায় অন্তর্মুখী এবং ভাষা রীতিও নমনীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত তৎসম শব্দবহুল ভাষার অলঙ্কারময়তা ও সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহারের মাধ্যমে এক ধরণের ছন্দময়তা সৃষ্টির প্রয়াস সঞ্জীবের রচনার মধ্যে খুবই লক্ষ্য করা যায়। তবে তরল কৌতুক মিশ্রিত রঙ্গাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক লঘু চপল অন্তরঙ্গ ভাষা ব্যবহারে সঞ্জীব ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁর কবিত্ব আমাদের বঙ্কিম অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির কথাই বেশী করে মনে করিয়ে

দেয়। মাঝে মাঝে অমিল গদ্যরীতির ব্যবহার আধুনিক গদ্যকবিতায় পূর্বসূরী ভাষা বলে মনে হলেও বঙ্কিম স্বয়ং ঐ রীতির প্রবর্তক। মাঝে মাঝে রূপ বর্ণনায় সঞ্জীব কী বিপুল পরিমানে বঙ্কিমের কাছে ঋণী তার প্রমাণ আমরা "মাধবীলতায়" পিতম পাগলের প্রকৃতির ছিন্নমস্তা রূপ দর্শনে এবং বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরের (তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদে) প্রকৃতির ভয়ঙ্করী রূপ বর্ণনায় পেয়েছি। বিশেষ করে বৃত্রসংহারের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা যখন বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, তাঁর সঙ্গে সঞ্জীবের বৃত্রসংহারের দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনাকে ভাষাগত ভাবে পৃথক করার ক্ষমতা আমাদের প্রায় থাকতো না, যদি না কবি নবীনচন্দ্র সেন তার আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে নির্দেশ করে যেতেন। উপন্যাসের ভাষার ক্রিয়া পদের সাধুচলিত ভাষার মিশ্রণ জাত দোষ সম্পর্কে বঙ্কিম অথবা সঞ্জীব কেউই সচেতন ছিলেন না অথবা সচেতন থাকার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ভাষা নির্মাণ ও কথন রীতিতে বঙ্কিমের সঙ্গে সঞ্জীবের সর্বপ্রধান পার্থক্যটি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা সহজেই সঞ্জীবের প্রতিভার আমূল গতি প্রকৃতি বুঝতে পারবো। রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবের সাহিত্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাষারীতির পরিচায়কও বটে—

> "সঞ্জীবচন্দ্রের লেখাগুলি কথা কাহার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত, ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া,—এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।"[১১]

লোকপ্রিয় সঞ্জীব মানুষটি ছিলেন যেমন ঢিলে ঢালা প্রকৃতির মজলিসী মেজাজের তেমনি তাঁর মাইফেলী ঢং লেখার মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। সে যুগের বিখ্যাত ধরণী কথক (যার পরিচয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন, যিনি প্রায়ই চট্টোপাধ্যায় বাড়ীতে সঞ্জীব বঙ্কিমের উপস্থিতিতে কথকতা করতেন) যেমন প্রাচীন কাহিনীকে নাটকীয় বর্ণনার গুণে শ্রোতাদের মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করাতেন, তেমনি সঞ্জীব সহজ বিবরণের মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতিকে অত্যন্ত আন্তরিক ভঙ্গীতে পাঠকের একান্ত আপন করেছেন।

এই আলোচনায় দেখলাম বঙ্কিম-সহোদর সঞ্জীব সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্কিম প্রভাবিত হয়েও তাঁর আপন ব্যক্তিত্বে ও বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। কিন্তু এই যুগে যেখানে বঙ্কিম তাঁর প্রতিভার সহস্র সূর্যের কিরণ বর্ষণ করেছেন সেইযুগে শুধু বঙ্কিম কেন অনেকের তুলনায় সঞ্জীব অতি অল্প পরিমান লিখে শতবর্ষের অন্তে চিরন্তনত্বের আসনটি দাবি করেছেন কোন গুণে? এই প্রসঙ্গে প্রথমে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের মতামত গ্রহণ করবো। প্রথমেই বঙ্কিমের মন্তব্যটি গ্রহণ করা যাক—

> "তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) যে এ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত

হয়েন নাই, তাহা যিনি তাঁহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্বক পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। কালে সে আপনটি প্রাপ্ত হইবেন।"[১২]

স্বভাবেতই সহোদর ভ্রাতার সাহিত্যের গুন কীর্তন সম্বন্ধে বঙ্কিমের সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু ক্রান্তদর্শী ঋষির দৃষ্টি যে সত্য ছিল তা আজ আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। তবে বঙ্কিম সঞ্জীবের সাহিত্য বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। সঞ্জীবের রচনা সম্পর্কে প্রথমে আমাদের সচেতন করেছিলেন বঙ্কিম সুহৃদ চন্দ্রনাথ বসু, যদিও রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের অনেক মতই 'সঞ্জীবচন্দ্র' প্রবন্ধে খণ্ডন করেছেন। চন্দ্রনাথ বসু তাঁর পালামৌ, দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট সমালোচনায় বলেছেন—

"সচরাচর লোকে যাহা দেখে না, সঞ্জীব তাহাই দেখিতেন এবং সেই রূপেই দেখিতে ভালবাসিতেন, এবং সেইরূপ দেখিবার শক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন সঞ্জীবের সাহিত্যে শিশুর যে সব অমর চিত্র রয়েছে তারা নতুন বলে আমাদের এত আকৃষ্ট করে না, বরং তা পুরাতন ও চিরন্তন বলেই আকৃষ্ট করে—

"সামান্য শিশুর এই শিশুত্বটুকু তাহার উদ্দেশ্য বোধহীন অনুকরণ বৃত্তির এই ক্ষুদ্র উদাহরণটুকুর উপর সঞ্জীবের যে একটি সকৌতুক স্নেহহাস্য নিপাতিত রহিয়াছে সেইটি পাঠকের নিকট রমণীয়····· সঞ্জীবের রচিত চিত্রটি আমাদের সম্মুখে খাড়া হইবামাত্র সেই সকল অপরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং তৎসহকারে শিশুদেব প্রতি আমাদের স্নেহরাশি ঘনীভূত হইয়া আনন্দরসে পরিণত হইল।"[১৩]

তবে সঞ্জীবের ভাষা সম্পর্কে চন্দ্রনাথের মন্তব্য,

"তাঁহার ভাষা বালকের কথার ন্যায় সহজ সরল মিষ্ট কারুকার্যহীন।" কিন্তু চন্দ্রনাথ ঐ সমালোচনায় সঞ্জীবের সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে বলেছেন,

"সৌন্দর্যতত্ত্ব খুব একটা বড কথা ··তিনি তাঁহার সৌন্দর্যতত্ত্ব কেমন সরল ভাষায় সরলভাবে বুঝাইয়াছেন।··· · সৌন্দর্যতত্ত্বের ইহা অতি উচ্চ কথা।"

বলা বাহুল্য সঞ্জীবের এই রকম কোন উদ্দেশ্য তাঁর কোন কথা-সাহিত্যেই প্রকাশ পায়নি। বস্তুত বঙ্কিম যুগে সঞ্জীব শিল্পের আনন্দেই শিল্প রচনা করেছেন, বঙ্কিমের মত কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর সাহিত্যেব সীমা ও স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি অনবদ্য,—

"অন্য সৌন্দর্য্য রাজ্যে সঞ্জীববাবুর তাঁহার নিজের রচিত একটা নতুন গলি কাটেন নাই, সহৃদয় ভাবুক ও কবিবর্গের পুরাতন রাজপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন এবং সেই তাঁহার গৌরব।"[১৪]

কিন্তু চির পুরাতনের মধ্যে তাঁর চির নূতনত্ব কোথায়? রবীন্দ্রনাথই তার উত্তর দিয়েছেন—

"সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিস সজীব কৌতুহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রধান চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে

পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।"[১৫]

প্রসঙ্গত ডঃ সুকুমার সেনের কয়েকটি মন্তব্যও এখানে গ্রাহ্য—

"ব্যঙ্গমিশ্রিত লঘু পরিহাসের রসিকতা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাশৈলীর একটা বড় বিশেষত্ব।"[১৬]

"সঞ্জীব বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে বাৎসল্য রসের কিছু যোগান প্রথম দিলেন।"[১৭]

সঞ্জীবচন্দ্রের অমরত্ব সম্পর্কে ডঃ সেনের অন্য মন্তব্যটি স্মর্তব্য—

"সঞ্জীবচন্দ্রের লেখায় প্রধান লক্ষণীয় হইতেছে নির্মল রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং আপাত তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়ে আনুবীক্ষণিক লক্ষ্য।......

সঞ্জীবচন্দ্রের মতো গভীর রসবোধ ও সহানুভূতি ইতিপূর্বে অন্য কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের লেখায় দেখি নাই।"[১৮]

সঞ্জীবের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার প্রারম্ভে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও প্রতিবেশ মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁহার উপর খুব বেশী অনুভূত হয় না, তবে উভয়ের চিন্তাধারা ও জীবন পর্য্যালোচনা প্রণালীর মধ্যে কতকটা ঐক্য আছে।......আসলে গল্প লেখকের মনোবৃত্তি অপেক্ষা চিন্তাশীল দার্শনিক ও বর্ণনাকুশল শিল্পীর মনোভাবই তাঁহার প্রবলতর।"[১৯]

সঞ্জীবের রচনার অন্তর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও কয়েকটি মন্তব্য মূল্যবান—

"প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন প্রতিবিম্বিত।"[২০]

"তাঁর উপন্যাসে এক ধরণের মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ দেখে অনুমান না করে পারা যায় না যে যুগ চিন্তার বিরুদ্ধে কোথায় যেন তাঁর মনে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের মনোভাব লুকাইত ছিল। বিদ্রোহের কোন স্পষ্ট রূপ বা উপকরণ না থাকায় তা ভাষায় প্রকাশ লাভ করে নি।......অথচ কাহিনী বিন্যাসে ও বাস্তবধর্মী চরিত্র সৃষ্টিতে সঞ্জীবচন্দ্রের যে দুর্লভ ক্ষমতা ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"[২১]

এখানে সঞ্জীব সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য আমরা স্মরণ করবো—

"সাহিত্যে সঞ্জীবের প্রতিভাও বড কম নয়।......সঞ্জীবের ভাষার কোনরূপ আড়ম্বর নাই।—ভাষাটি অতি সরল, স্বচ্ছ ধীর পবিত্র—স্থানে স্থানে কবিত্ব যুথিকার স্নিগ্ধ গন্ধে প্রাণ আমোদিত হয়।"[২২]

প্রায় একই ভাবে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"সঞ্জীবচন্দ্র যেন আকস্মিকভাবে বাস্তব পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, পৃথিবীতে বাস করিয়া এবং ইহার নির্মম পরিচয় পাইয়াও তাঁহার নয়ন হইতে স্বপ্ন লোকের মায়াঞ্জন মুছিয়া যায় নাই।"[২৩]

আপাততঃ সমালোচকদের মতামত-এর বিচার বিশ্লেষণ না করে বিভিন্ন

দৃষ্টিকোণ থেকে সঞ্জীব প্রতিভায় কি কি গুণ পেলাম তার একটি সংক্ষিপ্ত যোগফল নেওয়া যাক।—

সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন গভীর রস বোধ সম্পন্ন ভাষা চিত্রশিল্পী। তাঁর সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা ও সৌন্দর্যবোধ ছিল সুগভীর। যে সৌন্দর্য চোখের সামনে থাকতেও সকলে দেখতে পায় না, তিনি তাঁর আর্টিষ্ট সুলভ দৃষ্টির সাহায্যে সহজেই তা দেখতে পেতেন। অথচ তিনি আশ্চর্য অদ্ভুত নতুন কিছু সৃষ্টি না করে চির পুরাতন সেই চিরন্তনকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর সহানুভূতি ও হৃদয়ের গভীরতা ছিল অপরিসীম। ফলে তাঁর অনেক চরিত্রেই ব্যক্তিগত জীবনের ছবি ও ভাবনাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সেই জন্যে তাঁর রচনা হয়েছে অন্তরঙ্গ। অথচ দেখা যায় যুগচিন্তার বিরুদ্ধে কোথায় যেন তাঁর একটা চাপা বিদ্রোহ লুক্কায়িত। শিশুর চিত্র ও বাৎসল্য রস তাঁর সাহিত্যে অন্যতম প্রধান রস হয়ে দেখা দিয়েছে—ঐ যুগের সাহিত্যে যা ছিল বিরল। নিষ্ঠুর বাস্তবতার অনেক ছবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আঁকলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী মূলত স্বপ্নালু কবি দার্শনিক চিন্তাশীল ভাবুকের। এই কবি দৃষ্টি প্রকাশে সঞ্জীবের ভাষা ছিল বালকের ভাষার মত কারুকার্যহীন সহজ অনাড়ম্বর অথচ হৃদ্য ও গভীর। লঘু ব্যঙ্গ মিশ্রিত সকৌতুক পরিহাস চপল ভাষা ভঙ্গী তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভাষা। এই সব গুণেই তিনি কালোত্তর আসনের দাবি রাখেন।

এই সব গুণ যে কেবলমাত্র উপন্যাসিকের তাই নয়, কবি ও স্রষ্টা মাত্রেরই এই সব গুণের জন্যে চিরকালের আসনটি অধিকার করতে পারেন। অথচ আমাদের বিশেষভাবে দেখতে হবে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা মুখ্যত ঔপন্যাসিকের কিনা? ব্যাপকভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যায় কবি দৃষ্টির বাহুল্য, দার্শনিক ভাবালুতা ও আর্টিষ্ট সুলভ মনোভাবের আধিক্য কোন গুণই ঔপন্যাসিক হওয়ার পথে বাধা নয়। বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গির জন্যে কেবলমাত্র উপন্যাসের জাতি গোত্রের পার্থক্য ঘটতে পারে, সমালোচক কবি মোহিতলাল মজুমদার-এর মন্তব্যটি এস্থলে গ্রহণীয়—

> "সৃষ্টিশক্তিই কবিত্ব, এবং কল্পনার প্রকৃতি অনুসারে অর্থাৎ রসদৃষ্টির ভঙ্গি অনুসারে, উপন্যাসের প্রকৃতিও বহুবিধ হইয়াছে। এই বিভিন্নতার জন্য কাল ধারার প্রভাব কতখানি দায়ী—কোন যুগে অর্থাৎ কোন ঋতুতে কোন জাতের ফুল ফুটিয়া থাকে। সে জিজ্ঞাসা স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রত্যেক ফুলের নিজ নিজ বর্ণে ও রূপে ফুটিয়া উঠিবার অধিকার আছে, শুধুই এক এক যুগে নয় একই যুগের একাধিক কবির স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে তাহারা স্বতন্ত্র আকারে ফুটিযা উঠে, সেখানে কালানুক্রমিক বিকাশের কথাও অবাস্তব।"[২৪]

মোহিতলালের এই মন্তব্যের মধ্যেই সঞ্জীবচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বরূপটি আমরা খুঁজে পেতে পারি। যদিও সঞ্জীবচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে গ্রন্থখানির জন্যে অমর স্থান অধিকার করে থাকবেন—সেখানি উপন্যাস নয়, সেখানি একটি অনবদ্য ভ্রমণ স্মৃতি 'পালামৌ'। তাঁর চিন্তাশীলতার অন্যতম ফসল তাঁর প্রবন্ধ সমূহ—তারাও

সংখ্যায় তাঁর উপন্যাস সমূহের প্রায় কাছাকাছি। একথা অনস্বীকার্য তাঁর উপন্যাস-গুলিতে গুণের পরিমাণের সঙ্গে দোষের পরিমানও বড় কম নয়। আমরা বর্তমান আলোচনায় সঞ্জীবের উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, ভাষা, রীতি, কৌতুকপ্রবণতা, প্রকৃতি ও মানুষের উপস্থাপনা সমূহের বিচার করে তাঁর মানসিকতার মৌলিক গতি প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারবো।—

আমরা আগেই বলেছি সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন মজলিসি মেজাজের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি:তে সঞ্জীবের এই দিকটি খুব ভালোভাবে উল্লেখ করে গেছেন। গল্প বলতে ও শুনতে তিনি সমান ভালোবাসতেন। কাজের বন্ধন ছিল তাঁর কাছে কাবাদণ্ডের তুল্য। বিশ্রম্ভালাপে তাঁর জুড়ি ছিল না। হয়তো সঙ্গী না পেলে তিনি গীতি কবির মত নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতেন—সেই কথন ছিল নিজের চারিদিকের জগতের মধ্যে একটি আত্মজগৎ গড়ে তোলা। শ্রোতা বা পাঠক সেই আত্মকথন ইচ্ছে করলে শুনতে পারতেন—কিন্তু সেখানে প্রশ্ন করা চলবে না। সাহিত্য ক্ষেত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের এই রূপটিই আমরা বারবার প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ্রম্ভালাপই করুন অথবা কথকতাহ করুন, তিনি সর্বদাই পাঠক অথবা শ্রোতার একান্ত আপনজন। তাই বিবরণধর্মিতা তাঁর রচনার অন্যতম গুণ। বঙ্কিমচন্দ্রের উন্নত ব্যাক্তত্ব যখন কাহিনী বলেছে তখন তার মধ্যে একটি দূরত্বজনিত মহত্ত্ব প্রায় সর্বদা বর্তমান—কিন্তু স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গল্প কথনে সঞ্জীবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ভঙ্গীটি সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে। কাহিনী গঠনে অসম্পূণতা ও অসম্বদ্ধতা সঞ্জীবের রচনায় বঙ্কিমের তুলনায় সুপ্রচুর। কোন কাহিনাতে প্রথমেই যেভাবে কাহিনীকে সুসংবদ্ধভাবে গড়ে তোলাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তাকে সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার প্রতি তাঁর উৎসাহের যথেষ্ট অভাব। এর মধ্যে সঞ্জীবের ঔপন্যাসিক চরিত্রের তুলনায় কথক বা মজলিসি মাইফেলী চরিত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটেছে। কোন উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, ভাব ও পরিণতিকে সার্থকতায় পৌঁছে দেবার ক্ষমতা থাকলেও তাঁর অলস মেজাজ গাল গল্পেই খুশী থেকেছে। অথচ ঔপন্যাসিকের উদার দৃষ্টি, বাস্তবানুগত্য তা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণের ক্ষমতার কিছুমাত্র অভাব দেখি না। কিন্তু সঞ্জীবের অসতর্কতা ও ঢিলে ঢালা ভাব কাহিনীকে সুসংবদ্ধ দৃঢতায় সার্থকতা দান করেনি। মূলত তাঁর প্রতিভা ছিল গাল্পিকের প্রতিভা—তাই কথাকোবিদ কথা সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সার্থক ঔপন্যাসিক হতে পারেন নি।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখবো তাঁর ভাষারীতি, চরিত্র নির্মান, পরিহাস প্রবণতা ও চিত্র নির্ম্মিতি সম্পূর্ণত তাঁর স্বভাবানুগ হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর এই স্বভাব পৃথকভাবে প্রতিটি কাহিনী বিশ্লেষণে আলোচনা করা হলেও তার মূল গতি প্রকৃতি কি এখানে অতি সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঔপন্যাসিকের ভাষা রীতি তাঁর ব্যক্তিত্বের অনুগামী, ফলে কাহিনী ও চরিত্রের

গঠনেও সেই অনুযায়ী হবে। সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষার শোষণশক্তি ঐ যুগের পক্ষে বিস্ময়কর। একদিকে যেমন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাসে কথকতার ভঙ্গী দান করেছে অন্যদিকে কাব্যিক ও নাটকীয় ভাষাও প্রয়োজনে অনিবার্যভাবে এসে গিয়েছে। যুগের চাহিদা অনুসারে রোমান্স বা রূপকথাধর্মী কাহিনী রচনা করলেও ভাষার দৃঢ় সংবদ্ধতা ও আড়ম্বরময়তা অপেক্ষা কাব্যিক সাবলীলতা ও তরলতা অধিক। বাস্তব চিত্রগঠনে সঞ্জীবচন্দ্র অনুপ্রাস বাহুল্য বর্জন করে তদ্ভব ও দেশী বিদেশী প্রচলিত শব্দই বেশী ব্যবহার করেছেন। অন্যপক্ষে বঙ্কিমী ভাষারীতি অনুসরণ করে কাব্যময় ভাষা গঠনের যে চেষ্টা করেছেন সেখানে তিনি বঙ্কিমের মত কবি কল্পনার উত্তুঙ্গ অনির্বচনীয় রসলোক গঠনে সম্পূর্ণ সফল কাম নন। অথচ ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার আধুনিক ছোট গল্পের ঢংয়ে ইঙ্গিতময়তা ও স্পর্শকাতর আবেগাতিশয্য প্রকাশে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছোট কাহিনীগুলিতে গূঢ় সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার রীতি এবং ব্যঙ্গোক্তি মূলক ভাষা রীতি কাহিনীকে দ্রুততর ও শাণিত করে তুলেছে। সবচেয়ে বড় কথা যে বাস্তব জীবন নিঃসৃত বেদনার জ্বালা সঞ্জীবের কবি ও শিল্পী মানসকে বেদনার্ত করেছিল তারই প্রকাশ তাঁর তির্যক রঙ্গব্যঙ্গাত্মক ভাষা রীতির মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে। সঞ্জীবের ভাষা আড়ম্বরহীন হলেও তার প্রাণধর্মিতা লক্ষ্য করার মত। বিভিন্নধর্মী ভাষারীতির উদাহরণ কাহিনী বিশ্লেষণে আমরা উদ্ধৃত করেছি। এই যুগের ভাষা বৈশিষ্ট্য রচনায় সঞ্জীবের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব লঘুচপল অত্যন্ত দ্রুতগামী ব্যঙ্গাত্মক ভাষাকে গভীর রসের রোমান্সকাহিনীর মধ্যে আশ্চর্য সার্থকতায় প্রয়োগ করা। ভাষা ব্যবহারেই মূলত সঞ্জীবের মজলিসি মেজাজটি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে।

সঞ্জীবচন্দ্র মূলত রোমান্স বা রূপকথাধর্মী উপন্যাস রচনা করলেও তাঁর কয়েকটি চরিত্র সম্পূর্ণভাবে সমতলসদৃশ বা ফ্ল্যাট চরিত্র নয়। 'কণ্ঠমালার' শৈল চরিত্র এবং 'মাধবীলতার' পিতম চরিত্র পরিপূর্ণ বৃত্তাকার চরিত্র না হলেও সম্পূর্ণত কাহিনী পরিচালিত নয়। অন্যান্য চরিত্র কাহিনী নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরিস্ফুটনে লেখকের ক্ষমতার যথেষ্ট প্রমান রয়েছে। চরিত্রগঠনে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সঞ্জীবচন্দ্র চরিত্রের মধ্যে অলৌকিকতা কথনো অবশ্যভাবীভাবে প্রয়োগ করেন নি। যদিও কয়েকটি চরিত্রে (যেমন পিতম, মহেশচন্দ্র, ব্রহ্মচারী, মাতঙ্গিনী প্রভৃতি) কিছু কিছু অলৌকিক কার্যকলাপ সংঘটিত করার শক্তির আভাষ থাকলেও তারা প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক শক্তিধর বা দৈবক্ষমতাপন্ন কোন চরিত্র নয়। চরিত্র গঠনে সঞ্জীব বঙ্কিম রীতির দুটি ভঙ্গীই ব্যবহার করেছেন— ১। বর্ণনাত্মক ও তুলনামূলক ভঙ্গী এবং ২। নাটকীয় বা সংলাপপ্রধান ও ক্রিয়াপ্রধান ভঙ্গী। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান চরিত্রগুলি প্রস্তাবনার সঙ্গে পরিণতি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু অপ্রধান চরিত্রের ক্ষণিক উদ্ভাসে লেখক যে অসাধারণ সব 'স্কেচ' সম্পূর্ণতা গঠন করেছেন, তা তুলনাহীন। চরিত্র গঠনে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবণতার মধ্যে

প্রবলতম হচ্ছে, (১) উৎকেন্দ্রিক ভাগ্য পীড়িত এবং অবস্থাচক্রে পাপী চরিত্র (রামেশ্বর, দামিনীর মা, পিতমপাগল ইত্যাদি)—লেখক ব্যক্তি জীবনের দুর্ভাগ্য পীড়নের সহানুভূতি যেন এই সব চরিত্রের মধ্যে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন, এবং (২) বিষন্ন কবি প্রকৃতির দুর্বল পুরুষ চরিত্র গঠনে লেখকের অন্তর্লোকের বিষাদ বৈরাগ্যময়তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। নারী চরিত্রের মধ্যে শৈল চরিত্র গঠনে লেখকের স্বকীয়তা অপেক্ষা বঙ্কিমের শৈবলিনী রোহিনী হীরা চরিত্রের একটি মিশ্ররূপ প্রকট, কিন্তু দামিনী, মাধবীলতা, জ্যোৎস্নাবতী, পার্বতী প্রভৃতি চরিত্রের বিষাদ কারুণ্য সঞ্জীবের নিজস্ব প্রবণতার অন্তর্গত।

আর্টিষ্ট সুলভ চিত্র গঠনে তাঁর যুগে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এই চিত্রগঠনের উপাদান মূলত দুটি ১। শিশু ও ২। প্রকৃতি। একমাত্র 'জাল প্রতাপচাঁদ' ছাড়া বাকী সবকটি আখ্যানে এমন কি 'পালামৌতে' ও শিশু ও প্রকৃতির চিত্র অমর করে রাখবে। কবি ও শিল্পীর এই প্রবণতা উপন্যাসকারের সপক্ষ নয় বলে মনে হলেও সঞ্জীবের গভীর রসজ্ঞান ও রুচি বোধ কোথাও এই ধরণের চিত্র গঠনকে ক্লান্তিকর বা অতিমাত্রায অসঙ্গত করে তোলে নি। ফলে একথা বলা মোটেই অন্যায় হবে না যে সঞ্জীবের ক্ষেত্রে এই সব চিত্রগঠনের সার্থকতা তাঁর উপন্যাস গল্পগুলিকে একান্তই তাঁর বলে চিহ্নিত করেছে—এইখানেই তাঁর ব্যক্তিত্বের বা স্টাইলের বিশিষ্ট প্রকাশ দেখা গিয়েছে।

রঙ্গব্যঙ্গ পরিহাসপ্রবণ চিত্র চরিত্র গঠনে সঞ্জীবের ক্ষমতা তাঁর মজলিসি মেজাজের প্রতিবিম্বন। অথচ লক্ষণীয বৈশিষ্ট্য এই তিনি তাঁর রচনায় লঘু চপল পরিহাস প্রকাশে কোথাও সামান্যতম রুচি বিকৃতি বা গ্রাম্যতা প্রকাশ করেন নি। তাঁর হাস্যরসের মধ্যে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ চাবুকের চেয়ে সহানুভূতিশীল দরদী মানুষটির সকরুণ হাস্যোজ্জ্বল মুখটিই বেশী উদ্ভাবিত। পরিহাস চিত্র গঠনে কোথাও তিনি স্ফুরিত অধরের স্মিতহাস্যটি বিকীর্ণ করেছেন আবার কোথাও উচ্চকণ্ঠের কলহাস্যে কাহিনীর গভীর ধারাকে শুভ্র ফেনোচ্ছল করে তুলেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যে রবীন্দ্র সাহিত্যের মানুষ ও প্রকৃতির অচ্ছেদ সম্বন্ধের পূর্বভাস সূচিত হয়েছে বলে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন। বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় গানে ছোট-গল্পে উপন্যাসে প্রকৃতিকে শুধু যে জীবন্ত সত্তা বলেই গ্রহণ করেছেন তাই নয় স্বয়ং তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। খেয়ালী প্রকৃতি-প্রেমী কবি সঞ্জীবচন্দ্র প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি সত্য, কিন্তু মানব মনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রকৃতিকে প্রতীক বা রূপকরূপে ব্যবহার করে তার মধ্যে ইঙ্গিতময় প্রাণধর্মিতা প্রয়োগ করে তিনি যুগ-মানসের বাইরে তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দামিনী, কণ্ঠমালা, মাধবীলতা, প্রসঙ্গে আমরা তার আলোচনা করব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের খেয়ালীপণা কাহিনীর ধারাবাহিকতা ব্যাহত করেছে।

সমগ্র সঞ্জীব সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা লেখকের শিল্পগত বা মনোগত ক্রমপরিণতির যে একান্ত অভাব দেখতে পাই তার মূলে আছে তাঁর খেয়ালীপণা বা এক উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। শিল্পগত বা মনোগত ক্রমপরিণতির অভাব যে কেবলমাত্র তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যকর তাই নয়, কাহিনী চরিত্র, ভাব বা তত্ত্বের ও কোন সার্থক ক্রমপরিণতি আমরা তাঁর রচনায় দেখতে পাই না। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে; তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা যাত্রা প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে বেরিয়ে ছিল। কিন্তু তাঁর খেয়ালী প্রকৃতি মূলত গাল্পিকের। তাই শীঘ্রই তাঁর কথাকোবিদ প্রবৃত্তি আখ্যান সমূহে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। এমন কি প্রবন্ধের সরসতা তাঁর গল্পকার চরিত্র প্রকট করে তুলেছে। কিন্তু আশ্চর্য, ব্যক্তিজীবনের অস্থিরতা তাঁর কাহিনী সমূহকে কোন শিল্পগত বা মনোগত উন্নতির দিকে নিয়ে যায় নি। তাঁর প্রথম গল্প 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' যে পরিমাণে একটি নিটোল কাহিনী, 'দামিনীতে' সেই শক্তির অভাব লক্ষ্য করা যায়, 'কণ্ঠমালায়' স্থান কাল চরিত্রের যে স্পষ্টতা অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী কালের 'মাধবীলতায়' অন্য যে গুণেই থাকুক না কেন ঐ সাংগঠনিক ক্ষমতার অভাব বর্তমান। শুধু তাই নয় কণ্ঠমালা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে শৈল চরিত্রের যে মনস্তাত্ত্বিক ক্রমপরিণতি ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তা বহুল পরিমাণে খর্ব হয়েছে। আসল কথা সঞ্জীবচন্দ্র মানুষটি যেমন খেয়ালী প্রকৃতির ছিলেন তাঁর সাহিত্যও প্রকৃতপক্ষে সেই খেয়ালী মনের এক বিচিত্র ফসল।

: রামেশ্বরের অদৃষ্ট :

সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম বছর থেকেই তাঁর লেখা প্রকাশ হতে থাকে। রচনার নাম 'যাত্রা সমালোচনা' (প্রবন্ধ)। লেখার অভ্যাস সঞ্জীবের আগেই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন 'শশধর' পত্রিকায় তাঁর কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। কাহিনীকার হিসাবে সঞ্জীব তাঁর প্রতিভার বিশিষ্টতা প্রকাশ করতে না পারলেও রচনার বিশিষ্ট প্রবণতা তাঁর প্রথম আখ্যান 'রামেশ্বরের অদৃষ্টে' সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁরই সম্পাদিত 'ভ্রমর' পত্রিকার প্রথম

খণ্ডে (বৈশাখ ১২৮১ সন)। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৯৩ সালে বঙ্কিম কৃত সংকলন 'সঞ্জীবনী সুধায় যে তিনটি রচনা স্থান পেয়েছিল তার মধ্যে' রামেশ্বরের অদৃষ্ট অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্র "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" "সঞ্জীবনী সুধা"য় অন্তর্ভুক্ত করার সময় লিখেছিলেন—

"রামেশ্বরের অদৃষ্ট এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, এ জন্য তাহাও এই সংগ্রহ ভুক্ত হইল।"

রামেশ্বরের অদৃষ্ট যখন সঞ্জীবচন্দ্র রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ৪০ বৎসরের কাছাকাছি। শেষ চাকরীটি থেকে বিদায় না নিলেও কর্মজীবন সম্পর্কে সঞ্জীব রীতিমত বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছেন। বর্ধমানের চাকরী, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সঞ্জীবচন্দ্রের চাকরী জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়, তাও পার হয়ে এসেছেন। কিন্তু গৃহগত প্রাণ আত্মীয় বন্ধু পরিবৃত তৃপ্ত সংসারী সঞ্জীবচন্দ্রের স্নেহানুভূতিময় হৃদয় উত্তাপের ছাপ 'রামেশ্বরের অদৃষ্টে' প্রকট, যদিও উৎকেন্দ্রিক জীবন কল্পনা সঞ্জীবের বিশেষ প্রবণতার অন্যতম।

১২৮১ সনে ভ্রমর পত্রিকার রামেশ্বরের অদৃষ্ট যখন প্রকাশিত হয় তখন মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২১, কিন্তু সঞ্জীবনী সুধায় এরপৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১। শ্রেণী নির্দ্দেশক হিসেবে একে উপন্যাস বলা হয়েছে। আকারে আখ্যানটির জাতি বিচার প্রসঙ্গত করা যাবে। 'ভ্রমর' পত্রিকার সম্পাদনা কালে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর স্বকীয়ধর্ম ছেড়ে সামান্য সময়ের জন্যে হলেও, নিয়মিত লেখার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময়টি তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু। তখন তাঁর সাহিত্য রচনায় উৎসাহের শুরু—যদিও কোন উৎসাহই নির্বাপিত হতে সঞ্জীবের বেশী সময় লাগত না। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবের জীবন কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এই দিকটি খুব ভাল ভাবে উল্লেখ করেছেন।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম আখ্যান হলেও লেখকের বিশিষ্ট মনোভাবের প্রকাশ এর মধ্যে ঘটেছে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রথমতঃ সঞ্জীব তাঁর সাহিত্যে মধুর রসের অপেক্ষা বাৎসল্য রসের প্রাধান্য দিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—

"সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাস গল্প ও অন্যান্য লেখায় মুখ্য রস হইতেছে বাৎসল্য।"

সর্বত্র না হলেও অন্ততঃ রামেশ্বরের অদৃষ্টে এই রস নিঃসন্দেহে মুখ্য রস রূপে দেখা দিয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে স্বভাবত বৈচিত্রহীন বাৎসল্যরস প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের সাহিত্য রসের আধার নয়।

দ্বিতীয়তঃ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রায় সব আখ্যানের মধ্যে দেখি দুর্ভাগ্য পীড়িত সমাজ পতিত পাপী চরিত্রের প্রতি এক ধরণের সহানুভূতি। ফলে বঙ্কিম ভাবিত সামাজিক আদর্শবোধের সঙ্গে লেখকের সহানুভূতির দ্বন্দ্ব ও অপসঙ্গতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিচারক হিসাবে সঞ্জীবের যুক্তিবাদ অপেক্ষা হৃদয় ধর্মের প্রাবল্য অতিমাত্রিক। চন্দ্রনাথ বসু সঞ্জীবের মধ্যে সার্থকভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন 'বিলক্ষণ আবেগ ও উদ্দাম

ভাব'। তৃতীয়তঃ নিষ্ঠুর বাস্তবতার চিত্র বঙ্কিম যুগে অতি অল্প সাহিত্যিকই অঙ্কন করেছেন। এক্ষেত্রে সঞ্জীবের দক্ষতা অসাধারণ। মানুষের দুঃখের মূলে মনোধর্মের প্রাবল্য অপেক্ষা কার্যকারণের বাহ্যিক ও বাস্তব অভিঘাতগুলিকে তিনি প্রধান নিয়ন্ত্রনী শক্তি বলে গ্রহণ করেন।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট-এ দুঃখের দুঃসহ পীড়ন ভুল ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়েই যদিও প্রকাশিত হয়েছে, তবু তার কার্যকারণের যোগাযোগগুলি বাস্তব ও বহিরাগত ঘটনার ফলাফল। চতুর্থতঃ সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে যে আর্টিষ্টসুলভ মনটির পরিচয় বারবার পেয়েছি, রামেশ্বরের অদৃষ্ট তার সার্থক পরিচয বহন করছে। স্বল্প পরিসরে ঘটনা ও চরিত্রের পরিস্ফুটনের প্রকৃতির চিত্র ও প্রাকৃতিক উপমার ব্যবহার সঞ্জীবের রচনার অন্যতম প্রধানগুণ কাহিনী ও ভাষা নির্মিত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তার পরিচয় দেব। পঞ্চমতঃ সঞ্জীব বাংলা সাহিত্যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অপরিশোধিত বিশ্লেষণ ভঙ্গিটি কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন কণ্ঠমালা উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা দেখিয়েছি। আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত মনোবিশ্লেষণ সার্থকভাবে সঞ্জীবের মধ্যে আশা করা যায় না। কিন্তু মনোবিশ্লেষণের চিহ্ন চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে লেখকের সেই আধুনিক মনের বিদ্যুতি আভাস বারবার উদ্ভাসিত করেছে। ঘটনা যতই বাহ্যিক হোক, লেখকের বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গী আমাদের সব সময়েই চরিত্রের অন্তর্লোকে আহ্বান করেছে। ষষ্ঠতঃ এই আখ্যানে সঞ্জীবের অন্যতম প্রধান গুণ বা দোষ মাঝে মাঝে কাহিনী ভুলে নানারকম তত্ত্ব চিন্তা বা ক্ষণিক দার্শনিকতায় ডুব দেওয়া, অল্প হলেও কিছু আছে। অন্য ক্ষেত্রে কাহিনীর গতি যেখানে অতিমাত্রায় শ্লথ হয়েছে, এই কাহিনীতে তা ধীরগতি সম্পন্ন না হলেও তার অস্তিত্ব আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। সবশেষে সঞ্জীবের আখ্যানের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতধর্মিতার কথা উল্লেখ করতে হয়। 'দামিনী' গল্পে এই ইঙ্গিতধর্মিতার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। চরিত্র ও প্লট গঠনে ইঙ্গিতধর্মিতা একটি অতি আধুনিক সামগ্রী হওয়া সত্ত্বেও সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে তার যথেষ্ট সচেতন ব্যবহার আমাদের রীতিমত বিস্মিত করে। কারণ রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের যা বহু অনুশীলিত সাহিত্যিক ক্ষমতা তারই অপরিশোধিত প্রাথমিকরূপ সঞ্জীবের রচনায় অতি অনায়াসে প্রকাশ পেতে দেখি।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট আখ্যানটি বিশ্লেষণ করলে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রাগুক্ত প্রবণতাগুলি আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারবো। কাহিনীর কথামুখটি নিম্নরূপ—

"রামেশ্বর শর্মার পঁচিশ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইল। তিনি পিতাকে বড় ভালবাসিতেন। রামেশ্বরের পিতা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমুদয় রামেশ্বর শ্রাদ্ধে ব্যয় করিলেন।······ক্রিয়া সমাপ্ত হইল।······রামেশ্বর তখন জানিলেন যে তাঁহার আর কিছুই নাই। পরিবারের ভরণ পোষণ করা কঠিন হইল।"

এই কাহিনীতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—কথামুখেই কাহিনীর শুরু এবং কাহিনীর দ্রুততা আরম্ভেই দেখা গেল। অন্যান্য কাহিনীর ক্ষেত্রে তিনি কোথাও কাহিনীর মধ্যভাগকে কথামুখ হিসাবে ব্যবহার করেছেন আবার কোথাও মুখ্যভাব বা 'থিমকে' দার্শনিক ভঙ্গীতে কথামুখে স্থাপন করেছেন। কিন্তু 'রামেশ্বরের অদৃষ্টে' কাহিনী যেখানে থেকে যাত্রা শুরু করলো, তার পথটি শেষ পর্যন্ত কোথাও বাঁকলো না, বরাবর ঘটনা পরম্পরায় পরিণতির দিকে এগিয়ে চললো। ফলে কাহিনীর মধ্যে জটিলতার একান্ত অভাব লক্ষণীয়। এরই জন্য কারও কারও মতে এটি মামুলি গতানুগতিক বৃত্তান্ত মাত্র। কাহিনী নির্মাণে সঞ্জীব প্রায়ই তাঁর ক্ষমতার অভাব দেখিয়েছেন। তাঁর কৃতিত্ব অন্যত্র। কথামুখেই রামেশ্বরের চরিত্র সুস্পষ্ট—পিতৃভক্ত ও পরিবার কেন্দ্রিক যুবক, যে পাঠকের সহানুভূতি সহজেই আকর্ষণ করতে পারে। এই সহানুভূতির প্রাবল্য সমগ্র কাহিনীতে প্রতিকূল সামাজিক আদর্শবোধের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে প্রস্তুত করে তুলেছে।

মাত্র চারটি পরিচ্ছেদের এই কাহিনীর গতি অত্যন্ত দ্রুত। রামেশ্বর দেখলেন তিনি রিক্ত। স্ত্রী পার্বতী ও পুত্র আনন্দদুলালের জন্যে খাদ্য সংগ্রহে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। এই রিক্ততার চিত্রটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও ইঙ্গিতধর্মী—

> "দ্বারের কিঞ্চিৎদূরে ব্রাহ্মণ ভোজনের শুষ্ক পত্র, ভাঙ্গা হাঁড়ি প্রভৃতির স্তূপ মধ্যে গ্রাম্য কুকুরেরা আহার অন্বেষণ করিতেছে, শিশু একাগ্র চিত্তে তাহাই দেখিতেছে। রামেশ্বরকে দেখিয়া শিশু দৌড়িয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা। আমার জন্যে কি এনেছ ?" রামেশ্বরের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, দেখিয়া পার্বতীর চক্ষু জলে পুরিল, শিশুর মুখপানে চাহিতে সে জল উছলিয়া পড়িল, তখনই আবার মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিতে উভয়েই কাঁদিয়া উঠিলেন, বালক উভয়ের মুখ প্রতি দুই একবার চাহিয়া শেষ কাঁদিয়া উঠিল।"

অন্যান্য কাহিনী অপেক্ষা সঞ্জীব এখানে 'স্পেশ টাইম কনটেক্সট্' ও কার্যকারণ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন শিল্পী। এই ঘটনার পর রামেশ্বর ক্রমশঃ পাপের পথে নেমে চললেন। অথচ পাপবোধের যন্ত্রণা তাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট। তাই কায়িক পরিশ্রম করে পরিবার প্রতিপালনের আশায় পৈতৃক ভদ্রাসন বিক্রয় করে ভাতিপুর গ্রামে গেলে সেখানে অপরিচিত হওয়ায় জামিনের অভাবে কোন কাজ জুটলো না। জমিদারের নায়েবের কাছে চৌকিদারের কাজ চাওয়ায় তিনি একটি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব দিলেন। একটি নিরুদ্দিষ্ট খুনী অথবা চোরের পরিবর্তে আসামী সেজে ধরা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্রোধ থেকে জমিদার ও দারোগাকে রক্ষা করলে তাকে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হবে এবং জেল থেকে ফিরে এলে জমিদারীতে কাজ দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবে রামেশ্বরের মনের দ্বন্দ্বের স্বরূপ সুঅঙ্কিত।—

এর পরের অংশে রামেশ্বরের ও পার্বতীর ভাগ্য পীড়িত সমস্যা দীর্ণ দাম্পত্য জীবনের ছবি শিশুর কলরবে আনন্দাশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। একদিকে শাশ্বত নারী প্রকৃতির

কল্যাণী মূর্তি—

"ছার টাকার জন্য সাধ করিয়া কয়েদী হইও না। আমি ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব।" পার্বতীর মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী আশ্বাস 'মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি'—অন্যদিকে বাৎসল্য রসের ব্রজসুন্দর কারুণ্য বাংলা সাহিত্যে যার জুড়ি পাওয়া ভার,—

কিন্তু কাহিনীর দ্রুততর গতি সঞ্জীবের রয়ে বসে দেখে শুনে চলার অলস ভঙ্গীটি ত্যাগ করে সহজেই এই পরিবার বন্ধন হতে রামেশ্বরকে নায়েবের কাছে হাজির করে দিয়েছে। রামেশ্বর স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে জেলে চলেছেন। এখানে লক্ষণীয় জেল সম্পর্ক সঞ্জীবের এক বিশিষ্ট প্রবণতা তাঁর প্রায় সব আখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে—কণ্ঠমালা, জাল প্রতাপচাঁদ, মাধবীলতা ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে কমবেশী জেলের বর্ণনা আছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জীবচন্দ্র অবশ্যই আদালত জেল ইত্যাদির সঙ্গে ভাল ভাবেই পরিচিত ছিলেন—ফলে জেলের বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর একটি সহানুভূতি ছিল। এই সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার সীমা যুক্ত হয়েছিল। ফলে জেল নিয়ে যে আবেগ প্রাধান্য প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ তত্ত্বজিজ্ঞাসা যুক্ত করেন নি। বরং লেখক তাঁর সংস্কার বন্ধনের সংকীর্ণ চিন্তাকে অকুণ্ঠ ভাবে প্রকাশ করেছেন। এই সহানুভূতির মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের 'বিড়াল' ভাবনার যেন ছায়াপাত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ অংশটি অনন্যসাধারণ। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির ইঙ্গিতময়তার যেন প্রাক্ রূপ। জেলে যাবার সময় রামেশ্বর তাঁর স্ত্রীর যে ক্রন্দন ধ্বনি শুনিলেন তাতে—

"তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন সাগর উছলিতছে, জগৎ কাঁদিতেছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঘটনা আরও গতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। "রামেশ্বরের অদৃষ্ট শৃংখল চারিদিক হইতে রামেশ্বরকে আঁটিয়া ধরিতেছিল। গভীর রাত্রে রামেশ্বর পদাতিকগণের নিকট হইতে পালাইলেন।"

ইংরেজীতে যাকে Tragedy of errors বা ভ্রমাত্মক দুর্ভাগ্য বলে এখানে সেই ঘটনাই ঘটেছে। নায়েব চুরি প্রমাণ করার জন্যে একটি ঘটি গোপনে রাত্রে রামেশ্বরের ঘরে রাখতে এলেন। পলাতক রামেশ্বর স্ত্রীপুত্রকে দেখবার অভিলাষে আপন ঘরের কাছে এসে নায়েবকে তার ঘরে ঢুকতে দেখে তার স্ত্রীর উপপতি সন্দেহ করে অভিমান বশে ফিরে গেলেন। স্ত্রীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিলেন না। পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে মিথ্যা করে বললেন, তিনি শুধু চুরি করেন নি, কিছুকাল আগে একটি স্ত্রী হত্যাও করেছেন। ফলে তাঁর বিশ বছরের জন্যে দ্বীপান্তর হয়ে গেল। অন্যদিকে ক্রমে পার্বতী যখন বুঝিতে পারলেন কেন রামেশ্বর তাঁকে ছেড়ে গেছেন, তখন আত্মধিক্কারে তিনি জলমগ্না হলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদটিতে সঞ্জীবের সাহিত্য প্রতিভার সমস্ত গুণাবলী প্রায় দেখা

দিয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে সাধারণত সাহিত্যিকদের রচনা কালে প্রতিভার উন্নতি ক্রমে ক্রমে পরবর্তী রচনায় দেখা যায়, কিন্তু সঞ্জীবের ক্ষেত্রে তার অনেক কিছুরই ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। তিনি তাঁর প্রথম আখ্যানে প্রতিভার যে বিকাশ দেখালেন পরবর্তী আখ্যান সমূহে তার ক্রমোন্নতি দেখাতে পারলেন না। এই পরিচ্ছেদে চরিত্র চিত্রণ, নিসর্গ চিত্রের মাধ্যমে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা সৃষ্টি করা কাহিনীর দৃঢ় সংবদ্ধতা গঠনে লেখক গল্প লেখকের কর্তব্য অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে পালন করেছেন। লেখকের ব্যক্তি জীবনের দুঃখবোধ ও উৎকেন্দ্রিকতা উৎসারিত দার্শনিকতা ও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস এখানে রীতিমত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত।

"এই ঘোর নাদী সমুদ্রের অনন্ত বজ্রগম্ভীর কল্লোল শুনিতে শুনিতে বিশ বৎসর। এই বালুকময় উপকূলারূঢ় নারিকেল বৃক্ষের সংকীর্ণ ছায়ায় সে কোদালী হাতে বিশ্রাম করিতে করিতে বিশ বৎসর। এই সাগর প্রান্ত ব্যাপী যেন বিকীর্ণ ধূম মধ্যে আনন্দদুলালের হাসিভরা মুখের অন্বেষণ করিতে করিতে বিশ বৎসর। স্বেচ্ছানির্বাসিত রামেশ্বর মনে করিয়াছিল, মরিব, মরিতে পারিল না—বিশ বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিতে আসিল। আমরা মনে করি এই করিব আর একজন করেন আর। আমাদিগের কার্য দৃষ্ট, তাঁহার কার্য অদৃষ্ট।"

আপাত দৃষ্টিতে কাহিনীর গতি কিছুটা ধীর বলে মনে হলেও ঘটনার দ্রুততা ভালভাবেই পরবর্তী অংশে লক্ষ্য করা যায়। রামেশ্বর তাঁর প্রচণ্ড দুরদৃষ্ট পীড়িত জীবনের বাঁচার অর্থ খুঁজে পেলেন আপন সন্তানের কথা ভেবে। বিশ বৎসর পার হলে দ্বীপান্তর থেকে ফিরে ভাতিপুরে এসে দেখেন স্ত্রী পুত্র ঘর কিছুই নেই, রামেশ্বরকেও কেউ চেনে না। হাটে বাটে স্ত্রী পুত্রের অনুসন্ধান করতে করতে এক বেশ্যাকে দেখে মনে হল বয়সান্তরে ও অবস্থান্তরে এই পার্বতী, কারণ স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ভুল ভাঙ্গবার কোন কারণ ঘটে নি। সেই পতিতাকে আনন্দ দুলালের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল—

"চুলায় পাঠাইয়াছি—নদীর ধারে তারে পুঁতিয়া আসিয়াছি—তাহার ওলাওঠা হইয়াছিল—সে গিয়াছে, এখন তুমি যাও। রামেশ্বর আর সহ্য করিতে পারিলেন না, জোরে তাহার বক্ষে পদাঘাত করিয়া গেলেন।"

এরপর রামেশ্বরের চরিত্র ঘটনাও মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দ্রুত পরিণতিমুখী। রামেশ্বর উন্মত্ত প্রায়—একদিন পথে একটি স্ত্রীলোকের কোলের ছেলে কেড়ে তাকে পথে নামিয়ে দিয়ে স্ত্রীলোকটিকে একচড় মেরে বললেন—

"তোরা রাক্ষসীর জাত, ছেলে মারিয়া ফেলিবি—ছেলে ছেড়ে দে।"

এর পর ক্ষুধার জালায় দোকানী, বরকন্দাজকে মেরে খাবার খাওয়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেল—

"একজন প্রসিদ্ধ দায়মালী, পিলোবিনাং হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশ লুট করিতেছে। পুলিশ শশব্যস্ত হইল।...যত বদমাস, ডাকাইত, তাঁহার প্রতাপ শুনিয়া তাঁহার চারপাশে জমিল।"

ডাকাতের সর্দার হয়ে যখন ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য শুরু করলেন তখন একদিন ডাকাতিকালে আহত হলে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বনের মধ্যে ফেলে পালায়। এক ডাক্তারের দয়ায় জীবন লাভ করে আবার পুলিশের হাত এড়াল। এখানে ঘটনার দ্রুততা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে ভাষাও আশ্চর্য দ্রুতগতি সম্পন্ন। এই অংশে ছোটগল্পের সমস্ত লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে কাহিনীর পরিণতি। আশ্চর্য যোগাযোগে কাহিনী রোমাঞ্চকর রহস্যের উদ্ঘাটন সমাপ্তিতে পৌঁছেছে। আকস্মিকতা, অদ্ভুত যোগাযোগ গল্পের বাঁধাধরা প্লটে লেখকের রোমান্স রসিক মনেরই পরিচায়ক। প্রথম যুগের গল্পে, বিশেষত বঙ্কিম যুগের পরিমণ্ডলে জীবনের সহজ স্বাভাবিক চিত্র আশা করা যায় না। এই কাহিনীর পরিণতি সেই যুগ প্রবৃত্তিকেই চরিতার্থ করেছে। রামেশ্বর এখন রামু সর্দ্দার, ভয়ঙ্কর দস্যু। তবু তাঁর মনে আনন্দদুলালের শোক। শেষোক্ত ঘটনার চার মাস পরে ডাকাতের দল এক পাল্কী আক্রমণ করে আরোহীকে খুন করতে যাবে, এমন সময় রামু সর্দ্দার বাধা দিল কারণ আরোহী সেই ডাক্তার যিনি তার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। এবার রামু সেই ডাক্তারের প্রাণ রক্ষা করলেন তার দলের লোকের হাত থেকে। অবশ্যম্ভাবিভাবে এই ডাক্তার যে আনন্দদুলাল তা আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না। আরও আশ্চর্য যোগাযোগ পার্বতী মরেন নি, জেলেরা তাঁকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিল, বর্তমানে আনন্দদুলালের কাছেই থাকেন। অতএব রামেশ্বরের জীবন মিলনের আনন্দে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হল। প্লট গঠনের কৃতিত্ব লেখকের দাবীর মধ্যে না এলেও খণ্ড ক্ষুদ্র চিত্রে সঞ্জীব যে কৃতিত্ব অন্য সব সাহিত্যকর্মে দেখিয়েছেন তার পরিচয় রামেশ্বরের অদৃষ্টেও সুলভ। ডাক্তার আনন্দদুলালের চিন্তার চিত্রটি অপূর্বতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের স্মিতহাস্য—

> "পালঙ্কীতে শয়ন করিয়া বাবু অন্যমনে নানা বিষয় ভাবিতেছিলেন। গৃহিনী, কন্যা, ইটের পাঁজা, নূতন বাগান। নূতন বাগানের কেবল মালীর দোরঙ্গা দাড়ী, তাহার মালিনীর থাঁরা নাক, বাবুর চিন্তার ভাগী হইল।"

এই আধুনিক মানসিকতার স্ফুলিঙ্গ সঞ্জীবের মধ্যে প্রায়ই দেখা দিয়েছে, অথচ রোমান্স রসিক মনের অপসঙ্গতি প্রায়ই তাঁর রচনাকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দান করেনি। তবু একথা আমরা আগেই স্বীকার করেছি প্রথম আখ্যান হলেও রামেশ্বরের অদৃষ্ট অন্যান্য কাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী পরিপক্ক। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবের রচনা সংকলনে সঞ্জীবনী সুধায় রামেশ্বরের অদৃষ্টকে প্রথমেই স্থান দিয়েছিলেন বলে অনুমান করা যায়। 'পালামৌ' স্মৃতি চিত্রের পাশে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিনিধি স্থানীয় আখ্যানের মধ্যে রামেশ্বরের অদৃষ্ট অন্যতম।

প্রথম আখ্যান হলেও চরিত্র চিত্রণে ও ভাষা নির্মাণে রামেশ্বরের অদৃষ্ট শক্তিশালী রচনা। প্রকৃতপক্ষে রামেশ্বরের একটি চরিত্রই লেখকের আখ্যাবস্তু, পার্বতী ও আনন্দদুলালের চরিত্র যৎসামান্য হলেও নিপুন তুলির আঁচড়ে মুহূর্তের জন্য তা

আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। কাহিনী পাঠের শুরুতেই পাঠক বুঝতে পারেন একজন অদৃষ্টবাদী লেখক একটি অদৃষ্ট বিড়ম্বিত জীবনের কথা মজলিশী গল্পের ভঙ্গীতে লিখতে বসেছেন। কি কাহিনী কি চরিত্রের নির্মাণে সঞ্জীবচন্দ্র সর্বত্রই তাঁর মাইফেলী মেজাজটি রক্ষা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মেজাজটি সম্পর্কে অতি সার্থকভাবেই বলেছেন—

"সে লেখাগুলি কথা কাহারও অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত, ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া।"[২৫]

কাহিনীর মধ্যে লেখকের সেই আনন্দবেগে আসর জমিয়ে যাওয়ার কীর্তি আমরা দেখলাম। অন্যদিকে চরিত্র চিত্রণেও তাঁর ক্ষমতা সার্থকতায় পৌঁছেছে।

রামেশ্বর শর্মা পাঁচশ বৎসরের যুবক। পিতার প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা আর সেই জন্যেই পিতৃশ্রাদ্ধে যথা সর্বস্ব ব্যয়করে তিনি রিক্ত নিঃস্ব। মাতাপিতার প্রতি অগাধ ভক্তির মূলে আছে বাৎসল্য—তাই আপন সন্তানের প্রতি অসাধারণ বাৎসল্য থাকাটাই স্বাভাবিক। এই বাৎসল্যই রামেশ্বর চরিত্রের নিয়ন্ত্রণী শক্তি। এই প্রেষণা সঞ্জীবকে রামেশ্বর চরিত্র গড়ে তোলার জন্যে যে আবেগ ও অনুভূতি দান করেছে তা তার রোমান্স রসিকতার নামান্তর হয়েছে। কারণ রোমান্স রসিকতার মূলে যে তীব্র অনুভূতি কাজ করে তাতে চরিত্র সমাজ নীতি লঙ্ঘন করে যেতে চায়—যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়াবেগ চরিত্র বিচারের সপক্ষে প্রধান সহায় হয়। এই রোমান্সমানস সম্পর্কে Bliss Perry মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে—

"In attaining these (romantic) qualities the artist frequently runs the risk of falling into lawless, into the caprices of a disordered imagination. What seems significant to him may vague or even meaningless to us, for the romantic artist, generally speaking, deals more with the emotional element than with the purely intellectual factors that enter into the work of art."[২৬]

লেখকের এই মনোভাবই রামেশ্বরের চরিত্র পরিকল্পনায় মৌলিক ত্রুটীর কারণ। ভ্রান্তি থেকে দুঃখ, দুঃখ থেকে অন্যায় করার প্রবণতা ও পাপী হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত দুঃখের শেষ হয়ে কেবল দুঃখ ভোগের পুরস্কার অনাবিল প্রায়শ্চিত্তহীন সুখ রূপকথায় যুক্তিহীন পরিসমাপ্তি হতে পারে। কিন্তু সামাজিক কাহিনীতে তা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, অন্তত পক্ষে মানসিক দ্বন্দ্বের ইঙ্গিতমাত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু রামেশ্বর চরিত্র বর্তমান সমাজপরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেও শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে সমাজবোধের ইঙ্গিতমাত্রও প্রায় পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকারাবরণ। কিন্তু শেষাংশে তার পূর্বকৃত পাপের জন্যে বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা নেই। কেবলমাত্র স্ত্রীকে অন্যায় সন্দেহের জন্যে অনুশোচনা আছে। কিন্তু ডাকাতের সর্দার হয়ে যে সব ভয়ঙ্কর দুষ্কার্য

করেছিল তার জন্যে কোন অনুশোচনা নেই। দস্তয়ভস্কি তাঁর 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' বইয়ের নায়ক রসকলনিকভের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হয়েও তারা পাপের জন্যে সামাজিক ও মানসিক শাস্তি ভোগের বর্ণনা দিতে ভুলে যান নি। স্বয়ং বঙ্কিম ও তাঁর ভবানী পাঠককে (দেবী চৌধুরাণী) শেষ পর্যন্ত জেলে পাঠিয়েছেন। হয়তো সঞ্জীবের যুক্তি ছিল রামেশ্বরের শাস্তি তো আগেই হয়ে গেছে তাই পরের পাপের জন্যে তাকে আর শাস্তি দেওয়া যায় না। তবে রামেশ্বর চরিত্রে কয়েকটি মানবিকগুণের প্রকাশ খুবই মর্মস্পর্শী হয়েছে। তার মধ্যে তার আনন্দদুলালের জন্যে আকুতি এবং পার্বতীর প্রতি ভালবাসা ও সন্দেহজনিত ঘৃণার প্রকাশটি অত্যন্ত আন্তরিক। এই প্রকাশে প্রকৃতির পটভূমিকার ব্যবহারটি সুন্দর—

"যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদুমৃদু ডাকে রামেশ্বর ভাবেন আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে। যখন দূরে অস্পষ্টলক্ষ্য একটি তরঙ্গ উঁচু হইয়া নাচে, রামেশ্বর মনে করেন যে আনন্দদুলাল নাচিতেছে।"

অন্যদিকে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ—

"তখন রামেশ্বর ধীরে ধীরে সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল কোমল পুষ্পশোভিত তীর ভূমিতে উপবেশন করিলেন। দুই করে মুখ মণ্ডল আবৃত করিলেন ক্রমে তাঁহার দেহ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—ক্ষণকাল পরে রামেশ্বর ভূমিতে লুটাইয়া পার্বতী পার্বতী বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।"

আবার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহে মানসিক পরিবর্ত্তনের স্বরূপটি এমন—

"রামেশ্বর আর কোন উত্তর না দিয়া ভাবিলেন অন্যকে আর কষ্ট দিব না, আপনি আর কষ্ট পাইব না। এই ঘৃণিত পৃথিবী ত্যাগ করিব এই সিদ্ধান্ত করিয়া চলিলেন। অপরাহ্নে যে ক্রন্দন ধ্বনি মর্মভেদী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই শব্দ পৈশাচিক বোধ হইতে লাগিল।"

ছোট কাহিনীর চরিত্র সৃষ্টিতে চরিত্রের সামগ্রিক ধর্ম প্রকাশ পাবেই এমন কথা নেই। তবু সামান্য কয়েকটি গুণের প্রকাশে—বর্ণনায় অথবা কার্য কারিতায় চরিত্রের সামগ্রিক ধর্ম প্রকাশ লেখকের ক্ষমতার পরিচায়ক। পার্বতী চরিত্রের দুটি মাত্র ধর্ম এখানে প্রকটিত—একটি তার সন্তান স্নেহ, অপরটি তার স্বামী প্রেম। নারী চরিত্রের মাধুর্য তাতেই সামগ্রিকতা লাভ করেছে। পার্বতী রামেশ্বরের বাৎসল্য রসের চিত্র প্রসঙ্গত তুলে ধরেছি, কিন্তু মিশ্রিত প্রেম ও বাৎসল্যের চিত্রটি মর্মস্পর্শী—

"তুমি এমন করিও না, এই বিদেশে আমায় রাখিয়া তুমি যাইও না, আমার নিমিত্ত না ভাব, ছেলের মুখপানে চাও, ছেলের আর কে আছে?"

কেবল মাত্র স্বামী প্রেমের স্বরূপটিও আরও সুন্দর—

"এমন সময় শূণ্যমার্গ বিদীর্ণ করিয়া পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষলতা শাখা পত্র গ্রাম্য প্রদেশ কম্পিত করিয়া, তীব্রকরুণ মর্মভেদী রোদন ধ্বনি রামেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল।

পশ্চাদ ফিরিয়া দেখিলেন যে পার্বতী প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। কাঁদিয়া বলিতেছে', একবার দাঁড়াও। তোমায় দেখি।"

পার্বতী চরিত্রের ভালবাসার কোন দিকটি বেশী শক্তিশালী—বাৎসল্য অথবা স্বামী-প্রেম? বোধ করি একটি আর একটির পরিপূরক।

আনন্দদুলালের দুটি রূপ—প্রথমটিতে সে শিশু, পার্বতীর কোলে যেন গণেশ। অপরটিতে পরিণত বয়স্ক যুবক ডাক্তার—এই অবস্থায় তার মানবিক ধর্মের দুটি প্রকাশ লক্ষণীয়— ১। আর্ত আহত মানুষের প্রতি দয়া—এবং ২। পিতৃভক্তি—

এই তিন চরিত্র ছাড়া নায়েবের চরিত্র আছে বটে তবে তা উল্লেখ যোগ্য নয়। প্রভু ভক্তির জন্যেই বিদেশী রামেশ্বরকে কয়েদী হবার প্রস্তাব দিলেও তার মধ্যে কু মতলব নেই। তাঁকে রামেশ্বর পার্বতীর উপপতি বলে সন্দেহ করলেও তিনি পার্বতীকে মা বলে সসম্মান সম্বোধন করেছেন।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"আয়তনের দিক দিয়া প্রায় ছোটগল্পের অনুরূপ। ইহাদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের স্বভাব মন্থর গতি বিশ্লেষণ শক্তি নিজ উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় নাই। রামেশ্বরের শিশু পুত্রের বাৎসল্য রসপূর্ণ চিত্রে……লেখকের পূর্বশক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মোটের উপর ইহার চমকপ্রদ ঘটনা বিন্যাসের সীমা ছাড়াইয়া উপন্যাসের উচ্চতর রাজ্যে পৌছিতে পারে না।"[২৭]

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য রামেশ্বরের অদৃষ্টকে না ছোটগল্প না উপন্যাস রূপে চিহ্নিত করে। যদিও রামেশ্বরের অদৃষ্টের আখ্যাপত্রে লেখাছিল 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (উপন্যাস। ১২৮৩ সাল ২০শে জানুয়ারী ১৮৭৭। ভ্রমর হইতে উদ্ধৃত)। উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা বঙ্কিম যুগ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। উপন্যাস অর্থাৎ কল্পিত কাহিনী (বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য আকাদমী ১ম খণ্ড।) মাত্রকেই উপন্যাস বলা হত। তাই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ইন্দিরা (১৮পৃঃ) যুগলাঙ্গুরীয় (১৫পৃঃ) মধুমতী (১৪পৃঃ) ইত্যাদিকে উপন্যাস আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই কারণেই 'আলালের ঘরের দুলাল', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কাদম্বরী', 'স্বর্ণলতা' সব কিছুকেই উপন্যাস বলা হয়েছে। ইংরেজীতে নভেল শব্দের সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলা হয়েছে—

"Novel…fictitious prose narrative of volume length portreying characters & actions representative of real life in continuous plot"[২৮]

অর্থাৎ উপন্যাস বা নভেলের অন্যান্য গুণের মধ্যে Volume length এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। রামেশ্বরের অদৃষ্টে আর যে গুণই থাক না কেন উপন্যাসের Volume length তার মধ্যে নেই। অপরপক্ষে উপন্যাসের অন্যগুণ সম্পর্কে Ralph Fox এর মত

"The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt to take whole man and give him expression," ২৯

এরও সম্পূর্ণতা রামেশ্বর পার্বতী ও আনন্দদুলালের দীর্ঘ চব্বিশ বছরের জীবনের কথায় আভাসিত হলেও তা কয়েকটি ঘটনা ও মুহূর্তের খণ্ড বিচ্ছিন্নতা মাত্র। অবশ্য একথা স্বীকার করা হয় সমগ্র জীবন বা জীবনের বৃহত্তর অংশের বর্ণনা থাকলেই যে গোটা জীবনের সামগ্রিকতা থাকবে তা নয়, আবার জীবনের খণ্ডচিত্রের মধ্যে জীবনের সামগ্রিকতা দেখা যাবে না, তাও নয়। এই সামগ্রিকতা প্রকৃতপক্ষে লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনবোধের ফল। আর দৃষ্টিকোণের পার্থক্যই আখ্যানকে উপন্যাস অথবা ছোটগল্প রূপে চিহ্নিত করে। দেখা যাচ্ছে আকৃতি প্রকৃতিতে আমরা রামেশ্বরের অদৃষ্টকে উপন্যাস বলতে পারছি না। এখন বিচার করে দেখা যাক একে আমরা ছোটগল্প আখ্যা দিতে পারি কিনা ?

অধ্যাপক কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বৃত্তান্তমূলক ছোট আকারের গল্পের মধ্যেই আধুনিক ছোটগল্পের বীজ উপ্ত হয়েছিল। তাঁর ভাষায়—

"বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এরও যে গল্প রচনার প্রতি একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, তাঁর কৃপণ এবংঅসতর্ক সৃষ্টির মধ্যেই তার নিদর্শন রয়ে গেছে।[৩০]

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের ছোটগল্প রচনার প্রবণতাকে স্বীকার করে নিলেও স্পষ্টভাবে বলেন নি তিনি ছোট গল্প রচনা করেছেন। ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,—

"ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতী (Impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোন ঘটনা বা কোন পরিবেশ বা কোন মানসিকতাকে অবলম্বন করে এক সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"[৩১]

Bliss Perry এর একটি পুরানো সংজ্ঞা এই প্রসঙ্গে মন্তব্য—

"The short story in prose literature corresponds, them, to the lyric in poetry, like the lyric, its unity of effect turns largely upon its brevity".[৩২]

এই দুই সংজ্ঞার কিছু কিছু গুণ রামেশ্বরের অদৃষ্ট গল্পের মধ্যে বর্তমান। ঘটনা পরিবেশ ও মানসিকতার একতম বক্তব্য থাকলেও এক সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। অপরপক্ষে বিক্ষিপ্তভাবে লিরিক্যাল হলেও Lyric unity of effect এর অভাব লক্ষণীয়। এই সব অপূর্ণতা রামেশ্বরের অদৃষ্টকে বৃত্তান্ত করে তুললেও এর মধ্যে ছোটগল্পের গুণাবলীর অভাবও দেখছি। রবীন্দ্রনাথের মতে খাঁটি ছোট-গল্পের উপজীব্য ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা এবং শেষ পর্যন্ত মনে হবে

'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেছেন—

"তত্ত্ব থাকবে। কিন্তু তাত্ত্বিকতা বড় হয়ে উঠবে না—ফুলের গায়ে গন্ধের মতই তা অবিচ্ছন্ন হয়ে বিরাজ করবে, কাহিনীর ধূপ নিবে যাবে, কিন্তু তার ভাবের সৌরভটি মোহ বিস্তার করতে থাকবে ধীরে ধীরে। অতএব লেখকের কলম যেখানে থেমে দাঁড়াবে সেইখান থেকেই পাঠকের মনে গল্পটি সঞ্চারিত হয়ে চলবে।"৩৩

রামেশ্বরের অদৃষ্টে তাত্ত্বিকতা আছে এবং তা বড় হয়েও ওঠেনি। আর প্রতীতির সমগ্রতা (unity of Impression) রামেশ্বরের অদৃষ্টে কি নেই? অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে থাকলেও সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকার সামান্যতম অধিকার কি ভাবে ধ্বংস হয়ে অদৃষ্টের পীড়নে মানুষের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে তারই আভাস গল্পটিতে একটি সূক্ষ্ম সৌরভময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। তবে একটি প্রশ্ন আমাদের ক্ষুব্ধ করে গল্পটিতে তো আমাদের মনে শেষ পর্যন্ত গালগল্প বা উপকথা বা বৃত্তান্ত পরিসমাপ্তিতে লেখক আমাদের পরিতৃপ্ত করে মধুরেণ সমাপয়েৎ করলেন—

"তখন তিন জনে একত্রে আহ্লাদ রোদন করিতে করিতে পূর্ব বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া পরস্পরকে শুনাইতে লাগিলেন।"

এই শেষে এসে শেষ পর্যন্ত আমাদের থামতে হল। একটি নিটোল ছোটগল্পের পরিবর্তে আমরা একটি বৃত্তান্তই পেলাম।

সঞ্জীবচন্দ্রের রামেশ্বরের অদৃষ্টের জাতি সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, রচনাটিতে লেখকের কৃতিত্ব প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় যোগসূত্রটি সুন্দর গীতি কাব্য ধর্মী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

ঃ দামিনী ঃ

দামিনী গল্পটি যখন ভ্রমরে ১২৮১ সনের (১৮৭৪) জ্যৈষ্ঠে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বয়স ৪০ বৎসর। তাঁর জীবন পরিণতি তখন প্রায় নির্ধারিত। কোন পরীক্ষায় কৃতকার্যতা আসেনি, কর্মজীবনেও তিনি পরাজিত। চাকুরী অনিয়মিত, কাঁঠালপাড়ায় বাড়ীতে প্রায়ই এসে রয়েছেন। কাজের মধ্যে

ফুলের বাগান করা, গ্রামের লোক ও সেই সময়ে বাড়ীতে সমাগত বড় মানুষদের সঙ্গে গাল গল্প মজলিসী আড্ডা জমানো আর কথকতা যাত্রা কীর্ত্তন শুনে অলস জীবন যাপন। অন্যদিকে ভাইয়েরা বড় বড় রাজপদে অধিষ্ঠিত, সর্বোপরি কনিষ্ঠ বঙ্কিম সাহিত্যজীবনে ও কর্মজীবনে সে যুগে বাঙ্গালা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ—অথচ ভায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগেরও অভাব নেই। একদিকে নিস্তরঙ্গ জীবনে আত্মীয় পরিজন পরিবৃত গৃহগত প্রাণ অন্যদিকে অসফল ভাগ্যবিড়ম্বনাময় জীবন চিন্তায় ব্যাকুল উৎকেন্দ্রিকতা বার বার সঞ্জীবকে ঘরছাড়া দিকহারা হবার জন্যে আহ্বান করেছে। তাই সঞ্জীবের এই সময়কার প্রায় সব কাহিনীতে মৌলিক সমস্যা হয়েছে একটি শান্ত কোমল জীবন ধারার মধ্যে ভাগ্যবিড়ম্বনার অপ্রতিরোধ্য অভিঘাত, যা সাধারণতই বাইরে থেকে এসে দেখা দিয়েছে। ঘটনার বিচিত্রতা সৃষ্টির জন্যে একদিকে তিনি যেমন ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার প্রায় রোমান্সের ভঙ্গীতে [যেমন টাকার অভাবে জেলে যাওয়া। (—রামেশ্বরের অদৃষ্ট), অথবা ফৌজদার পুত্র কর্তৃক অপহৃত হওয়া, পোড়ো বাড়ী, হত্যা--(দামিনী)] আকস্মিকতা আমদানী করেছেন, তেমনি অন্তর উৎকেন্দ্রিকতার তাগিদে পাগল পাগলী বা প্রায় উন্মাদ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। একদিকে সৌন্দর্য প্রীতি ও মানসিক বিষন্নতা যেমন তাঁর লেখায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা রীতির প্রকাশ হয়ে দেখা দিয়েছে, তেমনি তাঁর নিজের জীবনের বিশৃংখলা তাঁকে তাঁর লেখায় অব্যবস্থ বিপথগামী করে সর্বত্রই প্রায় ধনী অথচ গৃহিনীপনার অভাব সৃষ্টি করেছে।

বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে এই সময় ছোট উপন্যাস স্বভাবধর্মে যা ছোটগল্পের স্বগোত্র, তারই প্রচেষ্টা শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারানী', 'ইন্দিরা', পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী', সঞ্জীবের 'দামিনী', 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট প্রায় সমকালের লেখা, কিন্তু সঞ্জীবানুজদ্বয়ের লেখার মধ্যে তার স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাগ্যবিড়ম্বনার ইতিহাস, তখন তাঁর নিজের জীবনের কেন্দ্রীয় কাহিনী, তারই চিত্ররূপ রামেশ্বর, দামিনী, জাল প্রতাপচাঁদ, রাজা ইন্দ্রভূপ ইত্যাদি সকলের মাধ্যমেই অজ্ঞাত হয়েছে। আর এই সমস্যার মধ্যেই লেখকের সৃষ্টির মূল প্রেরণা রয়েছে এবং তারই মধ্যে নিহিত আছে সেই আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব যা তাঁর রচনার প্রধান গুণ এবং দোষ। দামিনীর কাহিনী বা প্লট সংক্ষেপে আলোচনা করলে আমরা রচনাটির গঠন গত দোষগুণ ও চরিত্র সৃষ্টির সফলতা ও বিফলতা ভালোভাবে বুঝতে পারবো।

দামিনী গল্পের মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছয়টি। 'ভ্রমরে'র ছোট মাপের কাগজে লেখাটির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ২৪ পৃষ্ঠা। গল্পটি স্থান ও স্পষ্ট নয়, তবে মুসলমানী আমলের ইঙ্গিত বহন করছে। স্থানের বাস্তবতাও স্পষ্ট নয়। ভাগীরথী তীরবর্তী কোন স্থান, বিশেষ কোন নামে সুপরিচিতও নয়।

১ম পরিচ্ছেদ দামিনী নামে একটী সপ্তবর্ষিয়া বালিকা তার দিদিমা বা আত্মীয় সঙ্গে গঙ্গায় প্রদীপ ভাসাচ্ছিল, তার দীপ ভেসে যেতে সে কোন আহ্লাদ প্রকাশ করলো না, গম্ভীর ভাবে প্রদীপের ভেসে যাওয়া দেখতে লাগলো। আত্মীয় তাকে

তাকে ঘরে ফিরতে হলে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো ঠাকুর যেন তার প্রদীপ রক্ষা করেন।

সন্ধ্যা হয়ে এলো, ঘরে ফিরে দামিনী ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্ন দেখলো, নদীর বুকে মেঘ নেমেছে, ভয়ে দামিনীর দীপ জলতে জলতে পালাচ্ছে, এমন সময় ভীষণ ঢেউ চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরছে, সেই ঢেউয়ের মাথায় একটা বিড়াল বসে। যাকে দেখে দামিনী ভীষণ ভয় পেত। দামিনী চোখ বন্ধ করে তার আয়ীর আঁচল চেপে ধরতেই আয়ী তাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল। দামিনী চিৎকার করে উঠলো। ঘুম ভেঙ্গে গেল। আয়ী তাকে কোলে টেনে নিলেও সে তার মায়ের জন্যে কাঁদতে লাগলো।

পরদিন রমেশ নামে বার বৎসরের এক বালক পথের পাশে দামিনীকে গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার গাম্ভীর্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলো। আয়ী ছাড়া এই রমেশই ছিল তার একমাত্র আপনার জন। তার সঙ্গেই কেবলমাত্র তার ভাব। দামিনীর মা নেই। অথচ সে কখনও কারও মুখে শোনেনি যে তার মা মারা গেছে। অতি শৈশবের মাতৃস্মৃতি তার মনে এক অস্পষ্ট আলোছায়ার মায়া লোক সৃষ্টি করে। মার কথা, স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে দামিনীর মনে হল—'মরি তো বেশ হয়'।

২য় পরিচ্ছেদ দশ বছর পরের ঘটনা। সে এখন সপ্তদশ বর্ষিয়া সুন্দরী যুবতী, রমেশের স্ত্রী। স্বামী সোহাগ সৌভাগ্যে পরিপূর্ণা। একদিন যখন রমেশ ও দামিনীর দাম্পত্য জীবন প্রেমের আবেগে চঞ্চল সেই সময় এক পাগলী এলো সেখানে। দামিনীকে আলিঙ্গন করে পাগলী 'মা মা' বলে কাঁদলো এবং দামিনীও। রমেশ বহির্বাটিতে গেল এবং সেই সময় রমেশের সৎমা দামিনীকে ডাকতেই পাগলী চলে গেল। দামিনীর মনে হল এই পাগলীই তার মা। সে পাগলীর জন্যে লুকিয়ে কাঁদলো।

৩য় পরিচ্ছেদে আর একটি জগৎ। গঙ্গাতীরে এক নির্জন পরিত্যক্ত ভগ্ন প্রাসাদ। এখানে একবার একটি স্ত্রী হত্যা হয়েছিল। সেই হতে এই পরিত্যক্ত প্রাসাদটি ভূতের বাড়ী নামে খ্যাত। সেই বাড়ীতেই বর্তমানে পাগলীর বসবাস। সেই বাড়ীর ছাদে বসে একদিন রাত্রে পাগলী নিচে একদল মশালধারী সৈনিক, পাল্কী ও বেহারা, একটি ঘোড়া ও তার সওয়ারকে দেখলো। প্রথমে ভাবলো এরা ডাকাত, দামিনীর ঘরে ডাকাতি করতে যাচ্ছে। পরে ভাবলো এরা বরযাত্রী। বিয়ে দেখার আশায় সে সেই দলের অনুগামিনী হল। প্রথমে বাহকেরা তাকে ফিরে যেতে বললো, পরে তাকে পাগলী বুঝতে পেরে রঙ্গতামাশা করতে লাগলো কথায় কথায় প্রকাশ হল অশ্বারোহী যুবক ফৌজদারের পুত্র, তারা পণ্ডিত অদিতি বিশারদের পুত্রবধু অর্থাৎ রমেশের স্ত্রী দামিনীকে হরণ করতে যাচ্ছে, কারণ রমেশ তখন কিছুদিনের জন্যে শিশু-বাড়ী গিয়েছে। পাগলী অন্যপথ দিয়ে গ্রামে গিয়ে সকলকে ডেকে জানাল অদিতি বিশারদের সর্বনাশ হয়। কিন্তু কেউই তাতে সাড়া দিল না কারণ তাতে তাদের

কোন স্বার্থ ছিল না। ফলে বৃদ্ধ অদিতির ঘর থেকে মূর্চ্ছিতা দামিনীকে তারা পাল্কীতে তুলে নিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে যখন পালাচ্ছিল, সেই সময় পিছন থেকে পাগলী ফৌজদার পুত্রের পিঠে শূল বিদ্ধ করলো। সে হত হয়ে ঘোড়া হতে পড়ে গেলো, পাগলী বিকট হাস্যে অন্ধকারে অন্তর্হিত হল। পদাতিকরা দামিনীকে মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়ে ফৌজদার পুত্রকে পাল্কীতে তুলে নিয়ে চলে গেলো। ছিন্ন লতার মত দামিনী মাঠের মধ্যে পড়ে রইল।

৪র্থ পরিচ্ছেদে একটি সার্থক গ্রাম্য চিত্র। রাত্রি প্রভাতে অদিতির ঘরে গ্রামবাসীরা আত্মীয় কুটুম্বতা দেখাতে এলেন। কেউ সমবেদনা, কেউ বা আত্মাড়ম্বর প্রকাশ করলেন। এই সময় এক কৃষক এসে খবর দিল দামিনী বাড়ী ফিরে আসছে এবং ফৌজদার পুত্রকে কে হত্যা করেছে। মহাবীর গণেশচন্দ্র (এক স্থুলোদর প্রতিবেশী) মহা আড়ম্বরে ঘোষণা করলেন তারই লোষ্ট্রাঘাতে ফৌজদার পুত্র হত। অন্য এক প্রতিবেশী যখন তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন যে কথাটি ফৌজদারের কানে উঠলে তার পক্ষে মোটেই ব্যাপারটি সুখের হবে না। তৎক্ষণাৎ গণেশচন্দ্র ভয়ে বিবর্ণ হয়ে তাঁর আড়ম্বর যে সর্বৈব মিথ্যা এবং তামাসা তাই বলতে বলতে দ্রুত পলায়ন করলেন। অদিতি উপস্থিত সকলকে ইতি কর্তব্য জিজ্ঞাসা করতে তাঁরা জানালেন যে তিনি পণ্ডিত, তাঁর বিধানই গ্রাহ্য। তিনি কর্তব্য নির্ধারণের জন্য স্ত্রীর পরামর্শ করতে ভিতরে গেলেন। তাঁর স্ত্রী পণ্ডিতের ন্যায়বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়ে জানালেন দামিনী ষড়যন্ত্র করেই গৃহত্যাগ করেছে, কারণ হিসাবে তিনি পাগলীর কথা বললেন। অদিতির প্রত্যয় জন্মাল দামিনী কুলটা ও যবন স্পৃষ্টা তাই ত্যাজ্য। তিনি ফিরে এসে প্রতিবেশীদের কথাটা জানালেন। একদিকে কুলটা অন্যদিকে ফৌজদারের ভয়ে গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নিলেন কেউই দামিনীকে আশ্রয় দেবেন না।

৫ম পরিচ্ছেদে দামিনীর ভাগ্য বিড়ম্বনার পরিণতির চিত্রটি মর্মস্পর্শী। দামিনীকে ফিরে আসাতে অদিতি তাকে যবনস্পৃষ্টা বলে গৃহে স্থান দিতে অস্বীকার করলেন। প্রথমে দামিনীর সমস্ত ঘটনাকে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হল। কিন্তু পরে বুঝলো সবই সত্য। তবু সে কোথাও গেলো না, রমেশের প্রতীক্ষায় সে বর্হিদ্বারে বসে রইলো। প্রতিবেশিনীরা তাকে সমবেদনা জানাতে এলো। তার শাশুড়ী তাদের কটু কথা বলে বিতাড়িত করলো। এক সমবয়সী প্রতিবেশিনীর সমবেদনাপূর্ণ কথায় দামিনীর রমেশের প্রতি প্রেম বিশ্বাস আবেগ প্রকাশিত হল। মৃত্যু পণ করে দামিনী রমেশের আশায় সেখানে বসে রইল। তার ক্ষীণ আশা ছিল রাত্রে শ্বশুর শাশুড়ী তাকে ঘরে ঠাঁই দেবেন, কিন্তু কেউই তার জন্যে চিন্তা করলো না। অবসন্ন দামিনী রাত্রে গাছ তলায় ঘুমিয়ে মায়ের স্বপ্ন দেখলো, যেন মা বলছেন—"উঠ মা। এঘরে কাজ কী?" পরদিন আর কেউ দামিনীকে দেখতে পেলো না।

৬ষ্ঠ বা শেষ পরিচ্ছেদে গল্পের ভয়াল পরিণতি সাধিত হয়েছে। দশ বারোদিন পরে রমেশ বাড়ী ফিরে সব শুনে কাউকে কিছু না বলে বাড়ী ছেড়ে গেলো। নানা

স্থানে ঘুরে কোথাও দামিনীর কোন খবর না পেয়ে অবসন্ন দেহে, বিষণ্ণ মনে সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরের সেই পোড়ো বাড়ীতে প্রবেশ করলো। বহু ঘর পার হয়ে অবশেষে সে এক ঘরে ঢুকে চন্দ্রালোকে দেখলো একটি মৃত প্রায় রমণীর দেহ পড়ে এবং মাথার কাছে এক প্রৌঢ়া নারী। মৃত্যুপথগার মুখে নিজের নাম শুনে রমেশ চিনতে পারলো সেই দামিনী। উন্মত্ত আবেগে রমেশ দামিনীর কাছে ছুটে গেলো। পাগলী প্রথমে তাকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বললো, কারণ তার দামিনী ঘুমিয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে সত্যই দামিনী চিরকালের মতই ঘুমিয়েছে। পাগলীকে রমেশ চিনেছিল, সেই সময় পাগলী বিকট অট্টহাস্য করে কঠিন বলে রমেশের গলা টিপে ধরে বলল,

"আমি চিনিয়াছি, তুই রমেশ, তোর জন্যই আমার দামিনী মরিয়াছে।"

দামিনী গল্পের শেষটুকু এই রকম—

"রমেশের শ্বাসরুদ্ধ হইল, চক্ষুর শিরা সকল উঠিল, রমেশ বাক্য রহিত, শক্তিরহিত, শেষে দামিনীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। পাগলী আবার রমেশের গলদেশ পূর্বমত ধরিল। এবার সকল ফুরাইল।"

"দামিনী" সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নায়িকা প্রধান উপাখ্যান নায়িকার নামানুসারে এর নাম দামিনী। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নায়ক নায়িকার নামানুসারে কাহিনীর নাম করেছেন অনেক সময়, কিন্তু দেখা যায় নায়ক নায়িকার নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাহিনীর মূল সমস্যা, প্লট প্যাটার্ন চরিত্র ইত্যাদির অনুসারী। রজনী, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, সীতারাম, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি নামগুলি কাহিনী ও চরিত্রের নিগূঢ় রসব্যঞ্জনার ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের নাম যেমন দামিনী, সুচরিতা, লাবণ্য ইত্যাদি তো রীতিমত চারিত্রিক সুগন্ধ বহন করছে। কিন্তু সঞ্জীবের দামিনী নামে প্রথমেই আমাদের আশাহত হতে হয়। দামিনীর অর্থ বিদ্যুৎ। চকিত চমকের অত্যুজ্জ্বল জ্বালাময় শিহরণ দামিনী চরিত্রে অনুপস্থিত বলা চলে। দামিনী নামের এই সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মধ্যে সবদিকেই একটা কোমলতাময় বিষণ্ণতাই ফুটে উঠেছে। সৌদামিনীর সেই ঝিলিক দামিনী চরিত্রে কোথাও ফুটে ওঠেনি, কোথাও বিদ্রোহের কোন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয় নি তার মধ্যে। সে এক নাম মাত্র—নামে তার কোন পরিচয় নেই, তবে কাহিনীর মূল এবং একমাত্র কেন্দ্রচরিত্র হিসেবে তার নামে নামকরণ সেদিক থেকে সন্দেহহীন ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

দামিনী কাহিনীর কথামুখ এই রকম—

"বহুকাল হইল একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্ত বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া অনিমেশ লোচনে স্রোতস্তাড়িত দীপমালা দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল—'আয়ী আমার দীপ ভাসিয়া গেল।"

এর পরবর্তীকালের প্রচলিত কথামুখ থেকে এই ধরণের কথামুখ স্বতন্ত্র। দেখা যাচ্ছে-

বঙ্কিম প্রবর্তিত কাহিনীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে গল্পারম্ভের প্রণালী সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যেও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

বঙ্কিমী রীতির আর একটি দিক দামিনী গল্পে লেখক গ্রহণ করেছেন, সেটি স্বপ্নদর্শন। শিশু দামিনীর স্বপ্ন কাহিনীর পক্ষে পরিণতিমুখী কতকটা মামুলী হলেও বিড়ালের আবির্ভাবে ভীতিব্যঞ্জনা প্রকাশে শিশুমনের অভিক্ষেপন লক্ষণীয়। গল্পটির ট্র্যাজিক পরিণতির পক্ষে দামিনীর প্রথম স্বপ্ন যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। গল্পের কেন্দ্রীয় সমস্যা যে দামিনীর ভাগ্য বিড়ম্বনা ও অবলম্বনহীনতা তার সঙ্কেত ঐ স্বপ্নের মধ্যেই রয়ে গেছে। অপরপক্ষে গল্পের যে বিষাদময় গাম্ভীর্য মূলতঃ দামিনী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তার সূত্র সম্ভবত তার মায়ের (পাগলী) চরিত্রের মধ্যেই রয়ে গেছে। যদিও লেখক সচেতনভাবে সে দিকে কোন অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করেন নি।

১ম পরিচ্ছেদেই আমরা সঞ্জীবকে তাঁর সেই চিরন্তন প্রক্ষিপ্ত দার্শনিক মন্তব্যে মানব জীবনের গভীরে ডুব দিতে দেখেছি। এই সব রত্নরাজীই সঞ্জীবকে ধনী করেছে ঠিক, কিন্তু এই সব অবিন্যাস তাঁর গৃহিনীপনার অভাবই সূচিত করে।

দামিনী গল্পের কেন্দ্রীয় সমস্যা দামিনীর ভাগ্য বিড়ম্বনা হলেও তার প্রধান আকর্ষণ রয়ে গিয়েছে কয়েকটি জিজ্ঞাসায়—

"দামিনীর মা কোথা? তাহার মা কি মরিয়াছে? তা হইলে লোকে বলে না কেন? পাড়ার সকলে তার মার কোলে শোয়, মার হাতে খায়, মার কথা শোনে, মার মুখ পানে চায়, মার সঙ্গে গল্প করে মার সঙ্গে কোন্দল করে, মার কাছে দৌরাত্ম করে, দামিনীর কপালে এই সকল হোল না কেন?"

এই জিজ্ঞাসা কেবল দামিনীরই নয়, এ জিজ্ঞাসা এবং ছোট ছোট বাক্য বঙ্কিমী রীতির অন্যতম বিশিষ্টতা সঞ্জীব অনায়াসেই আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু এই আবেগ প্রাধান্য গল্পের গতির পক্ষে বাধা স্বরূপ। অনেক সময় দেখা গেছে এই ধরণের বিবরণের আবর্তে পড়ে সঞ্জীব তাঁর গল্পের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। যদিও অন্যান্য লেখার তুলনায় দামিনী গল্পে এই ধরণের বিবরণ মাঝে মাঝে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সগোত্র হয়েছে। বিশেষত শেষ বাক্যটি একটু আকস্মিক মনে হলেও একটি বিষন্নচিত্ত বালিকার মাতৃহারা অস্তিত্বের গভীর থেকে উৎসারিত।

অসতর্ক লেখক সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর অন্যান্য লেখায় কালগত সম্পর্কগুলি খুব দুর্বল ভাবে গ্রথিত। কিন্তু দামিনী গল্পে সেই দুর্বলতা দেখা যায় না। ২য় পরিচ্ছেদের যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে দশ বৎসর পরে। এই দশ বৎসরের কোন কথা বা ঘটনার কোন সামান্য ইঙ্গিতও লেখক রাখেন নি। ফলে ঘটনা [সংস্থাপনে কালগত ব্যবধান বিশেষ কোন সমস্যার সৃষ্টি না করলেও চরিত্রের বিকাশে এই মধ্যবর্ত্তী দশবৎসরের অন্ধকার আমাদের একটু বিব্রত করে। আমরা কেবলমাত্র জানতে পেরেছি এই সময়ের মধ্যে রমেশ ও দামিনীর বিবাহ হয়েছে এবং সেই বিবাহিত জীবন সুখেরও বটে। ১ম পরিচ্ছেদের শেষ কথা 'মরি তো বেশ হয়' শেষ করেই ২য় পরিচ্ছেদের

দামিনীর স্বামী সৌভাগ্য সুখের ছবি এক দিকে যেমন ১ম পরিচ্ছেদের পটভূমিতে বিপরীত বর্ণে চিত্রিত হয়ে গল্পের ভাব পরিণতিকে এক নিশ্চিত গতিপথে টান দিয়েছে, তেমনি সঞ্জীবের স্বভাব গভীর দার্শনিকতার ইঙ্গিত গল্পের ট্র্যাজিক পরিণতিকে নিশ্চিত করে পাঠকের মনকে অজানা আশঙ্কায় আতঙ্কিত করে রেখেছে। গল্পের গতি নির্ধারক যে পাগলী অর্থাৎ দামিনীর মা বিদ্যুৎ চমকের মত একবার দেখা দিয়ে এই ২য় পরিচ্ছেদে মিলিয়ে গেছে আর আমাদের মনকে সঞ্জীবের দার্শনিক মনন চিন্তনগত উপল ব্যথিত পথের পরেও এক নিশ্চিত ভাবেই তাকে To aim at one climax বা ছোটগল্পের চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সবচেয়ে বেশী আমাদের যা ভালো লাগে, তা দামিনী গল্পের বিষাদ কোমল সুরটি। রমেশ যখন দামিনীকে আদর করে তখনি দামিনীর দুচোখ ভরে জল আসে। লেখক বলেছেন—

"রমেশ দামিনীকে ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন 'তুমি কি নিত্য কাঁদিবে?' দামিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, তুমি আমায় নিত্য আদর কর কেন?"

এই ভাবটি অবশ্য আমাদের সাহিত্যে বিরল নয়। বৈষ্ণব-এর "দুহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিযা" ভাবটির লৌকিক অনুভূতির পরিচয় সঞ্জীব যখন গল্পের মধ্যে স্থাপন করেন তা অদ্ভুত একটি বিষাদ কোমল কারুণ্য সৃষ্টি করে। এই সব ক্ষেত্রে লেখকের কাজ অনেকটা গীতিকবির মতই হয়েছে—আশ্চর্য সংযম এবং বাক সংক্ষিপ্ততা কত সুন্দর ছবি গড়ে তুলতে পারে তার পরিচয় সঞ্জীব এই সব জায়গায় রেখে গেছেন।

কিন্তু বাস্তবধর্মী লেখার মধ্যে রোমান্স লেখকের চমক সৃষ্টির প্রবণতা গোয়েন্দা কাহিনীর বাস্তব অবাস্তবের সীমা রেখাহীন কাহিনীতে চললেও গভীর ভাবের কোন কাহিনীর মধ্যে তার অতি প্রতুলতা প্রায়ই রসাভাস ঘটিয়ে দেয়। দামিনী গল্পের মধ্যে এই আকস্মিকতার অভাব নেই।

২য় পরিচ্ছেদে পাগলীর আগমন থেকেই এই ধরণের আকস্মিকতা শেষের দিকে খুবই ঘন ঘন হয়েছে। ফলে গল্পের যে বিষাদ প্রবণতা তা বারবার ব্যহত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় গল্পের মূল সুরের মধ্যে প্রতিঘাতগুলি আন্তরিক হলেও কাহিনীর অন্তর্ব্যঞ্জনা যে পরিমানে বাড়তে পারতো, সেই পরিমানে বাহ্যিক হয়ে তা কাহিনীকে অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব করেছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি 'দামিনী' গল্পের কথা-মুখ কাহিনীর মধ্যভূমি। তাহলে গল্পের পশ্চাদভূমি অর্থাৎ পূর্বকথার সূত্র কোথায়? সূত্র স্বভাবতই দামিনীর মায়ের পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে। "দামিনীর মা স্বামীর শোকে পাগলি হইয়া পালাইয়াছিল।" —লেখক আমাদের এই খবরটি বিনা আড়ম্বরে দিয়েছেন বটে কিন্তু আরও একটু পরিচয় থাকলে পাগলী চরিত্রের আচার আচরণের সঠিক ব[illegible]্যা পাওয়া যেত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সঞ্জীব প্রায়ই পাঠকের প্রশ্নগুলি ভুলে [illegible]েন। অন্যপক্ষে দামিনী যে মাকে তিন বছর বয়সে হারিয়েছিল, যার সম্বন্ধে [illegible]ও কাছে কিছু শোনেনি,

(জানিনা ঐ দশ বছরের অর্থাৎ ১ম থেকে ২য় পরিচ্ছেদের মধ্যবর্তী অন্ধকার কালে কিছু সে জেনে ছিল কিনা। লেখক তার কোন খবর আমাদের দেন নি।) তাকে সতের বছর বয়সে এসে কি ভাবে চিনালো, "এই আমার মা নয় তো", এই সহজবোধ্যগম্যতা ব্যাখ্যা যোগ্য নয়, কারণ মা ও মেয়ের এই Intution এর উন্নতি এবং পরিণতি কোথাও দেখান হয় নি। কেবল তাই নয় লেখকের নিজেরই সন্দেহ রয়েছে দামিনী তার মাকে চিনেছিল কিনা। তাঁরও সন্দেহ রয়েছে। তাহলে পাগলীকে কেন্দ্র করে দামিনীর এই অশ্রুবিলাপ নেহাৎই তরল ভাবোচ্ছ্বাস নয় কি ? তবে একটা দুর্বল কৈফিয়ৎ হিসাবে বলা যায় মধ্যে এই বিমর্ষ অশ্রুবিলাপের ভাব দামিনীর স্বভাবধর্মের অন্তর্গত। কিন্তু সেই কৈফিয়তে কাহিনীকারের কাহিনী গঠনের দুর্বলতা হ্রাস পায় না।

যদিও ৩য় পরিচ্ছেদটি 'দামিনী' গল্পের বাস্তব সুরের মধ্যে একটি রোমান্টিক সুর বয়ে এনেছে, তবু গল্পের পরিবেশের পক্ষে অংশটির গুরুত্ব কম নয়। নদীতীরের পোড়োবাড়ীর ভৌতিক অপবাদ থাকলেও এখানে লেখক কোন অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ করেন নি। আধুনিক ডিটেকটিভ বা অ্যাডভেঞ্চার গল্পের মত একটি ভয়াল পরিবেশ এখানে গঠন করা হয়েছে। এই পরিবেশ সৃষ্টির সঙ্গে গল্পের ট্র্যাজিক পরিণতির সম্পর্কটি ইঙ্গিতবাহী। এই পরিবেশ সৃষ্টি একদিকে যেমন গল্পের গাম্ভীর্যের পক্ষে উপযোগী অন্যদিকে 'স্ত্রী হত্যা' ব্যাপারটি গল্পের উপসংহারের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কারণ এইখানে দামিনীর মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে আর একটি স্ত্রী হত্যা এবং রমেশের মৃত্যু যেন তারই মূল্য পরিশোধ। অন্যদিকে দামিনীর জীবনের করুণ পরিণতির যাত্রা শুরু এইখানে থেকেই। অতএব সঞ্জীবের বিরুদ্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, "তাঁহার প্রতিভার বিচ্ছিন্ন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সংহত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া দীপ্ত অচঞ্চল শিখায় জ্বলিয়া উঠে নাই।"[৩৪] তা 'দামিনীর' গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় নয়। গল্পের পরিবেশের সঙ্গে Suspense বা রহস্যাকর্ষণ এই পরিচ্ছেদে প্রায় প্রতিটি অংশে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। গল্পের এই আকর্ষণ সৃষ্টি নিঃসন্দেহে গল্পকারের প্রধান ক্ষমতার অন্যতম পরিচয়। কিন্তু এই আকর্ষণের টান বেশীক্ষণ ধরে রাখবার ধৈর্য সঞ্জীবের ছিল না। নাট্যদ্যোতনা সৃষ্টি করে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিয়েছেন নিজেই। যেখানে লেখক হিসেবে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক হওয়া উচিত ছিল সেখানে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দার্শনিকতার নিয়ে গল্পের ধারায় নিজেই নেমে পড়েছেন। কারণ এই-খানে গল্পের নাট্যদ্যোতনা যখন সবচেয়ে বেশী জমে উঠেছে, সেইখানেই লেখকের হিন্দুত্বের অভিমান হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠেছে। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তাঁর লেখাকে কোথাও কোথাও অমূল্য সুভাষিতাবলীর সুগন্ধে পরিপূর্ণ করে তুললেও তা গম্ভীর কোন আদর্শবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। তিনি বহুতর Notable Quotation ব্যবহার করলেও তা কাহিনীর প্লট ও প্যাটার্নের পক্ষে কতখানি উপযোগী তা তিনি গম্ভীরভাবে ভাবেন নি কখনও।

কিন্তু প্রাগুক্ত ত্রুটি সঞ্জীবের মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে থাকলেও একটি গুণ তাঁর লেখাকে আধুনিক কালের মনন প্রধান গল্প উপন্যাসের সমতুল করেছে। বাস্তব ভয়াল পরিবেশ অঙ্কন করতে গিয়ে অবাস্তব কোন ঘটনার অতিলৌকিকতা সৃষ্টি না করে লেখক সর্বত্র কবি সুলভ উপমা সৃষ্টি করে প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যে একটি সরস পেলবতা আনতে ভুল করেন নি। সঞ্জীবের বর্ণনার মধ্যে এই **Mental Prattle** বা 'অস্ফুট বচঃ প্রবৃত্তি' তাঁর সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যে একটি আশ্চর্য সরসতা দান করেছে। মাঠের মাঝে পরিত্যক্ত দামিনীকে ছিন্নপত্রের সঙ্গে তুলনা এবং বাতাসে তার শাড়ীর 'উলটি পালটি' হওয়া যে এর পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তার জীবনের উলটি পালটি হওয়া তা পরিপূর্ণ ভাবে ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। অথচ অসতর্ক লেখক সচেতনভাবে এখানে উপমাটি গল্পের দিক থেকে ইঙ্গিতময় করে তোলেন নি তা স্বীকার করতে বাধা নেই।

৪র্থ পরিচ্ছেদের পরিবেশ আগের ও পরের পরিবেশগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সঞ্জীবের স্বভাব সুলভ সরসতা ও রঙ্গরসিকতা এই পর্বে কিছুটা প্রগলভ হয়ে উঠলেও তার চিত্রধর্ম ও বাস্তবতা কোন অংশে অনস্বীকার্য নয়। এই পরিচ্ছেদ পড়লে মনে হয় আমরা শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের কোন প্রেক্ষাপটের প্রাচীন পাদপ্রদীপের নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। পল্লীসমাজের চিত্রকলায় শরৎচন্দ্রের ক্যানভাসটি যেমন একটু বড় আকারের ও তার রংয়ের ব্যবহারটি যেমন গাঢ় তেল রংয়ের, সঞ্জীবের এই অংশটি যেন সাদাকালোয় কালিকলমের নিখুঁত একখানি এচিং বা স্কেচ। এই ধরণের কাজে একদিকে যেমন সূক্ষ্মতার অভাব নেই, তেমনি অন্যদিক দক্ষ হাতে ছোট একখানি কার্ডের উপর যেন অসাধারণ আনুপুংখ রূপ ফুটিয়ে তুলে ছবিটিকে বাস্তব চিত্রের এ্যালবামে চিরকালের জন্যে ধরে রাখা হয়েছে। তবে স্বল্পায়তন কাহিনীর তুলনায় এই ধরণের ছবির বিস্তার কিছুটা পরিণতিহীন। অথচ গ্রাম্য লোকচরিত্র সম্পর্কে যে সঞ্জীবের জ্ঞানের অভাব ছিল না তাও বেশ স্পষ্ট। বীরত্বের আড়ম্বর এবং কাপুরুষতার প্রতি সঞ্জীবের সহাস্য সহানুভূতিও এখানে লক্ষণীয়। মহাপণ্ডিতের স্ত্রৈণতা নিয়ে সবযুগেই অনেক হাস্য বিদ্রূপ হয়েছে, কিন্তু তার বিষময় ফলোৎপত্তি এখানে সুনিপুন দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদের স্বল্প পরিসরে গল্পের প্লট এবং টাইপ চরিত্রগুলি দানা বেঁধেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে দামিনীর জীবন কি ভাবে এক অনিবার্য ভাগ্য বিড়ম্বনা ও নিষ্করুণ পরিণতির দিক ছুটে চলেছে তারই চিত্র। এই করুণরসের চিত্রটির প্রেক্ষাপটে উদাসীন প্রকৃতির রূপটি আমাদের রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ বেদনার এই সুরটি শেষ পর্যন্ত সঞ্জীব রক্ষা করতে পারেন না। দামিনীর জীবনের বিড়ম্বনা পঞ্চম পরিচ্ছেদে যখন পাঠকের চোখকে অশ্রুসজল করে তোলে তারই পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর বীভৎসতা পাঠককে পীড়িত করতে থাকে। আভ্যন্তর ট্র্যাজিডি যেখানে অভিপ্রেত সেখানে মৃত্যুর ভয়াল পরিবেশ কোথায় একটা ছন্দপতন

ঘটায়—পাঠকের পরবর্তী চিন্তনের রেশ মৃদু কম্পনে বাজতে থাকার কোন সুযোগ পায় না। এই পরিচ্ছেদেই আর একটি দোষও পীডার কারণ—সেটি তাঁর প্রসঙ্গান্তরে হঠাৎ পাশ কাটিয়ে যাওয়া। এই দোষত্রুটিই বোধ করি সঞ্জীবচন্দ্রের প্রধান দোষ। এখানেও যখন দামিনীর দুঃখ প্রকৃতির উদাসীন পরিবেশে চমৎকার জমে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার কোন সুযোগ না দিয়ে লেখক সাক্ষাৎ রসভঙ্গের মত পাডা প্রতিবেশিনীদের হঠাৎ সেখানে অর্থাৎ দামিনীর ঘনীভূত দুঃখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। লেখক হিসেবে এই মাত্রাবোধের অভাব অন্যান্য কাহিনীতে আরও বেশী হলেও দামিনীও সেই দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে সঞ্জীব প্রতিবেশিনীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে দামিনীর দাম্পত্য প্রেমের একটি সুমধুর ছবি এঁকেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে সঞ্জীবচন্দ্রই সে যুগের প্রথম লেখক যাঁর লেখায় বাৎসল্য রসের প্রাধান্য ছিল। ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,

> "সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে গল্পে ও অন্যান্য লেখায় মুখ্য রস হইতেছে বাৎসল্য"৩৫

অবশ্য এই কথা দামিনী গল্পে বস্তুতঃ গ্রাহ্য নয়। ডঃ সেন আরও বলেছেন,

> "দমিনীতে বাৎসল্যের যে ভীষণ বীভৎস পরিণতি দেখানো হইযাছে তাহা বাংলা সাহিত্যে পূর্বাপররহিত।"৩৬

এই মন্তব্য দামিনী গল্পের পরিণতির কারণ হিসাবে গ্রহণ করা গেলেও এর মুখ্য রস যে কারুণ্যমিশ্রিত মধুর সে পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারেন। কারণ দামিনী ও রমেশের মৃত্যুর কারণ একদিকে তাদের অপ্রতিরোধ্য ভাগ্য বিডম্বনা, মূলতঃ যা বাইরে থেকে আরোপিত হয়েছে এবং আন্তরিক কারণ যদি কিছু মানতেই হয়, তবে বলতেই হবে, উভয়ের প্রতি উভয়ের গভীর ভালোবাসা ও তার কেন্দ্রাতিগ গতি।

আর একটি প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে আসে। পঞ্চম পরিচ্ছেদেই গল্প শেষ হওয়া উচিত ছিল—বিশেষতঃ আধুনিক কোন ছোট গল্পকারের হাতে পডলে সম্ভবত তিনি এই পরিচ্ছেদের পর আর অগ্রসর হতেন না। এই পরিচ্ছেদের শেষকথা 'পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কেহ আর দামিনীকে দেখিতে পাইল না'—এইখানে গল্প শেষ হলে গল্পের **Solemnity** বা শান্ত গাম্ভীর্য বজায় যেমন থাকতো, তেমনি শেষ হয়ে শেষ নাহি হল ছোটগল্পের এই ভাবটিও বজায় থাকতো। প্রশ্ন উঠতে পারে শেষ পরিচ্ছেদে গল্পের **Climax** বা চরমক্ষণটি রচিত হয়েছে—কিন্তু চরমক্ষণটি কিভাবে বৃত্তান্তমূলক মাত্র হয়েছে এবং কিভাবে তা অসার্থক হয়েছে পরের পরিচ্ছেদটি আলোচনা করলেই সে কথা বোঝা যাবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এসে গল্প একটি পরিণতি লাভ করেছে। পোড়ো বাড়ীর সঙ্গে রমেশের অবস্থার তুলনা যথেষ্ট শিল্পসম্মত হয়েছে। এখানে উপস্থিত হওয়া রমেশের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপারও নয়। শেষ মিলন দৃশ্যটিও মর্মস্পর্শী। মৃত্যুপথ যাত্রিনী দামিনীর প্রলাপটিও অত্যন্ত সুচারু—

"আয়ী। এলে? বসো, আর বিলম্ব করিব না, কেবল একবার রমেশকে দেখে আসি। 'রমেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'দামিনী, দামিনী, আমি এসেছি, আর কখন তোমা ছাড়া হব না।"

গল্প এখানে মিলননান্ত হতে পারতো। অথবা দামিনীর মৃত্যুতে রমেশের ট্র্যাজেডী আরও ঘনীভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথের মালাদান গল্পের মত আমাদের মনে গভীর রেখা কাটতেও পারতো। যদিও আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি সঞ্জীবচন্দ্রের লেখায় অসঙ্গতির অভাব নেই, কিন্তু ট্র্যাজেডী সৃষ্টির মূলে লেখকের যে সার্থক অসঙ্গতি বোধ কাজ করে, সঞ্জীবের তা ছিল না। ফলে দামিনী ও রমেশের মৃত্যু দুটি কাহিনীকে নিঃসন্দেহে Targic Horror বা ভয়াল বিয়োগান্তে পরিণত করেছে। অথচ ভেবে আশ্চর্য হতে হয়, চরিত্রের বিকাশ, এবং প্লটের নাটকীয় ধর্ম সমগ্র কাহিনীকে নিশ্চিত একটি রস পরিণতি দান করতে পারতো। কিন্তু সমগ্রভাবে এই গল্প প্যাটার্ন বা রিদম অর্থাৎ জীবন বিন্যাসে কোন সুসম বিন্যাস লাভ করেনি। অপর পক্ষেHorror Tragedy সম্পর্কে অধ্যাপক নিকলের মন্তব্য—

"………stress on the outward elements with whatsoever there may be inner tragedy closely interwoven with and descending upon the stage sensationalism".[৩৭]

দামিনী ট্র্যাজেডী না হবার এইটিই প্রধান কারণ। অথচ এখানেও inner tragedy interwoven এর কোন অভাবও ছিল না। প্ল্যান, প্যাটার্ন, ইঙ্গিতমূলকতা এমন কি একমুখিতাও দামিনীর মধ্যে অপ্রতুল নয়, কিন্তু মৃত্যুকীর্ণ ব্যহত রস পরিণতি শেষ পর্যন্ত পাঠককে ভীত বিহ্বল করে ফেলেছে।

দামিনী কাহিনীর কেন্দ্রমনি দামিনী। কাহিনীর শুরুতেই সঞ্জীবচন্দ্র দামিনীর যে পরিচয় দিয়েছেন তা লক্ষ্য করার মত।—

"দামিনী শৈশবে এত গম্ভীর কেন? যে সুখী, সেই চঞ্চল, যে দুঃখী সেই শান্ত, সেই ধীর, সেই গম্ভীর। এক দারুণ দুঃখে দামিনী এই শৈশবে কাতরা। দামিনীর মা কোথা?"

দামিনী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখক বজায় রেখেছেন। ক্রন্দনশীলতা দামিনী চরিত্রের মৌলিক উপাদান। তাই পরম পাওয়াও তার কাছে হারানোর বেদনায় কম্পিত হয়। স্বামীর স্নেহস্পর্শের উত্তাপে সে কান্নায় গলে যায়। আয়ীর স্নেহ সে পেয়েছে, তবু সে স্নেহবুভুক্ষু।—

"আয়ী আছে—আয়ী বেশ, মার মত ভালোবাসে, তবু মা।"

কিন্তু লেখক দামিনীর চরিত্রের চিত্রণের ক্ষেত্রে এই মনোভঙ্গী কাহিনীর প্রথমাংশে উপস্থিত করে একটি সমস্যারও সৃষ্টি করেছেন। দামিনীর হৃদয়ের একমুখিতা কাহিনীর পরবর্তী অংশে দ্বিধাবিভক্ত। স্বামী প্রেম ও মায়ের প্রতি আকর্ষণ তাকে তার দ্বৈত মনোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে বলেই তার জীবনে ভালোবাসা নিয়ে আত্মদ্বন্দ্ব

কোন সমস্যার উদ্ভব হয় নি। ফলে লেখককে প্রায় বাধ্য হয়েই বাইরের ঘটনার অভিঘাত সৃষ্টি করতে হয়েছে। ভাগ্য বিড়ম্বনা প্রায় নিয়তির মত তার জীবনে নেমে এসেছে। এর সঙ্গে তার জীবন ধারায় তার চিন্তা ভাবনা ও সামাজিক প্রভাব কিছুমাত্র যুক্ত হয়নি। সামজিক অত্যাচারও তার জীবনে বাইরে থেকে হঠাৎ হাজির হওয়া কোন আগন্তুক যেন।

দামিনী চরিত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ তার সকরুণ কোমল পেলবতা। সঞ্জীব সযত্নে সেই দিকটি রক্ষা করেছেন প্রায় সমগ্র গল্পটির মধ্যে। তার মৃত্যু চিন্তা "মরি তো বেশ হয়" কোন গভীর মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার ফল নয়, বরং তা একধরণের Sentimentalism; দামিনী চরিত্রের এই তরলভাবালুতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তার সঙ্গে তার মায়ের প্রথম পরিচয় হয়। সে তার মাকে স্পষ্ট চিনেছিল কিনা তার কোন পরিচয় নেই। বরং তার সন্দেহ ছিল। অথচ তার মাকে চেনা ও না চেনার সংশয়ের কোন ব্যাখ্যা যোগ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যার সম্বন্ধে তার সংশয় রয়েছে তার জন্যে অশ্রুবিলাস করা নেহাৎই ভাবতরল্য।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন,

> "অভ্যস্ত জীবনচক্রের বাইরে না এসে দাঁড়ালে চরিত্রের গুপ্ত ঐশ্বর্য ধরা পড়ে না।"[৩৮]

এই মন্তব্য দামিনী চরিত্র সম্পর্কে প্রায় প্রযোজ্য নয়। যদিও দামিনী অভ্যস্ত জীবনচক্রের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তবু তার চরিত্রের গুপ্ত ঐশ্বর্য বিশেষ কিছুই প্রকাশ পায় নি। প্রতিবেশিনীর কাছে স্বামীর প্রেম সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণ ছাড়া তার চরিত্রে অন্য দিকই কাহিনীকার আগে তার অভ্যস্ত জীবনচক্রের মধ্যেই বলে গেছেন। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় সমস্ত কাহিনী দামিনীকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় চরিত্রে যে ধরণের অন্যান্য প্রভাব চরিত্রকে বহুমুখী করে তোলে, সেই ধরণের কোন প্রভাব দামিনী চরিত্রে পড়েনি। সে আপনার মাঝে আপনি বিকশিত। যেহেতু আন্তরিক সমস্যার সংঘাত দামিনী চরিত্রে সমস্যার বিচিত্রতা সৃষ্টি করে নি, তাই দ্বন্দ্বহীন চরিত্র হিসাবে দামিনী বৃত্তান্তমূলক কাহিনীতে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ টাইপ চরিত্র হিসেবেই গড়ে উঠেছে।

চন্দ্রনাথ বসু দামিনীতে সঞ্জীবের চরিত্রের সৃষ্টির প্রবণতা সম্পর্কে অতি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

> "সঞ্জীববাবু পাগল পাগলী গড়িতে বড় ভালোবাসিতেন।"[৩৯]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি পাগল পাগলী প্রভৃতি উৎকেন্দ্রিক চরিত্র গঠনের পিছনে রয়ে গেছে তাঁর ব্যক্তি জীবনের উৎকেন্দ্রিকতা। দামিনীর পাগলী চরিত্র সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটি লক্ষ্য করা যাক।—

> "দামিনীতেও এক পাগলী দেখিতে পাই, সে বড় বিষম পাগলী, পতি শোকে সে আপনি পাগলিনী। তাই যে পতিপ্রাণা পতির জন্য মরে, তা তাহার

পতিকে সে গলা টিপিয়া মারিয়া তাহারই সঙ্গে পরলোকে পাঠাইয়া দেয়।"[৫০]
এই সমালোচনার সমালোচনা করেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

"দামিনীর মায়ের পাগলামীর মধ্যে চন্দ্রনাথবাবু এক প্রকারের Poetic Justice বা কাব্যোপযোগী ন্যায় বিচার আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অনেকটা কষ্ট কল্পনা বলিয়া মনে হয়। এই পাগলামী কেবল রমেশের হত্যাকার্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহা তাঁহার পূর্বতন ব্যবহার বা কথাবার্তার সহিত সামঞ্জস্য রহিত।"[৫১]

দামিনীর মা বা পাগলী সম্পর্কে উপরোক্ত উভয় সমালোচকের মন্তব্যই বিচার্য। কারণ পাগলী যে দামিনীর মা সে সম্পর্কে লেখক স্পষ্ট করে পাঠককে কোন খবর দেন নি। তিন বছর বয়সে যে মেয়েকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে, সে যে মেয়েকে চিনতে পেরেছে তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। অন্যান্য সূত্র থেকে খবর নিয়ে যদি পাগলী জেনেই থাকে যে দামিনী তারই কন্যা, তবে তাকে পাগল বলা চলে না। পাগলীকে দেখে দামিনীর মা বলে যে সন্দেহ তাও ব্যাখ্যাযোগ্য যে নয় তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

বস্তু রসের কাহিনীর একটি চরিত্র বুঝতে হলে তার উন্নতি ও পরিণতি বাস্তব হওয়াই সঙ্গত। গোয়ান্দাকাহিনী সুলভ আকস্মিকতা ও তরল ভাবালুতা পাগলী চরিত্রেকে অবাস্তব ও পরিণতিহীন করেছে।

কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় দ্রুততা সৃষ্টি করলেও পাগলী চরিত্রের মধ্যেও নাটকীয় দ্বন্দ্ব কিছু নেই। তবে পাগল চরিত্রের অসংগতি যদি একমাত্র উপাদান বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে পাগলী চরিত্রের মধ্যে তার প্রকাশ আছে—অবশ্য তাকে প্রধানত পাগলী চরিত্রের উপাদান না বলে লেখকের চরিত্র সৃষ্টির সাধারণ অসংগতি-বোধ হয়েই দেখা দিয়েছে। তবু পাগলী চরিত্র টাইপ বা ফ্ল্যাট হিসেবে স্বীকার্য।

রমেশ চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব 'দামিনী' কাহিনীর পক্ষে কম নয়। কিন্তু রমেশ চরিত্রের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ কিছুমাত্রই নেই। দামিনীকে সে ভালো-বাসে এবং তা আন্তরিক। তার পরিণতি দুঃখকর ও ভয়াবহ কিন্তু বালক রমেশ সম্পর্কে সঞ্জীব যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অর্থাৎ সে একটি ডানপিটে অথচ ভদ্র ছেলে, তার কোন ক্রমপরিণতি আমরা দেখতে পাই না। নায়ক হবার যোগ্য কোন গুণই তার মধ্যে দেখা যায় না। শান্ত নির্বিরোধ ভদ্র শিষ্ট যুবক, বৃত্তি তার পূজা অর্চনা। স্ত্রীকে ভালোবাসার প্রাবল্যেই সে পিতা ও সমাজ পরিত্যক্তা স্ত্রীকে খুঁজতে বেরিয়ে শেষপর্যন্ত নির্বিবাদে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। যদিও ধরে নেওয়া যায় সে ক্লান্ত অবসন্ন বিহ্বল এবং শোকে আত্মজীবন সম্পর্কে বিগতস্পৃহ, তবু পাগলী যখন তার গলা টিপে হত্যা করতে উদ্যত তখন সেই দুরন্ত বালক এবং 'সিংহ' তুল্য (তার পিতার মন্তব্য) যুবক কোন বাধা দিল না কেন তার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ তার মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, হত্যাই।

তার এই প্রাণধর্মের বিরুদ্ধ-আচরণের আমরা কোন সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারিনা। প্রকৃতপক্ষে রমেশ চরিত্রের ঘটনাগত গুরুত্ব কম না হলেও, তার চারিত্রিক বিকাশ অসম্পূর্ণ। অথচ তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যহীনতা তাকে আদৌ কোন সম্পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিচরিত্র বা বৃত্তাকার চরিত্র করে তোলেনি। বরং এক রংয়ে আঁকা একটি সমতল বা নির্বিশেষ চরিত্র হিসেবেই গড়ে তুলেছে।

'দামিনীর' অন্যান্য চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা কাহিনী ঘটনা প্রবাহে পরিবাহিত হয়ে কমবেশি পরিণতিতে সাহায্য করেছে। তাদের মধ্যে রমেশের পিতা বৃদ্ধ অশক্ত ও স্নেহপ্রবণ। মহাপণ্ডিত হয়েও ব্যক্তিত্বহীন স্ত্রৈণ ও পরবুদ্ধি নির্ভর। রমেশের বিমাতা ক্ষরজিহ্বা কলহপ্রিয়া নিষ্ঠুর প্রকৃতির স্বার্থপর চরিত্র। তার জন্যেই দামিনীর দুর্ভাগ্য চরমে পৌঁছেছে।

দামিনীর আয়ী স্নেহশীলা বৃদ্ধা। সঞ্জীবচন্দ্র সার্থক টাইপ চরিত্র রূপে স্বল্প পরিসরে প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীদের চরিত্রগুলি এঁকেছেন। তার মধ্যে গণেশচন্দ্র সার্থক হাস্যরসাত্মক চরিত্র সৃষ্টি।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ইংরেজী রোমান্স কল্পনা প্রবণ রীতির প্রভাবে ভাষা রীতিতে যে আড়ম্বরপ্রিয়তা দেখা দিয়েছিল তার কিছু প্রভাব যে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখার মধ্যে ছিল না তা নয়, কিন্তু সেই প্রভাব অপেক্ষা তাঁর নিজস্ব রীতির বৈশিষ্ট্য প্রায় সব লেখাতেই প্রকট। বাস্তববাদী লেখকের সহজ বর্ণনাভঙ্গী তাঁকে মাঝে মাঝে আধুনিক কালের লেখকদের সঙ্গে প্রায় একাসনে স্থান করে দেয়। ফলে বাস্তবচিত্র বর্ণনায় তিনি তাঁর যুগের অধিকাংশ লেখকের চেয়ে বেশী কৃতিত্বের দাবী রাখেন। আবার অন্যপক্ষে রোমান্টিক কাব্যধর্মী শব্দাড়ম্বর সৃষ্টিতে তিনি প্রায়ই সফলকাম নন। ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি তাঁর দামিনীর ভাষারীতির পক্ষে অত্যন্ত সুপ্রযোজ্য,"

"বাঙ্গালা সাহিত্যে নিষ্ঠুর বাস্তবের প্রথম চিত্রকর বলিয়াও ইহার (সঞ্জীবের) খ্যাতি অটুট রহিবে। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনারীতি দোষহীন নয়, কিন্তু ইহার নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি ও রসবোধ সকল দোষত্রুটীকে ছাপাইয়া গিয়াছে।"[৪২]

ছোট ছোট বাক্যভঙ্গি কি রকম সার্থক ভাববাহী হয়েছে তা লক্ষ্য করা যাক।—

"সেই আকুল নদীতে দামিনীর দীপ ভাসিয়া চলিল। দামিনীর দীপ দামিনী আপনি ভাসাইয়াছিল, এক্ষণে আর উপায় নাই, অতএব কাতর অন্তরে দামিনী বলিতে লাগিল, হে ঠাকুর। আমার দীপকে রক্ষা কর।"

এই উদ্ধৃতি থেকে সঞ্জীবের ভাষারীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। আপাত সহজ বর্ণনার অন্তরে তিনি সর্বদাই যেন এক কাব্যধর্মী গভীরতায় ডুবতে চেয়েছেন। অবশ্য এই ধরণের আত্মমগ্নতা ও দার্শনিকতায় ভাষারীতি কখনো কখনো গল্পের গতির পক্ষে বাধা স্বরূপও হয়েছে। এমন কি ভাষাভঙ্গী মাঝে মাঝে কি ভাবে চরিত্র সৃষ্টির বাধা স্বরূপ হয় তার উদাহরণ পাগলীর কথায়—

"দেখ তোমার মার নামেই তুমি কাঁদিতেছ, আমি আজি আমার মা পাইয়াছি—
আমি কাঁদিব না?"

পাগলী চরিত্রের অসংলগ্নতা এখানে কিছুমাত্রই প্রকাশ পায়নি বলা চলে।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর ভাষা সৃষ্টিতে কাব্যময় চিত্রাবলীর ব্যবহার উপমায় ইঙ্গিতবহ করে তুলেছেন তার মধ্যে লেখকের কবিমানসের এক সুচারুপ্রকাশ ঘটেছে—

"নব পল্লবিত পুষ্পিত লতা বৃক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া পথে ফেলিয়া গেলে যেমন বাতাসে
তাহা উলটি পালটি করিতে থাকে প্রান্তরে পড়িয়া দামিনীর সেইরূপ দশা ঘটিল।"

বাস্তবতার মধ্যে সঞ্জীব এই জাতীয় সরস পেলবতা রক্ষা করেছেন বলেই ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,

"বাঙ্গালা গদ্য রীতিতে ইনি রবীন্দ্রনাথের এক অগ্রদূত বলিয়া ইহার দাবি
থাকিবে।"[৪৩]

দামিনীতে সঞ্জীবচন্দ্র কোথাও কোথাও গদ্যকবিতার মুক্তছন্দের ভাবময়ী চেতনা-প্রবাহধর্মী ভাষা ব্যবহার করেছেন। সাজিয়ে লিখলে এই রকম দাঁড়ায়—

আয়ী আছে—
আয়ী বেশ—
মার মত ভালবাসে—
তবু মা।—
মার আদর কেমন।
তিন বৎসর বয়সে দামিনী মা হারাইয়াছিল।
দামিনীর মাকে একটু একটু মনে পড়িত
একটু একটু।
কেবল ছায়াটি—
কেবল একখানি শরীর
আর একখানি মুখ—
তাতে আহ্লাদ আর হাসি—

এই ধরনের ভাষার উদাহরণ গদ্যছন্দের কিছু দোষ ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে, তবু রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা', 'শেষ সপ্তক' পুনশ্চের ভাষার সঙ্গে তুলনীয়—

নাম তার কমলা।
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়।
আমি ছিলাম তার পিছনের বেঞ্চিতে।

(ক্যামেলিয়া : পুনশ্চ—৯০পৃ.)

ঐ সব কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তারই অগ্রদূত এই ভাষা তা আমরা সহজেই স্বীকার করতে পারি।

প্রকৃতির বর্ণনায় গল্পের ধারাকে কোথাও ব্যহত না করে বিভূতিভূষণের মত সঞ্জীব প্রকৃতিকে কোথাও অন্যতম চরিত্রের মত ব্যবহার করেছেন। এই সর্ববিষয়ে অঙ্গীভূত হবার মত রসবোধ সেইযুগের পক্ষে একটি দুর্লভ ক্ষমতা।

দামিনী গল্পের ভাষারীতির আলোচনায় সঞ্জীবের যে বৈশিষ্ট্যর পরিচয় না দিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। লেখকের সেই ব্যঙ্গ প্রিয়তার অভাব এই স্বভাব-গম্ভীর রচনাতেও নেই। যথা :—

"গণেশ অমনি জড়বৎ হইলেন। কম্পান্বিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি উপহাস করিতেছিলাম। আমি, আমি তা বলি নাই, আমি কি বলিতেছি কিছুই নহে। আমার দ্বারা হাকিমের অনিষ্ট হইবে কখন সম্ভব নহে। আমি বরং বলিতেছি যে এত ডাকাডাকি করেছে তথাপি আমি কথা কই নাই। রমেশ বড না হাকিম বড় ? এই বলিতে বলিতে তিনি পলাইলেন।"

লক্ষ্য করার বিষয় বিরাট বাগাডম্বরের পর এই বীরের পলায়ন দৃশ্যটি সত্যই উপভোগ্য। তবে এই উদ্ধৃতিতে সঞ্জীবের ভাষায় গুরু চণ্ডালী দোষও লক্ষণীয়। যদিও তখনও পর্যন্ত সাধু ও চলিত ভাষার ভেদচিহ্ন সম্পর্কে কোন লেখকই সচেতন হয়ে ওঠেন নি।

দামিনী গল্পটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন একে জাতি হিসাবে উপন্যাস বলা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে এই যুগে কাহিনী মাত্রকেই প্রায়ই উপন্যাস নাম দেওয়া হত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা', 'রাধারানী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'পূর্ণচন্দ্রের' মধুমতী প্রভৃতির জাতি সংজ্ঞা উপন্যাসই ছিল। যদিও এই গুলি উপকথা বৃত্তান্ত বা ছোটগল্প শ্রেণীভুক্ত বলেই শ্রদ্ধেয় সমালোচকগণ যুক্তিযুক্তভাবেই চিহ্নিত করে গিয়েছেন। আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমরা দামিনীকেও উপন্যাস বলতে পারি না। উপন্যাসের অবাধ বিস্তৃতি, চরিত্রের জটিলতা প্রভৃতি উপন্যাসের বিশেষ গুণগুলি এর মধ্যে দেখা যায় না। এখন দেখা যাক দামিনীকে ছোটগল্প বলা যায় কিনা ?

রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন গল্প পাঠের পর 'শেষ হয়ে হইল না শেষ' এই ধরণের একটি অতৃপ্তি পাঠক মনে থেকে যাবে। "দামিনী গল্পের পাঠের পর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ার অতৃপ্তি থেকে গেলেও মূল কাহিনী কোথাও এতটুকু অতৃপ্তি আমাদের মনে শেষ হয়ে শেষ না হবার মত কোন বিশেষ অতৃপ্তি রাখে না। কাহিনীর মূল সমস্যা যে ভাগ্য বিড়ম্বনা তার বিয়োগান্ত পরিণতি কাহিনীর দুই প্রধান চরিত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেখান হয়েছে। দামিনী রমেশের প্রতি লেখক আমাদের যে সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিলেন পাগলীর প্রতি সেই সহানুভূতির বিকাশ দেখান হয়নি। ফলে দামিনী রমেশের ভয়াল মৃত্যুর পর আমাদের মনে ভীতবিহ্বল ভাবের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু পাগলী সম্পর্কে আমাদের মনে কোন প্রশ্ন আর জাগে না। অতএব গল্পের ছেদ টানা হয়েছে একটি নিশ্চিত পরিণতিতে। কিন্তু গল্পের আঙ্গিক বিচার করলে দেখা যাবে ছোটগল্পের বহুগুণ

'দামিনীতে' রয়ে গেছে। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ এবং প্লটের নাটকীয় ধর্ম, প্ল্যান প্যাটার্ন, ইঙ্গিত-মূলকতা এমন কি একমুখিতা প্রভৃতি ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য দামিনী গল্পে অপ্রতুল নয়। অথচ গল্পের ব্যাহত ট্রাজিক রস অন্যদিকে একটি নিটোল প্রতীতীর সমগ্রতার অভাব 'দামিনীকে সার্থক ছোটগল্প হতে দেয়নি। তাহলে' দামিনী কথা সাহিত্যের কোন শ্রেণীভুক্ত ?

ছোটগল্পের অন্যান্য গুণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচার বাদ দিয়েও ছোটগল্পের পরিণতি সম্পর্কে সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতটি অনুসরণ করা যাক।

> "তাই বলে ছোটগল্পে কি ঘটনা (Incident) থাকবে না ? নিশ্চয়ই থাকতে পারে। কিন্তু ঘটনার ভার, তার প্ল্যান প্যাটার্ন যাতে ছোটগল্পের ইঙ্গিতমূলকতা নষ্ট না করে, যাতে তার মধ্যে বৃহত্তম ব্যঞ্জনাধর্মিতার সৌন্দর্য আহত না হয়—তা যাতে কাহিনীঋদ্ধ পরাকাষ্ঠাই না পায়, সেই দিকেই লেখককে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। আর মনে রাখতে হবে ছোটগল্পে ঘটনা থাকবে কিন্তু সে ঘটনা বৃত্তান্ত সিদ্ধ হলে তাকে আর ছোট গল্প বলা চলবে না।"[৪৪]

দামিনী গল্প পড়ার পর আমরা এর মধ্যে ছোটগল্পের অন্যান্য অনেক গুণ লাভ করলেও এর বৃত্তান্ত সিদ্ধ ঘটনা অর্থাৎ উপকথা স্বয়ংসিদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হব। অথচ মানব চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিত—বিশেষত কাহিনীর দ্বারা যা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ নয়—দামিনী গল্পে ছোটগল্পের সেই আন্তরিক গুণ বিশেষভাবে দেখা যায় না।

: কণ্ঠমালা :

কণ্ঠমালা উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'ভ্রমর' পত্রিকার ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা আষাঢ় (১২৮১) থেকে ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ (১২৮২) পর্যন্ত। মোট ১২টি সংখ্যায় মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা ছিল ১৭০, কাহিনীর ৩৭শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৭৫ এপ্রিল-১৮৭৬ জুন)। কণ্ঠমালা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো ১৮৭৭ সালে। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে। উপন্যাসটি প্রথম যখন ভ্রমরে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে যে কাহিনী ও ভাষা দেখি, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময় লেখক তার অনেক পরিবর্তন ঘটান। আবার দ্বিতীয় সংস্করণের কালে আরও পরিবর্তন দেখি। এ সম্পর্কে স্বয়ং লেখক দুটি বিবরণ দিয়ে গেছেন। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনাংশে আছে,—

"ভ্রমর নামক মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসের সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশ

হইয়াছিল। পরে সন ১২৮২ সালে 'ভ্রমর' পত্রিকা বন্ধ হওয়ায় গল্পটি শেষ হইতে পারে নাই। এক্ষণে শেষ করা গেল।"

কাহিনীর পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্তন প্রসঙ্গে লেখক বলেন যে বাংলায় কোন শ্রেষ্ঠ লেখকের (সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের) অনুরোধে তিনি গল্পটি বাড়াইতে আরম্ভ করেন 'কিন্তু পরে সে উৎসাহ থাকিল না।' বলা বাহুল্য আলোচ্য উদ্ধৃতিতে আমরা সঞ্জীবের বিশিষ্ট মনোভঙ্গীর সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।—১। বঙ্কিমের প্রেরণা ২। সাহিত্য অনুশীলন—পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন ৩। রচনার মধ্য পথে উৎসাহের অভাব ঘটা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে সঞ্জীব লেখেন—

"এবার কণ্ঠমালার অনেক অংশ পরিত্যক্ত হইল।"

কণ্ঠমালা মাধবীলতার পরিশিষ্ট। দেখা যাচ্ছে কণ্ঠমালার প্রথম সংস্করণের পর লেখক কাহিনীর পূর্ব সূত্র রচনার তাগিদ অনুভব করেন। তারই ফল মাধবীলতা। কারণ কণ্ঠমালার প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৭৭ সালে, মাধবীলতার প্রকাশ ১৮৮৫ সালে আর কণ্ঠমালার দ্বিতীয় প্রকাশ ১৮৮৬ সালে। ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে সঞ্জীবের সৎকার প্রবন্ধ (১৮৮১), বাল্য বিবাহ প্রবন্ধ (১৮৮২), জাল প্রতাপচাঁদ (১৮৮৩), বৈজিক তত্ত্ব (১৮৭৯) প্রভৃতি মূল লেখাগুলি প্রকাশিত হয়ে গেছে। কেবলমাত্র তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা পালামৌ প্রকাশিত হয়নি। এই সময় (১৮৮৬) সঞ্জীবের সংসারিক অবস্থা চরম দুর্দ্দশা গ্রস্থ। তাঁর সংসার প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই দেখছেন। হাবড়া থেকে সঞ্জীবকে ১৮৮৬খৃঃ বঙ্কিমের লেখা একখানি ইংরেজি ছিন্ন পত্রে দেখি—

"আমার এই অবস্থায় আপনার সংসার চালানোর কি উপায়।"

সঞ্জীবের পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র তখনো পর্যন্ত কোন চাকুরী পান নি। এই অবস্থায় কণ্ঠমালার (শৈল) দ্বিতীয় সংস্করণের পরিমার্জন করেন, ফলে উপন্যাসের লোকরঞ্জনের দিকটি (কাহিনী ও রোমান্সের বাহুল্য) আগের ছাট সংস্করণের থেকে বেশী প্রাধান্য পেলেও শৈলর মনোবিকলনের অংশটি খর্বিত হয়েছে।[৫৫] সঞ্জীবকৃত শেষ সংস্করণটি ২য় সংস্করণ।

কণ্ঠমালায় মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৩৭টি। কোন পরিচ্ছেদের শিরোনাম নেই। কাহিনী আরম্ভের প্রথমভাগে লেখক অসাধারণভাবে কালজয়ী উপন্যাসিকের মত স্থান কাল পাত্রের সম্পর্কগুলি গভীর ভাবে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু শেষ অংশে মনোবিকলনের অংশটির অসামান্যতা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কাহিনী গঠনে উপন্যাসের সমস্ত রীতিনীতিকে তিনি অস্বীকার করে আপন খেয়ালে প্রায় এক রূপকথার রাজ্য গড়ে তুলেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে শৈল ও তার স্বামী বিনোদের সম্পর্কটি দেখানো হয়েছে—স্বামীর বিমুগ্ধ ভালবাসায় সে ক্লান্ত, কারণ তার মধ্যে রক্তমাংসের উদ্দামতা সে দেখতে পায় না। স্বামীর দারিদ্র্যের প্রতি তার সহানুভূতিহীনতা কাহিনীর সূচনাতেই লক্ষ্য

কথা যায়। নাপিতিনীকে শৈল বলে,—

"নিত্য যে অন্ন পাই, এই যথেষ্ট আবার হীরাকাটা মল কোথায় পাব।"

সঞ্জীবের সত্যিকারের আধুনিক বীক্ষণশীল সূক্ষ্মদৃষ্টির যে অভাব ছিল না, তা কণ্ঠমালার প্রথমাংশে দেখা যায়। শৈল যে তার দেহের তাড়নায় বিনোদের বিমুগ্ধ কাব্যিক প্রেমে ক্লান্ত এবং অসতীত্বে যে তার পরিণতি তা কাহিনীর বিস্তারের বহু পরে দেখা দিলেও লেককের সে সম্পর্কে ইঙ্গিতটি অভ্রান্ত—

"শৈলকে শরীর অল্প বাঁকাইয়া বক্ষ ঈষৎ উন্নত করিতে হইল। এই ভঙ্গীতে তাঁহাকে যে দেখিল সে ভাবিল সুন্দর। নিকটস্থ অন্য একটি ছাদে বিলাসবাবু দাঁড়াইযাছিলেন। যুবতী তাহা জানিতে পারেন নাই।"

অথচ লেখক যে মূলত অসতর্ক তার প্রমাণও এই প্রথম পরিচ্ছেদেই লক্ষ্য করা যায়। যে জটিল চরিত্র তিনি গড়ে তুলতে চলেছেন তার প্রতি পাঠকের গভীর সহানুভূতি ও মমত্ব লেখক যে ভাবে প্রথমে সৃষ্টি করলেন তার সঙ্গে পরের অংশের নীচতা ও নিষ্ঠুরতার চিত্র সঙ্গতিহীন। সঞ্জীবচন্দ্র শৈলের অধঃপতনের জন্যে যেন তার সংসারিক দারিদ্র্যকে ও বিনোদেব বিষয় উদাসীনতাকেই দাযী করেছেন। অথচ শৈলের চারিত্রিক পতনের মূল যে তার অন্তঃগূঢ় প্রবৃত্তি, তার স্বল্প ইঙ্গিত থাকলেও তা অপর্যাপ্ত থেকে গিয়েছে। লেখক যেন এ ব্যাপারে সম্পূণ সচেতন ছিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্র বিজ্ঞাপনাংশে নিজেই বলেছেন,

"বাঙ্গালার কোন শ্রেষ্ঠ লেখক সেই লিখিত অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি পড়িয়া আহ্লাদে বলিযা উঠিলেন যে গল্পটির যদি শত দোষ ঘটে তথাপি এই পরিচ্ছেদের গুণে সে সকল দোষের মার্জনা হইবে।"

এই পরিচ্ছেদ সম্পর্কে লেখকের এই উচ্ছ্বাসের কারণ কি? পরিচ্ছেদটিব বিষয়টি সামান্য। বিনোদ ছেলের দল নিয়ে বৈকালিক স্নানের জন্য পদ্ম পুকুরে নামলেন, পথে বন্ধুদের আহ্বানে সহাস্য সাড়া দিতে ভুললেন না।

এই পরিচ্ছেদ সম্পর্কে লেখকের পক্ষপাতিত্বের মূলকারণ প্রধানত দুটি:—

১। লেখকের মূল প্রেষণা বাৎসল্যের প্রতি। ডঃ সুকুমার সেন এই দিকটি নির্দ্দেশ করে বলেছেন,

"সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসে, গল্পে ও অন্যান্য লেখায়ও মুখ্য রস হইতেছে বাৎসল্য।"[৪৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বাৎসল্যের চিত্রটি অসামান্য।—

"বিনোদ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন, কিন্তু ভগিনীর প্রতি চাহিয়া মাথা হেলাইয়া হাসিতে লাগিল, যেন ভগিনীকে বলিতে লাগিল, দেখিলি? আমি কোলে উঠেছি।" আবার বিনোদ বাবুর দিকে ফিরিয়া সহাস্য বদনে চাহিতে লাগিল, তাঁহার ওষ্ঠের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল 'এই কাকা'।"

শিশুর চিত্র বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকে অল্পই আঁকা হয়েছে। সেই অল্প কয়েক

জন পটুয়ার মধ্যে সঞ্জীব অনবদ্য। সমগ্র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি এই চিত্র সম্ভারে পরিপূর্ণ। সঞ্জীবের প্রকৃতি প্রীতিও ২য় পরিচ্ছেদের অন্যতম অংশ—যদিও তা বাৎসল্যের ছবির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে—

"একজন কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, আমার পদ্ম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেও। পদ্মকলি জলে মাথা তুলিয়াছিল, শিশুর হাতে আসিয়া তাহার মাথা হেলিয়া পড়ে।"

শিশুর দৃষ্টি দিয়ে সৌন্দর্য দেখা সেকালের বাংলা সাহিত্যে একমাত্র সঞ্জীবচন্দ্রের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রাগুক্ত প্রবণতা দুটি ছাড়াও ২য় পরিচ্ছেদটি আমাদের কাছে আরও দুটি কারণে মূল্যবান। প্রথমতঃ শৈল যে বিনোদের সৌন্দর্য বোধ ও কবি প্রকৃতিতে বিরক্ত, পরবর্তী অংশে বিনোদ চরিত্র আরও সুচিত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই পরিচ্ছেদে অতি সূক্ষ্মভাবে সঞ্জীব কাহিনী বিস্তারের সূত্রটি রেখে গেছেন—

"এই রূপ কথা হইতেছে এমত সময় বিনোদবাবু গোপালের শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পূরবী আলাপচারি করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শৈল শিশুকে আদর করিতে লাগিলেন, রেবতী উঠিয়া গেলেন।"

এইখানেই পরিচ্ছেদ শেষ এবং কাহিনীর নাম 'কণ্ঠমালা' যে কারণে অর্থাৎ গোপাল বাবুর শিশুপুত্রের কণ্ঠমালা চুরির যে ঘটনা অবলম্বন করে এর চরিত্রগুলি ঘটনা সংঘাতের মাধ্যমে পরিণতির দিকে এগিয়েছে তারই ইঙ্গিতটি কেবল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে লেখক এক আশ্চর্য সংযমের পরিচয় রেখে গেছেন। অবশ্য সঞ্জীবের অধিকাংশ কাহিনীতে ডিটেকটিভ গল্প সুলভ চমক সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। রোমান্সের আকস্মিকতার প্রতি ঝোঁক এই যুগের অধিকাংশ লেখকেরই বিশিষ্ট প্রবণতা।

তাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিনোদের বাড়ীতে সকালে গোপাল বাবুর শিশুপুত্রের গলার হারানো হারের সন্ধানে হঠাৎ পুলিশের আগমন ও তল্লাসীর ফলে শৈলের বাক্স থেকে হার পাওয়া কাহিনীর মধ্যে একটি দ্রুততার সঞ্চার ঘটিয়েছে—ফলে আকর্ষণীয় উৎকণ্ঠা আমদের আহ্বান করেছে কাহিনীর জটিল আবর্তের মধ্যে। স্ত্রীর প্রতি অসীম ভালোবাসায় বিনোদ শৈলের অপমান নিবারণার্থে নিজেই কণ্ঠমালা চুরির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বিচারে তাঁর এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। এখানেও বিশেষভাবে লক্ষণীয় সঞ্জীব চরিত্রের বহিরাগত বিড়ম্বনার উপর জোর দিয়েছেন। কারণ জেলে যাওয়া, আগুনে পোড়া, লুটতরাজ রাহাজানি হানাহানি প্রভৃতি বাহ্যিক অভিঘাতগুলির প্রতি আসক্তিতে সঞ্জীবের নিজস্ব জীবনের তিক্ততাবোধ কাজ করেছে —বিশেষ করে আইন ও বিচার বিভাগের সরকারী কর্মচারী হওয়া সঞ্জীবের পক্ষে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের দৃশ্যগুলি ছিল প্রায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মতো। তাঁর সহানুভূতিশীল মনে ঐ সব ঘটনা বিশেষ ছাপও ফেলেছে। ফলে উপন্যাসের চরিত্রগুলির মৌলিক প্রবণতা অন্তর্গূঢ় কারণ নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও আকস্মিকতা ও

অত্যাচার অবিচারের ঘটনাগুলি প্রায়শই বাইরে থেকে আরোপ করা হয়েছে। নিরুদ্বেগ মন্দ গতি জীবন ধারণের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়া বিপদগুলি সঞ্জীবের রচনায় সুলভ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখি বিনোদ বিনা দোষে জেলে গিয়ে অকথ্য কষ্ট পাচ্ছেন। এইখানেই তাঁর সঙ্গে শম্ভু কয়েদী ওরফে মহারাজ মহেশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়। এই চরিত্রটির পূর্বসূত্র মাধবীলতায় বর্তমান। অসুস্থ বিনোদের প্রতি শম্ভুর অসীম সহানুভূতি-ফলে তাঁকে দিয়ে ঘানি ঘোরানোর জন্যে জেলের ওভারসিয়ারের সঙ্গে বচসা এবং বিনোদকে অব্যাহতি দিতে গিয়ে তাঁর আরও বিপদ বাড়িয়ে তোলা। কাজ না করার জন্যে বিনোদের নামে ওভারসিয়ারের জেল দারোগার কাছে নালিশ এবং বিনোদের বেত্রাঘাত প্রাপ্তি। বেত্রাহত হতচৈতন্য বিনোদের যখন শম্ভুর কোলে জ্ঞান ফিরে আসে তখন তিনি শৈলের নাম করাতে শম্ভু শৈলের কথা জানতে পারেন যে শৈল প্রকৃতপক্ষে শম্ভু অর্থাৎ মহারাজা মহেশচন্দ্রেরই কন্যা। অবশ্য এই চমকপ্রদ যোগাযোগের খবর লেখক উপন্যাসের শেষ ভাগে আমাদের জানিয়েছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে সঞ্জীবচন্দ্র ফিরে এসেছেন শৈল প্রসঙ্গে। এখানে গোপালের পরিবারের চিত্রটি অত্যন্ত সংক্ষেপে সুন্দর বাৎসল্য মধুর হয়ে উঠেছে—গোপালবাবুর যে শিশু পুত্রের কণ্ঠমালা চুরির দায় স্কন্ধে বহন করে বিনোদ জেলে গেছেন সেই শিশুও বিনোদকে ভোলে নি। গোপালের স্ত্রী পুত্রকন্যা ও গোপালও বিনোদের চরিত্র মাধুর্যের জন্যে তাঁকে ভোলে নি, বরং বিনোদের শাস্তির জন্যে নিজেদের অপরাধী বলে মনে করে—সেই বিনোদকেই শৈল ভুলে গেছে—এই খবরটি আমরা গোপালের স্ত্রীর মুখ হতে এই পরিচ্ছেদে পেয়েছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আবার জেল। ডাক্তারের নির্দেশে অসুস্থ মৃতপ্রায় বিনোদ জেলের মেয়াদ ফুরাবার আগেই মুক্তি পেয়ে যায়। জেলের বাইরে আসার আগে শম্ভু যখন বিনোদকে শৈলের কথা জিজ্ঞাসা করেন তখন বিনোদ বলে যে শৈল তাঁহার সর্বস্ব। কিন্তু পরম বিচক্ষণ শম্ভু বিনোদকে জিজ্ঞাসা করেন :

> "তুমি ত শৈলের কারণে কয়েদ হও নাই ?" বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'না—না—মিথ্যা কথা।…………শম্ভু আবার আসিয়া আর একটি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনোদ সে পরিচয়টি দিবামাত্র শম্ভু শিহরিয়া উঠিলেন, অতিদ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। শম্ভুর সহিত আর বিনোদের সাক্ষাৎ হইল না।"

চরিত্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই সব রহস্যময় ইঙ্গিতগুলি নাট্য কৌতূহল সূচক। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিনোদের শৈলপ্রেমের চিত্রটি অত্যন্ত গভীরভাবে অঙ্কিত। এখানে প্রেমের অবলম্বন হিসাবে নিসর্গচিত্রের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রথমভাগে সঞ্জীবচন্দ্র রীতিমত কবি হয়ে উঠেছেন—যদিও সেই কবিত্ব বিন্দুমাত্রও অকারণ অসঙ্গত হয় নি, বরং তা চরিত্রের বিকাশ ও ঘটনায়

বৈপরীত্য প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। শৈল চরিত্রের চরম নিষ্ঠুরতা দেখবার জন্যে এমন একটি উদার পটভূমি রচনার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। উত্তেজনায় আবেগে অসুস্থ মুমুর্ষ বিনোদ যখন শেষ পর্যন্ত আপন গৃহদ্বারে মধ্যরাত্রে উপস্থিত হল তাঁর মানসিকতার বিপরীতে শৈলের চিত্রটি কী ভীষণ ক্রুর কুটিল, স্বার্থপর ও ভয়াবহ। এই প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"তাঁহার (শৈলের) পদস্খলনেরও কোন ইঙ্গিত তাহার শোচনীয় পরিণতির জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করে না।"[৪৭]

ঠিক স্বীকার্য নয়। এর আগেই বিনোদের প্রতি শৈলের মনোভাবে যে বিরূপতা দেখানো হয়েছে, কণ্ঠমালাটি নিজে চুরি করে স্বামীর জেলযাত্রার পথ যেভাবে সুগম করেছে তাতেই ঔপন্যাসিক স্পষ্টত এই পতনের সম্ভাবনাটি দেখিয়েছেন। চরিত্রটির বিকাশ বিনোদের নিম্নোদ্ধৃত ব্যবহারের পটভূমিতে শৈলকে পিশাচীরূপে চিত্রিত করে ঠিকই—

"বিনোদ আহ্লাদে বলিবার চেষ্টা করিলেন 'শৈলরে আমি এসেছি।' কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না—কণ্ঠ হইতে কেবল একটা বিকট শব্দ নির্গত হইল মাত্র। …………বিনোদ উঠানে আসিয়া শয়ন ঘরের নিকট পড়িয়া গেলেন। আর কোন অঙ্গ সঞ্চালনের সাধ্য রহিল না। শৈলকে আর ডাকিতে পারিলেন না। কেবল তৃষিত লোচনে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।"

অবস্থা যখন এমন সেই সময় স্বৈরিনী শৈল তার জার বিলাসবাবুকে নিয়ে অবৈধ জীবন যাপন করছে। বিনোদের পতনের শব্দশুনে প্রদীপ নিয়ে যখন তারা বাইরে এলো তখন লেখক যে রুদ্ধশ্বাস বর্ণনাটি দিয়েছেন তাতে পাঠকেরও বিনোদের মতো প্রায় গতোন্মুখ অবস্থা—মূহূর্তে মনে হয়েছে এই বুঝি পায়ের তলার জীর্ণ ছাদ ভেঙ্গে পড়ছে, তবু তারই মধ্যে বিনোদের প্রেম অনবদ্য ও স্বর্গীয়—

"শৈল প্রদীপ হস্তে দ্বারোদঘাটন করিল। বিনোদ তাহাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইলেন। কিন্তু বিনোদ দেখিলেন শৈলের পিছনে বিলাসবাবু।"

অন্ধকারে বিলাসবাবু যখন শব্দের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলেন তার পা পড়লো বিনোদের বুকে। এমন ক্ষেত্রে লেখক নিরাসক্ত ভাবে পাঠককে যে রস গ্রহণের সময় ও সুযোগ দেয় তা কোন মন্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত হলে তখন তা মননোপযোগী হত না। যদিও এই উদাসীনতা সঞ্জীব এই কাহিনীর অন্যত্র বা অন্য কাহিনীতে খুব বেশী দেখান নি, তবু এক্ষেত্রে শৈল সম্পর্কে 'পিশাচী' বিশেষণটিই যথেষ্ট। এই ভয়াল পরিবেশে লেখকের বস্তুনিষ্ঠা লক্ষ্য করার মত।

এক দুশ্চরিত্রা রমণীর ভীষণ রূপ এক্ষেত্রে নির্বিকার বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত। মানসিক পর্যায়গুলি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হয় নি ঠিকই—তার পেছনে দুটি কারণ আছে— ১। তখনও আমাদের উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রীতির সূক্ষ্ম প্রয়োগ বঙ্কিমব্যতীত অপরের দ্বারা সম্ভব হয়নি। ২। দুই একটি ইঙ্গিত ছাড়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

বিশ্লেষণে নিয়োজিত থাকার মতো শিল্পবোধ ও সতকর্তা সঞ্জীবের ছিল না। কিন্তু সঞ্জীবের পক্ষে প্রশংসার বিষয় হল এ জাতীয় রমণী চরিত্রের পরিকল্পনা এবং তার হৃদয়ের গভীরে পূর্বে এবং পরে মাঝে মাঝে প্রবেশের চেষ্টা।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

"কণ্ঠমালার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ছায়াপাত লক্ষিত হয়, যদিও রচনা হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাস বোধ হয় পূর্ববর্তী। তাই শৈলের পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত 'চন্দ্রশেখর'-এ শৈবলিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, বঙ্কিমের মাত্রাজ্ঞান ও উচ্চাঙ্গের কবি কল্পনার অধিকারী সঞ্জীবচন্দ্র নহেন। শৈলের পাপ অতিস্থূল ও কোনরূপ সহানুভূতির অযোগ্য।"[৪৮]

আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি কণ্ঠমালার উপর মূলত চন্দ্রশেখর-এর প্রভাব বর্তমান। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্জীবের উপন্যাসকে বঙ্কিমের পূর্ববর্তী বলে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন তার বিশেষ কোন কারণ নেই। যেহেতু কণ্ঠমালার প্রথম প্রকাশও ঐ একই বছরে হলেও প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রশেখর রচনা কাল ১৮৭৩ সালে। (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বর্ষার সময় বঙ্কিম লিখিতেছেন ইত্যাদি—'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র'—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৩৬৮) ১৮৭পৃঃ)। সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমের এই সময় যোগাযোগ ছিল। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অন্য অভিযোগগুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার না থাকলেও একথা বলা যায় শৈলের পাপ ক্ষমার ও সহানুভূতি অযোগ্য হলেও শৈল নিজে সহানুভূতির অযোগ্য—একথা ঠিক নয়। স্বয়ং লেখক তাকে যে শাস্তি দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে তাই আমাদের সহানুভূতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যত্র আলোচনাক্রমে আমরা তা দেখতে পাব।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্জীব প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—

"খাঁটি ঔপন্যাসিক গুণের তাঁহার যে অভাব ছিল তাহা নহে। তবে ইহার স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা অনেকটা নিশ্চিত।"[৪৯]

অন্যভাবে বলা যায় এই পরিচ্ছেদের বাস্তবতাবোধের সঙ্গে কল্পনা আতিশয্যের অসঙ্গত অভিক্ষেপন 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসটিকে পরবর্তী অংশকে দুর্বল করে দিয়েছে। বাস্তব কাহিনীর মধ্যে রহস্যঘন পরিবেশের স্বরূপটি অনুপ্রবেশ করেছে, যখন মৃতপ্রায় বিনোদের জন্যে বিলাসবাবু প্রাচীরের পাশে কবর খুঁড়ছে তখনই—

"বৃক্ষপার্শ্বে প্রাচীরের উপর দীর্ঘকায় এক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে······সেই ভীমাকৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন 'শৈল। একি ?'

শৈল শিহরিয়া উঠিল, এ স্বর অপরিচিত নহে। বালিকা কালের কি এক ঘোর অথচ অস্পষ্ট কথা মনে আসিয়া আর আসিল না। ভীম পুরুষ বলিলেন, 'আইস, আমার সঙ্গে আইস'।"

আমরাও আরও জানলাম ঐ ভীম পুরুষ শৈলকে অন্য কোথাও রেখে এলেন এবং বিনোদের কথায় জানলাম তিনিই শম্ভু কয়েদী।

নবম পরিচ্ছেদের পর থেকে মুহূর্তের মধ্যে কাহিনী অন্য এক কল্পলোকে যাত্রা করেছে। সেখানে সত্য ও কল্পনার ভেদ রেখা একাকার হয়ে গেছে। শম্ভু দীর্ঘ পথ অতি দ্রুত পদবিক্ষেপে মুহূর্তে অতিক্রম করে রামদাস সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হলেন।

রামদাসের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে জানা গেলো তিনি কারাবাসে আছেন, তাঁর প্রজাদের কাছে সেটা অজ্ঞাতবাস। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রজার নানাবিধ কল্যাণে ব্যয়িত হয়, আরও বেশী জনকল্যাণের আদেশ তিনি দিলেন। 'যুবা মাত্রেরই বিবাহ হওয়া উচিত' এই মতবাদও তাঁর পরিবর্ত্তিত হয়েছে জানা গেলো। রামদাস তাঁকে রাজকুমারীর সন্ধান পাওয়া গেলো কিনা জিজ্ঞাসা করাতে—

"এই কথায় শম্ভু শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, রাজকুমারীর নাম আর আমার সাক্ষাতে উল্লেখ করিবেন না। এই বলিয়া শম্ভু উরুর উপর উরু রাখিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা চিবুক ধরিয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে দীপশিখার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।"

এর মধ্যে রাজকুমারীর খবরের মধ্যে যেমন সঘন রহস্যের আভাস আমাদের আকৃষ্ট করে তেমনি কাহিনীর অতিকল্পনা সত্ত্বেও খণ্ড চিত্রগুলি অসাধারণ বলে প্রতীত হয়। বিনোদকে নূরপুর গ্রাম থেকে ভুবনপুরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে শম্ভু চলে গেলেন।

শম্ভুর জেলের বাইরে আসা যাওয়ার অবাধ অধিকারের কৈফিয়ৎ আছে দশম পরিচ্ছেদে। জেল দারোগা তথা ইংরেজ প্রশস্তি থাকলেও লেখকের চরিত্রাঙ্কনের দক্ষতা দশম পরিচ্ছেদেও ক্ষুন্ন হয়নি।

একাদশ পরিচ্ছেদে শৈলের নির্বাসন যাত্রার দৃশ্যটি লেখক তুলে ধরেছেন। মাটির নিচের সুড়ঙ্গ ঘর ইত্যাদির বর্ণনা যে বঙ্কিমের আনন্দমঠের প্রভাবে প্রভাবিত তা স্পষ্টই বোঝা যায়। রামদাস দীর্ঘপথ পার হয়ে শৈলকে যেখানে রেখে গেলেন তা ভূগর্ভস্থ একটি কারাগার। এই অংশে শৈলের যৌবনোদ্ধত ভঙ্গিটির প্রকাশ অত্যন্ত সুচারু হয়েছে—এখানেও দেখি শৈল তার পাপ সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই পাঠকও তার সম্পর্কে খুব বিরূপ নন। এই গুণেই শৈল এই কাহিনীর নায়িকা, পাঠকও তার প্রতি সহানুভূতিশীল। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে এই গুপ্ত কারাগারের অসম্ভবতাকে লেখক যুক্তি দিয়ে সম্ভবের সীমায় আনবার চেষ্টা করেছেন। শৈল বা কণ্ঠমালা কাহিনীর আর যে ত্রুটিই থাকুক এ কথা স্বীকার করতে হবে, সঞ্জীবচন্দ্রের দৃষ্টির উদাসীনতা সত্ত্বেও তিনি যেভাবে ভ্রষ্টানারী চরিত্রের অবদমিত কামের কুটৈষণা জনিত প্রতিক্রিয়া অঙ্কন করেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। যদিও লেখক তাকে আরও কিছু ব্যাখ্যানের দ্বারা স্পষ্টীকৃত করলে শিল্পগত সাফল্যের প্রমাণ থাকত।

উপন্যাসিকের কর্ত্তব্য কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা, তার উন্নতি ও পরিণতি

এবং চরিত্রের সঙ্গত বিকাশ এবং সমগ্রভাবে তা পাঠকের গ্রহণযোগ্য করে তোলার। বিদ্যুৎ চমকের মতো মাঝে মাঝে চরিত্রের অন্ধকারে আলোকপাত করলেও সমগ্রত উক্ত দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারেন নি। সেই সার্থকতা ও বিফলতা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আশ্চর্যভাবে মুহূর্তমধ্যে আমাদের অভিভূত ও পীড়িত করে। বন্দিনী শৈলের মানসিক অবস্থার চিত্রটি লক্ষ্য করা যাক—

> "আমি তবে কয়েদী। আমি তবে ইচ্ছা করিলে এই ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না। আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। কতদিন থাকিতে হইবে? তাহারও নিশ্চয় নাই।"
>
> এই সময় একটি টিকটিকী গবাক্ষ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। টিকটিকী হেলিয়া দুলিয়া দুই এক পদ যায় আবার মাথা তুলিয়া দেখে, এইরূপে গৃহ গোধিকা প্রাচীর দিয়া অবতরণ করিতে লাগিল। শৈলের ইহা অসহ্য হইল। বেদি হইতে লম্ফ দিয়া শৈল টিকটিকীকে আঘাত করিল। টিকটিকী ভূমিতলে পড়িয়া চীৎ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শৈল তখন তাহাকে পদতলে দলিত করিয়া বলিল, 'কেমন এখন ইচ্ছামত যাতায়াত কর। আমি কয়েদী আর এই সামান্য টিকটিকী স্বাধীন ইচ্ছামত এই ঘরে যাতায়াত করে। এই ঘর আমাকে আবদ্ধ করিল কিন্তু এই পোড়া ক্ষুদ্র জন্তুকে কয়েদ করিতে পারিল না। যত যন্ত্রণা আমারই জন্য ছিল।"
>
> এই বলিয়া শৈল গ্রীবা বাঁকাইয়া দেখিতে লাগিল। টিকটিকীর ছিন্ন লাঙ্গুল ভূমে পড়িয়া রহিল। শৈল তখনও সেই দিকে চাহিয়া রহিল।"

সন্দেহ নেই চিত্রাঙ্কনে সঞ্জীবের দক্ষতা অতুলনীয়—উল্লিখিত চিত্রে শৈলের অনুচ্চারিত আত্মকথনের রঙ লেগেছে। তার মানস বিপর্যয় অনুশোচনা ও পাপবোধ জনিত বিকার এই চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও কিঞ্চিৎ শিশু সুলভ পর্যবেক্ষণ এর গাম্ভীর্যকে কিছুটা শিথিল করেছে।

আমরা আগেই বলেছি সঞ্জীবচন্দ্রের লেখায় বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার অতি-কল্পনার একটি অদ্ভুত যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবতা গঠন নীতিতে সঞ্জীবচন্দ্র আধুনিক কালের লেখকদের পূর্বসূরী—তাঁর বাস্তবতা কেবলমাত্র ঘটনার বাস্তবতা মাত্র নয় তা প্রধানত মানসিকতার বাস্তবতা। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ঘটনা ও মানসিকতার বাস্তবতা সুচিত্রিত। যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনা এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে তরল ও বক্রোক্তিতে তির্যক, তবু বিলাসবাবুর পাপ বোধের স্বরূপটি দস্তয়ভস্কির ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিসমেন্টের নায়ক রসকলনিকফের অপরাধ বোধের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদের বিলাসবাবুর গ্রেফতার বরণ দৃশ্যটি কিছু অস্বাভাবিক হলেও সঞ্জীবের পরিহাস প্রিয়তায় তা রীতিমত উপভোগ্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর স্বাভাবিক কবি ধর্মে স্বপ্রতিষ্ঠিত। মহারাজ মহেশচন্দ্র তথা বিনোদের কাছে শম্ভু কয়েদী, যিনি তার রক্ষাকর্তা অর্থাৎ যাঁর দয়ায়

বিনোদ সেই ভয়াবহ রাত্রির পরেও বেঁচে আছেন ও সুস্থ হয়ে উঠেছেন সেই শম্ভু কয়েদীকে বিনোদ কয়েকখানি (পাঁচটি) পত্র লিখেছেন। পত্রের মাধ্যমে কাহিনী ও চরিত্রচিত্রন রীতি বঙ্কিমের বহু উপন্যাসে দেখা যায়। সম্ভবত এই পত্রের ব্যবহার কৌশল তিনি বঙ্কিমের আদর্শেই আমদানী করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য নিজস্ব।

কণ্ঠমালায় এই অংশের পত্রগুলির মধ্যে অপূর্ব্ব মন্ময়তা ও গীতিময়তা লক্ষ্য করা যায়। পত্র সূচনায় আগেই লেখক বলেছেন—

"নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্রদ্বারা বিনোদের মনের অবস্থা কতক অনুভূত হইতে পারে। এই পত্রগুলি বিনোদ সময় সময় শম্ভুকে লিখিয়াছিলেন। কোন পত্রে শৈলের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহা না থাকুক মনের যন্ত্রনায় যে পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়।"

পত্রগুলির ভাষার মাধুর্য ও নিজস্ব চিত্রের মাধ্যমে মানব মনের বিচিত্র লীলার যে প্রকাশ এখানে ঘটেছে তা স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়—

"এই মাত্র ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। দূর্বাদল বৃক্ষপত্র সূর্যকিরণে নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। নানা বর্ণের প্রজাপতি উড়িতেছে। পক্ষীরা কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। এক একটি পক্ষী ডালে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিতেছে, তাহারা কিছু চাহে না কাহারেও ডাকে না, অথচ আপন মনে চীৎকার করিতেছে। আমার ইচ্ছা হয় আমিও ঐরূপ একবার প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করি।" (১ম পত্র)

অন্য একটি পত্রের মানসিক ইচ্ছার জটিলতার প্রকাশ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের রীতিমত চমকিত করে তোলে—

"আমার আবার আহ্লাদ কেন ? সম্প্রতি অনেকবার ভাবিয়াছিলাম জীবনে আর আমার ইচ্ছা নাই, মরিলেই ভাল। কিন্তু সে কথা মিথ্যা। বাঁচিতে আমার বড় ইচ্ছা। বুঝেছি এ পৃথিবীতে অবশ্য কিছু সুখ আছে, নতুবা বাঁচিতে ইচ্ছা কেন ? কিন্তু সে সুখ কি ? (৩য় পত্র)

এই মানসিক অস্থিরতা ও জটিলতা লক্ষ্য করেই আধুনিক কালের একজন সমালোচক বলেছেন—

"তাঁর (সঞ্জীবচন্দ্রের) উপন্যাসে এক ধরণের মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ দেখে অনুমান না করে পারা যায় না যে যুগচিন্তার বিরুদ্ধে কোথায় যেন তাঁর মনে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের মনোভাব লুক্কায়িত ছিল।"[৫০]

এই মনোভাবের জন্যই সঞ্জীব তাঁর সাহিত্যের স্বল্প সঞ্চয়েও কালের সীমা পেরিয়ে আজকের যুগ মানসকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। পত্রগুলির আরও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—কমলাকান্তের মতো সঞ্জীবও জগৎ জীবন সম্পর্কে এক গভীর অনুভূতিময় অথচ নিরাসক্ত উদাসীন মনোভাবের দার্শনিক প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন। সূক্ষ্ম

অন্তভূতি ও সঙ্কেতময়তায় সঞ্জীব যে রবীন্দ্রনাথের সার্থক পূর্ব পুরুষ তা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না—

"পূর্বে অরণ্য মধ্যে একটি শাল বৃক্ষের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া ছিলাম কি কারণে জানি না বৃক্ষটি এক সময় অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল, তাহার কোমল মঞ্জরীগুলি গিয়াছে, পত্রগুলি গিয়াছে, শাখাগুলি পর্যন্ত গিয়াছে কেবল অঙ্গারবিশিষ্ট বৃক্ষস্কন্ধে আর দুই একটি মূলশাখার অংশমাত্র রহিয়াছে। চারিদিকে ফুলে ফুলে বিটপি সমূহ সুখে দুলিতেছে। তাহার মধ্যস্থলে এই দগ্ধতরু বাহু প্রসারিয়া হাহা করিতেছে।" (৫ম পত্র)

অন্য পক্ষে রবীন্দ্রনাথে—

"একদিন দূরদেশে আমারই মত একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলাম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে।" ৫১

শম্ভু কয়েদীকে লেখা পত্রগুলির মধ্যে বিনোদ যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তাতে তাঁর মনে হয়েছিল,

"যাহা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি তাহা পত্রে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু শম্ভু ভাবিলেন বিনোদ তাহা সমুদায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

পূর্বপরিচ্ছেদে সঞ্জীবচন্দ্র যে কাব্যময়তায় অবগাহন করেছিলেন পরের পরিচ্ছেদে (১৬শ পরিঃ) গল্পের ধারাকে অন্য পথে বাঁক নেবার আগে সেই পূর্বধারার গীতিময় ভাবালুতার রেশটি হঠাৎ ছিন্ন করে দেননি। এইখানে পরিবেশ রচনার ক্ষমতা ও পরিমিতি বোধের উন্নতি সত্যিই আমাদের চমকিত করে। এই পরিচ্ছেদে সুমধুর প্রকৃতির মাঝখানে সুমধুর সঙ্গীত ও তদধিক সুমধুরা নায়িকার (পরবর্তী উপন্যাসের মাধবীলতার) সঙ্গে বিনোদের পরিচয় দৃশ্যটি লেখকের কবিত্বগুণে এক অনবদ্য রহস্য চন্দ্রালোকে পরিপ্লাবিত হয়ে গেছে। এইখানে পাঠক প্রথম স্পষ্টত জানতে পারলেন যে শম্ভু কয়েদী স্বয়ং মহারাজ মহেশচন্দ্র। যদিও সঙ্গীতজ্ঞা যুবতীর পরিচয় পাঠক এখনো সম্পূর্ণত জানেন না, শুধু এইমাত্র জানা গেছে এই যুবতী এই প্রাসাদে বাল্যকালে অনেকবার এসেছেন। কাহিনী রহস্য ঘন হয়ে উঠেছে —লেখক আমাদের কখন সুকৌশলে তাঁর সঙ্গীতের ও জ্যোৎস্নার মায়া জগৎ গল্পের ধারার মধ্যে নিয়ে এসেছেন তা যেন আমরা সচেতন ভাবে বুঝতে পারি না।

আমরা আগেও বলেছি সঞ্জীবচন্দ্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসে একটু বেশীই লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে শৈলের সঙ্গে এই যুবতীর (মাধবীলতার) তুলনা আমাদের কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মতিবিবির তুলনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে বঙ্কিমের উচ্চাঙ্গের কবিত্বের অলৌকিক মায়ার জগৎ এখানে না থাকলেও, সঞ্জীবের সহজ সরল বাস্তববোধের এবং আন্তরিক গভীরতার ভাবটি সুমুদ্রিত। সঙ্গীতরসে সুস্থ হৃদয়ে বিনোদ ভাবেন, সেদিন রাত্রে যাকে শৈল বলে মনে করেছিলেন সে শৈল নয়, তাই বিনোদ নূরপুর যাওয়া স্থির করলেন, কিন্তু

বিনোদ সেই ভয়াবহ রাত্রির পরেও বেঁচে আছেন ও সুস্থ হয়ে উঠেছেন সেই শম্ভু কয়েদীকে বিনোদ কয়েকখানি (পাঁচটি) পত্র লিখেছেন। পত্রের মাধ্যমে কাহিনী ও চরিত্রচিত্রন রীতি বঙ্কিমের বহু উপন্যাসে দেখা যায়। সম্ভবত এই পত্রের ব্যবহার কৌশল তিনি বঙ্কিমের আদর্শেই আমদানী করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য নিজস্ব।

কণ্ঠমালায় এই অংশের পত্রগুলির মধ্যে অপূর্ব্ব মন্ময়তা ও গীতিময়তা লক্ষ্য করা যায়। পত্র সূচনায় আগেই লেখক বলেছেন—

"নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্রদ্বারা বিনোদের মনের অবস্থা কতক অনুভূত হইতে পারে। এই পত্রগুলি বিনোদ সময় সময় শম্ভুকে লিখিয়াছিলেন। কোন পত্রে শৈলের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহা না থাকুক মনের যন্ত্রনায় যে পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়।"

পত্রগুলির ভাষার মাধুর্য ও নিজস্ব চিত্রের মাধ্যমে মানব মনের বিচিত্র লীলার যে প্রকাশ এখানে ঘটেছে তা স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়—

"এই মাত্র ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। দূর্বাদল বৃক্ষপত্র সূর্যকিরণে নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। নানা বর্ণের প্রজাপতি উড়িতেছে। পক্ষীরা কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। এক একটি পক্ষী ডালে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিতেছে, তাহারা কিছু চাহে না কাহারেও ডাকে না, অথচ আপন মনে চীৎকার করিতেছে। আমার ইচ্ছা হয় আমিও ঐরূপ একবার প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করি।" (১ম পত্র)

অন্য একটি পত্রের মানসিক ইচ্ছার জটিলতার প্রকাশ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের রীতিমত চমকিত করে তোলে—

"আমার আবার আহ্লাদ কেন? সম্প্রতি অনেকবার ভাবিয়াছিলাম জীবনে আর আমার ইচ্ছা নাই, মারিলেই ভাল। কিন্তু সে কথা মিথ্যা। বাঁচিতে আমার বড় ইচ্ছা। বুঝেছি এ পৃথিবীতে অবশ্য কিছু সুখ আছে, নতুবা বাঁচিতে ইচ্ছা কেন? কিন্তু সে সুখ কি? (৩য় পত্র)

এই মানসিক অস্থিরতা ও জটিলতা লক্ষ্য করেই আধুনিক কালের একজন সমালোচক বলেছেন—

"তাঁর (সঞ্জীবচন্দ্রের) উপন্যাসে এক ধরণের মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ দেখে অনুমান না করে পারা যায় না যে যুগচিন্তার বিরুদ্ধে কোথায় যেন তাঁর মনে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের মনোভাব লুক্কায়িত ছিল।"[৫০]

এই মনোভাবের জন্যই সঞ্জীব তাঁর সাহিত্যের স্বল্প সঞ্চয়েও কালের সীমা পেরিয়ে আজকের যুগ মানসকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। পত্রগুলির আরও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—কমলাকান্তের মতো সঞ্জীবও জগৎ জীবন সম্পর্কে এক গভীর অনুভূতিময় অথচ নিরাসক্ত উদাসীন মনোভাবের দার্শনিক প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন। সূক্ষ্ম

অনুভূতি ও সঙ্কেতময়তায় সঞ্জীব যে রবীন্দ্রনাথের সার্থক পূর্ব পুরুষ তা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না—

"পূর্বে অরণ্য মধ্যে একটি শাল বৃক্ষের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া ছিলাম কি কারণে জানি না বৃক্ষটি এক সময় অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল, তাহার কোমল মঞ্জরীগুলি গিয়াছে, পত্রগুলি গিয়াছে, শাখাগুলি পর্যন্ত গিয়াছে কেবল অঙ্গারবিশিষ্ট বৃক্ষস্কন্ধে আর দুই একটি মূলশাখার অংশমাত্র রহিয়াছে। চারিদিকে ফুলে ফুলে বিটপি সমূহ সুখে দুলিতেছে। তাহার মধ্যস্থলে এই দগ্ধতরু বাহু প্রসারিয়া হাহা করিতেছে।" (৫ম পত্র)

অন্য পক্ষে রবীন্দ্রনাথে—

"একদিন দূরদেশে আমারই মত একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলাম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে।" ৫১

শম্ভু কয়েদীকে লেখা পত্রগুলির মধ্যে বিনোদ যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তাতে তাঁর মনে হয়েছিল,

"যাহা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি তাহা পত্রে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু শম্ভু ভাবিলেন বিনোদ তাহা সমুদায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

পূর্বপরিচ্ছেদে সঞ্জীবচন্দ্র যে কাব্যময়তায় অবগাহন করেছিলেন পরের পরিচ্ছেদে (১৬শ পরিঃ) গল্পের ধারাকে অন্য পথে বাঁক নেবার আগে সেই পূর্বধারার গীতিময় ভাবালুতার রেশটি হঠাৎ ছিন্ন করে দেননি। এইখানে পরিবেশ রচনার ক্ষমতা ও পরিমিতি বোধের উন্নতি সত্যিই আমাদের চমকিত করে। এই পরিচ্ছেদে সুমধুর প্রকৃতির মাঝখানে সুমধুর সঙ্গীত ও তদধিক সুমধুরা নায়িকার (পরবর্তী উপন্যাসের মাধবীলতার) সঙ্গে বিনোদের পরিচয় দৃশ্যটি লেখকের কবিত্বগুণে এক অনবদ্য রহস্য চন্দ্রালোকে পরিপ্লাবিত হয়ে গেছে। এইখানে পাঠক প্রথম স্পষ্টত জানতে পারলেন যে শম্ভু কয়েদী স্বয়ং মহারাজ মহেশচন্দ্র। যদিও সঙ্গীতজ্ঞা যুবতীর পরিচয় পাঠক এখনো সম্পূর্ণত জানেন না, শুধু এইমাত্র জানা গেছে এই যুবতী এই প্রাসাদে বাল্যকালে অনেকবার এসেছেন। কাহিনী রহস্য ঘন হয়ে উঠেছে —লেখক আমাদের কখন সুকৌশলে তাঁর সঙ্গীতের ও জ্যোৎস্নার মায়া জগৎ গল্পের ধারার মধ্যে নিয়ে এসেছেন তা যেন আমরা সচেতন ভাবে বুঝতে পারি না।

আমরা আগেও বলেছি সঞ্জীবচন্দ্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসে একটু বেশীই লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে শৈলের সঙ্গে এই যুবতীর (মাধবীলতার) তুলনা আমাদের কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মতিবিবির তুলনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে বঙ্কিমের উচ্চাঙ্গের কবিত্বের অলৌকিক মায়ার জগৎ এখানে না থাকলেও, সঞ্জীবের সহজ সরল বাস্তববোধের এবং আন্তরিক গভীরতার ভাবটি সুমুদ্রিত। সঙ্গীতরসে সুস্থ হৃদয়ে বিনোদ ভাবেন, সেদিন রাত্রে যাকে শৈল বলে মনে করেছিলেন সে শৈল নয়, তাই বিনোদ নূরপুর যাওয়া স্থির করলেন, কিন্তু

যুবতী গায়িকার সঙ্গে নব পরিচয়ের আবেশে ক্লান্ত দুর্বল বিনোদ শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে (১৯শ পরিঃ) বিনোদের সঙ্গে যুবতীর আবার সাক্ষাৎ এবং প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারলেন সেই রাত্রে যাকে তিনি শৈল বলে মনে করেছিলেন সে প্রকৃতই শৈল এবং আরও জানলেন শৈল মহারাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা এবং দৈবক্রমে সে ব্রাহ্মণ রাঘবরামের দ্বারা প্রতিপালিতা হয়। এখানেও আমরা সঞ্জীবচন্দ্রের দুঃখাভিঘাত জনিত উৎকেন্দ্রিকতার প্রতি বিশেষ প্রবণতা ও দার্শনিকতার বিচ্যুতি দেখতে পাই। বিনোদের স্বপ্নভঙ্গ জনিত উন্মত্ততার বর্ণনায় সঞ্জীবচন্দ্র আপন কৃতিত্ব স্বভাবতই প্রকাশ করেছেন। বিশেষত আপন ব্যক্তিজীবনের ব্যথা বেদনাময় উৎকেন্দ্রিকতার নিগূঢ় চেতনা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য, সেখানে তিনি প্রায় সমস্ত প্রভাবের উর্ধে।

প্রখ্যাত সমালোচক Joyce Cary উপন্যাসিকের কর্তব্য সম্পর্কে বলেছেন,—

"He has somehow to translate an intuition from real objects into a formal and ideal arrangement".[৫২]

এই intuition বা ব্যক্তিগত চেতনার অর্থাৎ নিজস্ব আবিস্কারের ক্ষমতার কোন অভাব সঞ্জীবের ছিল না—খণ্ডচিত্র প্রকাশে তাই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—কিন্তু উপন্যাস লেখকের যে সুদৃঢ় সামগ্রিকতা বোধের প্রয়োজন সেইখানেই সঞ্জীবের শক্তির অভাব। সেই কারণেই বিংশ পরিচ্ছেদের শম্ভু কয়েদীর মহাকুলীন সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা লেখকের উপন্যাসের সামগ্রিক ধারার মধ্যে একটি আকস্মিক উৎপাত বলে মনে হয়েছে। এ সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামতটি গ্রাহ্য—

"শম্ভুর মহাকুলীন সম্প্রদায়ের গঠনের পরিকল্পনা আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায়ের স্মারক—কিন্তু আনন্দমঠে যাহা কেন্দ্রস্থ সংঘটন, কণ্ঠমালায় তাহা একটা অবিশ্বাস্য, ক্ষণিক খেয়ালমাত্র, ইতিহাসের আশ্রয় হীন একটা শূণ্য গর্ভ কল্পনা বিলাস। কণ্ঠমালায় সঞ্জীবচন্দ্রের নিজস্ব শক্তি বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভাবে অভিভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"[৫৩]

প্রকৃতপক্ষে কণ্ঠমালায় বিংশ পরিচ্ছেদের পর কাহিনী উপন্যাসের পথ ছেড়ে আধা রূপকথায় আলোছায়ার রহস্যময় সুড়ঙ্গ পথ ধরেছে যদিও শেষ পর্যন্ত লেখক তাকে বাস্তবের পথে বার করতে চেষ্টা করেছেন। বিংশ পরিচ্ছেদে কেন শম্ভু কয়েদী মহাকুলীন সম্প্রদায় গঠন করতে চাইলেন এবং তার সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনীর কী সম্পর্ক তা স্পষ্টত আমরা বুঝতে পারি না। একমাত্র শম্ভু চরিত্রের একটি বিশেষ দিক দেখান ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য এই অংশের আছে বলে মনে হয় না। অথচ ইংরেজ রাজত্বের কেন্দ্রস্থলে শম্ভু আর একটি প্রতিযোগী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কারণ কি সে সম্পর্কে লেখকও কিছু বলেন নি। এই ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রেখেই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্জীবের স্বভাব ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখেই মন্তব্য করেন—

"একেবারে আধুনিক যুগের জীবন যাত্রা প্রণালীর সহিত এই সমস্ত মধ্যযুগ সুলভ আবির্ভাবের যে অসংগতি আছে, লেখক তাহাকে নির্বিকার চিত্তে মানিয়া লইয়াছেন। কোনরূপ খাপ খাওয়াইবার চেষ্টামাত্র করেন নাই।"[৫৪]

উপন্যাসের প্রধান যে গুণ—স্থান কাল ও প্রসঙ্গের সার্থক মিলন সেই গুণের দিকে সঞ্জীবের সাগ্রহ দৃষ্টির অভাব সকলেই লক্ষ্য করেছেন।

সঞ্জীবের উপন্যাস পাঠের সময় আমাদের মনে যে সহস্র প্রশ্ন ভিড় করে আসে প্রায়ই তার কোন সদুত্তর পাওয়া কঠিন। মহাকুলীনের পঞ্চলক্ষণের বর্ণনা করে শম্ভু কয়েদী রামদাস সন্ন্যাসীকে যে পত্র দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই তিনি তাঁর মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তার পরেই ২১শ পরিচ্ছেদে লেখক প্রায় বালক ভুলান ভঙ্গীতে অন্যের মৃত্যুর মাধ্যমে শম্ভুর অন্তর্ধান দৃশ্যটি বর্ণনা করেছেন। এর পরেও ২২শ পরিচ্ছেদে অতিরোমান্টিক ভঙ্গীতে লেখক শম্ভু দরদী ইংরেজ জেলদারগাকে এক লক্ষ টাকা দান করেছেন এক অবিশ্বাস্য কাহিনী রচনা করে, ফলে লেখক ঔপন্যাসিকের ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়েছেন। শুধু তাই নয় কণ্ঠমালায় যে উদাস করুণ সুর এই পর্যন্ত ধ্বনিত হয়েছিল তার মধ্যে ছন্দপতন ঘটিয়ে ২৩শ পরিচ্ছেদে ইংরেজ চরিত্রের ও তাদের দাম্পত্য জীবনের যে ছবিটি তির্যকভঙ্গীতে এঁকেছেন তাতে লেখকের বিশেষ প্রবণতা প্রকাশ পেলেও উপন্যাসের ধর্মের পক্ষে যে তা বিষম ত্রুটি তাতে সন্দেহ নেই।

বিংশ পরিচ্ছেদ থেকে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সঞ্জীব যেমন আনমনে গল্পের ধারা থেকে সরে গিয়েছিলেন, প্রায় তেমনি আনমনেই আবার গল্পের মধ্যে ফিরে এলেন চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে। মাধবীকে রামদাস শৈলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দিতে রাজী হলেন, তবে সর্ত এই যে তাঁকে (রামদাসকে) বিয়ে করতে হবে।

কণ্ঠমালা উপন্যাসে একটি বিশেষগুণের জন্য অবশ্যই বাংলা সাহিত্যে অগ্রদূতের (Pioneer) সম্মানের অধিকারী হবে। আধুনিক কালের গল্পে উপন্যাসে যে অবচেতন মনের বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ড ফ্রয়েডিয় মনস্তাত্ত্বিক ভঙ্গীতে বর্ণনা করা হয় তারই অপরিশোধিত রূপ আমরা শৈলের বন্দী অবস্থায় আত্মপীড়নের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে দেখি। আধুনিক মনোবিকলন পদ্ধতির জন্মদাতা সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬—১৯৩৯) মূল তিনখানি গ্রন্থ—

Die Traumdeutung (1900), Psychopathologie des Allagslebens (1904) and Drei Abhandlugen Zur Serual Theorie (1905),

মূলত বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়, সঞ্জীবের মৃত্যুর অনেক পরে। স্বপ্ন সম্মোহন (Hypnotism), কূটৈষণা (Complex), অবদমিত কাম এবং তার প্রতিক্রিয়া (repression of libido and their reaction) প্রভৃতি বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের অন্যতম অবলম্বন। বৈজ্ঞিক তত্ত্বের লেখক সঞ্জীব যদি ঐসব গ্রন্থ হাতের কাছে পেতেন তাহলে তিনি যে সাহিত্য তার সদ্ব্যবহার করতেন, তা আমরা তাঁর অস্বাভাবিক মানসিকতার বিশ্লেষণের বিশেষ প্রবণতা থেকে আন্দাজ

করতে পারি। ভ্রষ্টা ব্যভিচারিণী চরিত্র বঙ্কিম যুগে আরও অনেকের লেখার মধ্যে দেখেছি। কিন্তু তার প্রেমের মূলে কোন উচ্চতর মনোবৃত্তি ব্যতিরিক্ত যে অবদমিত কাম ও স্বার্থপরতা বর্তমান তার স্বাভাবিক ও প্রায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোবিকলন পদ্ধতি অনুসারী বর্ণনা এখানে লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত বৈজিকতত্ত্ব অর্থাৎ পূর্বপুরুষের স্বভাববীজ উত্তর পুরুষে বার্তায় এই তত্ত্বে বিশ্বাসী লেখক শৈলের পিতা মহারাজ মহেশচন্দ্রকে মহাপুরুষ রূপে চিত্রিত করলেও মাধবীলতায় দেখিয়েছেন যে তার পিতামহ সচ্চরিত্রের ছিলেন না। ফলে তার মধ্যে নীচতা, চৌর্যবৃত্তি, স্বার্থপরতা ও ক্রূরতা, অন্যদিকে জন্মদাতার মহত্ত্ব শেষ পর্যন্ত তার চরিত্রের গভীরতর প্রদেশের সততাকে প্রকাশ করেছে। ২৫শ এবং ২৬শ পরিচ্ছেদে শৈলের প্রায়শ্চিত্ত তাই অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।—চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের ছবি আঁকবার আগে বঙ্কিম যেমন তার চরিত্রের মৌলিক সততা এঁকেছেন, প্রতাপের জন্য তার গভীর প্রেমানুভূতি—যা তাকে চন্দ্রশেখরের প্রতি কোন নীচ বা ক্রূর মনোভাব প্রকাশ করতে দেয়নি। কিন্তু সঞ্জীব শৈলের নির্জন কারাবাসেব মাধ্যমে যে প্রায়শ্চিত্তের চিত্র এঁকেছেন, তার কারণ যে অপরাধ, তার মূল খুঁজতে আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে—যা তার জন্মসূত্রের মধ্যেই রয়ে গেছে। অপব পক্ষে যে চরিত্রের ষোল আনা অসৎ তা অবস্থার চাপে পড়েও পরিবর্তিত হয় না—অথচ শৈলের পরিবর্তন হয়েছে—তার মূলেও তার জন্মদাতার রক্তের সংস্কার কাজ করেছে। এই তত্ত্ব আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত না হলেও সঞ্জীবচন্দ্র এতে বিশ্বাসী ছিলেন, সমকালে এটি একটি তত্ত্ব হিসেবে প্রচলিত ছিল। বন্দিনী অবস্থায় শৈলের পরিবর্তনটি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ও ইঙ্গিতধর্মী—

> "শৈল উর্ধমুখে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া মনে করিতে লাগিল প্রজাপতি আবার আসিবে……। কই, এখনো ত আসিল না, তবে কি উড়িতে উড়িতে দূরে গেলো? গবাক্ষ কি ছাড়াইয়া গেলো? তবে ত আর খুঁজিয়া পাইবে না, কে প্রজাপতিকে পথ বলে দিবে, আমি কেমন করে তারে ফিরাব, আমি কি বলে তাহারে ডাকিব, ডাকিলে কি সে শুনিতে পারে।" "এই আমি এখানে" বলিয়া চীৎকার করিয়া শৈল প্রজাপতিকে ডাকিতে লাগিল ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।……আবার চীৎকার করিয়া শৈল কাঁদিয়া বলিল, কে হয় তো আমার প্রজাপতিকে মেরে ফেলেছে, তাহা না হইলে সে আসিত—অবশ্য আসিত—অভাগিনীকে দেখা দিতে সে আবার আসিত। এখনও তো সে মরে নাই।"

এই ক্রন্দন অবশ্যই শুধুমাত্র প্রজাপতির জন্যে নয়। যে বিনোদকে শৈল একদিন তার জার বিলাসের সহায়তায় জীবন্ত কবর দিতে চিয়েছিল, তার স্বর্গীয় প্রেমকে অবহেলা করেছিল, তারই জন্যে অনুশোচনা শুরু। কিন্তু সঞ্জীব আধুনিক প্রতীকধর্মী কবিদের মত প্রথমেই বিনোদকে দিযে শুরু না করে সামান্য কীট পতঙ্গকে দিয়েই আরম্ভ করেছেন। উনিশ শতকের এই ধরণের প্রতীক ব্যবহার বাংলা

লেখকের পক্ষে অভাবনীয়। শৈলের অসুস্থ মানসিকতার ক্রম উদ্বর্তনও এখানে প্রায় আধুনিক—

"একবার একটি মাছি ধরিতে মাছিটি মরিয়া গিয়াছিল, শৈল তাহার নিমিত্ত কতই কাঁদিল।"

এই পরিচ্ছেদে আমরা আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করে অবাক হই। রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধন গল্পের স্বর্ণভাণ্ডারে আবদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিকতার সঙ্গে শৈলের কি আশ্চর্য মিল। রামদাস সন্ন্যাসী যখন' একখানি স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ হীরক ও মুক্তা খচিত অলঙ্কার রেখে গেলেন তখন শৈল যে স্বর্ণহারের লোভে শিশুর কণ্ঠমালা চুরি করেছে তা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে মৃত্যুঞ্জয়ের মত বলেছে—

"আমি এসকল কিছুই চাই না। আমায় একবার দেখা দাও। একবার আমায় শৈল বলে ডাক।"

নির্জনবাসের আত্মসমালোচনার মাধ্যমে শৈল তার কৃতকর্মের অধরাধের গুরুত্ব ক্রমে উপলব্ধি করতে করতে মানসিক ভারসাম্য শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। তার কাছে সত্য ও কল্পনার ভেদরেখাটি মুছে যায়—

"কখন পূর্বাবস্থা, কখন বর্তমান অবস্থা, কখন মেঘ বৃষ্টি। কখন রন্ধন কার্য ভাবিতেছে, শৈল মনে মনে অন্নযষ্টি তাডনা করিল, করিবামাত্র বুদ্বুদ অদৃশ্য হইয়া তাহার পরিবর্তে উত্তপ্ত জল টগবগ করিয়া স্থানে স্থানে লাফাইতে লাগিল। শৈল সরিয়া বসিল। ভাবিল অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত। এখন দেঁতোর মা কোথায়? আহারের স্থান পরিষ্কার করুক।

দেঁতোর নাম মনে আসিবা মাত্র সকল স্মরণ হইল। শিহরিয়া নত শিরে শৈল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। আপনার হৃদযাঘাত আপনি শুনিতে পাইল।"

সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাবার আগে মানুষ যে Obsession or Fixation of Idea তে ভুগতে থাকে তারই অতি স্বাভাবিক চিত্র আমরা আগের বর্ণনায় পেলাম। কিন্তু এর মধ্যে কাহিনী ধারার অতিরোমান্টিক অনুপ্রবেশ—গান বাজনা এমনকি গানের বাণী পর্যন্ত তুলে দেওয়ায় লেখকের মাত্রা জ্ঞানের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। ২৬শ পরিচ্ছেদের শেষে দেখি মাধবীলতা রামদাস সন্ন্যাসীর সহায়তায় ভূর্গভস্থ কারাকক্ষে শৈলের সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাকে সান্ত্বনা দেয়, জানায় বিনোদ মৃত নয়। প্রথমে ব্যাপারটা শৈলের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়, পরে অবশ্য বুঝতে পারে। ২৭শ ও ২৮শ পরিচ্ছেদের মাধবীর সঙ্গে শৈলের মিলন দৃশ্যটি অতি কোমল পেলব স্পর্শকাতরতার সঙ্গে লেখক বর্ণনা করেছেন। মাধবী ও শৈলের সম্পর্কের পূর্ব সূত্রও বর্ণনা করা হয়েছে। ২৯শ পরিচ্ছেদে রামদাস সন্ন্যাসী মাধবীকে আদেশ করলো শৈলকে ছেড়ে চলে যেতে। মাধবী তা অস্বীকার করলে শূল দিয়ে তার বুকে আঘাত করল। এই পরিচ্ছেদের শেষ অংশে শৈলের গুপ্ত কক্ষে বন্দী হয়ে পড়ার ঘটনা থেকে শুরু করে পরের পরিচ্ছেদে মাটির আরও নীচে যাদু কলাকৌশলের

রহস্যময় বালক ভুলান ডিটেকটিভ গল্প সুলভ বর্ণনার মাধ্যমে রামদাসের বন্দী হওয়া শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের সমস্ত মহত্ত্ব ও গভীরতাকে অনিবার্য ভাবে ব্যর্থতার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। রহস্যময়ী বৃদ্ধা যে মাতঙ্গিনী তারও পূর্বপরিচয় সূত্র না রেখে এবং মহেশচন্দ্রের মৃতারানীর বীভৎস দেহ উপস্থিত করে লেখক যে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, তা রূপকথার অলৌকিতা হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে লেখক কোন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেন নি। দোষী রামদাস সন্ন্যাসীর অন্যায়ের শাস্তি বিধান কোন Poetic Justice বা কাব্যিক ন্যায় বিচারের সমগোত্রীয় নয়। বরং তা সস্তাদরের ডিটেকটিভ নভেল বা মহৎ দস্যুর ক্রিয়াকাণ্ডের সমতুল্য। এমন কি রামদাস কেন মহেশচন্দ্রের রানীকে হত্যা করেছিল তারও কোন কারণ দেখান হয় নি।

৩১শ পরিচ্ছেদ সঞ্জীবচন্দ্র আবার তাঁর স্বাভাবিক চিত্র কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন আদালতের বিলাসের বিচার দৃশ্য দর্শনেচ্ছু গ্রাম্য দর্শকদের ছবি এঁকে। এই ছবির উপরে কোন বিদেশী বইয়ের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। "হাঞ্চব্যাক অব নটরডাম" বইটিতে এই ধরণের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এইখানে শিশুর সস্নেহ সহাস্য চিত্রটি বাৎসল্যরস রসিক সঞ্জীবের বিশেষ প্রবণতার সাক্ষর বহন করছে।—

> "বালকটি আবার পিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা। দুই পয়সায় ফাঁসি কিনিতে পাওয়া যায় না? পিতা বলিলেন, না। পুত্র পুনরায় অতি স্নেহভাবে বলিল, বিলাসবাবুর ফাঁসি হবে, বাবা, তোমার ফাঁসি কবে হবে?"

সঞ্জীবের লেখার এই ধরণের আর্টিষ্ট সুলভ চিত্রচয়ণ মাঝে মাঝে অসামান্যতা লাভ করলেও উপন্যাসিকের সার্থক সঙ্গতি অসঙ্গতি বোধের অভাব মাঝে মাঝে কি ভাবে পীড়িত করে তা আগের পরিচ্ছেদদ্বয়েই পরিচয় লাভ করেছি। অথচ সার্থক ঔপন্যাসিকের বহুগুণই সঞ্জীবের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। শেষ পর্যন্ত আদালতে বিলাস শৈল এবং বিনোদের সাক্ষ্য চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের সার্থকতা ঘোষণা করে। আদালত হতে নদী তীরের নির্জন বাসে ফিরে শৈলের সম্পূর্ণভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার বর্ণনাটিও অপরিশ্রুত বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনার সমগোত্রীয়।

৩২শ পরিচ্ছেদটি মূল্যবান অংশ। সঞ্জীব অন্যান্য পাগল চরিত্র অঙ্কনে পাগলের একটি সচেতন ভাববজায় রেখেছেন। মাধবীলতায় পিতম পাগল, দামিনীর মা, রামেশ্বরের অদৃষ্টে রামেশ্বর এমন কি কণ্ঠমালায় বিনোদের সাময়িক অস্বাভাবিকতার মধ্যে লেখকের চেষ্টাকৃত ভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শৈলের অপ্রকৃতিস্থতার মধ্যে সঞ্জীব যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা ঐ যুগের সাহিত্যের পক্ষে সত্যই অভাবনীয়। মনস্তত্ত্বের ব্যবহারবাদের (Behaviovrism) সূত্র ধরে কিভাবে স্তর পরম্পরায় সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ (Schizophrenic) রমণীর মানসিকতার বিশ্লেষণ করা যায় তা আধুনিক মনস্তত্ত্ব না পড়েও লেখক যেন দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হয় এখানে সঞ্জীব বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর-এর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। শৈবলিনীর নিজেকে সাপ বলে মনে হয়েছে, কিন্তু শৈল তার ভ্রষ্টাচারের

সঙ্গীকে অথবা পাপকে সাপ বলে মনে করেছে—এখানে চন্দ্রশেখর প্রভাবিত সঞ্জীবের সচেষ্টভাব থাকলেও সমগ্রভাবে এই পরিচ্ছেদটি তাঁর প্রতিভার বিচ্ছিন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় শৈলের ক্ষণে ক্ষণে অবস্থান্তর ঘটেছে তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

"কাহারে উদ্দেশ্য করিয়া শৈল কত সাধিতে লাগিল, শেষ রাগ করিয়া উঠিল আবার তৎক্ষণাৎ বসিয়া জোড় করে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিল একবার ফিরিয়া চাও, একবার মাত্র, আমি কিছুই চাই না। কেন? কি ক্ষতি? আমার প্রতি চাহিবে না? তবে আমায় একবার ডাক শৈল বলে ডাক। আমার নাম শৈল। না, না, আমার নাম শৈল নয় আমার নাম আর কিছু। আমার নাম বিনোদ।"

মানসিক বিকৃতির একটি স্তরে অভেদ (Identity) কল্পনার বিশেষ প্রবণতা আধুনিক মনস্তত্ত্বে স্বীকৃত। বিনোদের ভাবনামগ্ন আত্মপীড়িত শৈল শেষ পর্যন্ত যে নিজেকে বিনোদের সঙ্গে এক ভাববে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু সঞ্জীবের রূপকথা বলার শিশুসুলভ প্রবণতা শেষ পর্যন্ত সাধুগণের রক্ষা এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ বিধান করে উপন্যাস পাঠকের পরিণত মনটিকে একটি রসাভাসের দিকে অনিবার্য ভাবে টেনে নিয়ে গেছে। তাই যখন দেখি পাগল অবস্থায় ভয়ঙ্করী বেশে শৈল বিলাসবাবুর কাছে গিয়ে হাজির হল, তাতেই ঘটনাচক্রে পদস্খলিত বিলাসের পতন ও মৃত্যু। সংসারে এই সব ঘটনা সম্পর্কে মনে হতে পারে—"এমন কেন সত্যি হয় না আহা"! কিন্তু উপন্যাসের অমোঘ গতি যে অনিবার্য বেগে ধাবিত হয়, তাতে মনে হয় লেখকের বিশেষ কোন দায়িত্ব থাকে না। মহাভারতের সঞ্জয়ের মত তিনি কেবল ঘটনার গতি প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেন। কিন্তু সঞ্জীবের কণ্ঠমালা উপন্যাসে শেষপর্যন্ত যা করলেন তাতে লেখক ভাল গল্প বললেও তাকে অনিবার্যভাবে উপন্যাসের পরিণতি আমরা বলতে পারি না। কারণ ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাতে কাহিনী শেষ পর্যন্ত যে পরিণতি লাভ করে—তা ট্র্যাজিডি না কমেডি তাও নির্ভর করে ঘটনার গতির উপর, প্রতিটি স্তরের বিন্যাসে ও স্বাদে। তাকেই আমরা সার্থক উপন্যাস বলবো, যার মধ্যে লেখকের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যপক্ষে কৃত্রিমতা, কোন বিশেষ বিষয়ে আসক্তি এবং পল্লবগ্রাহীতা উপন্যাসকে দুর্বল করে দেয়। অথচ উপন্যাসের অন্যগুণ বিচিত্র রূপসাধনার মাধ্যমে উপন্যাসিকের রসসাধনা সঞ্জীবের মধ্যে ছিল, যদিও প্রাগুক্ত দোষেরও অভাব ছিল না।

৩২শ পরিচ্ছেদের থেকে ৩৭শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত উপন্যাসের পরিসমাপ্তি সূচিত হয়েছে। এই অংশে বাস্তবাস্তবের ভেদরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কাহিনীর দ্রুততা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ৩২শ পরিচ্ছেদে শৈলের পাগলামি বৃদ্ধি ও বিলাসের মৃত্যু। ৩৩শ পরিচ্ছেদে শৈলের মর্ষকামিতা (Sadism) ক্রমশ তাকে আত্মহত্যার দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটিয়েছে। শৈলের মৃত্যু নিঃসন্দেহে করুণ যুএবং এই করুণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শম্ভু তথা মহারাজ মহেশচন্দ্রের আপন কন্যার

শৈলের জন্যে আকুতি। যদিও পরের পরিচ্ছেদে দুঃখে অচঞ্চল জ্ঞানী শম্ভুর কথাগুলি নিতান্তই শুষ্ক তত্ত্বকথা বলে মনে হয়েছে—অথচ আগের পরিচ্ছেদগুলিতে শম্ভুর পর দুঃখে কাতরতার প্রচুর প্রমাণ লেখক দিয়ে গেছেন। ফলে এই নিস্পৃহতা জনিত চারিত্রিক অসঙ্গতির কোন স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। অবশ্য তিনি মহান্তকে বলেছেন তাঁরই অতিমাত্রিক শাস্তি বিধানের জন্যই শৈলের মৃত্যু ঘটেছে, ফলে তিনি বন্দীকে মুক্তির আদেশ দিয়ে বলেছেন,

"কোন দোষ সংশোধনের জন্য কি দণ্ড দিতে হইবে যে কোন রাজা বুঝেন এরূপ আমি শুনি নাই।"

হয়তো লেখক শম্ভুর জ্ঞানী মূর্তিটি এইভাবেই আঁকতে চেয়েছেন—যদিও এক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার অভাব একটু বেশীই চোখে পড়ে। শম্ভু মাতঙ্গিনীর কাছে মাধবীর সঙ্গে বিনোদের বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই মৃত্যুশোকাভিঘাতের পরিচ্ছেদে বিবাহের প্রসঙ্গটি হয়তো লেখকের নিজের কাছেই অসঙ্গত পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তাই তার কৈফিয়েৎ হিসাবে মাতঙ্গিনীর ভাবনায় আপন চিন্তার সমর্থন খুঁজেছেন—

"মহারাজের নিকট মৃত্যু আর বিবাহ তুল্যকথা। এই শোকের সময় বিবাহের কথা কিরূপে মহারাজের অন্তঃকরণে আসিয়াছে? আশ্চর্য অন্তঃকরণ। কেবল পাথর? তাহাই বুঝি কন্যার নাম শৈলকুমারী হইয়াছিল?"

কিন্তু এই বিরোধী চিন্তা থাকা সত্ত্বেও লেখক এই পরিচ্ছেদেই মাধবী ও বিনোদের প্রথম প্রেম প্রকাশের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। অন্য পরিচ্ছেদে এই ঘটনা বর্ণনা করলে লেখক আকস্মিকতা ও সঙ্গতিহীনতা দোষের হাত থেকে রেহাই পেতে পারতেন। তা সত্ত্বেও লেখকের চিত্রনির্মাণ ক্ষমতা এই সব অসঙ্গতির মধ্যে আমাদের মনে অপূর্ব একটি রূপলোক রচনা করে—মাধবীর কথাতে—

"চারিদিকের সুরের সঙ্গে আমার সুর মিলাইয়া কথা কহিতেছি। দেখিতেছ না সর্বত্র ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার সুর অতি মৃদু প্রায় শব্দ হীন। জড় জঙ্গম সকলেই এই ছায়ার সঙ্গে সুর মিলাইতেছে, ঐ দেখ নদীর জল নিঃশব্দে চলিতেছে। বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে। বক সাবধানে পদ বিক্ষেপ করিতেছে। মাছরাঙ্গা পালক মুড়ি দিয়া শুষ্ক ডালে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। পৃথিবীর গোলমাল একেবারে থামিয়া গিয়াছে। আমিও তাই চুপি চুপি কথা কহিতেছি।"

গীতি কবি সুলভ এই মনোভাবেই সঞ্জীবের গুণ ও দোষ। খণ্ড চিত্র রচনায় যেখানে তিনি মহৎ শিল্পী, সেক্ষেত্রে উপন্যাসকার হিসাবে ব্যর্থ। শিল্পী হিসাবে যেখানে তিনি ঘরে বসে ছবি দেখেছেন আর অন্তর বাহিরের রং দিয়ে ছবি এঁকেছেন, ঔপন্যাসিক হিসাবে আসক্তি মুক্ত হয়ে কাহিনী ও চরিত্রকে সার্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভুলে গেছেন। এক একটি ছবি আঁকার পর হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেছে উপন্যাস শেষ করতে হবে, তাই তাড়াহুড়ো করে কাহিনী শেষ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, ঘটনার স্রোতকে জোর করে যেন তাঁর নিজের ইচ্ছের কাটা খালে ঢুকিয়ে

দিয়েছেন—যা স্বচ্ছন্দ গতি বেগবতী স্রোতস্বিনী হয়ে মানসিক ব্যাপ্তির সাগরে মিলতে পারতো, তা না হয়ে নিতান্তই সঙ্কীর্ণ পরিসমাপ্তিতে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে।

৩৫শ পরিচ্ছেদে মাতঙ্গিনী কর্তৃক রামদাস সন্ন্যাসীকে পীড়ন একদিকে যেমন সমগ্রভাবে উপন্যাসের মূল সুরের পক্ষে অত্যন্ত লঘু চপল বালখিল্য তেমনি হাস্যকরও বটে। পরের পরিচ্ছেদটি এই তুলনায় কিছুটা সংযত। তবে পিতম পাগল ও জ্যোৎস্নাবতীর ভিখারী বেশে হঠাৎ মাধবীর রোগ শয্যার পাশে উপস্থিত হওয়া কেবলমাত্র কণ্ঠমালার পাঠকের কাছে একটি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা অথবা অলৌকিক কাণ্ড বলেই মনে হয়। কণ্ঠমালার স্বয়ং সম্পূর্ণতা এইখানেই সামান্য ব্যহত।

শেষ পরিচ্ছেদে (৩৭শ) বিনোদ ও মাধবীর মিলন দৃশ্যটি যেন নেহাতই 'আমার কথাটি ফুরালো নটে গাছটি মুড়োলো'। রূপকথা শেষ করে গল্পকার যেন হাসিমুখে শ্রোতার মুখের দিকে তাকালেন। ভাবতে অবাক লাগে—আধুনিক উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যেখানে পাঠকের মনকে গভীর অতলান্ত মনোজগতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, সেখানে এই পরিণতি আমাদের মনকে একটা মহৎ কিছু অপ্রাপ্তির হতাশায় পরিপূর্ণ করে তোলে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থক ভাবেই মন্তব্য করেছেন,

"তাঁহার উপন্যাসিক প্রতিভার ব্যহত ও প্রতিরুদ্ধ বিকাশের জন্য আমাদের মনে একটা খেদের ভাব জাগাইয়া তোলে।"[৫৫]

কণ্ঠমালা উপন্যাসের ভঙ্গী বিশ্লেষণ করে আমরা দেখছি উপন্যাসটির নাম কণ্ঠমালা দেবার বিশেষ কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। নামকরণের ক্ষেত্রে সঞ্জীবের এই অসতর্কতা অন্যান্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে। উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখকরা মূলত পাঁচটি দৃষ্টি কোণের একটি অবলম্বন করেন—প্রথমতঃ ঘটনালম্বিত নাম, যাকে ঘিরে সমস্ত চরিত্র ও কাহিনী পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। দ্বিতীয়তঃ চরিত্র প্রধান নাম যে চরিত্রকে ঘিরে বাকী চরিত্র ও কাহিনীর বিস্তার। তৃতীয়তঃ ভাব বা থীম প্রধান নাম বা লেখকের বিশিষ্ট মানসিকতার দ্যোতক, চতুর্থতঃ উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্যগত নাম এবং পঞ্চমতঃ আবেষ্টনী নির্ভর নাম। কণ্ঠমালা উপন্যাসটি ভ্রমরে যখন প্রকাশিত হচ্ছিল এবং প্রথম সংস্করণে লেখক কণ্ঠমালা নামের সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে শৈল নামটি উল্লেখ করে যাচ্ছিলেন। পরে শৈল নামটি তিনি আর ব্যবহার করেন নি। বোঝা যায় কণ্ঠমালা নামটি তিনি ঘটনা প্রাধান্যের দিকেই নির্দেশ করেছেন। কিন্তু লেখক ঘটনা প্রাধান্য অপেক্ষা যেন ভাব প্রাধান্যকেই প্রশ্রয় দিতে চেয়েছেন। শৈল নামকরণের যুক্তি অবশ্য শক্তিশালী ছিল—কারণ নায়িকা ও প্রধান চরিত্র শৈল তার নামানুসারে গ্রন্থের নাম শৈল হতে কোন বাধা ছিল না। অথচ গ্রন্থের নাম শেষ পর্যন্ত তিনি কণ্ঠমালা করেছেন কেন তার কারণ সম্ভবত সঞ্জীবের বঙ্কিম প্রভাবিত আদর্শবাদ। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন,

"শৈলর চরিত্র কতকটা প্রকৃতমূলক। যেমন সচ্চরিত্রের আখ্যান উপকারী তেমন

অসচ্চরিত্রের কথনও উপকার আছে। যাহারা পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যরূপে হিংস্রজন্তু তাহাদের জানাও আবশ্যক।" (প্রথমবারের বিজ্ঞাপনাংশ ১৮৭৭)। দেখা যাচ্ছে সচেতনভাবে লেখক তাঁর নায়িকা চরিত্রকে অসচ্চরিত্র এবং মনুষ্যরূপে হিংস্র জন্তু বলেছেন।

আমরা জানি ভূমিকায় শৈল সম্পর্কে যে মন্তব্যই করুন না কেন, তাকে তিনি নায়িকার মর্যাদা দান করেছেন এবং তার প্রতি তাঁর সহানুভূতি অপ্রকাশ্য নয়। এই সহানুভূতি বলেই তিনি প্রথমে গ্রন্থের নাম শৈল রেখেছেন, পরে পাপী চরিত্রের নামে গ্রন্থের নামকরণ করতে যে দ্বিধা দেখা দেয় তার মূলে সম্ভবত বঙ্কিমের প্রভাব কার্যকরী হয়। এখন প্রশ্ন 'কণ্ঠমালা' নামকরণের মূলে লেখকের কোন প্রবণতা কাজ করেছে তাও বিচার করে দেখতে হবে।

বিনোদের বন্ধু গোপালের শিশু পুত্রের কণ্ঠমালা শৈল চুরি করে। তাকে চুরির শাস্তি ও অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বিনোদ কারাবরণ করে। বিনোদের কারাবাসের সময় শৈলের ভ্রষ্টাচার, তারফলে তার শাস্তি ভোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি ও মৃত্যু অন্যদিকে বিনোদের পুরস্কার, মাধবীলতা লাভ। কণ্ঠমালা চুরি এই উপন্যাসে কেন্দ্রীয় ঘটনা না হলেও, ঐ ঘটনা কাহিনীর ও চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি। ঘটনা কেন্দ্রিক নাম হলেও কণ্ঠমালা চুরি কেন্দ্রীয় ঘটনা নয়—বরং কাহিনীর সূত্রপাত। এখানে অবশ্য একটি সমস্যা আছে—এই উপন্যাসের গ্রন্থন এতই শিথিল যে প্রকৃতপক্ষে এখানে কোন কেন্দ্রীয় ঘটনা নেই বললেই চলে। একমাত্র শৈলের শাস্তি ভোগ, মানসিক বিকৃতি ও আত্মহত্যা অন্যান্য ঘটনার চেয়ে বেশী প্রাধান্যলাভ করলেও তা কোন মতেই কেন্দ্রীয় ঘটনা নয়। অতএব কাহিনীর উৎস হিসাবে কণ্ঠমালা নামকরণ খুব অযৌক্তিক নয়। কিন্তু আমাদের মনে একটি সংশয় থেকে যায়, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু দার্শনিক সঞ্জীবের অন্তর্লোকের কোন ইঙ্গিত এই নামকরণের মধ্যে বাহিত হচ্ছে কি না। বিষবৃক্ষ, রক্তকরবী বা মুক্তধারার মত স্পষ্ট ইঙ্গিত বা প্রতীকধর্মিতা কণ্ঠমালা নামের মধ্যে নেই। তবে এরকম ভাবা অন্যায় হবে না, যে শৈলকে বিনোদ তার স্বর্গীয় প্রেম দিয়ে কণ্ঠমালা করে রেখেছিলেন তা শৈলের ভ্রষ্টাচার হরণ করে নিল, আপাতত গুরুদণ্ড শৈলের ভাগ্যেই জুটলো। অন্য দিকে বিনোদ তার প্রেমের সততায় মাধবীকে কণ্ঠমালা রূপেই পেলো। অবশ্য এই যুক্তি একান্তই পাঠকের কল্পনা নির্ভর।

কাহিনীর শুরু বা কথামুখ যথারীতি সঞ্জীবের বিশিষ্টতার পরিচায়ক এবং বঙ্কিমীরীতির অনুসারী। কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা অপেক্ষা চরিত্রের পরিস্ফুটনের দিকে লেখকের অধিক লক্ষ্য—

"একদিন অপরাহ্নে ছাদে বসিয়া জনৈক নাপিতানী একটি অল্প বয়স্কা গৌরাঙ্গীর পদে আলতা পরাইতেছিল।"

গৌরাঙ্গী যুবতী শৈল সুন্দরী এবং আপনার সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন, তবু সে আত্ম-প্রসংশা শুনিতে চায় তার প্রশ্ন—'আমার বর্ণ কি এতই সুন্দর?' আপাত দৃষ্টিতে

গহনার প্রতি নারীসুলভ আকর্ষণ মনে হলেও তার অলঙ্কারের লোভ এবং স্বামীর দারিদ্র্যের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন বিক্কার তথা স্বামীর প্রতি অপ্রেম কথারম্ভেই লেখক দেখিয়ে গেছেন।—

"সুন্দরী অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া বলিলেন, তা আর এজন্মে হয়েছে, নিত্য যে অন্ন পাই এই যথেষ্ট। আবার হীরাকাটা মল কোথায় পাব ?"

এই সূত্র ধরেই আমরা শৈল চরিত্রের স্বরূপ ও তার পরিণতি বুঝতে পারবো। শৈলকে ঘিরে লেখক অত্যন্ত সংযতভাবে তার চরিত্রের যৌনতার প্রাধান্য ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন—

"শরীর অল্প বাঁকাইয়া বক্ষ ঈষৎ উন্নত করিতে হইল, এই ভঙ্গীতে যে দেখিল সে ভাবিল সুন্দর।"

চরিত্র হিসাবে শৈল চরিত্রকে কোনক্রমেই সমতল বলতে পারি না। লেখক প্রায় কখনই তার চরিত্রকে বেশী বর্ণনা করেন নি। শৈল চরিত্রটি সঞ্জীবের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। কিছু কিছু অসঙ্গতি থাকলেও ঘটনার গতিতে শৈল আপনা-আপনি বিকশিত। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বিকাশক্রম অস্থিরময়তা ও একাধিক বৃত্তির সংঘাতজনিত তীব্রতা শৈলের মধ্যে যে ভাবে বৃত্ত রচনা করেছে, তাতে চরিত্রটি তিন আয়তনে বা ঘনত্বে (Three Dimension) সম্পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বৃত্তিনিচয়ের অসামঞ্জস্য শৈলকে জীবন্ত করে তুলেছে। রোহিনী, হীরা, মতিবিবি, শৈবলিনী চরিত্র পরিস্ফুটনে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত রূপক প্রতীক ব্যবহার করেছেন, সঞ্জীব সে সমস্ত কিছু প্রায় না ব্যবহার করেও ক্রমবিকাশের ও আকস্মিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে অতি আধুনিক শিথিল সংবদ্ধগঠন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চরিত্রের পূর্ণব্যক্তিত্ব রচনা করেছেন। বৃত্তাকার চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ, লেখক গোড়া থেকে চরিত্রটির কোন মাপ বলে দেন না—ঘটনা ও সংঘাতের মাধ্যমে সে আপনিই বেড়ে উঠতে থাকে। যদিও এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি শৈলচরিত্র সৃষ্টিতে ব্যক্তিচেতনা এবং ব্যক্তির মূল্যবোধ লেখকের সচেতন সামাজিক মূল্যবোধ ও সমাজচেতনার কাছে পরাস্ত হয়েছে, তা সত্ত্বেও এই চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু যে অবদমিত কাম তা আমাদের খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না। বিনোদের অপরিমিত বাৎসল্য স্নেহ থাকলেও, নিজে নিঃসন্তান। তার দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে কাব্য থাকতে পারে—কিন্তু সুদৃঢ় পৌরুষের কোন বিকাশ নেই। রক্তমাংসের স্বাদহীন ভালোবাসায় শৈলের যে অচিরেই বিরাগ জন্মাবে তা বোঝাই যায়। শৈলের রূপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে—

"শৈলের মুখ প্রতি চাহিতে চাহিতে ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলি বিনোদ আদরে টিপিলেন। আবার হাতখানি যেখানে ছিল সেইখানে যত্নে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে প্রাঙ্গণ হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন। শৈল তখনও বিমর্ষভাবে দ্বারে মাথা হেলাইয়া বিনোদের প্রতি চাহিয়া আছে। বিনোদের চক্ষে জল আসিল।"

শৈলের প্রতি ভালবাসায় বিনোদের চক্ষে জল আসতে পারে, কিন্তু আদিম নারী প্রকৃতি কি তাতে তৃপ্ত হয়? তারই ফলশ্রুতি শৈলের চরিত্র। যে নারী পুরুষের কাছে পীড়িতা হতে চেয়েছে তার চরিত্র তো জটিল হবেই। শেষ পর্যন্ত বিনোদের জন্য নির্জন কারাবাসে পীড়ন ঘটেছে বলেই সে বিনোদমুখী হয়ে উঠেছে। তবে তার মানসিক পীড়ন বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া, কোন স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া নয়। সঞ্জীবের ব্যক্তি চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা এখানে ধরা পড়ে গেছে—অন্যান্য উপন্যাসে এই দোষ আরও প্রকট।

উপন্যাসের ঘটনা বৈশিষ্ট্য আলোচনা ক্রমে আমরা দেখেছি শৈলের বাল্যজীবন রহস্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে মহারাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা, ব্রাহ্মণ রাঘবরাম দ্বারা প্রতিপালিত, তার মাকে রামদাস সন্ন্যাসী হত্যা করেছিল। কেন তিনি তাঁর স্বামীর অমতে বিদেশ যাত্রা করেছিলেন এবং কেনই বা রামদাস তাঁকে হত্যা করলো তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অনাবিষ্কৃত রহস্যের অন্তরালে তার মনে বাল্যকালের অস্পষ্ট স্মৃতি মন্ত্রের মত কাজ করেছে—যে ভীমকায় পুরুষ সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে তাকে নির্জন বাসে নিয়ে গেলো সেই সময় প্রাচীরে তাঁর 'মেঘবৎ গম্ভীর স্বর শুনে শৈল শিহরিয়া উঠিল, এ স্বর অপরিচিত নহে। বালিকা কালের কি এক ঘোর অথচ অস্পষ্ট কথা মনে আসিয়া আর আসিল না।' শৈল চরিত্রের উন্নতি ও পরিণতিতে এই ধরণের অস্পষ্ট অবচেতনার স্বল্পালোক শৈলের চরিত্রের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে। খুব স্পষ্ট ভাবে না হলেও লেখক দক্ষতার সঙ্গেই চরিত্রের আবহ সৃষ্টির কাজটি সম্পন্ন করেছেন—সে সুন্দরী কিন্তু লোভী, আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে যে সর্বদাই তৎপর। স্বামীর ভালোবাসার প্রতি তার তাচ্ছিল্য খুব স্পষ্ট নয়, বরং তার প্রতি লেখকের সহানুভূতি চরিত্রের মৌলিক গতি প্রকৃতিতে কিছুটা অসংগতি সৃষ্টি করেছে। যে নারী আপন প্রেমময় স্বামীকে ভুলে এক লম্পট জারের সঙ্গে অবৈধ জীবন যাপন করতে পারে এবং অত্যন্ত ক্রূর ভাবেই স্বামীর মৃত্যুর যথার্থতা বিচার না করেই যে তাকে কবরস্থ করতে দ্বিধা করে না এবং পলায়নোন্মুখ জারকে চুলের মুঠি ধরে কবর দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করতে বাধ্য করে, তার সম্পর্কে লেখক যখন মন্তব্য করেন,—

> "সাংসারিক অপ্রতুলতা জনিত যত যন্ত্রণা, তাহা প্রায় শৈল একা ভোগ করিত, বিনোদ কেবল আহারের সময় আসিয়া আহার করিতেন, কোন বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন না।"

এই ধরণের সহানুভূতি প্রকাশের পর লেখক বিনোদকে কবর দেবার দৃশ্যটিতে তার পিশাচী মূর্তি অঙ্কন করেন। এদের মধ্যে বাইরের কিছু অসঙ্গতি থাকলেও অভ্যন্তরের মনস্তাত্ত্বিক যোগসূত্র ছিন্ন হয় নি।

স্বৈরিণী নারী চরিত্রের সাহস শৈলের মধ্যে প্রবল ভাবেই দেখান হয়েছে। সর্পের উদ্ধত ভঙ্গী তার স্বৈরিণী স্বভাবের পূর্ণ চিত্রখানি গঠন করে তোলে। এই

ঔদ্ধত্য, চাকরানীকে শাসন করবার সময় যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি নির্জন বাসে যাবার সময় অথবা নির্জন বাসের পীড়নে এমন কি আদালতে উপস্থিত হওয়া থেকে শুরু করে বিলাসের মৃত্যু ঘটান পর্যন্ত সমানভাবেই অঙ্কিত হয়েছে। অথচ লক্ষ্য করবার বিষয় লেখক তার এই চরিত্রের কোন সমতল বর্ণনা দেননি। তিনি সমগ্রভাবে যে উপাদান সমস্ত গ্রন্থে ছড়িয়ে রেখে গেলেন তাই নিয়ে ত্রিস্তর বিশিষ্ট ঘনমূর্তি গড়ে তোলা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। তবু লেখকের খুব অল্প বর্ণনা থেকে শৈলের চিত্রটি আমরা স্পষ্ট করে নিতে পারি—

"সুন্দরীর নাম শৈল। বয়স উনবিংশতি বৎসর। তিনি আপনার গৃহে একা ফুটিয়া থাকিতেন। স্বামী ভিন্ন আর কেহই গৃহে ছিল না।"

অন্যত্র মাধবীলতার সঙ্গে তুলনায় লেখক তার যে পরিচয় দিয়েছেন—

"শৈল ক্ষীণাঙ্গী। শৈলকে কখন হাসিতে দেখা যাইত না। শৈলের দৃষ্টি সর্বদাই তীব্র বোধ হইত, আবার তাহার প্রতি কেহ চাহিলে সেই তীব্রতা আরও বাড়িত।"

তবে শৈল চরিত্র যেখানে তার মানসিক বিকৃতিতে প্রকাশিত সেখানেই সে একটি অসাধারণ সৃষ্টি।

কণ্ঠমালা উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলির মধ্যে মাধবীলতা ও মাতঙ্গিনী ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলি নামে মাত্র আছে। মাধবী চরিত্রটি কণ্ঠমালার পূর্বভাগ মাধবীলতায় বর্তমান। যদিও কণ্ঠমালা (১৮৭৭) মাধবীলতার (১৮৮৫) অনেক আগেই লেখা। সম্ভবত কণ্ঠমালায় মাধবীলতার আবির্ভাব এবং জন্মরহস্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে দেখাবার তাগিদেই সঞ্জীবের কণ্ঠমালার পূর্বভাগ মাধবীলতা রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। যদিও মাধবীলতা গ্রন্থের মাতঙ্গিনী, মহেশ্চন্দ্র, পিতম পাগল ও জ্যোৎস্নাবতী চরিত্রগুলি কণ্ঠমালাতেই প্রথম পদক্ষেপ করে, মাধবীলতায় লেখক তাদের সম্যক বিকাশ ঘটিয়েছেন। কণ্ঠমালায় মাধবীলতার পূর্বপরিচয়, রহস্যাবৃত। মাধবীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

"মহারাজ মহেশ্চন্দ্রের সংসারে এই রূপবতী আশৈশব প্রতিপালিতা অথচ তাহার পরিচয় কেহ জানিত না, লোকে নানা সন্দেহ করিত। কেহ কেহ বলিত যুবতী কোন নর্তকীর গর্ভজাত।"

মাধবীর এই পরিচয় দান বোধহয় লেখকের পছন্দ হয় নি, তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাধবীলতা লিখতে হয়েছিল। মাধবীর জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত করে তাকে মহারাজ ইন্দ্রভূপের কন্যারূপে পরিচয় দান করেছেন (মাধবীলতার আলোচনা দ্রষ্টব্য)। মাধবী চরিত্রটিকে আমরা কোনমতেই জটিল বৃত্তাকার চরিত্র বলতে পারি না। এইখানে মোটামুটি তার সহজ সরল চরিত্রের সহজ বর্ণনা দিয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্র—

"শৈল অপেক্ষা এই যুবতী (মাধবী) প্রায় সাত আট বৎসর বয়োধিকা, তদভিন্ন, শৈল ক্ষীণাঙ্গী, যুবতী ঈষৎ স্থূলাঙ্গী।...যুবতী কখন হাসি ছাড়া থাকিত না।

যুবতী কখন উচ্চ হাসি হাসিত না অথচ সতত হাসিত, কিন্তু সে সময় নিকটস্থ শ্রোতাদিগের মুখ প্রতি চাহিয়া হাসিত। যুবতী অপ্রতিভের হাসি আর তাহার দুঃখের কান্না প্রায় একই রূপে দেখাইত, হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে সহজে তাহা বুঝা যাইত না। অনেকে বলিত ওষ্ঠের গঠনের নিমিত্ত তাহার ক্রন্দনেও হাসি বোধ হইত।"

…আবার কথায় কথায় তাহার মুখ আরক্ত হইত, তৎসঙ্গে নিম্ন দৃষ্টি নাসাগ্রে ঘর্ম ওষ্ঠকম্প দেখা যাইত।"

মাধবীর আকৃতি ও প্রকৃতির যে বর্ণনা এইখানে দেওয়া হয়েছে সমগ্র উপন্যাসে তার কোথাও তেমন কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তার কোমল সহাস্য মূর্ত্তিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার সঙ্গীত প্রতিভা। সেই প্রতিভা তাকে কবি ও শিল্পীতে পরিণত করেছে। সে তার শিল্পী সুলভ দৃষ্টি দিয়ে যেমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছবি দেখে তেমনি নিজেও ছবিতে পরিণত হয়।—

"সে উদ্দীপ্ত দীপালোকে সুন্দরীর উন্নত মুখমণ্ডল আর একখানি চিত্রিত পট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।"

অপর পক্ষে কবি সুলভ দৃষ্টিতে সে সমগ্র বিশ্বের অণুপরমাণুতে বিশ্বপ্রাণের ধ্রুবপদ লক্ষ্য করে—

"ছায়ার স্বর অতিসূক্ষ্ম, প্রায় শব্দহীন। জড় জঙ্গম সকলেই এই ছায়ার সঙ্গে সুর মিলাইতেছে।"

কপালকুণ্ডলা চরিত্রের পরিস্ফুটনের জন্যে যেমন মতিবিবি চরিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন হয়েছে, তেমনি শৈল চরিত্রের পটভূমিতে মাধবীর ব্রীড়াবনত প্রেক্ষাপটটি অত্যন্ত শিল্পীসুলভ দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করা হয়েছে। মাধবীলতা গ্রন্থে মাধবীর চরিত্র বলে কিছুই নেই—কারণ সেখানে সে নিতান্ত শিশুরূপেই চিত্রিত। এই চরিত্রটি প্রতি লেখকের গভীর মমতা উপলব্ধি করা যায়, তাই মাধবীলতা গ্রন্থের নামকরণের পিছনে লেখকের বাৎসল্য স্নেহ ব্যতীত অন্য কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও তার নামেই মাধবীলতার নামকরণ করেছেন। মাধবী ছাড়া অন্য কোন চরিত্রের প্রতি লেখক এতখানি দরদী হয়ে ওঠেন নি। তার শান্ত কোমল মূর্ত্তির সঙ্গে যুক্ত করেছেন তার স্বাভাবিক জ্ঞান—সর্বজীবে সমদৃষ্ট। এই জ্ঞানকে সে বিন্দুমাত্র করে রাখেনি। শৈলের প্রতি তার যে স্নেহ তা তার স্বভাবের সঙ্গে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ কারণ শৈলের জন্যে সে তার সঙ্গে কারাবাসেও প্রস্তুত। কিন্তু এই আত্যন্তিক কোমলতার যে বিপদ ঘটে তাও ঘটেছে, যখন ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বৃদ্ধ রামদাস সন্ন্যাসী তাকে বিবাহ করবার জন্যে যে অসংগত প্রস্তাব দিয়েছে তা সে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না।

মাধবী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে মাতঙ্গিনী চরিত্র। নারী চরিত্র তিনটির নামকরণে লেখকের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। শৈল কুমারী যে পাষাণী তা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন (২৪শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। মাধবীলতা

যে 'সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতেব' তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। অন্যপক্ষে মাতঙ্গিনী সত্যই মত্ত মাতঙ্গিনী। তার সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি এবং রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় আমরা মাধবীলতায় পেয়েছি—যদিও যুবতী বিধবা মাতঙ্গিনী কণ্ঠমালার বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী সৃষ্টির পরেই হয়েছে। তবু যুবতী মাতঙ্গিনীর সঙ্গে বৃদ্ধা মাতঙ্গিনীর চরিত্রের সঙ্গতির কোন অভাব দেখা যায় না। কণ্ঠমালায় মাতঙ্গিনী চরিত্রটি এক রংয়েই অঙ্কিত। তার প্রথম আবির্ভাবটি রহস্য মণ্ডিত। রোমান্সের ভয়াল পরিবেশে তার উপস্থিতি রীতিমত রোমাঞ্চকর।

> 'ক্ষণপরে সন্ন্যাসী রামদাস দেখিল নিম্নস্তরে একটি ক্ষুদ্র ঘরে তাহাকে আসিতে হইয়াছে। তথায় একটি ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে, পার্শ্বে একজন বৃদ্ধা বসিয়া মালা জপিতেছে। তাহাকে সন্ন্যাসী ইতিপূর্ব্বে কখন দেখে নাই, এখন দেখিয়াও উৎসাহিত হইল না। বৃদ্ধা কৃশাঙ্গী, লোলচর্মা, গৌরবর্ণা, কিন্তু দৃষ্টি অতি প্রখর, অতি ভয়নক। রামদাসকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, পরে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল, 'আইস, কি ভাবিতেছ? আমি তোমার প্রহরী তোমায় যত্ন করিয়া রাখিব, শৈলের প্রতি যেমন তুমি নিষ্ঠুর ছিলে আমি সেরূপ হব না।' এই বলিয়া বৃদ্ধা আবার হাসিয়া উঠিল। সে হাসি দেখিয়া সন্ন্যাসীর অঙ্গ কণ্ঠকিত হওয়ায় সে মুখ ফিরাইল।"

এই বৃদ্ধাই মাতঙ্গিনী এবং তাঁর ঐ বেশ ছদ্মবেশ। একদিকে তিনি যেমন দুষ্টের দমন করতে ভয়ঙ্করী ও কঠোরা তেমনি শম্ভু তথা মহারাজ মহেশচন্দ্রের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা —কিন্তু তাই বলে তিনি যে প্রভুর বিচার করেন না তা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ তাঁর মধ্যে স্পষ্ট। তিনি মনে মনে বিচার করেন—

> "মহারাজের নিকট মৃত্যু আর বিবাহ তুল্য কথা। এই শোকের সময় বিবাহের কথা কিরূপে মহারাজের অন্তঃকরণে আসিয়াছে? আশ্চর্য অন্তঃকরণ। কেবল পাথর? তাহাই বুঝি কন্যার নাম শৈলকুমারী হইয়াছিল।"

এই বিচার বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অসাধারণ বিচক্ষণতা, যার বলে তিনি অনায়াসে রামদাসের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারেন—যার মধ্যে নারীজনোচিত অনুভূতি গভীরভাবে কাজ করেছে। তাঁর মাধবীর প্রতি স্নেহ শাসনের স্বরূপটিও ভারি সুন্দর। পরভৃতিকা রাজকুমারী মাধবীলতাকে তিনি আপন কন্যার সমান পালন করেছেন, তার ভবিষ্যৎ সুখের চিন্তায় তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই। তাই মাধবীলতা যখন বিনোদকে ভালবাসে এবং তাকে বিবাহ করতে পশ্চাদপদ হয়, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই ক্রোধের মধ্যে তাঁর স্নেহের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত খল স্বভাবের রামদাস সন্ন্যাসীকে পীড়ন করবার সময় তিনি ভয়ঙ্করী, এমন কি তাঁর কথার অন্যথা করলে তিনি যে কোন লোককে কঠোর শাস্তি দিতে পারেন। এক কথায় কণ্ঠমালার রোমান্সরসের পরিবেষ্টনে মাতঙ্গিনীর বড়ো ভূমিকা আছে। যদিও কাহিনীর অবাস্তবতাকে প্রকৃতপক্ষে মাতঙ্গিনীই বাড়িয়ে তুলেছেন। তবু তাঁর

চরিত্রের উজ্জ্বল রঙীন সাহস আমাদের মনে তাঁর যে বীরাঙ্গনা মূর্ত্তিটি গড়ে তোলে তা অবিশ্বাস্য হলেও ঐশ্বর্যময়ী।

কণ্ঠমালায় পুরুষ চরিত্র অনেকগুলি থাকলেও মোটামুটি ভাবে চারটি চরিত্র স্থপরিস্ফুট। এই চরিত্রগুলি যথাক্রমে বিনোদ, শম্ভু কয়েদী বা মহেশচন্দ্র, রামদাস এবং বিলাস। এছাড়া জেল দারোগা, মহন্ত, গোপালবাবু সন্ন্যাসীদ্বয় ইত্যাদিও তাদের ক্ষণিক উপস্থিতিতে আপন আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে।

বিনোদ শৈলের স্বামী এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র, তবু আমাদের সন্দেহ হয় সে এখানে নায়ক কিনা। নিঃসন্দেহে বিনোদ কাহিনীর কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র, তা সত্বেও শম্ভু কয়েদী বা মহারাজা মহেশচন্দ্রের মধ্যে যে নায়কোচিত গুণ আছে, যে প্রাণ চাঞ্চল্য আছে তা বিনোদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর দু দিকে রয়েছে নায়িকা শৈল এবং উপনায়িকা মাধবী। তা সত্বেও তাঁকে ঘিরে কোন ত্রিকোণ প্রেম সমস্যা গড়ে ওঠেনি। তাঁর ভীরুকাব্যময় প্রেম মূলত পৌরুষহীন, আর এই পৌরুষহীনতা তাঁর স্ত্রীকে ভ্রষ্টা হতে সাহায্য করেছে। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে নারী সুলভ কোমলতা, কবি সুলভ প্রেম ভাবুকতা এবং বৈষ্ণবোচিত সহনশীলতা লেখক রক্ষা করে গেছেন। রোমান্সের নায়কের গতিশীলতা তার মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত। এই ধরণের কোমল চরিত্র গঠনের প্রতি সঞ্জীবের বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—দামিনীর রমেশ, মাধবীলতার ইন্দ্রভূপ এবং কণ্ঠমালার বিনোদ প্রায় একই চরিত্র। এর পশ্চাতে লেখকের নিজের ব্যক্তিজীবনের উৎকেন্দ্রিকতা জনিত দুঃখের দহন ও সহন এবং কাব্যসৌন্দর্য চর্চ্চার বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বিনোদের প্রথম পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক তাঁর যে পরিচয় দিয়েছেন তাঁতেই তার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> "শৈলের স্বামীর নাম বিনোদ, বয়স বত্রিশ বৎসর, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সরল আমোদ প্রিয়। কোন কারণ প্রযুক্ত পিতৃত্যক্ত অর্থ অনেকদিন হইল নষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে সামান্য আয় ছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়া অতিকষ্টে কালযাপন করিতেন। কষ্ট তিনি সবিশেষ জানিতে পারিতেন না।"

বিনোদের আড়ালে যেন আমরা সঞ্জীবের আত্মপরিচয়ের আভাস পাই। এই বিনোদ তাঁর উনিশ বৎসর বয়সের সুন্দরী স্ত্রীকে অসাধারণ ভালবাসেন, তার প্রতিদানে তিনি কিছু পান বা নাই পান সেদিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই। স্ত্রীর হাস্যশূন্য বিরস বিমর্ষ মুখ দেখে, তার জন্যে কারাবরণ করে এবং তার চৌর্য বৃত্তির কথা জেনেও বিনোদ তারই জন্যে ব্যাকুল। তারই দেখা পাবার আশায় যে পথ তাঁর অতিক্রম করা অসম্ভব তাও তিনি পার হয়ে যান। শৈলের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা একান্তই আপন অন্ধপ্রেম। এই ভালবাসার পরিচয় লেখক গোপালবাবুর বক্তৃতায় দিয়েছেন—

"বিনোদের ভালবাসায় ভ্রম আছে সত্য। কিন্তু কানা না হইলে ভালবাসা জন্মে না, যে দোষ দেখিতে পায় সে কখন ভালবাসিতে পারে না, ভ্রমই এই পৃথিবীর সুখ।"

বিনোদের এই অন্ধ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের ছবিটা লেখক দক্ষশিল্পীর তুলিকায় এঁকেছেন—বিনোদ চরিত্রের উন্নতিতে লেখকের সবচেয়ে বড় ত্রুটি তাঁর মধ্যে দ্বৈততায় অভাব। যে বিনোদ শৈল অন্তপ্রাণ, তার দোষকে গুণ ভেবে নিতে পেরেছেন, সেই বিনোদ যখন মাধবীকে ভালবেসেছেন তখন তাঁর মধ্যে শৈলের জন্যে বিন্দুমাত্রও চিত্ত চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় না। ত্রিকোণ প্রেম কাহিনী না হতে পারে, কিন্তু লেখক মাধবী বিনোদের মিলন কথায় শৈলকে একেবারে বিদায় দিলেন কেন, বঙ্কিম যুগের অপেক্ষাকৃত অধিক বাস্তববাদী লেখকের কাছে তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। আদালতে বিনোদ শৈলের সাক্ষাৎ হবার পর শৈলের বিকৃত মানসিকতায় যে প্রতি-ক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলো সেই তুলনায় বিনোদের প্রতিক্রিয়ার কোন ছবিই আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। শৈল সম্পর্কে বিনোদের মনে কোন পূর্ণচ্ছেদ পড়ার কথাও নয়। শেষাংশে বিনোদের সংলাপও বড় দুর্বল, তারমধ্যে আগের অংশে যে কবিত্বময় ভাষা রচনার ক্ষমতা দেখেছি শেষ অংশে তা অত্যন্ত শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ হয়ে উঠেছে।

বিনোদের তুলনায় শম্ভু কয়েদী বা মহারাজ মহেশ্চন্দ্রের চরিত্র অনেক বেশী সুঅঙ্কিত। তাসত্ত্বেও প্রথমেই স্বীকার করতে হচ্ছে শম্ভু যে পরিমাণ জীবন্ত সেই পরিমাণে স্বাভাবিক নয়। একই চরিত্রের যেমন দুটি নাম,—তেমনি সত্তাও প্রকৃতপক্ষে দুটি। শম্ভু কয়েদী রূপে তিনি অনেক বেশী প্রাণচঞ্চল। আবার মহারাজরূপে তাঁর স্থির গম্ভীর ব্যবহারে কিছু স্বাভাবিকতা থাকলেও সেখানে প্রাণশক্তির একান্ত অভাব দেখা যায়। মহারাজ মহেশ্চন্দ্রের পরিচয় মাধবীলতায় লেখক যেভাবে দিয়েছেন সেইভাবেই তিনি কণ্ঠমালার মহেশ্চন্দ্রের পূর্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন—দুই গ্রন্থেই চরিত্রের সংগতি রক্ষা করা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি বিনোদ কণ্ঠমালা গ্রন্থের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র হলেও তার মধ্যে নায়কোচিত কর্মচাঞ্চল্যের একান্ত অভাব সেই অভাব পূর্ণ করেছেন শম্ভু। নায়কের Doings and Sufferings কার্যত যথাক্রমে শম্ভু ও বিনোদের মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিনোদ চরিত্রে যদি Sufferings প্রধান হয়, তবে শম্ভু চরিত্র Doings ই প্রধান।

শম্ভুর প্রথম আবির্ভাব কয়েদী রূপে, বিনোদের প্রতি তার অসীম সহানুভূতি; জেলখানার কঠোর পরিশ্রমের যন্ত্রণা থেকে অসুস্থ বিনোদকে মুক্তি দেবার জন্যে তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে সহানুভূতি ও মহাপ্রাণতা থাকলেও দূরদর্শিতার পরিচয় নেই—থাকলে বিনোদকে বেত্রের আঘাতজনিত কঠোর শাস্তি পেতে হতো না। কিন্তু ঐ একই কালে শম্ভুর দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি আমাদের বিস্মিত করে—বিনোদের মুখে শৈলের প্রশস্তি শুনে অনায়াসে বলেন—

"ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত শৈলের কারণে কয়েদ হও নাই?"

জেলখানায় শম্ভুর নেতৃত্বের স্বরূপটি এমনই সুঅঙ্কিত যে তা কেবল লেখকের বর্ণনা মাত্র নয়—চরিত্রের কর্মচাঞ্চল্য তাঁকে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ প্রকাশমান করে তুলেছে। অথচ শম্ভু চরিত্রকে ঘিরে লেখকের কল্পনা সম্ভব অসম্ভবের সীমা প্রতি মুহূর্তে লঙ্ঘন করে গিয়েছে। শম্ভু প্রকৃতপক্ষে মহারাজ মহেশচন্দ্র তিনি চিরকৃতজ্ঞ রামদাসকে রক্ষা করতে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছেন। কারাগারে তিনি শম্ভু কয়েদী। তাঁর বীরোচিত স্বভাবের গুণে ইংরেজ জেলদারোগার সহায়তায় যখন খুশী জেলের বাইরে যাওয়া আসা করেন—আর তিনি যখনই জেলের বাইরে আসেন তখনই একটি মহৎ কর্মানুষ্ঠান করেন এবং যেদিন প্রয়োজন বোধ করলেন সেদিন এক অলৌকিক ঘটনা সংযোগে জেলখানা থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

অন্যপক্ষে মুক্তজীবনে তিনি মহারাজ মহেশচন্দ্র ; লক্ষ লক্ষ টাকা সৎকর্মে ব্যয় করেন। এরই মধ্যে দেশোদ্ধারে তিনি মহাকুলীন সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি আপন আত্মজার ভ্রষ্টচরিত্র সংশোধনের জন্যে এমনই শাস্তির ব্যবস্থা করলেন যে শেষ পর্যন্ত তাতে শৈলের মস্তিষ্ক বিকৃতি ও আত্মহত্যা ঘটল। এখানেও তাঁর দূরদর্শিতার অভাব দেখা যায়—যদিও লেখকের ভাষায় তিনি চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শী মহাজ্ঞানী কর্মী পুরুষ, ঠিক সময় ঠিক স্থানে তিনি উপস্থিত থাকেন, যেমন বিনোদের জেল থেকে ঘরে ফেরার রাত্রে—"বৃক্ষপার্শ্বে প্রাচীরের উপর দীর্ঘকায় এক পুরুষ"—রূপে চিত্রিত। অথবা শৈল যখন জলে ডুবে আত্মহত্যা করছিল, সেই সংকটিতে অবশ্য তাঁর বাৎসল্যের চিত্রটি সুঅঙ্কিত।—

"শম্ভু শোকাকুল সিংহের ন্যায় লাফাইয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিল, ক্ষুদ্র নদী ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। শম্ভু এক একবার জল হইতে মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে 'শৈল'। সে চীৎকার যেন প্রান্তর পার হইয়া মেঘে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শম্ভু আবার ডুবিতেছে আবার উঠিতেছে আবার ডাকিতেছে 'আমার শৈল'।

কন্যার প্রতি অপ্রকাশিত স্নেহের প্রকাশটি সত্যই সুন্দর। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী মহেশচন্দ্র কন্যার মৃত্যুর পরক্ষণেই যখন বলেন 'মৃত্যু কেবল পর জন্মের পূর্ব ক্রিয়া—গর্ভমুক্তি মাত্র,—সেই মুহূর্তের চরিত্রটিকে আর স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। হয়তো লেখক নিজেও বুঝেছেন তাই কৈফিয়ৎ স্বরূপ মাতঙ্গিনীর চিন্তায় বলেছেন—

"মহারাজের নিকট মৃত্যু আর বিবাহ তুল্য কথা। এই শোকের সময় বিবাহের কথা কিরূপে মহারাজের অন্তঃকরণে আসিয়াছে ? আশ্চর্য অন্তঃকরণ। কেবল পাথর ?"

তবে মহেশচন্দ্রের কর্মী ও জ্ঞানী মূর্তিটির আড়ালে যে বৈরাগী মূর্তি প্রতিক্ষণে আভাসিত, তাতে সমগ্রভাবে অসঙ্গতি যথেষ্ট থাকলেও সক্রিয় পুরুষ চরিত্র হিসাবে তিনিই কণ্ঠমালার সবচেয়ে সুঅঙ্কিত চরিত্র।

অন্যান্য পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে রামদাস চরিত্রটি প্রকৃতই খল চরিত্র। সে মহারাজ মহেশচন্দ্রের কর্মচারী হয়েও তাঁর পরম অনিষ্টকারী। সে মহারাজের স্ত্রীকে হত্যা করেছে, তা সত্ত্বেও মহারাজ তাকে রক্ষা করতে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছেন। আপাতভাবে সে আনুগত্য দেখালেও সর্বদাই সে তাঁর অনিষ্ট করতে সচেষ্ট। তার এই উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠুরতা প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যা বিহীন। সে কুৎসিত বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নারী মাংসলোলুপ, মিথ্যা প্রলোভন ও ভীতি এবং নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনে মাধবীকে বিবাহ করতে চায়। তবে শেষ পর্যন্ত এই শঠ পাষণ্ডকে শাস্তি দিয়ে লেখক তার প্রতি পাঠকের বিদ্বেষের জ্বালা কিছুটা লাঘব করেন। প্রকৃতপক্ষে সঞ্জীবের মত উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী লেখকের পক্ষে সার্থক খল চরিত্র আঁকা খুব সহজ সাধ্য নয়। মাধবীলতার চুড়াধন খল চরিত্র হলেও আমাদের সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে, সেই তুলনায় রামদাস বরং আরও বেশী পরিমানে শঠ ও পাষণ্ড। তবে তার অসঙ্গতি ও অবাস্তবতাও বড় কম নয়।

জেল দারোগার চরিত্রের মাধ্যমে সঞ্জীবের অভিজ্ঞতা সম্ভবত কর্মোপলক্ষে পরিচিত ইংরাজ জাতির বীরত্ব ও অর্থলোলুপতা প্রকাশ করেছে। সাহেবের দাম্পত্য জীবনের চিত্রটি সঞ্জীবের কৌতুক ব্যঙ্গ রচনার কৌশলকেই প্রকাশ করেছে। কৌতুক করার সুরসিক মনের প্রকাশ সঞ্জীব সবচেয়ে বেশী বিলাস চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ঘটিয়েছেন। এই লম্পটের মৃত্যুও আমাদের কাছে যেন একটি হাস্যোদ্দীপক ঘটনা। বিলাস শুধু লম্পট নয় সে ভীরু কাপুরুষ, শৈলের হাতের ক্রীড়ানক। শৈল তাকে পলায়ন করতে দেখে তার চুলের মুঠি ধরে বিনোদের জন্যে কবর খুঁড়তে বাধ্য করেছে। বিলাসের পাপ বোধের চিত্রটির মধ্যে কিছু কৌতুক রসের যোগান থাকার ফলে তা বেশ 'মেলোড্রামা' দোষে দুষ্ট হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও পাপী মনের চিত্রটি এখানে লেখক দক্ষতার সঙ্গেই এঁকেছেন। একথা সত্য বিলাস ভীরু লম্পট হলেও সে দুর্বৃত্ত বা খল চরিত্র নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবেন্দ্র (বিষবৃক্ষ) বা হীরালাল (মৃণালিনী) চরিত্রের সঙ্গে বিলাসের তুলনাই হয় না। বরং তার ভীরুতা আমাদের মনে তার সম্পর্কে একটা করুণাই জাগায়।

বিনোদের প্রতিবেশী ও বন্ধু গোপালবাবুর চরিত্রটি অল্প কথায় সুন্দর ভাবে অঙ্কিত। তারই ছেলের 'কণ্ঠমালা' চুরির সন্ধানে বিনোদের দুর্গতি। তিনিই যেন অপরাধী, তার জন্যে তিনি বারবার বিনোদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন—বিনোদের প্রেম সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাবোধটি গভীর—

"বিনোদের ভালবাসায় ভ্রম আছে সত্য। কিন্তু কানা না হইলে ভালবাসা জন্মে না। যে দোষ দেখিতে পায় সে কখন ভালবাসিতে পারে না, ভ্রমই এই পৃথিবীর সুখ।"

কণ্ঠমালা উপন্যাসের ভাষা চিত্র নির্মানের ক্ষেত্রে সঞ্জীবের স্বভাবসুলভ কবিত্ব বিশেষ প্রাণময়। আধুনিক গদ্য কবিতার মত তা আমাদের ভাবচেতনাকে সহজেই

স্পর্শ করে। প্রকৃতি বর্ণনায় অথবা প্রেমের বিচিত্র মানসিকতা বর্ণনায় বা বাৎসল্য রস প্রকাশে সঞ্জীব সমান ভাবগম্ভীর রসাত্মক ভাষা ব্যবহার করে গেছেন। নানা প্রসঙ্গে পূর্বে তা কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হয়েছে।

একথা সত্য ভাবা চিত্র রচনায় সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিপুল ঐশ্বর্যময়ী ভাষা রচনা করেন নি, তবে আগের সামান্য উদাহরণ থেকে বুঝিতে পারি রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী প্রকৃতি স্পর্শী গদ্যরীতির পূর্বসূরী সঞ্জীবচন্দ্রই। বর্ণনীয় বিষয়ের ভাব সত্যকে অথবা বস্তু সত্যকে সঞ্জীব সার্থক ভাবেই সঞ্চারিত করে রস সংবেদন সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন। কণ্ঠমালা উপন্যাসে কোমল ভাবরাশিকে কাব্যময় করে প্রকাশ করার সুযোগ যথেষ্ট রয়েছে—সেইখানেই সঞ্জীবের ভাষা নির্মিতি সার্থক। অপরপক্ষে বাস্তবচিত্র ও হাস্যরস সৃষ্টিতে সঞ্জীবের উদার নিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রসন্নতা 'কণ্ঠমালা'য় খুব বেশী না হলেও কম নয়। ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও দ্রুততা আশ্চর্য ভাবে বিষয়ের অনুগামী। কিন্তু যেখানে রোমান্সের অতিরেক ঘটাবার চেষ্টা করেছেন, সেখানে তিনি সম্পূর্ণ সার্থককর্মা নন। গুপ্ত গৃহের রহস্য চিত্রগুলি ভাষার মায়ায় মায়ালোক সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি। অন্যান্য গ্রন্থের অপেক্ষায় 'কণ্ঠমালা'য় বিক্ষিপ্ত দার্শনিকতা কম। তবে সঞ্জীবচন্দ্রের সুভাষিতাবলী এখানে অল্পবিস্তর আছে—যেমন—

> কানা না হইলে ভালবাসা জন্মে না, যুবা মাত্রেরই বিবাহ হওয়া উচিত, সময়ে বিবাহ না হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বভাব কুলষিত হয়। সংসার না থাকিলে সমাজ থাকে না, অবিবাহিত অবস্থা ধর্ম বিরুদ্ধ। একা অসহ্য, অস্বাভাবিক। পশুরাও একা থাকিতে পারে না। অথবা, অনাথিনী না হইলে কেন অনাথিনীর দুঃখ ভাবিবে?

এই ধরণের মন্তব্য সমগ্র সঞ্জীব সাহিত্যে সহস্রাধিক হবে। দার্শনিকতার প্রকাশ কণ্ঠমালায় অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা কিছু কম হলেও যা আছে তাও অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ হয়েছে। নিচের দুটি উদাহরণ থেকে সহজেই তা বোঝা যাবে।

(ক) আমি মরিব না, পরলোক আমি চাহি না। চাহি না বা কেন বলি। মরণ আছেই, মৃত্যু অলঙ্ঘনীয় অপরিহার্য্য, যে জন্মিয়াছে সেই মরিয়াছে অথবা মরিবে। তুমি নিশ্চয় মরিবে। আমিও নিশ্চয় মরিব।

(খ) এই চন্দ্র কিরণ কতদূর ব্যাপিয়া কত পদার্থের উপর পড়িতেছে, পর্বত কন্দরে, অরণ্যে, সাগরে—যে পর্বতে কখন মনুষ্য কখন প্রবেশ করে নাই, যে সাগরে মেঘ ভিন্ন অন্যের ছায়া পড়ে নাই—সর্বত্র চন্দ্রের কিরণ পড়িতেছে। এই চন্দ্ররশ্মি হিমালয়ের তুষার রাশিতে জলিতেছে, হত্যাকারীর অস্ত্র ফলকে জলিতেছে, হতব্যক্তির রক্তধারায় জলিতেছে, আবার কত দুর্ভাগ্যের নয়নাশ্রুতে জলিতেছে।

আধুনিক কালের কোন সমালোচক কণ্ঠমালাকে উপন্যাস বলতে চাননি। অথচ সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে আমরা বস্তুত দুখানি মাত্র গ্রন্থের নাম করতে

পারি—'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা'। দামিনী, রামেশ্বরের অদৃষ্ট ছোট গল্প শ্রেণীর। জাল প্রতাপচাঁদ ঐতিহাসিক বিবরণ। এই সামান্য সম্পদের মধ্যে যদি কণ্ঠমালা ও মাধবীলতাকে আমরা উপন্যাস থেকে বাদ দিই তবে যা অবশিষ্ট থাকে তাতে সঞ্জীবের প্রতি অবিচারই করা হয়। অতিসূক্ষ্ম বিচারে আধুনিক সমালোচকরা কণ্ঠমালার পরিণতি দেখে বলেছেন এই বইখানিতে উপন্যাসের সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকলেও শেষ পর্যন্ত রোমান্সের বাড়াবাড়ি ও বিনোদ মাধবীর মিলন কণ্ঠমালাকে উপকথা বা Tale এ পরিণত করেছে। তবু স্থূলভাবে E. M. Forster এর মন্তব্য—

"The novels we have now to consider all tell a story, contain characters, and have plots or bits of plots".[৫৩] যদি মেনে নিই তাহলে কণ্ঠমালাকে আমাদের উপন্যাস বলতে বাধা নেই।

: জাল প্রতাপচাঁদ :

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস নেই বলে দুঃখ করেছিলেন। অথচ বাংলার সাধারণ পাঠকের মনে ইতিহাস সম্পর্কে বোধ জাগ্রত হয়েছে। বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর অনেকেই সেই নবজাগ্রত ইতিহাস বোধকে তৃপ্ত করার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। বঙ্গদর্শনের যে খণ্ডে (৯ম খণ্ড) সঞ্জীবচন্দ্র-এর জাল প্রতাপচাঁদ প্রকাশিত হয়েছিল সেই খণ্ডেই 'আনন্দমঠ', 'কাঞ্চনমালা', 'জগৎ শেঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'বাংলা ইতিহাসের ভগ্নাংশ', 'বাঙ্গালীদিগের পৌরুষ', 'বিষ্ণুপুর হইতে মহারাষ্ট্রদিগের প্রস্থান (প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ)', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়', 'রাজা সিতাব রায়', সিরাজউদ্দৌলা', ইত্যাদি ইতিহাস বা ইতিহাসাশ্রিত রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে সেই নবজাত গরুড়ের মত পাঠকের নবজাগ্রত ইতিহাস ক্ষুধায় 'জাল প্রতাপচাঁদ' অন্যতম পরিবেশিত খাদ্য। যদিও অনেকে বলেছেন জাল প্রতাপচাঁদ ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু স্বয়ং লেখক একে 'ইতিহাসোপযোগী উপকরণ' বলে চিহ্নিত করেছেন। একথা সত্য এই যুগের নবজাগ্রত ইতিহাস ক্ষুধায় সত্য ও কল্পনার মিশ্রণজাত পাচ্যাপাচ্য অনেক খাদ্যই সরবরাহ করা হয়েছে। অবশ্য বঙ্কিম তাঁর সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে সম্ভবত সত্যকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। যদিও রোমান্স রাজ্যে তিনি ছিলেন সম্রাট। তার ফলেই বোধহয় তিনি 'জাল প্রতাপচাঁদের' ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে কালীনাথ দত্তকে বলেছেন, (অবশ্য এই উক্তি কতদূর সত্য তারও বিচার করার কোন উপায় নেই)—

"মেজদাদা জন প্রবাদ ও জনশ্রুতির অবিচারে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। আখ্যায়িকায় বর্ণিত ঘটনা পুঞ্জের ঐতিহাসিক মূল তিনি অতি অল্পই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।"[৫৭]

কিন্তু বঙ্কিমের এই মন্তব্য বোধহয় ঘটনার সামান্যতা লক্ষ্য করেই। কারণ বঙ্কিম স্বয়ং সঞ্জীব সম্পর্কে লিখেছেন,—

"বিনা সাহায্য নিজ প্রতিভাবলে অল্পদিনে ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষালাভ করিলেন। কলেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।"[৫৮]

সঞ্জীবের ইতিহাস জ্ঞান যে সামান্য ছিল না এবং তাঁর অনুসন্ধিৎসাও যে গভীর ছিল, জাল প্রতাপচাঁদ-এর মত সাধারণ রচনায় আমরা তা লক্ষ্য করেছি।

জাল প্রতাপচাঁদ রচনাকালে অর্থাৎ ১৮৮২ খৃঃ সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর শেষ চাকুরীটি থেকে বিদায় নিয়ে কাঁটালপাড়ায় এসে বাস করছিলেন এবং বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করেছিলেন। তখন কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে নবস্থাপিত বঙ্গদর্শন প্রেসে তাঁরই পরিচালনায় বঙ্গদর্শন ৫ম খণ্ড থেকে ৯ম খণ্ড (১২৮৪—১২৮৯) প্রকাশিত হচ্ছে, যদিও এরই মধ্যে তাঁর বঙ্গদর্শন সম্পাদনায় উৎসাহ নির্বাপিত প্রায়। কারণ— "এক কাজ তিনি নিয়মিত অধিক দিন করিতে ভালবাসিতেন না।"[৫৯] কিন্তু একটি সামান্য ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে সার্থক রূপ দেবার প্রয়াসে তিনি যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তা তাঁর সেই ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানী মনেরই প্রকাশ, যার বলে গবেষক ঐতিহাসিক হয়ে ওঠেন। তাঁর এই বিপুল তথ্যানুসন্ধানের মূলে একটি ব্যক্তিগত কারণ বোধহয় সক্রিয় ছিল। লেখকের ব্যক্তিগত ব্যর্থতার সঙ্গে জাল রাজা প্রতাপচাঁদের জীবন চর্যার স্বাধর্ম্য এবং ব্যর্থতার ঐক্যবোধ যুক্ত হয়েছিল। তবে ঐ যুগে লোকমুখে গীতিকবি অনুপচন্দ্র দত্তের 'প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত' নামে তুলাতার লিখিত পুঁথির গান এবং আর একটি নিকৃষ্ট স্তরের প্রতাপচাঁদ বিষয়ক ঐতিহাসিক কাব্য সম্ভবত সঞ্জীবকে জাল প্রতাপচাঁদ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই যুগে যে সমস্ত লোকপ্রিয় কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাদের মধ্যে বর্ধমান রাজবাড়ীর জাল রাজার মামলার কাহিনীটি আজ থেকে ৫০-৬০ বছর আগের ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার মতই সাধারণের নিস্তরঙ্গ জীবনের ঘোলাজলের ডোবায় দু-একটি ব্যাঙের লাফের মতই সামান্য তরঙ্গ তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাসগত উপাদানের যে প্রভাব দেশকালের উপর অমোঘ ক্রিয়াশীল এবং দেশকাল ও মানবচরিত্রের বিপুল বিস্তারের নির্দেশক সেই উপাদান জালরাজার কাহিনীর মধ্যে নেই। যদিও লেখক অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে কাহিনীর সত্য উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করেছেন। জালরাজার প্রতি তাঁর সহানুভূতিকে তিনি সঠিক ভাবেই প্রমাণ করতেও পেরেছেন। অতি বাল্যকাল থেকেই যে জালরাজার প্রতি লেখকের সহানুভূতি জেগেছিল সে সম্পর্কে কালীনাথ দত্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে ধৃত বঙ্কিমচন্দ্রের

মন্তব্য লক্ষণীয়,

"আমরা খুব বাল্যকালে এই নামধারী আখ্যান জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহার মুখে শুনিতাম এবং সহানুভূতিতে কাঁদিয়া গণ্ডদেশ ভাসাইতাম।"[৯০]

বাল্যকালের এই সহানুভূতির সঙ্গে পরিণত বয়সে যুক্ত হয়েছিল দুটি ব্যাপার— (১) আপনার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার সঙ্গে একটা সাদৃশ্যবোধ। (২) সরকারী কর্মচারী হিসেবে আদালতের নথিপত্র পরীক্ষার সুযোগ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় সঞ্জীবচন্দ্র কাহিনীর গড়ে তুলবার সময় যতখানি বস্তু নিষ্ঠ সেই পরিমানে তিনি কল্পনা নির্ভর নন। আর সেই কারণেই প্রতাপচাঁদ ও রাজা তেজচন্দ্রের চরিত্র ছাড়া আর কোন চরিত্র গ্রন্থখানিতে নেই বললেই চলে। আর যারা আছে তার প্রকৃত পক্ষে নামে মাত্র আছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি নারীর নাম আছে বটে, কিন্তু তাদের চরিত্রের কোন পরিচয়ও নেই। প্রকৃতপক্ষে সঞ্জীবচন্দ্রের জাল প্রতাপচাঁদ কাহিনীকে কোন প্লট প্যাটার্নে না নিয়ে এসে কাহিনীকে প্রায় পুরোপুরি ইতিহাস করে তুলেছেন। তবে স্বীকার করতেই হয়—ইতিহাস তথ্য মাত্র। কাব্যের সত্য অর্থাৎ লেখকের দিব্যচক্ষু তার মধ্যে প্রবেশ করলেই তবে তা সাহিত্য হয়ে ওঠে। জাল প্রতাপচাঁদে সেই সত্য দর্শনের কিছুমাত্র অভাব ঘটেনি। তথ্য সত্যের এমন এক হরিহর মিলন সহজে দেখা যায় না।

অথচ কাহিনীর সামগ্রতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের পুত্র মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর অথবা অন্তর্ধানের ১৫ বৎসর পরে এক সন্ন্যাসী এসে দাবী করেন তিনিই প্রতাপচাঁদ। অনেকে তাঁকে প্রতাপচাঁদ বলে মেনে নেন, আবার অনেকে মানেন নি। রাজ প্রতিকূলতায় তাঁকে যেমন বিস্তর কষ্ট পেতে হয় তেমনি শেষ পর্যন্ত সেই দাবীও ত্যাগ করতে হয়। এই ঘটনাকেই সঞ্জীব রূপায়িত করেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের অন্যান্য কাহিনীর মতই জাল প্রতাপচাঁদ পরিমিত পরিমানের কাহিনী। আগেই বলা হয়েছে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কাহিনী পরবর্তী কালে যখন গ্রন্থআকারে প্রকাশ করলেন, তখন তার পরিমাপ বর্দ্ধিত হলেও এমন কিছু বেশী হয়নি। ১২৯৭ সনে শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটির আকার বর্তমান কালের পকেট সংকরণের মতই, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মোট ১৪৫। সে যুগে এই পরিমাপের গ্রন্থই ছিল সাধারণ আকারের। বঙ্কিমের অধিকাংশ গ্রন্থই এই আকার অপেক্ষা ছোট। প্রাথমিক অবস্থা অপেক্ষা গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি হলেও কাহিনীর কোনই পরিবর্তন হয় নি। কেবলমাত্র বর্ণনীয় বিষয়গুলিই বিস্তৃত হয়েছিল। কাহিনীটি মোট ২৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছিল। লেখক প্রতিটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছিলেন। পরিচ্ছেদের নাম যথাক্রমে—১। পূর্বকথা, ২। তেজবাহাদুর (বর্দ্ধমানের বুড়া রাজা), ৩। কুমার বাহাদুর, ৪। ছোট রাজা, ৫। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু, ৬। অলোক শা, ৭। কাপ্তেন লিট্লের লড়াই, ৮। ওগলবি সাহেব আসামী,

৯। সামুয়েল সাহেবের উদ্যোগ, ১০। দায়রা সোপর্দ, ১১। দায়রার, কার্য্যপ্রণালী, ১২। সেনাক্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের সাক্ষী, ১৩। সেনাক্ত সম্বন্ধে আসামীর সাক্ষী, ১৪। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রকৃত কি না, ১৫। জালরাজা গোয়াড়ি, কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কিনা, ১৬। কালনায় জমিয়ৎবস্ত হয়েছিল কিনা, ১৭। জালরাজার নিজ কথা, ১৮। দায়রার হুকুম, ১৯। অন্য আসামীদের প্রতি দায়রার হুকুম, ২০। ওগলবি সাহেব আবার আসামী, ২১। জালরাজা সম্বন্ধে নিজামত আদালতের হুকুম, ২২। জালরাজার সর্বনাশ, ২৩। সাধারণের বিচার, ২৪। জলরাজা ধর্মপ্রণেতা, ২৫। জালরাজার মৃত্যু।

আলোচ্য পরিচ্ছেদ বিভাগ থেকে বোঝা যায় প্রতাপচাঁদের জীবনারম্ভ পিতৃ পরিচয় থেকে শুরু করে তথাকথিত মৃত্যু, সন্ন্যাসী বেশে প্রত্যাবর্তন, দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তার ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্ঠার সঙ্গে লেখকের গভীর সহানুভূতিও যুক্ত হয়েছে।

কাহিনীর কথামুখে লেখক তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে যেমন কাহিনীর মধ্য ভূমি থেকে কথারম্ভ করেছেন, এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ফলে কাহিনীর প্রতি পাঠকের সহজ আকর্ষণ গোড়া থেকেই প্রায় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। দুঃখ কথার প্রতি আমাদের চিরকালের সহজ আকর্ষণ। সঞ্জীব সেই আকর্ষণের কথা ভুলে যান নি। "প্রতাপচাঁদের দুর্গতি সকলের অন্তকরণ স্পর্শ করিয়াছিল। জাল প্রমানের পূর্বেই তাঁহার পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক অথবা তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব রচনা অনুরোধেই হউক, আবালবৃদ্ধ সকলেই জাল রাজার সাপক্ষ হইয়াছিল।"

আমরা অনত্র আলোচনা করে দেখেছি সঞ্জীবের ব্যক্তি জীবনের অসাফল্য তাঁকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছিল—ফলে তাঁর উপন্যাস গল্প অথবা ঐতিহাসিক গল্প-কথা সবকিছুর মধ্যেই ঐ ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতার হাহাকার অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। একদিকে তাঁর কথা রচনার সহজ ক্ষমতা, অন্যদিকে ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থতা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিচেতনায় প্রকাশ ঘটিয়েছে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। ফলে জাল প্রতাপচাঁদ তিনি যেন আপন চরিত্রের দ্বৈতরূপকেই রাজা তেজচন্দ্রের এবং প্রতাপচাঁদের মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে আমরা প্রামাণিক পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের সঞ্জীবনী সুধাতেই সবচেয়ে বেশী পেয়েছি। বঙ্কিম বলেছেন সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভায় সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর খেয়ালীপনা, কোন এককাজে বেশীদিন লেগে থাকার মনোভাবের অভাব, উদ্যানচর্চা, অলস আলাপাচারী হয়ে সময় কাটানো, মনের দুঃখে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার চিন্তার ফসল তাঁর রচনাবলী। একদিকে তাঁর রচনা ক্ষমতা অন্য দিকে নিষ্ঠার অভাব তাঁর সাহিত্যকে বঙ্কিমের মত আদর্শনিষ্ঠ করে তোলেনি। বঙ্কিম যেখানে মত পথ ও আদর্শকে বারবার নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন, প্রয়োজনে পুরোনো লেখায় আমূল পরিবর্তন করে নতুন করে

লিখেছেন, সঞ্জীবচন্দ্র সে রকম কোন নিষ্ঠার পরিচয় দেন নি। বঙ্কিমের যে ক্ষেত্রে সাহিত্যের বিশেষ শ্রেণী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল, সঞ্জীবের সে রকম ধারণার কোন পরিচয় আমরা পাই না। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিম যেখানে তাঁর ধ্যান দৃষ্টির সাহায্যে চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন সঞ্জীব সেখানে অত্যন্ত বাস্তবদৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার ও চরিত্রের উপরের অংশ দেখতেন। সঞ্জীবের সাহিত্যের গঠন-গত ও চরিত্র-গত বিচার আমাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকেই করতে হবে।

আগেই কথামুখের কথা বলা হয়েছে। আখ্যান ভাগের নাম যদিও পূর্ব কথা, তবু এই পরিচ্ছেদের ঘটনার মধ্যভাগই বর্ণিত হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য যে ঐতিহাসিক সে সম্পর্কে সঞ্জীবের বক্তব্য স্পষ্ট—

"আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। পূর্বে গবর্ণমেন্ট কিরূপ ছিল। বিচারের প্রণালী কিরূপ ছিল, আর সে সময় আমাদের এই বাঙ্গালীরা কিরূপ ছিলেন তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা জাল রাজার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি। মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যে সকল কাগজপত্র সেই সময় প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টি লিখিলাম।"

কিন্তু লেখকের অন্তর্গূঢ় উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিরসে জারিত তা আমরা আগেই বলেছি। সঞ্জীব তাঁর অসাফল্যের জন্যে ইংরাজ সিভিল সার্ভেন্টদের দায়ী করতেন, প্রতাপচাঁদও তাঁর সমস্ত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন সিভিল সার্ভেন্টদেরই উপর—

"প্রতাপচাঁদের রাগ সিভিল সার্ভেন্টদের উপর ছিল, তাহাদেরই তিনি বেয়াদাব বলিতেন। অন্য ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ সদ্‌ভাব ছিল।"

কাহিনী গঠনে লেখক প্রতাপের আড়ালে আত্মকথা বহুবার বলেছেন। সঞ্জীবের মেধা ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও কুসংসর্গে পড়ে কোনদিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ঘটেনি। প্রতাপচাঁদ বাল্যকালে লেখা পড়া না শিখলেও ভালো ইংরেজী জানতেন এবং যৌবনে বৈরাগ্যের কারণ কুসংর্গদোষে দুষ্ট হয়ে মানসিক অবসাদ ও শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস সঞ্জীবের জীবনেও ঐ একই পরিণতি আনে।

জাল প্রতাপচাঁদ কাহিনী সরল হলেও লেখক তাঁর স্বভাবধর্মানুযায়ী অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গে বিষয়ান্তরচারণ, দার্শনিক আলোচনায় অকারণ উৎসাহ, আদালতের নথিপত্রের প্রামাণিক তথ্যকে কাহিনী কল্পনার সূত্রে হিসেবে গ্রহণ না করে সরাসরি তাদের হাজির করে কাহিনীকে জটিল ও ব্যহত গতি করে তুলেছেন। কিন্তু অসতর্ক প্রতিভা সঞ্জীব তাঁর আনমনে পথচলায় যে অমূল্য রত্নরাজি ছড়িয়ে ফেলে গেছেন, তার অনেক উদাহরণ আমরা জাল প্রতাপচাঁদ থেকেও পেতে পারি। সামাজিক ইতিহাসের চিত্র রচনা করতে গিয়ে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে যে তুলির টান দেন তা লক্ষ্য করার মত।

"নাটকের মজ্জা কার্যকারিতা, সে কার্যকারিতা ব্যক্তিগত নহে, তাহা জাতিগত ও সমাজগত।...মহারাজ্ঞী ইলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডের কার্যকারিতা শক্তি বড় প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় ইংরেজি নাটক হয়"।

অপর পক্ষে তিনি তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী—

পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট কিরূপ ছিল, বিচার প্রণালী কিরূপ ছিল আর সে সময় আমাদের বাঙ্গালীরা কিরূপ ছিলেন—

তা তিনি গ্রন্থের সর্বত্র দেখিয়েছেন এবং তা সম্পূর্ণতই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে। অথচ কবির সত্য দৃষ্টি যুক্ত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ঘাটনের সঙ্গে, ফলে অতীতের ঘটনা তাঁর লেখায় এত প্রত্যক্ষ ও আকর্ষণীয় হয়েছে। ঐতিহাসিক নীরস তথ্য আকর্ষণীয় হবার আরও কারণ সঞ্জীবের সহজ দার্শনিকতা। অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের প্রমারা তাসের খেলার আধিক্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সঞ্জীব মানবজীবনের চিরন্তন সত্য প্রকাশ করে বলেছেন।

"খেলাটি ড্রামাটিক। যে খেলা এ সংসারে সকলে নিত্য খেলিতেছে, সেই খেলার আশ্চর্য্য অনুকরণ এই প্রমারা।"

সে যুগের ইংরাজ রাজ কর্মচারী কেমন ছিল তার ভুরিভুরি নজির সঞ্জীব রেখে গেছেন। যেমন জালরাজার দরখাস্ত নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে দুজন মোক্তার উপস্থিত হলে কি দরখস্ত, "তাহা তিনি (ম্যাজিষ্ট্রেট) অনুসন্ধান না করিয়া একেবারে উভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন।" কি ভীষণ অন্যায়ভাবে প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তারের সময় কালনা গ্রামের নিরীহ লোকেদের ও অন্যান্য তীর্থযাত্রীর নৌকা থেকেও আবালবৃদ্ধবণিতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তার নজির লেখক ওগলবি সাহেবের ২রা মে ১৮৩৮ সালের রিপোর্ট থেকে উদ্ধার করে মন্তব্য করেছেন,

"যেরূপ তখন গবর্ণমেন্ট ছিল, যেরূপ কর্মচারী ছিল, তাহাতে বিপদগ্রস্থের নিকটে আসিলে বিপদগ্রস্থ হইতে হইত। মন্দ সমাজের দোষ এই।"

স্পষ্টতই বোঝা যায় ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সত্যদ্রষ্টার দৃষ্টি। অথচ সঞ্জীবচন্দ্র জাল প্রতাপচাঁদের মামলার বিবরণ কি বিপুল নিষ্ঠার সঙ্গে অসাধারণ পরিশ্রম করে সংগ্রহ করে তা গবেষকের অন্বেষা দিয়ে বিচার করে প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সপ্রমান করেছেন তার আশ্চর্য উদাহরণ এখানে রয়েছে। ৭ম পরিচ্ছেদ থেকে ২৩শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তাঁর গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো তাঁর সংগৃহীত উপাদান কত খাঁটি ছিল। সাক্ষ্য প্রমাণের পাদটীকাগুলি নিম্নরূপ :—

১। Extract from petition dated 15th February 1838.
২। এই মিনিটের কথা সুপ্রিমকোর্টে জোবান বন্দিতে প্রকাশ পায়। (৭ম পরিঃ)
৩। Petition to the Nizemut Audalut.
৪। A. Alexander—এর চিঠির উদ্ধৃতি (৭ম পরিঃ)
৫। Extract from Superintendent's letter, No. 4000. dated 28th April, 1838.

৬। Extract from a letter from the Acting Magisirate of Burdwon to the Magistrate of Hoogly dated the 6th May 1838.

৭। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অমান্য হওয়ায় 'হরকরা'র মন্তব্যের নকল। (৮ম পরিচ্ছেদ)

৮। দ্বারকনাথ ঠাকুরকে জালরাজার বিরুদ্ধে স্বমতে আনার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট ই: এঃ সামুয়েলের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ সালের লেখা চিঠির নকল। (৯ম পরিচ্ছেদ)।

৯। হরকরার মন্তব্যের বিরুদ্ধে সামুয়েলের উত্তরের নকল। (৯ম পরিচ্ছেদ)

১০। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ সালের হরকরার মন্তব্যের উদ্ধৃতি (৯ম পরিচ্ছেদ)

১১। Extract from No. 3 of the Calendar for September 1838.

১২। জজ সাহেবের রায়ের নকল। (১৫শ পরিচ্ছেদ)

১৩। Extract from petition dated 30th November 1838.

১৪। ওগিলিবি সাহেবের সাজার রায়ের নকল। (২০শ পরিচ্ছেদ)

১৫। Extract from order dated 19th July 1839.

১৬। ওগিলবি সাহেবের বিরুদ্ধে সাধারণের অভিযোগের উত্তরে সাহেবের কৈফিয়েতের নকল। (২৩শ পরিচ্ছেদ)।

এ ছাড়া আরও কত বিষয়ে লেখকের গভীর জ্ঞান ছিল তার প্রমাণও বড় কম নেই এই গ্রন্থে। জাল রাজার ইচ্ছামৃত্যু (মৃত্যুর ভান) যে সম্ভব তা সঞ্জীবচন্দ্র নানান প্রামাণ্য গ্রন্থের বিবরণ থেকে উদ্ধার করেছেন। প্রতিটি সাক্ষীর সাক্ষ্য, সংবাদ পত্রের মন্তব্য ইত্যাদি তিনি সাল তারিখের প্রামাণিকতা সহ উপস্থিত করেছেন। ফলে ইতিহাস একদিকে যেমন গবেষণার গুণে তার সত্য স্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তেমনি লেখকের কাহিনী কথনের গুণে তা মনগ্রাহী হয়ে উঠেছে। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন,

> "জাল প্রতাপচাঁদ নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনা সংস্থান প্রমাণ বিচার এবং লিপি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্বক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকে না।"[৩১]

এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেন,

> "জাল প্রতাপচাঁদ (১৮৮৩) ইতিহাস কাহিনী হইলেও লিখিবার গুণে উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক। সঞ্জীবচন্দ্রের সহানুভূতির পাত্র উৎপীড়িত জাল প্রতাপচাঁদের ভূমিকাটি পাঠকের চক্ষে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে।"[৩২]

ডঃ সেনের মতে সঞ্জীবচন্দ্রের

> "সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি এবং আপাত তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়ে আনুবীক্ষনিক লক্ষ্য" থাকায়

ফলশ্রুতি জাল প্রতাপচাঁদ। সমস্ত ঘটনার তথ্য গত বিবরণ সাহিত্য সম্মত উপায়ে সুচারুভাবে বর্ণিত।৩৩

সঞ্জীবচন্দ্রের জাল প্রতাপচাঁদের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বঙ্কিমযুগের অর্থাৎ উনিশ শতকের বিশিষ্ট চেতনা বা ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার প্রেরণা, তা এই গ্রন্থে প্রায় অস্বীকার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিম গোষ্ঠীর সকলেই প্রায় স্কটের মতন জীবনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং জীবন যে পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত তা উপন্যাসের শেষে দেখাতে ভোলেন নি। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর অন্যান্য কাহিনীতে সেই যুগমনোধর্ম প্রকাশ করলেও জাল প্রতাপচাঁদে তা প্রকাশ করেন নি। বরং স্পষ্টতই বলেছেন,—

"আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন 'যথা ধর্মস্তথা জয়'। কিন্তু বাস্তবিক একথা সকল সময়ে সত্য নহে। তাহাই বলিতে হইয়াছে, 'কলিতে অধর্মেরই জয়, যে প্রবঞ্চনা করে, যে শঠতা করে, তাহারই জয়।"

(লক্ষনীয় বিষয় বঙ্গদর্শনে (শ্রাবণ ১২৮৯) এই অংশ ছিল না। পরবর্তীকালের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে এই অংশ সংযোজিত হয়েছে)। চন্দ্রনাথ বসু যতই সঞ্জীবের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার দেখুন না কেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন,

"চন্দ্রনাথ বাবু এক প্রকারের Poetic Justic বা কাব্যোপযোগী ন্যায় বিচার আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অনেকটা কষ্ট কল্পনা বলিতে হয়।"৩৪

মন্তব্যটি দামিনী সম্পর্কে হলেও জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধেও সুপ্রযোজ্য। তবে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক পরাজিতের মনোভাব এবং চিরন্তন করুণ রসের প্রতি আসক্তি প্রতাপচাঁদের পরিণতিকে চিত্রিত করবার জন্যে লেখককে প্রেরিত করেছে।

জাল প্রতাপচাঁদ রচনার পশ্চাতে লেখকের যে ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার প্রতিফলনই থাকুক না কেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঐতিহাসিক চরিত্রের অন্তরালে মানুষকে মাত্র অঙ্কন করেন নি। ঐতিহাসিক মানুষ আঁকতে তিনি ইতিহাসকে আড়াল করেন নি। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ঐতিহ্যের সূচনা করলেন সঞ্জীবই সর্বপ্রথম তাতে ইতিহাসের সত্যকে প্রাণপণে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন, যদিও সেই প্রচেষ্টার বিষয় নির্বাচনে বিরাট শক্তির অপচয় সূচিত করেছে। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,

"ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র। এই ক্ষমতা যদি তিনি কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন, তবে তাহা আমাদের ক্ষণিক কৌতুহল চরিতার্থ না করিয়া স্থায়ী আনন্দের বিষয় হইত। যে কারুকার্য প্রস্তরের উপর ক্ষোদিত করা উচিত, তাহা বালুকার উপরে অঙ্কিত করিলে কেবল আক্ষেপের উদয় হয়।"৩৫

সঞ্জীবের জাল প্রতাপচাঁদের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই বিষয় নির্বাচনে। যদিও ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণী বিন্যাস প্রসঙ্গে H. Butterfield তাঁর Historical

Novel গ্রন্থে বলেছেন স্থানীয় ইতিহাস বা কিংবদন্তীমূলক কাহিনীও ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয় হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'বৃহৎ জাতীয় ইতিহাসের এবং তীব্র মানবইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎ পরিমানে ভাবেরও যোগ'[৩৩] জাল প্রতাপচাঁদের কোথাও দেখতে পাই না। ঘটনাটি একান্তই একটি সাময়িক ও স্থানীয় ঘটনা। জাতীয় জীবনে তার বিন্দু মাত্রও প্রভাব ছিল না। যদিও কোন কোন ব্যক্তিমানসে স্থানিক ও কালিক প্রভাবের চিত্রটি দেখাতে লেখক ভুলে যান নি। জাতীয় জীবনকে আলোড়িত করতে পারে এমন ঘটনা যে জাল প্রতাপচাঁদের মামলা নয়, তা বোধ করি লেখকও জানতেন। সেইজন্য কাহিনীকে অবলম্বন করে উনবিংশ শতকের কোম্পানীর শাসনের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। বিচারের নামে যে প্রহসন চলতো তারই কাহিনী এই জাল প্রতাপচাঁদ। সঞ্জীব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় বলেছেন,

> "যাহারা ছয় মাসের অধিককাল জেলে থাকে, তাহাদের বিচার করিতে আইনে নিষেধ। সেই জন্য মেজেষ্টার বাহাদুর তাহাদের বিচার না করিয়া জেলে রাখিয়াছিলেন। যাহাদের বিচার করিতে নিষেধ তাহাদের জেলে রাখিতে নিষেধ নাই। ছয়মাসের স্থলে নয় মাস তাহারা জেলে আছে। আরও থাকিবে, তাহাতে আইনের আপত্তি নাই। আইনের আপত্তি কেবল বিচার করার সম্বন্ধে। ছয় মাসের পর, খবরদার যেন আর বিচার করা না হয়। ছয় মাসের পর যতদিন ইচ্ছা জেলে রাখ, কিন্তু বিচার করিও না। ইহা কোম্পানীর আইন।"

সমগ্র জাল প্রতাপচাঁদ কাহিনীর কোন কেন্দ্রগতি যদি থাকে, তবে তা উল্লিখিত অত্যাচার ও অবিচারের কাহিনী। লেখক ঐ কাহিনী গঠনে ব্যক্তি অভীপ্সার যে পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে ইতিহাস গবেষক-এর অন্বেষা যুক্ত হলেও, ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি তার সঙ্গে যুক্ত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ লিখতে গিয়ে যতই বলুন হিন্দুদিগের বাহুবল তাঁর প্রতিপাদ্য তবুও তিনি সেখানে তিনি নিরপেক্ষ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বলেছেন, "অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হৌক মুসলমান হৌক সেই নিকৃষ্ট" সঞ্জীবের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি জালপ্রতাপচাঁদের উপাদানগুলি ঐতিহাসিক কিনা তার বিচার যতখানি না প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী দেখা প্রয়োজন তাঁর ব্যবহৃত তথ্যগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা এক্ষেত্রে কতখানি স্থান জুড়ে রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস ও ইতিহাস পরস্পরবিরোধী শব্দ। প্রথমটিতে কল্পিত কাহিনী ও দ্বিতীয়টিতে পূর্বঘটিত তথ্যগত সত্যকাহিনী। উপন্যাস বলতে বোঝায় যা ঘটেনি, আর ইতিহাস বলতে বোঝায় যা ঘটেছে। এই সত্য মিথ্যা হাঁ আর না এর মিলন ঘটান ঐতিহাসিক উপন্যাসকার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "ইতিহাসের সংস্রব উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে। ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি উপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির

নাই।"৬৭

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাফল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঐখানেই আবার বলেছেন,

"লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই বলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সকল হইলেই হইল।"৬৮

আমাদের জানা দরকার এই ঐতিহাসিক রস কি? একেই তিনি বলেছেন মহা-কাব্যের প্রাণ স্বরূপ। অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসের অবলম্বন তাঁদের নিয়েই,

"যাহাদের সুখ দুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ।"৬৯

ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে যতই তর্ক থাকুক রবীন্দ্রনাথের প্রতীতির দৃষ্টি কোণ থেকে আমরা দেখবো জাল প্রতাপচাঁদ ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়েছে কিনা?

প্রতাপচাঁদের কাহিনী অবলম্বনে কবি অনুপচন্দ্র দত্ত "প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত" নামে যে কাব্যখানি রচনা করেছিলেন তার মধ্যে সত্যনাথ প্রতাপচন্দ্রের শিষ্য অনুপচন্দ্রের ভক্তমনের আবেগ বিহ্বলতার প্রকাশ ঘটে, সেখানে ইতিহাস অলৌকিকতায় নিমজ্জিত হয়েছে। কিন্তু জালরাজার ইতিহাসের স্রোতকে সঞ্জীবচন্দ্র ভাগীরথের মত সত্যপথে অর্থাৎ প্রমাণ বিচারের খাতে বইয়ে এনে কাব্যসত্যের মোহনায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আগেই বলেছি কাহিনী যাত্রা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক রীতিতে বর্ণিত। মামলার বিবরণ পড়তে পড়তে একবারও মনে হয় না, আমরা কেবলমাত্র আদালতের শুষ্কবিবর্ণ কাগজ ঘাঁটছি, বরং বর্ণনাগুণে শ্লেষ বক্রোক্তি ও সহানুভূতির গুণে প্রতি ক্ষণে মনে হয়েছে এরপর কি? লেখকের সহানুভূতিতে আমরাও একাত্ম হয়ে শেষপর্যন্ত তাঁর মতই সিক্ত মনে ভেবেছি—

"তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জাল রাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন, তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালোবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।"

"আসলে গল্প রসের স্বাদের উপরই উপন্যাসের ঐতিহাসিকত্ব অনৈতিহাসিকত্ব নির্ভর করে। গল্পরসের সুনির্দ্দিষ্ট দেশকালের আধারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় স্পেস, টাইম কনটেকস্ট-এ পরিবেশিত বলেই উপন্যাসকে বলব ঐতিহাসিক, তা না হলে নয়।"৭০

ডঃ সুকুমার সেনের এই মন্তব্য অর্থাৎ গল্প রস ও সুনির্দ্দিষ্ট দেশ কালের আধার জাল প্রতাপচাঁদে কোথাও ব্যহত যে হয়নি তা আগেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন—"যাহাদের সুখ দুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ" রবীন্দ্রনাথের সেই জাতীয় ঐতিহাসিক চরিত্র কি জাল প্রতাপচাঁদ? সেই জাতীয় চরিত্র হতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু লেখক প্রতাপের সুখ দুঃখের প্রতি যত গভীর দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন, 'জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ, তাকে বলা যায় না। প্রসঙ্গত স্বভাবতই বঙ্কিমের রাজসিংহের কথা মনে আসে, সেখানে ভারত ইতিহাসের মহারাজ্যপথে ইতিহাস কল্পনা এক রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ছুটে চলে, মানব হৃদয়

ও ভারতের ইতিহাসকে একই রথে তুলে নিয়ে ছিল, সঞ্জীবের ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হয় নি ; সেক্ষেত্রে সঞ্জীবের ক্ষমতার অভাবের কথা যেমন সত্য, তার থেকে বেশী সত্য বিষয় নির্বাচনের ত্রুটি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের আর একটি দিক দেখাতে গিয়ে বাটার ফিল্ড বলেছেন,

> "Even where it contains no sounding of the trumpets of nationalism, and where its author holds no patriotic motive, the historical novel cannot help reminding men of their heritage in the soil."[৭১]

জাল প্রতাপচাঁদে যতই ব্যক্তিভাবনার স্ফুরণ ঘটুক না কেন, তার মধ্যে সঞ্জীবের দেশপ্রীতি ফল্গুধারার মত তলে তলে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। লেখক যখন বলেন—

> "বাঙ্গালী তখনও সজীব, তখনও দশ হাজার লোক একজনের নিমিত্ত একত্রে চীৎকার করিতে পারিত। পেনাল কোডের ভয়ে হউক অথবা অন্য কারণে হউক, এখন দশজন লোকের একত্রে স্ফূর্ত্তি হয় না।"

এই রকম উদাহরণের অভাব নেই জাল প্রতাপচাঁদে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাল প্রতাপচাঁদকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে।

মোটামুটিভাবে আধুনিক তত্ত্ববিদেরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে সব বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করেন তা হল প্রথমতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক তাঁর সৃষ্টিশীল কবি কল্পনার দ্বারা শুষ্ক ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণ এবং বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘটনার উপাদান সমূহের বৈচিত্র্য থেকে একখানি সম্পূর্ণ সংহত চিত্রগঠন করে শিল্পের সংহতি গঠন করবেন। দ্বিতীয়তঃ এই সব চিত্রগঠন পদ্ধতি এমন হবে যাতে বিশেষ যুগ ও সভ্যতা ও তার ক্রিয়াকাণ্ডের সুক্ষ্মধূলিকণাটুকু প্রাচীন নথিপত্রের গবেষণা ছাড়াই সাধারণ পাঠকের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হবে। তৃতীয়তঃ পাঠকের মনে বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস ও জ্ঞান নিয়ে অতিসামান্যই প্রশ্ন জাগবে। তার জন্যে উপন্যাসিককে প্রায়ই তাঁর উপস্থাপিত ঐতিহাসিক বিষয়ের উৎসগুলি প্রামানিকতা স্বরূপ উপস্থাপিত করে তাঁর রচনার উপাদান সমূহের উপর আলোকপাত করতে হবে। এই আলোকে বিচার করলে সঞ্জীবচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস-কারের সর্বকর্তব্যই প্রায় পালন করেছেন। বিশিষ্ট যুগের চিত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐতিহাসিক উপাদান থেকে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আহরণ করেছেন, এমন কি তার উৎস সমূহের সাক্ষ্য প্রমাণও উপস্থিত করে দিয়েছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই তাঁর Creative Imagination বা ঐতিহাসিক রস পরিবেশনা মানব জীবনের গভীরে প্রবেশ করে আমাদের চিত্তকে গ্রাস করতে পারেনি—বিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দার্শনিকতা, কবিচিত্তের মুহূর্মুহু বৈদ্যুতি থাকলেও তা তথ্যের ভারে এতই ব্যথিত গতি যে আমাদের সমগ্র ভাবে ভাসিয়ে নিতে পারেনি। কি ভাবে এই ব্যাহত গতি হল, তা তাঁর চরিত্র সৃষ্টি এবং

ঘটনা সংঘাতের পরিণতি দেখলেই বুঝতে পারবো।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি নাটক উপন্যাসে চরিত্র বলতে যা বুঝি তাল প্রতাপচাঁদে তা নেই বললেই চলে। তারই মধ্যে রাজা তেজচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের চরিত্রের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। ঘটনা সংঘাতজনিত কোন জটিলতা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব চরিত্রের মধ্যে ঘটে নি। লেখক নিজে চরিত্রের যে সাধারণ পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে কোথাও কোন ঘটনাগত পরিণতি আমরা দেখতে পাই না।

প্রতাপচাঁদের পিতা মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর ছিলেন বিলাসী এবং বিষয়কর্ম বিমুখ। মোক্তারের লক্ষ টাকা চুরি অপেক্ষা লালপক্ষী ভয় পাবে এইটাই বড় কথা। এমন কি দোষীকে তাঁর সামনে হাজির করলে তিনি তার কথায় ভুলে শাস্তি দেবার পরিবর্তে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন। বৃদ্ধবয়সে খেয়াল খুশিমত বিবাহ করতে তাঁর এতটুকু বিবেক দংশন হয় না। প্রমারা তাসের বাজীতে লক্ষ টাকা জেতা বা হারা তার কাছে দুইই সমান। এরূপ চরিত্রাঙ্কন ঐতিহাসিকের ক্ষমতার ও লক্ষ্যের বাইরে, ঔপন্যাসিকেরই এখানে অধিকার।

পিতার এই চরিত্রের প্রভাব যে পুত্রের উপর বর্তাবে তা বৈজিক তত্ত্বের লেখকের কাছে পূর্ব সিদ্ধান্ত মাত্র। প্রতাপচাঁদও বাল্যকাল থেকে বেপরোয়া। ঘুড়ির সুতোয় কান কেটে যাওয়া অথবা ঘোড়ার কামড়ে পিঠের মাংস উঠে যাওয়া প্রতাপচাঁদের বাল্য কালের দুরন্তপনার ফল। তিনি লেখাপড়া বিশেষ না শিখলেও সঙ্গগুণে অনর্গল ইংরেজী বলতে পারতেন। বাল্যে মাতৃহারা হওয়ায় পিতামহী রানী বিষণকুমারীর আদরের দুলাল প্রতাপকে কেউ ভয়ে কিছু বলতে পারতেন না। এমন কি রাজা তেজচন্দ্রও কিছু বলতে সাহস করতেন না। ফলে তিনি কাউকেই ভয় করতেন না। এই প্রসঙ্গে সঞ্জীবের মন্তব্য লক্ষণীয়,—

> "এই বীজ অর্থাৎ এই দুর্দ্দম ইচ্ছা, তাহার কাল স্বরূপ হইয়াছিল। ইচ্ছা দমন করিতে তিনি শিখেন নাই।"

ফলে প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুর পশ্চাদ্দেশে কলিকাপোড়ার ছাপ দেবেন তাতে আর অবাক হবার কি আছে। প্রতাপের অন্যগুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সঞ্জীব বলেছেন,

> "সর্বদাই প্রতাপচাঁদ আহ্লাদে আমোদে কাটাইতেন, তিনি হাসতে বড় পটু ছিলেন, হাসিতে গেলে তাহার গালে টোল পড়িত। সর্বদাই তাঁহার ঘর্ম হইত। পৌষ মাসের শীতেও তিনি ঘামিতেন। এই ঘর্মরোগ তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি ছিল।"

যুগ ও পরিবেশের সন্তান এই প্রতাপচাঁদ। যুগধর্মানুসারে তিনি সঙ্গীত ও অস্ত্রবিদ্যার চর্চা করেছিলেন। সাঁতার দিতে ও ঘোড়ায় চড়তে তিনি দক্ষ ছিলেন। আর প্রতাপচাঁদের রাগ কেবল সিভিল সার্বেন্টদের উপর ছিল। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনে ইংরেজ ওপর-ওয়ালার হাতে নিপীড়িত হয়ে যে কর্মহীন জীবনের অভিশাপ ভোগ করে ছিলেন তারই প্রতিশোধের তৃপ্তি তিনি

জাল প্রতাপচাঁদের এই "মেজেষ্টরকে নামাইয়া আগাগোড়া বিতাইয়া দেওয়ার" মধ্যেই নিহিত। কথাটির সত্যতা সঞ্জীবের জীবন প্রকৃতির সঙ্গে প্রতাপচাঁদের আন্তরিক মিলকেই মনে করিয়ে দেয়। প্রতাপচাঁদের সঙ্গে তাঁর পিতার একটি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য ছিল। তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধিও আগ্রহের অভাব ছিল না। একদিকে যেমন পিতা বর্তমান থাকতে সমস্ত বিষয় কর্মের দায়িত্ব নিয়েছিলেন অন্যদিকে কৌশলে পিতার কাছ থেকে সমুদয় বিষয়ের দানপত্র লিখে নিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র প্রতাপচাঁদের চরিত্র সম্পর্কে দুটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন,

"১। প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর এই রটনা হইয়াছিল যে তিনি কোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাত বাস গিয়াছেন—মরেন নাই।" ২। তাঁহারা (প্রতাপচাঁদ ও কুমার কৃষ্ণনাথ (বর্দ্ধমানের রাজা, সঞ্জীবচন্দ্রের সমকালে) সময়োপযোগী বা সমাজোপযোগী ছিলেন না।"

কিন্তু ঐ বিশেষ দুটি দিক সম্পর্কে কোন সবিশেষ আলোচনা করেন নি। অথচ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের হাতে পড়লে ঐ দুটি দিক কতই না বিস্তৃত হতে পারতো? কল্পনায় অবাধ বন্যা ইতিহাসের সত্যকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র সে পথে গেলেন না। তাই শতাব্দীর অন্তে জালরাজার কাহিনীতে চরিত্র নেই বলে অথবা পূর্ণ ইতিহাস হয়নি বলে দুঃখ করে লাভ নেই। যা আছে তাও আমাদের কাছে কম নয়।

জাল প্রতাপচাঁদের আসল মনোহারিত্ব রয়েছে লেখকের গভীর মমত্বে। যে মমত্ব তাঁর একান্ত আপন অন্তরসঞ্চারী। আপন জীবনের অভিজ্ঞতার স্মৃতির গাম্ভীর্য, নিজত্বের অনুষঙ্গ আধুনিক উপন্যাসে লেখকের লৌকিক অভিজ্ঞতার ফসল, —যেমন, শ্রীকান্ত, অপু, শিবনাথ (ধাত্রীদেবতা)। কিন্তু এরা তো চরিত্র অথচ এরা কি লেখকের আত্মস্বরূপ নয়? অথচ এরা তো সকলেই সৃজিত চরিত্র, ইতিহাসের কেউ নয়। কারণ ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে যে দুরত্ব ও বিপুলত্ব আছে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়। আমরা কেউই নিশ্চয়ই রাজসিংহ সীতারাম বা ভবানী পাঠকের মধ্যে বঙ্কিমকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবো না অথবা শিবাজী বা প্রতাপের মধ্যে রমেশচন্দ্রের সন্ধান করবো না। অথচ প্রতাপচাঁদের মধ্যে সন্ধানী পাঠকমাত্রেই সঞ্জীবচন্দ্রকেই দেখতে পাবেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে লেখকের এমন নিজত্ব আমরা আর কোথাও লক্ষ্য করি না।

ঐতিহাসিক চরিত্রের সমস্ত ঐতিহাসিক সত্যতা বজায় রেখে কল্পনার জল না মিশিয়েও কাহিনী প্রায় উপন্যাসের সগোত্র হয়েছে; ঐ কারণে সহানুভূতি মমত্ব স্বজাতিপ্রীতি এবং সর্বোপরি সমাজ ও কালের রেখা চিত্রণে লেখক তাঁর সহজ জীবন দর্শনের মাধ্যমে অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সার্থক উপন্যাসের কাহিনী থাকলেও চরিত্র ঘটনার সংঘাতের পরিণতিমুখিতা জালপ্রতাপচাঁদে যদিও

নেই, তবু ঐতিহাসিকতা সন্দেহাতীত। সমকালের পত্র পত্রিকা আজও প্রতাপচাঁদের মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করছে। জাল প্রতাপচাঁদকে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাস, বা উপন্যাস কোন চিহ্নেই অভিহিত না করতে পারলেও একে একখানি অদ্বিতীয় ইতিহাস নামে অভিহিত করা যায়।

ধর্মপ্রণেতা জাল রাজা প্রতাপকে লেখক যৌবনে স্বয়ং সত্যনাথ সন্ন্যাসী রূপে শ্রীরামপুরে দেখেছিলেন—তা সত্বেও তাঁর শেষ জীবনের চিত্রকে তিনি দীর্ঘায়িত করতে চাননি।

জাল প্রতাপচাঁদের মধ্যে আমরা মূলতঃ তিন ধরণের ভাষা ভঙ্গীর পরিচয় পাই। ১। ঐতিহাসিক প্রবন্ধকারের তথ্য বহুল ঋজু ভাষা, ২। দার্শনিকের গভীর ভাব নিমগ্ন কাব্যিক এপিগ্রাম এবং ৩। প্রহসন রচয়িতার তীব্র শ্লেষাত্মক বক্রোক্তি। সব মিলিয়ে কোথাও তাঁর মজলিসী মেজাজ এই গ্রন্থে ব্যহত হয় নি। কোথাও কোথাও এর তথ্য ভার যখনই একে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে তখনই লেখকের সহানুভূতিশীল ম্লান হাসির রেখাটি আমাদের আকর্ষণ করেছে কাহিনী ধারায়। সামান্য উদাহরণ নিলেই জাল প্রতাপচাঁদের ভাষাভঙ্গী অনুধাবন করা যাবে

১। ঋজু বর্ণানাত্মক ভঙ্গী :—

ক। "মূলকথা এ অঞ্চলের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই জালরাজার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। মোকদ্দমার সময় হুগলীর চতুর্স্পার্শ্বস্থ দুই তিন ক্রোশের অন্যূন দশ হাজার লোক নিত্য আসিয়া উপস্থিত হইত। জেলখানার দ্বার হইতে কাছারি পর্যন্ত পথে ঠাসাঠাসী করিয়া দাঁড়াইত।"

খ। "এই মোকর্দ্দমার প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব। যশোর জেলা নিবাসী শ্যামলাল তেওয়ারি নামক একজন ব্রাহ্মণ গোয়াড়ীতে আসিয়া কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন।" সাক্ষ্য প্রমাণের ভাষায় এই ভঙ্গী বর্ত্তমান। কোথাও কোথাও আদালতের নিজস্ব ভাষারীতি ব্যবহার করে আমাদের একেবারে সেই পরিবেশে হাজির করে দিয়েছেন, জাল প্রতাপচাঁদে এই ভাষারীতিরই প্রাধান্য লক্ষণীয়।

২। ভাব গম্ভীর কাব্যময় ভাষা :—

ক। "এ সংসারে যে চাঞ্চল্য, যে বেগ, যে আশা দশ বৎসরে ক্রমে ক্রমে মন্দগতি, কখন আইসে কখন আইসে না, সেই আশা, সেই বেগ, সেই চাঞ্চল্য এক দিনে একদণ্ডে, এক মুহূর্ত্তে, দুর্দ্দম বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই খেলার সুখ। আবার তাহার উপর অদৃষ্টের কুহক। প্রমারার অদৃষ্টের নাম গডতা। এ সংসারে অদৃষ্ট খুলিলে ধুলামুটা ধরিলে সোনামুটা হয়।"

খ। "যিনি কর্জ লইতেন, তিনি জানিতেন উপকার করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব, যিনি কর্জ দিতেন, তিনি জানিতেন আমি সময়ে সময়ে বিপদে হইতে উদ্ধার পাইব। তখন পদে পদে লোকের বিপদ ঘটিত। বাঙ্গালীর মধ্যে আত্মীয়তা ও শত্রুতা উভয়েই তখন গুরুতর ছিল।"

এখানে লক্ষণীয় গভীর কথার অন্তরালে ইতিহাস কথন ভঙ্গীটি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

৩। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বিচার প্রহসনের চিত্রগুলির মধ্যে সঞ্জীব তাঁর চিরাচরিত ব্যঙ্গপ্রিয়তা অসাধারণ বক্রোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অথচ আশ্চর্য সহৃদয়তা তারই আড়ালে সর্বত্র সঞ্চারমান।

ক। "লোকে এ বিবাহের তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই বিবাহের সকলেই বিরক্ত হইল, অনেক সন্দেহ করিল। মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর পরাণবাবুর ভগিনীপতি ছিলেন, এবার জামাতা হইলেন। লোকে ভাবিল, ইহা গ্রন্থির উপরগ্রন্থি। প্রতাপচাঁদ ভাবিল পরাণমামা দড়ি পাকাচ্ছেন।"

খ। "তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়, প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া থাকেন। কেহ কোন নূতন সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, ইনি কাহার সাহেব? অর্থাৎ কাহার ক্রীত? যাঁহার কেনা সাহেব থাকিত, তাঁহার সম্মান বঙ্গসমাজে অতুল হইত। তিনি মনে করিলে শত্রুর প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে পারিতেন। কেনা সাহেব তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। সাহেব ক্রয় করার পদ্ধতির মধ্যে এই মাত্র একটু বিশেষ ছিল যে, সাহেব ক্রয় করিতে বাজারে যাইতে হইত না। যে সাহেবেরা বিক্রীত হইবেন, তাঁহারা আপনারাই বাটীতে আসিয়া শৃঙ্খল গলায় পরিয়া যাইতেন।"

এই শ্লেষাত্মক ভঙ্গী কোথাও তীব্র ও ব্যক্ত, আবার কোথাও অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত। ইতিহাসের তথ্য বর্ণনার মধ্যে এই প্রহসনাত্মক ভঙ্গী তথ্যের ভারকে কখন যে হাল্কা করে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করেও তা আমরা বুঝতে পারি না—এইখানেই সঞ্জীবের ঐশ্বর্য।

জাল প্রতাপচাঁদের আলোচনার উপসংহারে আমরা একটি প্রাচীন মন্তব্য তুলে আমাদের আলোচনা শেষ করতে পারি।—

"জাল প্রতাপচাঁদ পড়িয়া কাহার না চোখে জল আসে? সঞ্জীবচন্দ্র ভিন্ন আর কোন ঐতিহাসিক এমন করিয়া প্রতাপের প্রতি সমবেদনার সৃষ্টি করিতে পারিতেন? হৃদয় না থাকিলে কে প্রতাপের জন্য এতকাল পরে রাশীকৃত নথীপত্র হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে যাইত!"[১২]

: মাধবীলতা :

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর "মাধবীলতা" গ্রন্থটি তাঁরই সম্পাদনাকালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম বর্ষে অর্থাৎ ১২৮৫ থেকে ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। রচনা ও প্রকাশকাল একই সময়ে বলে অনুমান করা হয়। মাধবীলতা কণ্ঠমালার পূর্বভাগ। অথচ কণ্ঠমালার রচনাকাল ১২৮১-৮২ সন। অর্থাৎ মাধবীলতার উত্তরভাগ কণ্ঠমালা ৪-৫ বছর আগেই রচিত। উত্তর খণ্ড আগে রচনা করে পূর্বখণ্ড পরে রচনার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল। তবে মনে রাখতে হবে কয়েকটি চরিত্রের নাম ছাড়া প্রকৃত পক্ষে কাহিনী ও রচনা রীতি এবং স্থানকাল পাত্রের ক্ষেত্রে কোন গ্রন্থই একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল নয়। দুটি বই-ই স্বয়ং সম্পূর্ণ। গ্রন্থাকারে কণ্ঠমালা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খৃঃ এবং মাধবীলতার প্রথম গ্রন্থাকারেপ্রকাশকাল ১৮৮৫ খৃঃ। এই দুই গ্রন্থ প্রকাশ কালের মধ্যবর্তী সময়ে সঞ্জীবের আরও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে জাল প্রতাপচাঁদ (১৮৮৩ খৃঃ), বৈজিকতত্ত্ব (১২৮৪ সন, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) সংকার (১৮৮১ খৃঃ) বাল্য বিবাহ (১৮৮২ খৃঃ) ইত্যাদি প্রধান।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অংশ অপেক্ষা মুদ্রিত গ্রন্থটিতে বহু পাঠান্তর ঘটেছে, তবে কণ্ঠমালার মত কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটান নি লেখক। কণ্ঠমালার পরে রচিত হওয়া সত্ত্বেও মাধবীলতার রচনারীতি আরও শিথিল। উপন্যাসের ধর্ম থেকে মাধবীলতা অনেক বেশী বিচ্যুত। ডঃ সুকুমার সেনের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এস্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে—

"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশের দুই জমিদার বাড়ীর চক্রান্ত লইয়া এই রোমান্টিক ও অনেকটা উপকথা ধরণের উপন্যাসটির পরিকল্পনা। মাধবীলতার রচনভঙ্গীও যেন উপকথার মতো। মূল আখ্যানের সহিত অল্প বিস্তর সম্পৃক্ত ঘটনার ও বর্ণনার লতাজালে মূল কাহিনী স্থানে স্থানে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। প্লটের পরিসমাপ্তি অত্যন্ত আকস্মিক, মনে হয় লেখক যেন হঠাৎ বইটি শেষ করিয়া দিয়াছেন।"[৭৩]

ডঃ সেন কণ্ঠমালার ইংরেজ জেলদারোগা, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদির উল্লেখ দেখে মাধবীলতার কাল ভূমিও অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বলে ধরে নিয়েছেন। অথচ গ্রন্থটিতে এমন কোন ইঙ্গিত নেই যা আমাদের কাহিনীর স্থান ও কালের বাস্তব সীমা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থকভাবেই এই দিকটি নির্দেশ করেছেন—

"মাধবীলতা উপন্যাসটি যে অতীতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাহা আমাদের

নিকট অপরিচয়ের রহস্যে আবৃত রহিয়া গিয়াছে। সেটা যে কোন যুগ, কতদিন পূর্বের সমাজচিত্র তাহা আমাদের নিকট অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত থাকিয়া যায়—লেখকের কাল জ্ঞাপক ইঙ্গিতগুলির অঙ্গুলি নির্দেশ ও সে বিষয়ে আমাদিগকে নিঃসংশয় করিতে পারে না। রাজা ইন্দ্রভূপের সম্পূর্ণ স্বাধীন নৃপতির স্থায় আচরণ, তিনি হিন্দুরাজার ক্রিয়াকলাপ ও শাসন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। এক প্রজাবৃন্দের নৈতিক অসমর্থন ছাড়া তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনায় আর কোন প্রতিবন্ধক নাই। মুসলমান বা ইংরেজ প্রভাবের ক্ষীণতম ইঙ্গিতও গ্রন্থ অনুপস্থিত।"৭৪

সত্যাই ভেবে অবাক হই কণ্ঠমালার পূর্বভাগ পরে রচনা করে সঞ্জীব কিভাবে সম্পূর্ণত কালের কথা ভুলে গেলেন—এই অসতর্কতা সঞ্জীবের স্বভাব ধর্মের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মত সম্পূর্ণত আমরা গ্রহণ করতে পারি না, তিনি বলেছেন,

"মাধবীলতায় রোমান্সের অংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, এক পিতম পাগলের অলৌকিক দৈবশক্তিই ইহার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের পর্যায়ে পড়ে।"

আমরা জানি রোমান্স প্রবণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কেবলমাত্র অলৌকিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, স্থান কাল পাত্র যখন বাস্তব সীমা লঙ্ঘন করে কোন সুদূর লোকে যাত্রা করে তখন লেখকের রোমান্সরসিক মনের পরিচয়টি আমরা সহজেই পাই। কণ্ঠমালায় অলৌকিক জগতের অসম্ভব্যতার বাড়াবাড়ি কিছু থাকলেও মাধবীলতার জগৎটিই লেখকের দূরচারী মনের সামগ্রিক প্রকাশ। এর রচনা রীতিই মূলত উপকথা বা রূপকথাধর্মী। বরং স্থান কালের ও চরিত্রের বাস্তব সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে সঞ্জীব তাঁর রচনাবলীর মধ্যে মাধবীলতায় চরম রোমান্সরসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের সুদূরচারিতার মধ্যে যেটুকু বাস্তবের গন্ধ আছে সঞ্জীব কল্পনার রাজারানীদের এখানে হাজির করে সেটুকু বাস্তবের অস্তিত্বও মুছে ফেলেছেন।

মাধবীলতা কাহিনীর কথামুখ তাঁর অন্যান্য কাহিনীর কথামুখ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, রীতিমত রূপকথা, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মমগ্ন তত্ত্বজিজ্ঞাসা, জগৎ ও জীবনের কোন গভীর সত্যে অবগাহনের চেষ্টা প্লটের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়েও সূক্ষ্মভাবে কাহিনীর থিম বা ভাবসত্য বহন করছে,—

"একদা সিংহ শত গ্রামে একজন ধনবান রাজা বাস করিতেন। এক্ষণে সে গ্রাম নাই, সে রাজাও নাই। কেবল বৃহৎ অট্টালিকার দুই একটি ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে। ধনবানের শেষ চিহ্ন এইরূপ প্রস্তরখণ্ড বা ইষ্টক স্তূপ। উপযুক্ত পরিণাম, বিক্রমাদিত্যের এক্ষণে সিংহদ্বারের এক ভগ্নাংশ মাত্র আছে। কিন্তু গরিব কালিদাসের শকুন্তলা অদ্যাপি নব প্রস্ফুটিত কানন কুসুমের স্থায় সত্যাক্ত, পূর্ণচন্দ্রের স্থায় মনোহর ও দিগন্তব্যাপী। মূর্খের নিকট শকুন্তলা বৃথা। অন্ধের নিকট চন্দ্রও মিথ্যা। বিক্রমাদিত্য স্বর্ণসিংহাসনে, আর কালিদাস নিম্নে, যোড়হস্ত। ভুল।"

কথামুখের এই আলোকে আমাদের মাধবীলতার রসাস্বাদ করতে হবে। কাহিনী-গঠনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখবো এখানে যে গল্প আছে তা যতই জটিল হোক ও অপ্রাসঙ্গিকতার লতাজালে যতই আচ্ছন্ন হোক, লেখক যেন আনমনে আপন কথাই বলে গেছেন, কখন কাহিনীতে কখন চরিত্রের পরিস্ফুটনে আর কখনও বা স্বগতোক্তিতে ; ফলে মাধবীলতার গঠন ভঙ্গি অত্যন্ত শিথিল, পরিচিত বিচারের মানদণ্ডে পদে পদে দণ্ডিত। তবু কবি হৃদয়ের গভীর মননজাত অনুরণনের সাধারনী-করণ যদি সাহিত্য হয়, রচনা রস সম্ভোগের আনন্দ যদি আমাদের আস্বাদ্য হয়, তবে মাধবীলতা পাঠে আমরা হতাশ হব না।

প্রথম পরিচ্ছেদেই কাহিনীর সূচনা। কোন পশ্চাদপটের অপেক্ষা রাখেন নি সঞ্জীবচন্দ্র। রাজা ইন্দ্রভূপ শান্ত নির্বিরোধ সরল প্রকৃতির সাধারণ মানুষ, কিন্তু তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র চূড়াধন বাবু কুচক্রী কুটিল। রাজার সঙ্গে আপাতভাবে তিনি খুব ভালো ব্যবহার করলেও সর্বদাই তাঁর অনিষ্ট সাধনের চক্রান্ত আঁটেন। রাজা বোঝেন না, কিন্তু তাঁর সৎ কর্মঠ দেওয়ান তা সহজেই বুঝতে পারেন। চূড়াধনের চক্রান্তে দেওয়ানের গৃহদাহ হয়, যদিও চূড়াধনই তাঁদের রক্ষা করার জন্যে সকলের আগে উপস্থিত হন। দেওয়ান তাঁর ছেলেকে চূড়াধনের ধূর্তামি সম্পর্কে সাবধান হতে বলেন—চূড়াধন অন্য প্রসঙ্গক্রমে দেওয়ানকে ব্যঙ্গ করেন। কাহিনী সূচনার উপস্থাপন ভঙ্গীটি শক্তিশালী লেখকের কীর্তি তা পাঠকের বুঝতে ভুল হয় না। এই প্রথম পরিচ্ছেদে মুহূর্ত মধ্যে উক্ত তিনটি চরিত্র আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চূড়াধন ও তাঁর স্ত্রীর পরিচয় সঞ্জীব সহজ ব্যঙ্গপ্রিয়তায় চমকপ্রদভাবে দান করেছেন। আমরা জানতে পারি চূড়াধনের দুই পাপ সঙ্গী জনার্দন ও কালীপ্রসাদের কথা। এখানে রচনাভঙ্গী অনেকটা কথকতা ধরণের।

তৃতীয় পরিচ্ছেদটিতে আমরা সঞ্জীবের প্রতিভার বিশিষ্ট প্রবণতা প্রকাশ হতে দেখি। উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের প্রতি সঞ্জীবের বিশেষ সহানুভূতি যে তাঁর আত্মানুভূতির অঙ্গীভূত তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। তাঁর সৃষ্ট উৎকেন্দ্রিক চরিত্র সমূহের মধ্যে পীতাম্বর বা পিতম পাগলা একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। কণ্ঠমালায় শৈল চরিত্রের পাগলামির মধ্যে স্বাভাবিকতা ও পরিণতির কারণ দেখালেও পিতম পাগলার চরিত্রের মধ্যে এই স্বাভাবিকতার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। তা সত্ত্বেও বলা যায় পিতমের পাগলামির মধ্যে একটা রিদম বা ছন্দ আছে। পাগল চরিত্র সৃষ্টিতে এই ছন্দোবোধ নিঃসন্দেহে লেখকের সঙ্গতিবোধের অভাব সূচিত করে। অবশ্য লেখক নিজেই বলেছেন—

"পিতমের ভুলে লোকের রহস্য বাড়িত, লোকের ভুলে পিতমের রাগ বাড়িত।... এ সকল প্রথম অবস্থার কথা।"

এই প্রথমাবস্থার কথা বর্ণনা করতে লেখক পিতমকে পাগল সাজিয়েছিলেন, পরে আবার তাকে সজ্ঞানে ফিরিয়ে এনেছেন। স্মৃতিভ্রষ্ট চরিত্রকে নিয়ে সঞ্জীবানুজ পূর্ণচন্দ্র

"মধুমতী" গল্প অনেক আগেই রচনা করেছেন। কিন্তু সেখানে স্মৃতিভ্রষ্টাকে পাগল হিসাবে দেখান হয় নি। কিন্তু সঞ্জীবের উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের প্রতি যে গভীর সহানুভূতি তাতে তিনি পাগল পাগলী চরিত্র গড়তে ভালবাসতেন আর তারই ফল পিতম চরিত্র। সেই জন্যেই পিতম উন্মাদ হাস্যকরচরিত্র মাত্র নয়। তার মধ্যে লেখক যে দিব্যোন্মাদ বা Poetic Ecstasy প্রকাশ করেছেন তাতে লেখকের কবি-সুলভ আত্মানুভূতি বারবার প্রকাশ পেয়েছে। পিতম রাজা ইন্দ্রভূপকে জানাল যে সে সমুদ্রকে বিবাহ করে ফেলেছে, তাই শুনে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—সমুদ্র কি সুন্দরী? পিতম উত্তর করলো—"চমৎকার সুন্দরী। রামধনুকে শ্যামাঙ্গীর কটিবন্ধন। এই জন্য তাহার যে বাহার তা আর কি বলিব? সুন্দরী অনবরত হেলিতেছে, দুলিতেছে আর খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।" আবার পিতমের পাগলামি কোথাও কোথাও হাস্যোদ্দীপক হলেও দেখবো তার প্রতিটি কথা ও আচার আচরণ গভীর অর্থবাহী রূপকদ্যোতক। রাজার মত আমাদের মনেও সংশয় জাগে, "বল দেখি, তুমি কি সত্যই পাগল?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখকের সঙ্গতি অসঙ্গতিবোধের একটি সুন্দর কৈফিয়ৎ আছে, পিতমকে ঘিরে চূড়াধন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দেওয়ান ও রাজার ভাবনার মাধ্যমে। বিশেষ করে রাজার ভাবনায় পিতমের পূর্ব ইতিহাসের রহস্য যেমন ঘন হয়ে উঠেছে তেমনি তার পাগলামির স্বরূপ সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিকোণের সঠিক গতি বোঝা যায়—'পিতমের কথাবার্তা অসঙ্গত, কিন্তু অসংলগ্ন নহে। পাগলের কথা এরূপ হয় না।'

এই অংশের পরেই সঞ্জীব দার্শনিক তত্ত্বচিন্তায় ডুব দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে আধুনিক মনোভঙ্গীর যে আগুন ছিল তারই স্ফুলিঙ্গ মুহূর্তে মুহূর্তে উদ্‌ভাসিত হয়েছে—

> "যে ব্যক্তিরা বাষ্পীয় যন্ত্র গঠন করিতেছে, চন্দ্র সূর্যের গতি গণনা করিতেছে, বাষ্প হইতে জলের সৃষ্টি করিতেছে, তাহারাই হয়তো বৃষ্টির নিমিত্ত দৈব চেষ্টা করিতেছে। মড়ক নিবারণ করিতে হইলে তাহারাই হয়তো বলিবে; চল ধর্ম মন্দিরে চল, বা আড্ডায় চল, প্রার্থনা গাই গিয়া, মড়ক অবশ্য নিবারিত হইবে।' বুদ্ধির এইরূপ বৈষম্য দেখিলে কেহ এক্ষণে অসঙ্গত বিবেচনা করে না। কিন্তু পরে করিবে। হয়তো তখন এরূপ বুদ্ধিমানকে লোকে পাগল বলিবে।"

অথচ এই পরিচ্ছেদেই রোমান্স লেখকের ভঙ্গীতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নাটকীয় ভাবে রেখে গেছেন,—

> "রাজা—নৃসিংহদেব। তোমার প্রহ্লাদ কই?
> পিতম—তুমিই আমার প্রহ্লাদ, তুমিই আমার ভক্ত।
> রাজা—আর তোমার রাজা হিরণ্যকশিপু কই?
> পিতম—(চূড়াধনকে দেখাইয়া) ঐ আমার হিরণ্যকশিপু।
> রাজা—চূড়াধন ত রাজা নহে।

পিতম—শীঘ্র হবেন।

হঠাৎ রাজা ও চূড়াধন উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদে কাহিনীর ধারায় নামবার আগে লেখক যদিও কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথায় জল ঘোলা করেছেন, তবুও ধীরে ধীরে রাজার সঙ্গে শিশু কন্যা মাধবীলতার সম্পর্কটি এক অপূর্ব সংযমের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এখানে সঞ্জীবের বাৎসল্য রসের আধিক্যের প্রকাশটিও সুন্দর। আমরা আগেই বলেছি বাঙ্গালা সাহিত্যে বাৎসল্য রসের স্রষ্টা হিসেবে সঞ্জীবের কীর্তি অসামান্য। অপর পক্ষে রাজা কন্যার পরিচয় না জেনেই আপন আত্মজার প্রতি গভীর স্নেহ প্রকাশ করলেন, তা আমাদের শিশু ভরতের প্রতি রাজা দুষ্মন্তের স্নেহের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার রাজার অকারণ বিমর্ষতার স্বরূপটিও অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত। এই ধরণের বিষাদ বৈরাগ্য কখনো কখনো কোন কোন রচনায় রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রধান উপাদান, এমন কি অতি আধুনিক মননধর্মী গল্প উপন্যাসে যে অহেতুক বিমর্ষতারই রূপটি দেখতে পাই তারই অপরিশোধিত পূর্ব রূপ এখানে আভাসিত—

"শঙ্খ প্রথমে একটি দুইটি, এখানে সেখানে, ভগ্ন স্বরে, নিম্ন স্বরে, কম্পিত স্বরে, পরে একেবারে প্রতিগৃহে গম্ভীর স্বরে বাজিয়া উঠিল, শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। রাজা আরও বিমর্ষ হইলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন, মরণোন্মুখ কোন ভীষণ অসুর হতাশস্বরে আর্তনাদ করিতেছে। তাঁহার কর্ণে শঙ্খধ্বনি অমঙ্গল ধ্বনি বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।"

মাধবীলতাকে কোলে করার পর তাঁর সেই বিমর্ষভাব কেটে গেলো। তা যে কেবল মাত্র শিশুর স্পর্শেই ঘটেছে তা নয়, তার পিছনে আপন আত্মজার স্পর্শ যে বেশী ক্রিয়াশীল তা উপন্যাসের পরবর্তী অংশে বুঝতে পেরেছি।—এখানে লেখকের ইঙ্গিতমর্মিতা প্রশংসার যোগ্য। এই অংশে রাজা, চূড়াধন ও রামসেবক শর্মার (মাধবীলতার পিতা) চরিত্র তাদের ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যার নামে এই গ্রন্থ তার অর্থাৎ শিশু মাধবীলতার নামও আমরা এই পরিচ্ছেদে জানতে পেরেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট। এক ব্রহ্মচারীর পরিচয়—যদিও রহস্যাবৃত, তবু রাজার মঙ্গলাকাংক্ষী। রাজার শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনে যে অমঙ্গলের ছায়াপাত হতে চলেছে তার ইঙ্গিত আগের পরিচ্ছেদে থাকলেও এই অংশে প্রজার অপহরণ ঘটনায় (ঘটনার মূলে চূড়াধন) তা আরও অর্থবাহী হয়ে উঠেছে। দেওয়ানের বুদ্ধি ও রাজার এবং রাজ্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গল্পের গতি এইখানে থেকে জটিল ও দ্রুত হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে সঞ্জীবের লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা সুস্পষ্ট। দরিদ্রের ভাগ্যোদয়ে প্রতিবেশীদের যে কী জ্বালা তা তিনি প্রবাদ বচনের মতই বলেছেন—

"বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, ঋষি কেবল প্রতিবাসী পরিত্যাগী গৃহী।"

(পালামৌ) তারই প্রত্যক্ষ নাটকীয় রূপটি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজা যখন মাধবীলতার প্রতি স্নেহে তার পিতামাতার সুখের ব্যবস্থা করে দাসদাসী পাঠিয়েছেন তখন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামসেবকের অবস্থার উন্নতির ভিতর দিয়ে প্রতিবেশীদের মর্মদাহী মন্তব্য যে তাদের দুঃখের কারণ হবে তার আভাসটি সুপরিস্ফুট। এরই মধ্যে পুটু (মাধবী) ও তার মায়ের বাৎসল্য রসের চিত্রটি বর্ণ বৈপরীত্য সৃষ্টি করছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদের প্রেক্ষাপট রাজ অন্তঃপুর॥ পুটুকে নিয়ে মহারাজ অন্তঃপুরে এলেন। শিশুর কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠলো পরিবেশের গাম্ভীর্য। রাণীও আপন আত্মজার স্পর্শে পরিতৃপ্ত। রাজার সঙ্গে তারই আলোচনা মাধবীলতার জন্ম রহস্যের ইঙ্গিত ঘণীভূত করে তুলেছে।

নবম পরিচ্ছেদে মাধবীলতার জন্ম রহস্য পাঠককে রুদ্ধ শ্বাস করে তুলেছে। রাজ ভগিনীর সঙ্গে মাধবীলতার জন্মের কোন রহস্য যে জড়িত তা আমরা বুঝতে পারি। এখানে রাজার কনিষ্ঠা ভগিনীর পরিচয়ে প্রথম উন্মোচিত হল—

"তিনি বিধবা নিঃসন্তান তথায় (রাজগৃহে) বাস করেন।"

রানীর সঙ্গিনীদের একজন রাজভগিনীকে জানাল যে মাধবীলতাকে নিয়ে তার মা রাজ অন্তঃপুরে এসেছিল। রাজভগিনী ও রানীর সঙ্গিনীদের কথোপকথন রহস্যকে সঘন করে তুলেছে। এখানে লেখকের অসামান্য কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যাক—

"সঙ্গিনী—আজি সেই মেয়ে দেখিলাম।

রাজভ—কোন মেয়ে?

সঙ্গিনী—আপনি সকল ভুলে গেছেন?

রাজভ—আমার কই কিছুই মনে হয় না।

সঙ্গিনী—সেই হতভাগিনী।

রাজভ—কোন হতভাগিনী?

সঙ্গিনী—আপনি কি সেই বিপদের রাত্রি ভুলিয়া গিয়াছেন?

রাজভ—এখন বুঝিলাম। কোথায় দেখিলে?

সঙ্গিনী—এই রাজবাটীতে, এইমাত্র।

রাজভ—সে কি? কে আনিল? চল আমি দেখি গে।

সঙ্গিনী—এক্ষণে আর দেখিতে পাইবেন না, তারে লয়ে গিয়েছে।

রাজভ—আহা। আমি দেখিতে পেলেম না। কে আনিয়াছিল?

সঙ্গিনী—তার মা।

রাজভ—রাণী কি বলিলেন?

সঙ্গিনী—দরিদ্রের কন্যা বলিয়া কয়েকখানি মোহার দিলেন। মেয়েটিকে রাজা বড় ভালবেসেছেন। আপনি কোলে নিলেন, মুখে চুমো খেলেন।

রাজভগিনী চক্ষের জল মুছিয়া অন্য মনস্কে বসিয়া রহিলেন।"

মাধবীলতার জন্মের অস্ফুট পরিচয়ের রহস্যাবৃত চমকপ্রদ বর্ণনা রোমান্স আবহের

পরিমণ্ডল লেখকের নির্মিতি কৌশলকে প্রশংসনীয় করে তুলেছে। দশম পরিচ্ছেদে দরিদ্রের হঠাৎ অবস্থা ফিরলে কি দুর্দশা হয় তারই সহাস্য সহৃদয় বর্ণনা। রামসেবকের প্রতিবেশীর ধারণা যেমন পুটুর মায়ের আকর্ষণে তাদের প্রতি রাজার দয়া, তেমনি দাসী সোহাগীর ধারণা পুটুর মায়ের জন্যেই রাজার রানীর প্রতি ভালোবাসা গিয়েছে। এখানে কালজ্ঞাপক দুটি পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের ফলে মাধবীলতার কাহিনীর কালভূমি চিহ্নিত করতে পারি না।

"১। তেল আর কেনা যায় না। ছয় পয়সা করে সের। পরে কি যে হবে, তাহা বলা যায় না।

২। রক্তবর্ণই তখনকার ফ্যাশন ছিল।...পরে শক্তি উপসনার সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্ণের কিছু মান কমিয়াছিল। কৃষ্ণ উপাসনা প্রবল হইলে রক্তবর্ণের পরিবর্তে কৃষ্ণবর্ণের আদর বৃদ্ধি হইল।"

এ কোন সময়? শায়েস্তা খাঁর রাজত্বকাল না হোসেন শাহের কাল?

একাদশ পরিচ্ছেদে দরিদ্রের অবস্থান্তরে প্রতিবেশীদের কথা, হয়তো বা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশ—

"যাহারা ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া আহা বলে, পরে তাহারা অলঙ্কার দেখিলে মুখভার করে। যতদিন আমার অপেক্ষায় তুমি দীনদশাপন্ন থাক, ততদিন আমি তোমায় ভালবাসি। তাহার পর স্বতন্ত্র ব্যবহার।"

লেখক আর একটি সরস মন্তব্যের আলোকে এই পরিচ্ছেদের অন্য অর্থ বোঝা যাবে—

"গৃহিনী সুন্দরী দেখা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।"

রামসেবক এতদিন স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখেন নি, একটি ভালবাসার কথাও বলেন নি। অবস্থান্তরে সেই সব প্রশ্ন তাঁদের মনে জেগেছে। তাঁদের সুখী দাম্পত্য জীবনের উপর আশু অমঙ্গলের ছায়া ঘনিয়ে উঠতে চলেছে তার আভাস সরলমতি গ্রাম্যবধূ পুটুর মায়ের কথার মধ্যে ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। মনের গভীরে দৃষ্টি ক্ষেপনের সহজ ক্ষমতা যে সঞ্জীবের ছিল তা এই পরিচ্ছেদের আর একটি কথার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রামসেবক তাঁর স্ত্রীকে বলেছেন "তোমায় হয়তো মার মত ভালবাসি'— সংলাপটি পাঠককে সচকিত করে তোলে। ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব বলে, প্রতিটি পুরুষের মধ্যে ঈডিপাস কমপ্লেকস কাজ করছে, আপন প্রেয়সীর মধ্যে তাই প্রতিটি পুরুষ তার মাকে খুঁজছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কাহিনীর রহস্য আবার গভীর হয়ে উঠেছে। রাজা ইন্দ্রভূপ ও চূড়াধনবাবু ও পরিষদবর্গের সঙ্গে ভ্রমণ করছেন তখন পিতম পাগলের সঙ্গে দেখা। পরে রাত্রে দুই খর্বকায় সঙ্গীর সঙ্গে চূড়াধনের রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। কিন্তু কাহিনীর ফাঁকে লেখকের তত্ত্বালোচনা তাঁর বিশেষ প্রবণতা ও মৌলিকতার পরিচয় বহণ করছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মন্তব্যটি যথার্থ—

"সঞ্জীবচন্দ্রের নিকট কেবল গল্প বলিবার সহজ সরল চিত্তাকর্ষক ভঙ্গী ও আখ্যায়িকা

রচনায় নিখুত স্থাপত্য কৌশল প্রত্যাশা করিলে পাঠককে হতাশ হইতে হইবে, লেখকের প্রতিও অবিচার করা হইবে। আসলে গল্প লেখকের মনোবৃত্তি অপেক্ষা চিন্তাশীল দার্শনিক ও বর্ণনাকুশল শিল্পীর মনোভাবই তাঁহার প্রবলতর। গল্প বলিতে যখনই কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনা বা মন্তব্য প্রকাশের অবসর উপস্থিত হয়, তখনই তিনি পূর্ণমাত্রায় সেই অবসরের সদ্ব্যবহার করেন, গল্পের অগ্রগতিরোধের ভাবনা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে না।···ইন্দ্রভূপ ও চুড়াধনের আকৃতি বৈষম্যের আলোচনা, হাসি ও পাগলামির প্রকৃতি বিশ্লেষণ, পোষাক পরিচ্ছেদ ও দেহ প্রসাধনে রক্তবর্ণের ও কৃষ্ণবর্ণের প্রাদুর্ভাবের কারণ নির্দেশ, শ্মশ্রুগুম্ফ রাখা না রাখার সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য, বাঙলাদেশের মৃত্তিকার সহিত বাঙালী প্রকৃতির ঘনিষ্ট সম্পর্ক, বর্ণমালার অক্ষরের আকৃতির দ্বারা জাতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়—এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক সূক্ষ্ম চিন্তাশীল মন্তব্যই তাঁহার প্রতিভার বিশেষ প্রবণতার সাক্ষ্য দেয়।"৭৫

মাধবীলতার এই পরিচ্ছেদে লেখকের এই বিশেষ প্রবণতা গল্পের অগ্রগতি রোধের কারণ হয়েছে।

পরের পরিচ্ছেদে ঐ একই দোষ। ব্রহ্মচারী ও পিতমের আলাপের সূচনায় বাঙলাদেশের মৃত্তিকার সহিত বাঙালীর প্রকৃতির ঘনিষ্ট সম্পর্ক' লেখক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে দুটি সংবাদ পিতমের মুখে দেওয়া হয়েছে—'কল্য রাজকুমারের জন্মদিন।' আর 'রাজার বিপদ।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদটি বড এবং কাহিনী এখানে জটিল আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে। রাজকুমারের প্রথম জন্মবার্ষিক উৎসব। সমাগতদের মধ্যে পিতম পাগলা বিমর্ষভাবে বসে, চিকের আড়ালে রাজভগিনী জ্যোৎস্নাবতী তাঁকে দেখে কোন এক স্মৃতি বিস্মৃতির দ্বন্দ্বে তাঁর পরিচায়িকা মাতঙ্গিনীকে তার পরিচয় জানতে চাইলেন। রাজকুমারকে আশীর্বাদ করার আহ্বানে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁকে চলে যেতে হল বটে, কিন্তু তাঁর অশ্রুসজলতাকে রাণী বিপরীত বুঝলেন, তাতে ইন্ধন জোগাল চুড়াধনের স্ত্রী। রাজসভায় রাজকুমারকে আশীর্বাদের জন্যে আনা হলে দশরথ নামে একজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক তাকে তাঁর অপহৃত সন্তান বলে দাবী করলেন। দেওয়ান এই ব্যাপারে গভীর চক্রান্ত অনুমান করে অধ্যাপককে নিয়ে অন্যত্র গেলেন।

পরের পরিচ্ছেদের এই সন্তান চুরির ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়! তবে পিতমের রহস্যময় কথায় আমরা জানতে পারি এই ঘটনার পশ্চাতে চুড়াধনের চক্রান্ত বর্তমান। লেখকের উপস্থাপনা রীতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময়। ছেলে যে রাজা চুরি করেছেন এই ব্যাপারে দশরথকে প্রশ্ন করার সময় চুড়াধন হাজির হলে দশরথ জানাল সে চুডাধনের অনুপস্থিতিতে সবকথা দেওয়ানকে জানিয়েছে। পিতম উত্তর করলো সব কথা জানান হয় নি।—

"দশরথ—কি কথা?

পিতম—স্মরণ করুন।

দশরথ—কৈ, আর কোন কথা ত স্মরণ হয় না।

পিতম—তবে চূড়াধন বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।

এই কথায় চূড়াধনবাবু কিঞ্চিৎ সভয়ে পিতমের দিকে কটাক্ষ করিলেন, তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কথা পিতম।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে সঞ্জীব পিতমকে সম্পূর্ণ সুস্থতার দিকে নিয়ে চলেছেন। এই পরিচ্ছেদে চূড়াধনের প্রচণ্ড শয়তানির স্বরূপটি লেখক সুদক্ষ ঔপন্যাসিকের মত অঙ্কন করেছেন। আমরা আগেই বলেছি পিতমের পাগলামির মধ্যে একটি ছন্দ ও রীতি আছে। তার প্রতিটি কথা প্রায় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তার প্রতি সহানুভূতি প্রকৃতপক্ষে লেখকের আত্মানুভূতির নামান্তর, তাই ক্ষণে ক্ষণে পিতমের মধ্যে আমরা লেখকের দার্শনিক তত্ত্বচিন্তার বৈদ্যুতি লক্ষ্য করি—

"মালা গাঁথা বড় ভাল। মন স্থির করিবার এমত উপায় আর নাই, মাথা নামাইলে জগতের আর কিছু দেখা যায় না। সে সময় পক্ষীর চীৎকার ব্যতীত আর কোন শব্দ শুনা যায় না, পুষ্পের গন্ধ ভিন্ন আর কোন ঘ্রাণ পাওয়া যায় না। তখন দেহের সকল কপাট বন্ধ, কেবল মন খোলা, মনকে তখন একা পাওয়া যায়। তাহাতেই যুবতী বেটীরা মালা গাঁথে। যোগীর ধ্যান আর যুবতীর মালা গাঁথা একই জিনিস।"

এই পিতম সজ্ঞানে ফিরে এসেছে, যখন সে অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি বলল,

"ভগবান। আবার এ বিড়ম্বনা কেন? অন্ধকারে আলোক কেন?"

অন্ধকারে আলো কি? এই সব রহস্যই পাঠককে সমস্ত বাধাবন্ধ পেরিয়ে রহস্য ভেদের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে রাজার ও দেওয়ানের কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারলাম অধ্যাপকের ছেলে চুরির ব্যাপারটা নেহাত অমূলক ঘটনা নয়। জ্যোৎস্নাবতীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে। তার আভাস আমরা নবম পরিচ্ছেদেই পেয়েছি। এখানেই দেখি কাহিনীর আর একটি অংশ উদ্‌ঘাটিত হতে চলেছে—জ্যোৎস্নাবতীর উপর রানীর রাগ দাসীদের চক্রান্তে আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদে অপমানাহত জ্যোৎস্নাবতীর দুঃখ। পরিচারিকা মাতঙ্গিনীর কাছে সমস্ত পূর্বপরিচয়ের রহস্য উদঘাটন। অপূর্ব সহৃদয়তা ও কারুণ্যের ছবি পাঠকের হৃদয় জ্যোৎস্নাবতীর বেদনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে লেখকের রোমান্স পরিমণ্ডলের আরহ সৃষ্টিতে এক আশ্চর্য ভাবার যাদুতে।

জ্যোৎস্নাবতী ছিলেন স্বামী সোহাগিনী রাজবধূ। স্বামী রাজকুমার সর্বগুণান্বিত, —একমাত্র দেওয়ান ছাড়া রাজবাড়ীর সকল মানুষ পশুপক্ষী তাকে ভালবাসতো। বিপদলোভী রাজপুত্র একবার ডাকাতদের সঙ্গে লাঠালাঠি করবার সময় একজন ডাকাত মারা যায়, রাজপুত্রের ধারণা জন্মায় তিনি খুন করেছেন, ফলে তিনি খুনী ও

পাপী। এই চিন্তা করতে করতে তিনি পাগল হয়ে গৃহত্যাগ করে যান। কয়েকদিন পরে শোনা গেল এক জেলে নদীতে তাঁর মৃতদেহ পেয়েছে। নায়েবের উৎসাহে তার সৎকার হল। জ্যোৎস্নাবতীর দৃঢ় ধারণা ছিল তিনি মরেন নি—বৃদ্ধ রাজা নায়েবের ছেলেকে (মহেশচন্দ্র, কণ্ঠমালার অন্যতম প্রধান চরিত্র) পোষ্য গ্রহণ করলেন, বৃদ্ধরানী উন্মাদ হয়ে গেলেন। রাজপুত্র নাকি ফিরে এসেছিলেন, নায়কের চক্রান্তে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি—এখানে যে উপকাহিনীটি উপস্থিত হল তাতে আমরা জালপ্রতাপচাঁদের কাহিনীর সারাংশ যেন পেলাম। (মাধবীলতার আগেই জাল প্রতাপচাঁদ রচিত হয়েছে।)

বিংশ পরিচ্ছেদে মাতঙ্গিনী চরিত্রের বিকাশ হয়েছে। এই চরিত্রের পরিকল্পনা সঞ্জীব কণ্ঠমালায় আগেই করেছিলেন। মাতঙ্গিনী রাজবাড়ী ত্যাগ করে ব্রহ্মচারীর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে রাজমাতার খবর জানতে চাইল। রোমান্স রসিক লেখকের এই ধরণের অতিক্রিয়াশীল চরিত্র গঠনের প্রতি ঝোঁক বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রভাবেই এসেছে। কিছুটা অস্বাভাবিক হলেও এই চরিত্র রোমান্সের উপযোগী ও উপভোগ্যও বটে। যুবতী মাতঙ্গিনী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তক্ষপুরে রাজ জামাত, বিজয়রাজের অনুসন্ধানে যাত্রা করলো।

পরের পরিচ্ছেদে আবার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট—রাজাকে জড়িয়ে পুঁটুর মায়ের যে কলঙ্ক তা স্পষ্টভাবে পদ্ম (এক প্রতিবেশিনী) মাধবীলতার মাকে জানিয়ে গেলো। সরলা গ্রাম্যবধূ তারই ঝড়ে পুঁটুকে নিয়ে গৃহ ত্যাগের সংকল্প করলো। সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে উপস্থাপনা রীতিটি চমৎকার। কলঙ্ক প্রপীড়িতা পুঁটুর মায়ের চিত্রটি উপমায় অনবদ্য—

"ঝটিকা প্রপীড়িত তৃণের ন্যায় পুঁটুর মায় অন্তর থর থর কাঁপিতেছিল।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে কলঙ্ক ভীতা মাধবীলতার মায়ের গৃহত্যাগের বর্ণনা। আধুনিক কালের বিচারে মাধবীলতার মায়ের মানসিকতা গ্রহণযোগ্য নয়, তবু একটি অদৃষ্ট বন্ধনে বদ্ধ মানুষ কিভাবে তার মৃত্যুর দিকে যাত্রা করে তারই মর্মস্পর্শী দৃশ্যোন্মচন। মানুষ তার নিজের দুঃখের জন্যে যে নিজে সবসময় দায়ী নয়, ভাগ্য বিড়ম্বিত লেখক তাই যেন বারবার দুঃখদীর্ণ চরিত্র গঠনের মাধ্যমে আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে আমরা আবার ফিরে এলাম সিংহশত গ্রামে রাজগৃহ থেকে পথে পথে। রাজা জ্যোৎস্নাবতীর কাছে জানাতে চাইলেন রাণীর সন্তান প্রসবের সময় কি হয়েছিল। জ্যোৎস্নাবতী বললেন প্রথমে রাণীর এক মৃত কন্যা হয় পরে এক পুত্র, অর্থাৎ যমজ সন্তান। রাজা আনমনে কেবলমাত্র কন্যার কথা শুনে বাকী কথা কিছু মাত্র না শুনেই রাজসভায় প্রচার করলেন দশরথের পুত্রের দাবী সঙ্গত। এদিকে পথে পিতম ছেলের দলের কাছে বলে গেল দশরথ চুড়াধনের পরামর্শে মিথ্যা দাবি করেছেন। প্রতিবেশীদের নিন্দা ও রাজভয়ে দশরথ পলায়ন করলেন। কাহিনী যে জটিল আবর্তের দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে তার গতিরুদ্ধ

করা সহজ নয়। ইন্দ্রভূপ যেন শরৎচন্দ্রের আত্মভোলা পুরুষ চরিত্রের প্রাক সংস্করণ। গভীর গম্ভীর ঘটনার মধ্যে সঞ্জীব প্রায়ই লঘু চপল হাস্য রসের অবতারণা করে বিপরীত রসের বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। এখানে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যে সন্তান রহস্যে পাঠক এতক্ষণ ব্যগ্র ছিল পরের পরিচ্ছেদে তারই সম্পূর্ণ রহস্যোৎঘাটন হল। আমরা জানলাম রাজপুত্র ও মাধবীলতা দুজনেই রাজার যমজ সন্তান। এই পর্যন্ত কাহিনীর প্রথম পর্ব শেষ হল। এর পর লেখক আমাদের জ্যোৎস্নাবতী বিজয়রাজ রহস্যের দিকে আকর্ষণ করেছেন।

পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে লেখক চমকপ্রদ ভাবে বর্ণনা করেছেন ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে মাতঙ্গিনী কি ভাবে মহারাজ মহেশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলো। প্রতি মুহূর্তে চমক—গোয়েন্দা গল্পের বা রোমাঞ্চকর গল্পের মতো সমস্ত বাস্তব অবাস্তবের সীমাহীন মেঘ রাজ্যে আমরা উপস্থিত হয়ে যাই—কিন্তু লেখকের এমনই বর্ণনাচাতুর্য যে তা আমাদের মনে পরে যতই খণ্ডিত প্রতীতির জন্যে আক্ষেপ জাগাক না কেন, পাঠকালে আমরা গল্পরসে একেবারে ডুবে যাই। এ যেন স্বপ্নের বাস্তবতা। মাতঙ্গিনী, রাঘবশর্মা ও মহারাজ মহেশচন্দ্রের বুদ্ধির বিদ্যুৎচমক আমাদের হতচকিত করে তোলে।

সঞ্জীব মাধবীলতার কাহিনীকে ক্রমশঃ বাস্তবতার বিশ্বাস ভূমি থেকে অবাস্তবতার কল্পলোকে নিয়ে চলেছেন। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে চুড়াধন নিয়োজিত হত্যাকারী কালিদাস জনার্দ্দান পিতমকে হত্যা করার জন্যে কালীদহের ব্রহ্মচারীর আশ্রমের কাছে একটি দীঘির ঘাটে উপস্থিত হলে পিতম সমস্ত কিছু জেনেও তাদের কাছে ধরা দিল। হত্যাকারীর মধ্যে কে তাকে হত্যা করবে এই নিয়ে যখন তাদের মধ্যে বচসা ও মারামারি উপস্থিত হল পিতম আনমনে অন্যত্র চলে গেলো। সঞ্জীব সচেতনভাবেই এই হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, তবে ঘটনার অসম্ভবতা আমাদের বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ইংরেজী কমেডি বা কমিক ফিল্ম-এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন শিশু উপন্যাসে এই ধরণের ঘটনা সমাবেশ সম্ভব হলেও গুরুগম্ভীর রসের রোমান্সের মধ্যে এই রকম ঘটনা সমাবেশ আদৌ লেখকের সঙ্গতি বোধের নিদর্শন নয়।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদে দুই দাসীর রঙ্গরসিকতা লেখকের মাত্রাহীনতা বোধকে ব্যক্ত করে। ঘটনা সংস্থাপনে যেখানে তিনি তাঁর সঙ্গতি বোধের অভাবকে তুলে ধরেছেন তেমনি দার্শনিক মানসিকতা প্রকাশে জগৎ ও জীবনের খুঁটিনাটি চিত্রগঠনে অসামান্যতা দেখিয়েছেন। রাজা ও রাণীর পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণ বর্ণনা সঞ্জীবের পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতার নিদর্শন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ সঞ্জীবচন্দ্রের স্বকীয়তা বহন করছে। কাহিনীর ধারার মধ্যে পিতমের (লেখকেরও বটে) তত্ত্বচিন্তা কিছু অসঙ্গত হলেও কম উপভোগ্য নয়। মাধবীলতার অনুসন্ধান করতে এসে দেওয়ানের পিতমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।

তত্ত্বদর্শী উৎকেন্দ্রিক পাগলের মাধ্যমে সঞ্জীব তত্ত্বচিন্তার সুযোগ ছাড়লেন না। তত্ত্বচিন্তা এখানে দুটি—প্রথমটি প্রকৃতির ভয়ঙ্করী রূপের বর্ণনা অপরটি অক্ষরের মাধ্যমে জাতিতত্ত্বের আলোচনা। সঞ্জীব চন্দ্রশেখর-এর তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের প্রকৃতি বর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে অনুমান করা হয়। বঙ্কিমের বর্ণনা সঞ্জীবের চেয়ে অনেক বেশী কাব্যধর্মী দার্শনিকতাময় ও ইঙ্গিতবহ বলে অনেকের অভিমত। এই অভিযোগ কতদূর সত্য দুটি অংশের তুলনা করলেই আমরা বুঝতে পারবো।—

বঙ্কিমের বর্ণনা—

"তুমি জড় প্রকৃতি। তোমায় কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই। তুমি অশেষ ক্লেশের জননী অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্বসুখের আধার সর্বমঙ্গলময়ী, স্বার্থসাধিকা সর্বকামনা পূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী, তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করি নানারূপরঙ্গিনী।"

(চন্দ্রশেখর—তৃতীয় খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদ)

সঞ্জীবের বর্ণনা—

"ছিন্নমস্তার রূপ কে কল্পনা করিয়াছিল জান? ঘোর অদৃষ্টবাদীর এ কল্পনা। কল্পনা নহে, ইহা সত্য সত্যই অদৃষ্টের মূর্তি, অদৃষ্ট আর প্রকৃতি এক।······প্রকৃতি দেবী কি ছিন্নমস্তা? এই কি প্রকৃতির যথার্থ মূর্তি? তাই কি জন্তুরা আপনার শাবক আপনি খায়? তাই কি রাণী আপনার কন্যা আপনি নষ্ট করিতে চান? তবে হে প্রকৃতি। আমাদের কেন ঠকাও? তোমার এই যথার্থ মূর্তি ঢাকিয়া কেন নিয়ত মোহিনী মূর্তিতে আমাদের চোখে চোখে বেড়াও? কেন ফুল ফুটাও, কেন অনন্ত নক্ষত্র সনাথ কিরীট মাথায় পর? আমি আর ঠকিব না।"

বর্ণনারীতি ও ভাষার গাম্ভীর্য্য বঙ্কিম অপেক্ষা সঞ্জীবের কিছু কম ঐশ্বর্য্যময় বলে মনে হলেও মাধবীলতার স্বচ্ছন্দ ভাষা প্রবাহের মধ্যে সেই অলঙ্কার বহুল শব্দাড়ম্বরযুক্ত ভাষা যে মোটেই সুপ্রযোজ্য হত না সঞ্জীব সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি যে বঙ্কিমের অক্ষম অনুকরণ করেন নি, সেইখানেই তাঁর মৌলিকতা। প্রশ্নের আবেগ যে কি পরিমানে কাব্যসৃষ্টি করতে পারে এখানে তার উজ্জ্বল প্রমাণ বর্তমান। এই পরিচ্ছেদেই সঞ্জীবের আর একটি মৌলিক চিন্তা আমরা লক্ষ্য করি পিতমের অক্ষর-চিন্তার মাধ্যমে জাতিতত্ত্ব চিন্তায়। সঞ্জীবের মতই তাঁর পিতম পাগলা খামখেয়ালী, বাঙলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়—

"বাঙ্গলা অক্ষরগুলি তান্ত্রিক, মুসলমানদিগের অক্ষর সামরিক, ফিরিঙ্গীদিগের অক্ষর সাংসারিক।···ফারসি অক্ষরগুলি কেবল তরবারি—ছোট তরবারি, বড় তরবারি, ভগ্ন তরবারি—তাই বলিতেছিলাম, ফারসি অক্ষর সামরিক। আর এক দেশের অক্ষর তীরের মত ছিল, বাঁকা তীর, তির্য্যক তীর তাহাও সামরিক। ফিরিঙ্গীর অক্ষর গৃহদ্রব্যের অনুরূপ কোচ, কেদারা বাসন কোসন, প্লেট ডিস ফানস এগুলা

ইত্যাদি।"

লক্ষ্য করার বিষয় মাধবীলতায় কোন কালের চিহ্ন না থাকলেও পিতমের মুখে 'কোচ, প্লেট, ডিস, ফানস' শব্দগুলি কোন দূর কালের নয়—উনিশ শতকে বাংলা শব্দভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত ইংরেজী শব্দ। সঞ্জীবের এই সব অসঙ্গতি আমাদের মনঃপীড়ার কারণ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদের অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনাটি সুচারু ও ইঙ্গিতবাহী। সন্ন্যাসীবেশী দস্যু জনার্দন মাধবীলতা ও তার মা যে বাড়ীতে ছিল সেই বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে নিজেই তাদের রক্ষাকরার ছলনায় ভিতরে প্রবেশ করেছে। কপোতীর মাতৃহৃদয়ের বর্ণনাটি মাধবীলতার মায়ের মাতৃহৃদয়ের ইঙ্গিতবহন করেছে।

পরের পরিচ্ছেদে অগ্নিকাণ্ডের রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা আর অলৌকিক অভাবিত কাণ্ডকারখানা। এক অপরিচিত ব্যক্তি মাধবীকে, জনার্দনকে ও মাধবীর মায়ের এক বৃদ্ধাবিধবা পিসীকে অগ্নি দেবতার মত উদ্ধার করলো, কিন্তু মাধবীর মাকে উদ্ধার করার পরেও তার কাপড়ে আগুন লাগায় সে লজ্জা নিবারণের জন্যে স্বেচ্ছায় অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিল।—

"মাধবীর মা লজ্জার ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, এবার লজ্জার ভয়ে দেহত্যাগ করিল।"

এর পরের পরিচ্ছেদে অর্থদ্বারা ধর্মক্রেতা বৃদ্ধ রামকল্প বিদ্যানিধি ফুলের মুখটি বলরাম ঠাকুরের সন্তানের ধর্মক্রয়ের প্রসঙ্গে সঞ্জীবের আধুনিক মনের প্রকাশ লক্ষ্য করি—"চাল কেনে, ডাল কেনে কাজেই ধর্মও কিনিবে। ধর্ম চাল ডালের মধ্যেই বটে।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ থেকে কাহিনীর গতি দ্রুত, তার প্রকৃতি ও লক্ষ্য—মিলনান্তক। লেখকের ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডি তাঁর অধিকাংশ কাহিনীকে (দামিনীও জাল প্রতাপচাঁদ ব্যতীত) মিলনান্তক সীমায় পৌঁছে দিয়ে একধরণের শান্তি পেতে চেয়েছে। এই পরিচ্ছেদে পিতমের পরিচয় সম্পূর্ণ উদঘাটিত। মানুষ না চিনলেও তার প্রিয় হাতি তাকে তাদের যুবরাজ বিজয়রাজ বলে ঠিক চিনেছিল। এ যেন গৃহ প্রত্যাগত ভিক্ষুকবেশী ওডিসিউসকে দেখে যখন তার পত্নী পেনিলোপও চিনতে পারেন নি, তখন যেমন তার প্রিয় কুকুর কেবলমাত্র চিনেছিল, ঠিক তেমনি ঘটলো পিতম তথা বিজয়রাজের ক্ষেত্রে। ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশিনীর আনন্দাশ্রুসজল উক্তি, 'এ দাসীর এখন কার্য ফুরাইল'। কিন্তু এখনো কিছু বাকী আছে জানার। পরের পরিচ্ছেদে পিতৃদ্রোহী মহানুভব রাজা মহেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেওয়ান রাঘবশর্মার কথায় জানলাম সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অগ্নিদেবতাতুল্য অপরিচিত পুরুষ আর কেউ নয়—সে বিজয়রাজ। জ্যোৎস্নাবতীর সন্ধানে তিনি তক্ষপুরে এসেছেন কিন্তু এখনও তাঁর দেখা পান নি। তাই মহারাজ মহেশচন্দ্র এখনও তাঁকে যে চিনেছেন তা প্রকাশ করেন নি।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে জ্যোৎস্নাবতীর প্রসঙ্গে সঞ্জীব একটি কোমল কারুণ্যের চিত্র

এঁকেছেন। যদিও ঘটনা সবই দৈব যোগাযোগে সাজান ব্যাপার। পিতম এক বৃদ্ধার কাছে দৈবক্রমে জানতে পারলেন জ্যোৎস্নাবতী মুমূর্ষু, তিনি ব্রহ্মচারী ও মাতঙ্গিনীকে ডেকে আনলেন—চিকিৎসা ও সেবায় মৃত্যু পথগা জীবনে ফিরলেন।—এখনো বিজয়রাজ জ্যোৎস্নাবতীর মিলন হয় নি। ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদে বিজয়রাজ জ্যোৎস্নাবতীর মিলন হল। রামেশ্বরের অদৃষ্টের সঙ্গে শেষ অংশের গভীর মিল দেখি।—মাধবীলতায়—

'এক অবগুণ্ঠনবতী কষ্টে ক্রন্দন সংবরণ করিতেছে। পিতম জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? দাসীকে চিনিতে পারিলে না? বলিয়া অবগুণ্ঠনবতী পিতমের পদতলে আছাড়িয়া পড়িল। পিতম কম্পিতস্বরে ডাকিল, জ্যোৎস্নাবতী।"

অপর পক্ষে রামেশ্বরের অদৃষ্টে—

"সেই সময় অর্দ্ধাবগুণ্ঠাবৃতা এক স্ত্রীলোক আসিয়া রামেশ্বরের পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়া রামেশ্বর চমকিল, এ কার গলা। দুই হস্তে তাহাকে তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া চিনিল, ভূপতিতা পার্বতী।"

কাহিনী এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সঞ্জীব ভুলে গেছেন যে তিনি উপন্যাস বা রোমান্স রচনা করতে বসেছেন, রূপ কথা নয়। তাই সকলের প্রাপ্য তিনি হাতে হাতে মিটিয়ে নগদ বিদায় করতে চেয়েছেন, ফলে শেষ দুই পরিচ্ছেদে কাহিনীকে অযথা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মনে হয় রূপকথার কথক শেষ পর্যন্ত দোষীকে শাস্তি এবং নির্দোষকে পুরস্কৃত না করে শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাই যে দেওয়ানের জন্যে বিজয়রাজ কষ্ট পেয়েছিলেন, তার করুণ মৃত্যু ও ক্ষমা প্রার্থনা না দেখালেই যেন চলছিল না। সম্ভবত কণ্ঠমালার কথা স্মরণ করে লেখক মহেশচন্দ্রের প্রসঙ্গকে আরও দীর্ঘায়ত করবার চেষ্টা করেছেন। সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদে ছদ্মবেশী মহেশচন্দ্রের বিজয়রাজ জ্যোৎস্নাবতীর অনুসন্ধান যাওয়া এবং বাইট পইঠার ঘাটের বর্ণনা। শেষ পরিচ্ছেদে মাধবীলতার দায়িত্ব যে সব মাতঙ্গিনী গ্রহণ করলেন তাই জানানো। মহেশচন্দ্রের পিতার করুণ মৃত্যু ও বিজয়রাজের কাছে তাঁর অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা এবং সর্বত্যাগী বিজয়রাজের মহেশচন্দ্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে জ্যোৎস্নাবতী সহ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে নিরুদ্দেশ যাত্রাকাহিনীর পরিসমাপ্তি সূচিত করলো।

কাহিনী বিশ্লেষণ করে আমরা দেখলাম মাধবীলতাকে সঞ্জীব তাঁর আত্মভাবনার এবং ব্যক্তিগত দুঃখের শান্তির জন্যে ব্যবহার করেছেন। তাই তিনি এই সব আকাশচারী কল্পনার ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দুই জগতের মধ্যবর্তী দিগন্ত রেখায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। যে জীবন নিজেই ট্র্যাজিক এবং ন্যায় বিচার যেখানে স্বপ্নলব্ধ আকাংক্ষা মাত্র সঞ্জীব সেইখানেই কাহিনীর নোঙর বাঁধলেন। এইখানে যে যাত্রা শেষ এমন কথা তিনি নিজেও যেমন বলেন নি, আমরাও তা বলতে পারি না।

কণ্ঠমালা রচনা করে যে আশা পূর্ণ হয় নি, মাধবীলতায় তারই পূর্বপথ পরিক্রমায় করে যে পরিতৃপ্তি হয়েছে এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। কোন কাহিনীকে উপন্যাস বলার যে সমস্ত মাপকাঠি থাকুক না কেন তার মাধ্যমে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের ধ্যান ধারণার রূপকেরই যে পরিস্ফুটন হয় তা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। আর এর মধ্যেই শিল্পী তাঁর আত্মজীবনী রচনা করেন গোপনে অলক্ষ্যে। সঞ্জীবচন্দ্র মাধবীলতার কাহিনী বিন্যাসে ও চরিত্রগঠনে সেই আত্মজীবনী সর্বত্র আলোছায়ায় ছড়িয়ে রেখেছেন।

সঞ্জীবের মধ্যে যে খেয়ালী শিল্পী ছিল তার প্রবণতা নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। অন্যান্য গল্প উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে সঞ্জীব কোন সময়েই কোন ধরাবাঁধা নীতিকেই প্রায় গ্রহণ করেন নি। মাধবীলতার নাম করণেও তার ব্যতিক্রম নেই। তিনি কখনও কাহিনী সূত্র, কখনও কেন্দ্রীয় চরিত্র আবার কখনও সামান্য একটি নাম মাত্রকে ভিত্তি করে গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। ভাবগভীরতা দার্শনিকতা ইত্যাদি গভীর অর্থদ্যোতক ব্যাপারগুলি কখনই তাঁকে গ্রন্থের নামকরণে সাহায্য করেনি। সঞ্জীবের গ্রন্থের নামকরণের মূলে তাঁর স্নেহ প্রীতি মমতাই প্রধান কার্যকারী শক্তি হয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি উনিশ শতকের বঙ্কিম পরিমণ্ডলে একমাত্র সঞ্জীবের সাহিত্যের অঙ্গীরস বাৎসল্য। কণ্ঠমালা ও মাধবীলতায় এই বিশিষ্ট প্রবণতা গ্রন্থের নামকরণের সহায়ক। কণ্ঠমালার নামকরণে শিশুর কণ্ঠমালা চুরি লেখকের স্নেহপ্রবণ মনে সে আবেগ সৃষ্টি করেছিল, তারই খাতিরে অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে তিনি গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন কণ্ঠমালা। মাধবীলতায়ও সেই শিশুর প্রতি আত্যন্তিক স্নেহ প্রবণ হৃদয়ের একই আবেগ কাজ করেছে।

মাধবীলতা প্রকৃতপক্ষে কোন চরিত্র নয়—সে একটি এক বছরের ভাগ্য বিড়ম্বিত শিশু। ঘটনা যে তাকে ঘিরেই কেবলমাত্র আবর্তিত হয়েছে তাও নয়। একটি মাত্র স্থানে পিতমপাগলার ভাষায় লেখক বলেছেন,—

> "যে তাহার সংস্রবে আসিবে সেই কষ্ট পাইবে অথবা নষ্ট হইবে,···মাধবীলতা নিজে দুরদৃষ্ট, মনুষ্যরূপে জন্মিয়াছে,·· তুমি ছিন্নমস্তা দেখিয়াছ? আমি তাহারই পার্শ্বে মাধবীকে দেখিয়াছি।"

একথা সত্য মাধবীলতাকে ঘিরে রাজা ইন্দ্রভূপ, মাধবীলতার মা, রাণী, এবং জ্যোৎস্নাবতী কষ্ট পেয়েছেন, তবুও সে উপন্যাসের নিয়ন্ত্রণীশক্তি নয়। অবশ্য লেখকের ক্ষণিক তত্ত্বচিন্তার যতই বিদ্যুতি আভাস থাকুক না কেন, কোন বিশেষ ভাব বা থিম এবং প্লট প্যাটার্ন মাধবীলতার মধ্যে সমগ্রভাবে দানা বেঁধে ওঠে নি। ফলে নামকরণ ও চরিত্রায়ণের মধ্যে কোন গভীর ব্যাপারের অনুসন্ধান না করাই ভাল। মোটামুটি-ভাবে বলা যায় গ্রন্থকে চিহ্নিত করার জন্যে তিনি যে নামকরণে করেছেন তার মধ্যে লেখকের একটি বাৎসল্য প্রবণতা কাজ করেছে মাত্র।

কাহিনী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি মাধবীলতায় সঞ্জীবের অন্যান্য গল্প

উপন্যাস অপেক্ষা চরিত্রের ভিড় বেশী। এখানে উল্লেখযোগ্য স্ত্রীচরিত্র পাঁচটি,—রাজা ইন্দ্রভূপের স্ত্রী, মাধবীলতার মা, জ্যোৎস্নাবতী, মাতঙ্গিনী ও সোহাগী দাসী এবং পুরুষ চরিত্র এগারটি—রাজা ইন্দ্রভূপ, চূড়াধন, পিতম পাগলা, দেওয়ান, ব্রহ্মচারী, রামসেবক, মহেশচন্দ্র, রাঘবশর্মা, জনার্দন, কালিদাস এবং দশরথ। এখানে লক্ষণীয় সংখ্যায় যেমন পুরুষ চরিত্র বেশী তেমনি কাহিনীতেও তাদেরই প্রাধান্য।

মাধবীলতার নায়ক নায়িকা নিয়েও সমস্যা আছে। কারণ কাহিনীটি মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত, তাদের গ্রন্থিবন্ধন অত্যন্ত শিথিল, প্রথমভাগটিতে আছে মাধবীলতার মা ও রামসেবক এবং তৃতীয় ভাগে পিতম পাগলা, জ্যোৎস্নাবতী মাতঙ্গিনী, ব্রহ্মচারী দস্যুদ্বয়, মহেশচন্দ্র এবং রাঘবশর্মা। এর ফলে প্রতি অংশের নায়ক নায়িকা নির্বাচন করা সম্ভব হলেও সমগ্রভাবে কাউকে নায়ক বা নায়িকা বলা যায় না।

প্রথমাংশের নায়ক রাজা ইন্দ্রভূপ। তিনি সিংহশত নামে কোন কাল্পনিক গ্রামের কাল্পনিক কালের রাজা অর্থাৎ জমিদার। তিনি কোন স্থান কালে চিহ্নিত রাজা নন। চরিত্র হিসেবে তিনি সম্পূর্ণত ফ্ল্যাট বা ভিন্ন চরিত্র; ইণ্ডিভিজুয়াল চরিত্র তাঁকে কোন মতেই বলা যায় না। লেখকের বর্ণনায়—

> "সিংহশত গ্রামের শেষ রাজা ইন্দ্রভূপ পরাক্রান্ত ছিলেন না। সামান্য লোকের ন্যায় শান্ত ও সরল ছিলেন। সেই সরলতা তাঁহার অনর্থের মূল হইয়াছিল।... ইন্দ্রভূপ স্বয়ং সর্বদা সন্তুষ্ট, সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন।"

এই ইন্দ্রভূপ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ কাব্যরসিক ও উদ্যানপ্রিয়। উদ্যানপ্রিয়তা সঞ্জীবের একটি বিশেষগুণ ছিল—তাই প্রিয় চরিত্রগুলিতে আপন ভাললাগাগুলি লেখক প্রায়ই আরোপ করেছেন।

ট্র্যাজিক চরিত্র হবার মত বেশ কিছু যোগ্যতা ইন্দ্রভূপের ছিল। দুঃখীর প্রতি সহৃদয়তা, বঞ্চিতের প্রতি সহানুভূতি এবং শিশুর প্রতি স্নেহ, স্ত্রীর প্রতি প্রেম, প্রজার প্রতি দয়া, কর্মচারী ও আত্মীয়ের প্রতি বিশ্বাস তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ হওয়া সত্ত্বেও আবেগপ্রণতা এবং বিচারশীল চিন্তার ক্ষমতার অভাবই তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজ্য ত্যাগ করে যেতে বাধ্য করেছে। তাঁর মধ্যে লেখক আত্মভোলা অনুভূতি প্রবণ হৃদয়ের একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা প্রসঙ্গত বলেছি ইন্দ্রভূপ যেন শরৎ সাহিত্যের আত্মভোলা অনুভূতি প্রবণ পুরুষ চরিত্রের প্রাক সংস্করণ। রাজা হয়েও রাজার অহংকারের লেশ মাত্র নেই তাঁর মধ্যে।

এরই বিপরীতে তাঁর স্ত্রীকে সঞ্জীব স্থাপন করেছেন—তিনি আধিপত্যকামী ও গর্বিতা। তাঁর দুর্দম রাগ প্রকৃতপক্ষে রাজা ও জ্যোৎস্নাবতীর জীবনে দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে। তবে তাঁকে কুটিল বা খল স্বভাবের কোন ক্রমেই বলা যায় না। ক্রোধের আবেগে ফলাফল চিন্তা না করে তিনি অনেক নিষ্ঠুর কাজও করে ফেলেন। তাঁর সম্পর্কে লেখক আমাদের সর্বশেষ খবরটি দিয়েছেন,—

"রাজা ইন্দ্রভূপ আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দেওয়ান কর্মচ্যুত হইয়াছেন। চূড়াধনবাবু রানীর বিশ্বাস পাত্র হইয়া রাজকার্য চালাইতেছেন।

এর মাধ্যমে রানীর ক্ষমতা-প্রিয়তা এবং স্বামীর প্রতি অপ্রেম প্রকাশ পেলেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে লেখক রানী চরিত্রের কোন উন্নতি বা পরিণতি দেখান নি। চরিত্রের পরিণতিতে সঞ্জীব প্রায়ই তাদের কার্যকারণ সম্পর্কগুলি দেখাতে ভুলে যান।

মাধবীলতার প্রথমভাগের অন্যতম চরিত্র চূড়াধনবাবু। ইনি রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র। এই চরিত্রটি সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—

"চূড়াধন বাবুর চরিত্র পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি, রাজার বিরুদ্ধে জন সাধারণের বিদ্বেষ উৎপাদনের চেষ্টা · এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে যথেষ্ট বাস্তব রস সমৃদ্ধির ও বিশ্লেষণ পটুতার পরিচয় পাওয়া যায়।"[১৬]

সত্যাই এই খল চরিত্রটি লেখকের একটি সার্থক কীর্তি। কোলরিজের মন্তব্যে যাকে উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠুরতা (Motiveless Malignity) বলা হয়েছে, চূড়াধনের শয়তানি ঠিক সেই পর্যায়ের নয়। তার নিষ্ঠুরতার পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে।·· তা হচ্ছে রাজ বংশের সন্তান হয়েও সে রাজত্বে বঞ্চিত। বঞ্চনা জনিত ঈর্ষার কু-প্রবৃত্তি কি ভাবে মানুষকে কুৎসিত করে তোলে লেখক তা নিয়ে দীর্ঘ এবং অপ্রয়োজনীয় তত্ত্বালোচনা করেছেন। এই ঈর্ষা থাকা সত্ত্বেও চূড়াধনের নষ্টামি কি ধরণের ছিল লেখক তার বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে লেখক অতি সাবধানে চরিত্রটি উদঘাটিত করেছেন—লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যতখানি না বর্ণনায় তা উদঘাটিত তার চেয়ে অনেক বেশী চূড়াধনের ক্রিয়াকুশলতায় প্রকাশিত। চরিত্রের উদঘাটনে—

"তিনি যৎপরনাস্তি মিষ্টভাষী, নম্র, শান্ত এবং নির্বিরোধী ছিলেন, তাঁহাকেই ইন্দ্রভূপ ভালবাসিতেন।···চূড়াধনবাবু বড় সাবধানী ছিলেন। আপনি কখন রাজসম্মুখে কোন কথাই উত্থাপন করিতেন না। মহারাজ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সসম্মানে নতশিরে কেবল সেই কথারই উত্তর দিতেন, কখন নিজের মত জানাইতেন না। সাধারণের মত অন্যের মত কি, দেওয়ান মহাশয়ের মত কি আবশ্যক হইলে কেবল তাহাই জানাইতেন। ইন্দ্রভূপ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন, ভাবিতেন চূড়াধন বড় বিজ্ঞ।"

চূড়াধনের রামায়ণ মহাভারত ভাল লাগে না, এবং তাঁর হাসি, "দাঁত ছড়ানো যদি হাসি হয়, তবে শৃগালের হাসি আছে।" এই চূড়াধনকে কেবল প্রথম থেকে চিনেছিলেন দেওয়ান ও পিতম পাগলা। এই দুজন সম্পর্কে চূড়াধনের মনোভাব লেখকের ভাষায়—

"দেওয়ানের বৈরিত্ব চূড়াধনবাবু জানিতেন, কিন্তু সেজন্য দেওয়ানের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেন না, বরং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।"

এবং

"পিতম আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান, আমি এ পর্যন্ত আপনার কার্য সাধন করিতে

"পারি নাই। পাগল হইরাও আপনার কাজ হাসিল করিল। আমার নিজের ঔদাস্যে আমি সকল হারাইতেছি।"

অথচ চূড়াধনের কাজ হাসিলের জন্যে যে ঔদাস্য ছিল না, তার পরিচয় সঞ্জীব বেশ সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলতে কোন প্রয়াসের কার্পণ্য করেন নি। সাধারণের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার কি ভাবে হয় লেখক তার আভাসমাত্র অতি সূক্ষ্ম ভাবে দেন। কেবল ঘটনা প্রবাহে জানা যায় পিতমের বাঘের ঘরে বাস করা লোকমুখে প্রচারিত হয় রাজা নাকি পিতমকে রাঘের মুখে দিয়েছেন দেওয়ানের পরামর্শে। "শেষে কে চুড়াধনবাবু আছেন, তিনিই না কি তাহাকে রক্ষা করেন।" প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ প্রচারের স্বরূপটি ক্রমশ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। মাধবীলতার প্রতি রাজার স্নেহ প্রদর্শন লোকমুখে দাঁড়ায়—

"রাজা নাকি এই মাত্র সন্ধ্যার সময় লোকজন লইযা স্বয়ং একটি ব্রাহ্মণ কন্যা অপহরণ করিযা লইয়া গিয়াছেন।"

এই সব ঘটনার আগে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চূডাধনের কুকার্যের সঙ্গী জনার্দন ও কালিদাসের সঙ্গে ইঙ্গিতবহ কথাবার্তায় পরবর্ত্তী অংশে অর্থবহ ও চূড়াধনের চরিত্রের পরিস্ফুটনের সহায়ক হয়েছে। চূড়াধনের দুবৃত্ত চরিত্রের খবর দিবা পাগল পিতম জানতো। তাই সে জনার্দ্দন ও কালিদাসকে তাদের হত্যার উদ্দেশ্য জানিয়ে বলেছে—

"চূড়াধনবাবু তোমায় এই সৎকার্যের জন্য পাঠাইয়াছেন।"

এইখানেই জনার্দ্দনের কথায় জানতে পারি,—

"চুড়াধনের মিথ্যা কথা। আমি তাহার সহায়। আমার সাহায্যে সে রাজা হতে চায়।"

সরল পুত্রহারা ব্রাহ্মণ দশরথকে রাজার পুত্র দাবী করতে যে চূড়াধনই পরামর্শ দিয়েছে তাও পিতমের কথায় প্রকাশ পায়। আরও জানা যায়—

"চূডাধনবাবু দশরথকে কিছু টাকার লোভ দেখাইয়া এই কার্যে নামাইয়াছেন। রাজকুমার যদি দশরথের সন্তান বলিয়া জনরব থাকে তাহা হইলে রাজার অবর্ত্তমানে চূড়াধনবাবু রাজ্য পাইবেন।"

অতএব চূড়াধনের শয়তানি উদ্দেশ্য বিহীন নয়। সঞ্জীব চূডাধনের ক্ষেত্রেই কোন ন্যায় বিচার করতে পারেন নি। কারণ শেষপর্যন্ত চূড়াধনের উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে সে খবরটি আছে। চূডাধনের স্ত্রীও স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী; এই নিঃসন্তানা মিথ্যাবাদিনী সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য,

"চূডাধনবাবু এদিকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন, সকলের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর নিকট অন্ধ হইতেন, তাঁহার চাতুরী কৌশল কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। গৃহিনী বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন না। প্রতিবাসিদিগের অভিসন্ধি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেন না, কিন্তু তিনি চূড়াধনবাবুর অন্তঃস্থল

পর্যন্ত দেখিতে পাইতেন, বুঝিতে পারিতেন।"
এই দুই চরিত্র লেখকের যে আশ্চর্য বাস্তববোধ প্রকাশ পেয়েছে এখানে অন্য চরিত্রের সম্পর্কে তা দেখা যায় না।

রাজা ইন্দ্রভূপের দেওয়ান প্রকৃতই রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সৎ ও কর্মঠ। তিনিও তাঁর ভাব প্রবণ রাজার মত হৃদয়বান মানুষ অথচ কর্মনাশা বলে রামায়ণ মহাভারত শোনেন না, কারণ "একদিন শুনিলে দুই দিন কোন কর্ম করিতে পারা যায় না।" তিনি চূড়াধনের শয়তানি বোঝেন। তাই নিজেও সাবধানে এবং পুত্র নবকুমারকে সাবধান করে বলেন যে চূড়াধনই তাঁর গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়েছে। রাজার প্রতি প্রজার শ্রদ্ধা হ্রাসের জন্যে চূড়াধন যে অপবাদ ঘটাচ্ছে তাও তাঁর জানা ; তাই তিনি তার প্রতিকারেরও সচেষ্ট। রাজার হিতার্থী এই কর্মচারীর চরিত্রটি একান্তই একরাঙা বৈশিষ্ট্যহীন হলেও লেখক সামান্য তুলির টানে তাকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

আমরা কাহিনীর যে দ্বিতীয় পর্ব নির্দেশ করেছি তাতে চরিত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য তেমন কেউ নেই। রামসেবক ও তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ মাধবীলতার মা লেখক যার কোন নাম ব্যবহার করেন নি, মূলত একই ধরণের চরিত্র দরিদ্র গ্রাম্যসরল মানুষ, সন্তানসুখে সুখী সঞ্জীবের বাৎসল্য রসের আধার। চরিত্র হিসেবে অতি সাধারণ ফ্ল্যাট হওয়া সত্ত্বেও কাহিনীর বিকাশে ও জটিলতা সৃষ্টিতে মাধবীলতার মায়ের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। রাজা রাণীর দ্বন্দ্বের মূলে এই চরিত্রটি বর্তমান, তাকে ঘিরেই রাজা প্রজা, রাজা রাণী ও রাজভাগিনীর বিচ্ছেদে কাহিনীর পরিণতি। উপন্যাসে কোন চরিত্রই অমূলক নয় অথবা কাহিনীও অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। এই সম্পর্কের গুরুত্বের দিক দিয়ে মাধবীলতার মায়ের চরিত্র প্রাধান্যের দাবী রাখে।

প্রথম উপস্থিতিতে মাধবীলতার মাকে দেখেছি, সে একান্তই পুটুর মা। রাজা ইন্দ্রভূপ যখন তার পুটুকে স্নেহভরে কোলে তুলে নিলেন, সে সাধারণভাবে মাতৃ-স্নেহের বশে মনে করেছিল রাজা বুঝি তার পুটুকে কেড়ে নিয়ে গেছেন, তাই তার কান্না। আবার যখন জেনেছে তা নয় রাজা সত্যই তার পুটুকে ভালবাসেন আপন সন্তানগর্বে তার বুক ভরে গিয়েছে। রাজা না জেনেই যখন আপন কন্যার দুঃখ মোচনের জন্য তার পিতামাতার (পালক) দুঃখ মোচনের জন্যে দাসদাসী বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাতে পুটুর মার গর্ব হয়েছে কিন্তু, প্রতিবেশীদের বুক ফেটে গেছে। তারা বলেছে 'গয়না পরার গলায় দড়ি।'

নির্বোধ নারী চরিত্রের সহজ সতীত্ব বোধের স্বরূপটি অসাধারণ বাস্তবজ্ঞানের সাহায্যে লেখক এঁকেছেন পুটুর মায়ের চরিত্রে। কেন প্রতিবেশীরা তাদের ত্যাগ করেছে তা বিচার করার ক্ষমতা তার নেই। যে ধনের জন্যে তাদের বিন্দুমাত্র গর্ব হবার কথা নয়, তাই নিয়ে সে গর্ববোধ করেছে। তার ইচ্ছে করেছে প্রতিবেশিনীদের ডেকে দেখায় সেই সব। লেখক দক্ষতার সঙ্গে দরিদ্রের আকস্মিক সম্পদবৃদ্ধিতে

অভ্যন্ত জীবনে কি রকম উৎপাত হয় তাই দেখিয়েছেন।

এই মাধবীলতার মায়ের দাম্পত্য জীবনের চিত্রটির ক্ষেত্রের লেখকের ক্ষমতার প্রকাশ আছে। যে দরিদ্র স্বামী স্ত্রী সুন্দরী কি কুৎসিতা অনুভব করেন নি তিনি নববস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা স্ত্রীকে দেখে অনুভব করলেন যে স্ত্রী সুন্দরী। অথচ স্বামী ভালবাসার কথা জানেন না, রাজার দাসীর মুখে মিথ্যে গল্প শুনে স্বামীকেও তার আদর্শ ভালবাসা শেখাতে সাধ হয়। অথচ কঠিন দারিদ্র্যের পেষণ ভালবাসার সঠিক রূপটি কি তা স্বামী বা স্ত্রীর কারও জানার সময় বা সুযোগ হয় নি। সঞ্জীবের কোন কোন স্থানের পরিমিতিবোধের তুলনা হয় না আবার কোথাও কোথাও তিনি অতিমাত্রায় বেহিসাবী। মাধবীলতার মায়ের বাৎসল্য স্নেহ এবং দাম্পত্যজীবনে শ্রদ্ধা ও সতীত্ব প্রকাশের সহজ স্বাভাবিক চিত্রগঠনের কৌশলটি লেখকের ক্ষমতার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার গৃহত্যাগের চিত্রটি স্বাভাবিক নয়—এ চিত্রের সঙ্গে নিমাই সন্ন্যাসের গৃহত্যাগের চিত্রের আপাত সাদৃশ্য সামান্যরমণীর ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হয়েছে। তবে মাধবীলতার মায়ের অমোঘ অদৃষ্ট নির্দ্দিষ্ট বিয়োগান্ত জীবনগতি সম্পর্কে লেখকের দার্শনিক উক্তি তার চরিত্রের ও পরিণতি সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে—

"বাস্তবিক, এ কথা সত্য, কেবল লজ্জার ভয়ে মাধবীলতার মা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, কলঙ্কের কথা স্বামী প্রাতে শুনিবেন। এই লজ্জায় তিনি পালাইয়াছিলেন। এখন কলঙ্কের কথা শুনা দূরে থাকুক, সন্দেহেরও স্থল রহিল না। এতক্ষণ রামসেবক জানিয়াছেন যে তাঁহার স্ত্রী নিশ্চয়ই কুলটা। তাহাতেই মাধবীলতার মা বলিতেছিলেন, সকলই আমার দোষ। আর উপায় নাই, আর গৃহে যাইবার পথ নাই। পথে পথে বাস, ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন এই এখন মাধবীলতার মার অদৃষ্টের লিখন। তিনি দার্শনিক নহেন যে অদৃষ্ট লইয়া তর্ক করিবেন, কার্যকুশলী নহেন যে পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্ট খণ্ডন করিবেন, মহাতেজা নহেন যে অদৃষ্টের আয়ত্তাতীত থাকিবেন, অদৃষ্ট যতই পীড়ন করুক, তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পর্বতের ন্যায় অটল থাকিবেন। মাধবীলতার মাতা সামান্যা, অদৃষ্টের ভয়ে অতি ভীতা, কষ্টের স্পর্শ মাত্রেই পরাজিতা, চক্ষের জল একমাত্র সহায়। পিতৃমাতৃ সম্মুখে চক্ষের জল সহায় হইলে হইতে পারে কিন্তু অদৃষ্টের সম্মুখে তাহা কিছুই নহে, অশ্রুবর্ষণে কোন ফলই হয় নাই, তথাপি অদৃষ্টের পীড়নে সামান্য লোকেরা কাঁদে, মাধবীলতার মাও সামান্য লোকের মত কাঁদিলেন।"

মাধবীলতার মাধবী যেন তার সেই দুরদৃষ্ট। যে তার আত্মজা না হয়েও কন্যা হয়েছে, যাকে কোলে নিয়ে বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে চলে যেতে হয়েছে।

রামসেবক মাধবীলতার মায়ের স্বামী অর্থাৎ আপাত অর্থে মাধবীলতার পিতা। দরিদ্র অবনত বিনীত। স্ত্রী কন্যার প্রতি তারও ভালবাসাও স্নেহের অভাব মাত্র নেই—তাঁর আচার আচরণ থেকে জানা গেছে তাঁদের রাজানুগ্রহ যে লোকাপবাদের

ভয়াল রূপ ধারণ করতে চলেছে সে সম্পর্কে কিছু কানে এলেও স্ত্রীকে তিনি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করেন নি। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা অকৃত্রিম হলেও তিনি ভালবাসার কথা সানিয়ে বলাকে ব্যঙ্গ করেন। তার অনুভূতির গভীরতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপযোগী হয়েছে—

"এক সময় যাকে ভালবেসেছি, এখন হয়তো সেইরূপ তোমায় ভালবাসি।"

অথবা—

"অলঙ্কার সুন্দরীর সৌন্দর্য বাড়ায় সত্য। কিন্তু আবার কুৎসিতার কুরূপ আরও বাড়ায়।"

অথবা—

"লোকে কি বস্ত্র অলঙ্কারের নিমিত্ত স্ত্রীকে ভালবাসে? তাহা না থাকিলে কি ভালবাসে না?"

রামসেবকের এই সব উক্তিগুলির মধ্যে একটি অনুভূতিপ্রবণ মননশীল মানুষের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্ত্রীর গৃহত্যাগের পর তাঁর বেদনাদীর্ণ মূর্তিটি লেখকের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন। স্ত্রীর গৃহত্যাগের পর তাঁকে আমরা এক নিস্তব্ধ প্রস্তর মূর্তিবৎ দেখলাম—

"তাঁহার পত্নীর কথা কেহ উপস্থিত করিলে তিনি উঠিয়া স্বতন্ত্র স্থানে তামুক সাজিতে বসিতেন।"

রামসেবককে আমরা মাধবীলতা গ্রন্থের অতি প্রয়োজনীয় চরিত্র বলে গ্রহণ করতে পারি না। মাধবীলতার মায়ের চরিত্র পরিস্ফুটন ছাড়া গ্রন্থের অন্য কোন উদ্দেশ্য রামসেবকের দ্বারা সাধিত হয় নি। তবে কেবলমাত্র চরিত্র হিসেবে রামসেবক লেখকের চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতার পরিচয় বহন করেছে।

আমরা চরিত্রানুসারে মাধবীলতাকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করেছি তার তৃতীয় ভাগে পিতম পাগলার চরিত্রটি প্রধান। কেবল এই অংশেই একটি স্বতন্ত্র কাহিনী গড়ে উঠতে পারে। পিতম জ্যোৎস্নাবতী কাহিনীকে আমরা মূলকাহিনী বলে গ্রহণ করতে পারি না অথচ উপকাহিনী হিসেবে তার প্রাধান্য এতই যে তা মূলকাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছে। শেষাংশে প্রকৃত পক্ষে পিতম জ্যোৎস্নাবতীর কাহিনী মূল কাহিনী ইন্দ্রভূপ-চূড়াধন-রানী-মাধবীলতার মা প্রায় গৌণ হয়ে এসেছে। ফলে নায়ক সমস্যা এখানে প্রায় অমীমাংসিত একটি সমস্যা। এখানে প্রধান পুরুষ চরিত্র দুটি, রাজা ইন্দ্রভূপ ও পিতম। আবার নায়ক হবার যোগ্যতা কারও নেই। কিন্তু লেখক উভয়েরই প্রতিই প্রায় সমান সহানুভূতিশীল। সঞ্জীবের নিজস্ব প্রবণতা উভয়ের চরিত্রেই প্রকট হয়ে উঠেছে। এখানে পিতম পাগলা সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচকদের মন্তব্য আলোচনা করলে সঞ্জীবের এই চরিত্রগঠনের প্রবণতা ও ক্ষমতার স্বরূপটি বুঝতে পারবো। চন্দ্রনাথ বসু বলেছেন—

"সঞ্জীববাবু পাগল পাগলী গড়িতে বড় ভালবাসিতেন। মাধবীলতার পিতম

পাগলা আছে, কিন্তু পিতমের পাগলামী দেখিতে দেখিতে কিছু শ্রান্তি বোধ হয়।"৭৭

এই উক্তির সমালোচনা করে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—

"পিতমে পাগলার অসম্বদ্ধ উক্তিগুলি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ে শ্রান্তিকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং বাস্তবিকই তাঁহাদের মধ্যে একটি অতি পল্লবিত আত্মসচেতন সচেষ্টতা অনুভব করা যায়। তথাপি তাহারা যে একেবারে উপভোগ্য নয় সে কথাও বলা যায় না—পাগলামির নিজস্ব তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী, সাধারণ জ্ঞানের উপলব্ধিগুলিকে এক নূতন অনুভূতি কেন্দ্রের চারিদিকে বিন্যাস, পরিচিত সত্যের উপর উদ্ভট কল্পনার আলোকপাত ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদান সবই তাহার উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, কেবল এই সমস্ত উপাদানের সংমিশ্রন খুব স্বাভাবিক হয় নাই।"৭৮

চরিত্র বিশ্লেষণের সময় আমরা এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার করবো। পিতম সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য" গ্রন্থে বলেছেন যে সঞ্জীবের রচনা বাৎসল্য রসের আধার। কাহিনী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখেছি পিতম বা পীতাম্বর প্রথমাবস্থায় বদ্ধ উন্মাদ থাকলেও কাহিনীতে তার আবির্ভাব সেই অবস্থায় নয়। এখানে তার কথাবার্তা ও আচার আচরণের মধ্যে একটা রিদম বা ছন্দোরীতি আছে। ফলে তার স্বাভাবিকতা সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠেছে সে সম্বন্ধে লেখকের কৈফিয়ৎ লক্ষণীয়,—

"পিতমের স্মরণ শক্তি নাই, তাহারা ভাবিত পিতমের জ্ঞান নাই। পিতম ভুলিত, লোকেরাও ভুলিত। পিতমের ভুলে লোকের রহস্য বাড়িত। লোকের ভুলে পিতমের রাগ বাড়িত। পাগলের রাগ বাড়িলে লোকের আহ্লাদ বাড়ে। দুর্ভাগ্য পিতম জালাতন হইয়া মধ্যে মধ্যে স্থান ত্যাগ করিত, কিন্তু কিছু দিন পরে আবার ফিরিয়া আসিত। এসকল প্রথম অবস্থার কথা।"

এই প্রথমাবস্থার কথা বলতে গিয়ে লেখক রঙ্গরসিকতাও কিছু করেছেন, তবে তা খুব উচ্চাঙ্গের নয়,—

"পিপাসা পাইয়াছে, পিতম বলিবে জল খাব, কিন্তু জলশব্দের পরিবর্ত্তে হাতী শব্দ মুখে আসিল, পিতম বলিল হাতী খাব। লোকে হাসিয়া উঠিল।"

অথচ এই প্রথমাবস্থার কথা বলেও লেখক পিতমকে যখন আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন তখন তার "অঙ্গে বহুতর বেত্রাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। কোন কোনটি রক্তোন্মুখ।" তার এই অবস্থা কে করে তার কোন ইঙ্গিতমাত্রও নেই—আর বদ্ধ উন্মাদ অবস্থা ছাড়া কারও ঐ অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক নয়—অথচ পরবর্ত্তী অংশে আমরা তাকে অনেকাংশে স্বাভাবিক দেখি। তার কথাগুলি আমাদের কোন সময়েই পাগলের প্রলাপ বলে মনে হয় না, তার পরিচয় গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় দেখেছি —যেমন

"যে দিন আমি পেটে না খাই, সে দিন আমি পিঠে খাই…পেট আমার পিঠ পরের।"

আবার কোথাও তার কথা অতিমাত্রার ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। সেই জানিয়ে দেয় চূড়াধন শীঘ্রই রাজা হবেন। অন্যপক্ষে চূড়াধনের ষড়যন্ত্র সেই একমাত্র বুঝতে পারে—

"সেদিন রাত্রে ভুবনেশ্বর দশরথকে বলিয়াছিলেন, চূড়াধনের কথা শুনিস না।"

রাজপুত্র নিয়ে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার সূত্র অন্য কেউ যখন আবিষ্কার করতে পারছে না তখন কেবল পিতমই তার একমাত্র সূত্রাবিষ্কারক। কোন পাগলের কাছে এই সব ব্যাপার আশা করা যায় না। মোটকথা পিতমের পাগলামির অংশটুকুতে লেখক তাঁর একটা খেয়াল চরিতার্থ করতে চেয়েছেন মাত্র, যার ফলে পিতম কোন সার্থকচরিত্র রূপে গড়ে উঠতে পারে নি, যদিও ফ্ল্যাট কমিক চরিত্র হিসাবে তাকেই আমাদের সবচেয়ে বেশী মনে থাকবে।

পিতম চরিত্রের আর একটি দিক আছে—সেখানে সে বিজয়রাজ—তক্ষপুরের যুবরাজ, রাজা ইন্দ্রভূপের ভগিনীপতি, জ্যোৎস্নাবতীর স্বামী। জ্ঞানে বুদ্ধিতে শিল্পনৈপুণ্যে শৌর্যে সকলের প্রতি স্বর্গীয় ভালবাসায় তিনি অসাধারণ। অথচ সামান্য একটা পাপ বোধে তিনি পাগল হয়ে গেলেন—এই মানসিক ভারসাম্য হীনতার কোন পূর্বপরিচিতি নেই। পিতমকে লেখক স্বপ্নদৃষ্টিতে রোমান্সের নায়ক করে গড়তে চেয়েছেন—অথচ তার জন্যে পটভূমি রচনা করার যে প্রয়োজন ছিল সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, ফলে কোন দিক দিয়েই চরিত্রটি সমগ্রতা লাভ করেনি। তবে পিতমের মাধ্যমে লেখক মাঝে মাঝে তো দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা করেছেন তা বিচ্ছিন্নভাবে উপভোগ্য। তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। পিতম চরিত্রের সমগ্রতার অভাব থাকলেও আলাদা ভাবে তার বাৎসল্য ও পত্নীপ্রেম পশুপ্রীতির চিত্রগুলি সত্যই অনবদ্য হয়েছে। তার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ক্ষমতা কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা না রেখেই এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা একমাত্র রূপকথাতেই সম্ভব। বল্গাহীন কল্পনার বাস্তবাস্তবের সীমারেখাহীনতায় পিতম চরিত্র আমাদের বাস্তব প্রত্যাশার কিছুমাত্র পূর্ণ না করলেও রূপকথা শোনার মন নিয়ে পিতমকে যদি দেখি তবে আমাদের মধ্যেকার চিরশিশু সত্যই খুব খুশী হয়ে উঠে পিতমকে পেয়ে।

পিতম অর্থাৎ বিজয়রাজের স্ত্রী রাজা ইন্দ্রভূপের ভগিনী জ্যোৎস্নাবতীর রূপটি সঞ্জীবচন্দ্র রাজা ইন্দ্রভূপের স্বগত চিন্তায় সার্থকভাবেই প্রকাশ করেছেন—

"আমার ভগিনী রাজভগিনী কখন তিনি মিথ্যা বলিবেন না। তাঁহার স্বামী জীবিত থাকিলে তিনিও আজ মহারাণী, এখানে কাঙ্গালিনী—কিছু দুঃখ নাই—সকল সময়েই হাসিমুখে অথচ একটু ম্লান—জ্যোৎস্নাবতী ঠিক নাম, গভীর অথচ আলোকময়—কিন্তু একটু ম্লান—তাহার ম্লানতা আর ঘুচিবে না।"

আমরা জানি শেষ পর্যন্ত প্রিয় মিলনে তাঁর ম্লানভাব ঘুচেছে—যদিও তিনি আর রাজরাণী হন নি—বিজয়রাজ অর্থাৎ পিতমের সঙ্গে তিনি ভিখারিনী রূপেই পথকে

যর করেছেন। দুঃখভোগ ও ক্রিয়াশীলতায় জ্যোৎস্নাবতী গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সহানুভূতির পাত্রী হয়ে থেকেছেন। বয়ঃসানুপাতে তাঁর স্বভাব ধর্মের প্রকাশটি লেখক সুচারুভাবেই আঁকতে পেরেছেন। 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসের শেষভাগে শিতময়ও জ্যোৎস্নাবতীকে লেখক যে ভাবে উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে মাধবীলতার চরিত্র কোন ভিন্নতর রূপে দেখা দেয়নি।

'কণ্ঠমালা' উপন্যাসের অন্যতম প্রধানা মাতঙ্গিনী। সেখানে তার যে বিপুল ক্রিয়াশীলতা দেখেছি মাধবীলতায় সেই নারীর নবযৌবনের রূপটির মধ্যে সেই ক্রিয়াশীলতার কোন অভাব নেই। মাতঙ্গিনী জ্যোৎস্নাবতীর পরিচারিকা। এই সহৃদয়া নবীন বয়সিনীও রাজভগিনীর মত দুঃখিনী, বিধবা। জ্যোৎস্নাবতীর প্রিয় 'মাতু' কেবল মাত্র তাঁর দুঃখের সমভাগিনী নয়, সে ব্রহ্মচারীর সহায়তায় তক্তপুরে গিয়ে ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে বিজয়রাজের অনুসন্ধান করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সার্থকও হয়েছে। রোমান্সে পুরুষবেশী ছদ্মরূপধারিনীর যে বিশেষ স্থান আছে মাতঙ্গিনী তা এখানে কিছুটা পূর্ণ করেছে। এক্ষেত্রে সঞ্জীব সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের বিমলা (দুর্গেশ-নন্দিনী) শান্তি (আনন্দমঠ) প্রভৃতি চরিত্রের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। তার কথা ও কাজের মধ্যে লেখক যে বিদ্যুৎচমক সৃষ্টি করেছেন তাও উপভোগ্য। ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তার কথোপকথনের কিছুটা অনুধাবন করলেই তা বুঝতে পারবো—

"ব্রহ্ম—কে তুমি?
মাত—আমি বিধবা—অনাথ।
ব্রহ্ম—কিন্তু যুবতী দেখিতেছি।
মাত—বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর তাহা চিনিতে পারা উচিত হয় নাই।
ব্রহ্ম—এই অন্ধকারে একাকী যুবতীর এই প্রান্তরে আসা আরও উচিত হয় নাই।
মাত—বিপদগ্রস্তের সে বিচার থাকে না। অন্যেরও সে বিচার করা অন্যায়।
ব্রহ্ম—আমি আবার জিজ্ঞাসা করি তুমি কে?
মাত—আমায় যাহা দেখিতেছেন আমি তাহাই। ইহার অধিক পরিচয় আর আমার নাই।"

আবার অন্যত্র ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে মাতঙ্গিনী ও মহারাজ মহেশচন্দ্রের দেওয়ান রাঘব শর্মার কথোপকথনে তার সেই দ্যুতি দেখতে পাই—

"ব্রহ্ম (ছদ্মবেশী মাতঙ্গিনী)—দ্বারপালের অস্ত্রশস্ত্র কই?
রাঘব—এই আমার বামপার্শ্বে।
ব্রহ্ম—পুঁথি না পুঁথির তক্তাগুলি?
রাঘব—উভয়ই, যখন যাহা প্রয়োজন।
ব্রহ্ম—বলিষ্ঠের নিকট ইহার কোনটাই ত কার্যের নহে।
রাঘব—সম্পূর্ণ কার্যের, তবে তোমার মত ছদ্মবেশীর নিকট অন্য কোন অস্ত্র আবশ্যক

হইলে হইতে পারে।

ব্রহ্ম—মানুষমাত্রেই ছদ্মবেশী। আত্মার ছদ্মবেশ এই দেহ। দেহের মিথ্যা বেশ এই বস্ত্র।

রাঘব—এত কথা শিখলে কবে?

ব্রহ্ম—আপনার সহিত কি আমার পূর্ব পরিচয় ছিল? আমার মুখে এ কথা কি অসম্ভব?"

মাতঙ্গিনী চরিত্রের তির্যকতা তা উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে যতই প্রখর হয়ে উঠুক, তবু সে যে কোন স্বাভাবিক চরিত্র নয় তা বুঝে নিতে আমাদের মুহূর্তমাত্র সময় লাগে না। উপন্যাসের কাহিনী নিয়ন্ত্রণেও মাতঙ্গিনীর বড় কোন ভূমিকা নেই—যদিও লেখক মাতঙ্গিনীকে দিয়ে বিজয়রাজের অনুসন্ধান করিয়াছেন ও জ্যোৎস্নাবতী তাকেই পিতম বা বিজয়রাজের পূর্ব পরিচয় দিয়েছেন, এবং তার অনুসন্ধান কার্যের মধ্যে অদ্ভুত সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে, তবু শেষ পর্যন্ত ঘটনার রহস্য যে ভাবে উদঘাটিত হয়েছে তাতে তার নিজস্ব কার্যকারিতা প্রায় মূল্যহীন।

মাতঙ্গিনী প্রসঙ্গে আমরা রাঘব শর্মার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে বোঝা যায় মহারাজ মহেশচন্দ্রের দেওয়ান রাঘব শর্মা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাঁর অন্য পরিচয়—তিনি মহেশচন্দ্রের অত্যন্ত বিশ্বাসী অনুচর এই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে মহেশচন্দ্র বলেছেন—

"ইন্দ্রভূপের দেওয়ান প্রতাপপুরে আসিয়াছিলেন। অথচ মাধবীলতার সন্ধান পান নাই। আর তুমি আসিয়াই তাহার সংবাদ পাইয়াছ। তুমি যে সে দেওয়ান অপেক্ষা উপযুক্ত, এ কথা শুনিলে ইন্দ্রভূপ তোমায় ছাড়িবেন না।"

মহারাজ মহেশচন্দ্রের চরিত্রটির পরিকল্পনা সঞ্জীব কণ্ঠমালায় সুবিস্তৃতভাবেই করেছেন—সেখানে তাঁর অন্যরূপ, শম্ভু কয়েদী, রোমান্টিক নায়ক। কিন্তু মাধবীলতায় মহারাজ মহেশচন্দ্র অনেকখানি মাটির কাছাকাছি মানুষ, তবে তার উচ্চ আদর্শময় জীবনের সঙ্গে কণ্ঠমালার মহেশচন্দ্রের কোন বিরোধ নেই। মহেশচন্দ্র বর্তমানে তক্ষপুরের রাজা, তারই পিতা রাজার দেওয়ানের ষড়যন্ত্রের যুবরাজ বিজয়রাজ রাজ্যচ্যুত হন এবং বালক মহেশচন্দ্রকে রাজা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রাজা হবার পর তিনি পিতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু করেন। মাতঙ্গিনী ও ব্রহ্মচারীর কথোপকথনে তার প্রথম পরিচয়টি ব্রহ্মচারীর ভাষায়—

"তাঁহার (মহেশচন্দ্রের) দাম্ভিকতা অতিশয় বলিয়া বোধ হইত। কোন রাজা, কি প্রজা, কি পণ্ডিত, কাহাকেও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। এমন কি তাঁহার জন্মদাতাকেও তিনি লক্ষ্য করিতেন না। একদিন তাঁহার তাকিয়ায় লাথি মারিয়াছিলেন। আর পিতাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। মাতঙ্গিনী—পিতাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন কি? বুঝিলাম না। তাঁহার পিতা রাজা ছিলেন, তাঁহাকে কি রূপে বরখাস্ত করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচারী—তাঁহার জন্মদাতা রাজা ছিলেন না, রাজার দেওয়ান ছিলেন। আপনার পুত্রকে পোষ্যপুত্র দিয়াছিলেন। পোষ্যপুত্র

ক্রমে এমনি কৃতঘ্ন হইয়া উঠিলেন যে তিনি রাজ্য পাইবামাত্রই জনকের দেওয়ানী কাড়িয়া লইলেন। শুনিয়াছি যে বিজয়রাজের সময় যে সকল আমলা ছিল, তাঁহার ভাই তাহাদের সকলকে ডাকাইয়া নিজ নিজ কর্ম দিয়াছেন, তবে তাঁহার জনকের নিয়োজিত সকল লোককে তাড়াইয়াছেন।

মাতঙ্গিনী—দুইটিই শুভ সংবাদ।"

এই মহেশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত বিজয়রাজের সন্ধান পেয়ে বলেছেন—

"দাদা এখন আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন, আমায় বিদায় দিন।"

মুমূর্ষু পিতাকে দেখে তিনি বলেছেন—

"পিতঃ। তোমার প্রায়শ্চিত্তের যাহা বাকি থাকিল, তাহা আমি করিব।"

উচ্চ আদর্শের চরিত্রে হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে লেখক কোন অতিলৌকিক গুণ আরোপ করেন নি। স্বল্প পরিসরে মহেশচন্দ্র একটি সুঅঙ্কিত চরিত্র।

অন্যান্য গৌণ চরিত্রের মধ্যে ব্রহ্মচারীর চরিত্রের মধ্যে রোমান্সগন্ধী অলৌকিক শক্তির আভাস থাকলেও তাঁর ক্রিয়াকলাপে কোথাও অলৌকিতা নেই। তার সম্পর্কে চুড়াধন বলে—"ব্রহ্মচারী হয় জুয়াচোর নয় অদৃষ্টবান পুরুষ।" আমাদের মনে তাঁর চরিত্র নিয়ে সংশয় থাকলেও তাঁকে কখনও জুয়াচোর বা অদৃষ্টবান পুরুষরূপে আমরা দেখি না। তাঁর আচার আচরণে রহস্যময়তা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তার কোন পরিণতি নেই।

জনার্দন ও কালিদাস নামে দস্যুদ্বয়ের চরিত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট হলেও তারা, বিশেষ করে জনার্দ্দন দস্যুবৃত্তির উপযোগী নয়, বরং আধুনিককালের ভাড়াটে গুণ্ডাদের সঙ্গে তাদের মিল আছে।

বহু চরিত্রের ভিড় থাকা সত্ত্বেও চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে সঞ্জীবের দক্ষতার পরিচয়ের অভাব নেই—শুধু লেখকের অসতর্কতা চরিত্রগুলিকে মাঝে মাঝে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে। তাঁর গড়া মূর্ত্তিগুলির কাঠামো কি অসামান্য, কোথাও বা তারা মাটি রংয়ের লীলায় সুন্দর হয়ে উঠেছে, কেবল যা প্রাণ প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় রয়েছে, কিন্তু ফিরে যখন দৃষ্টির আলোকে তাদের দেখতে চেয়েছি তখন হতাশ হয়ে দেখেছি তারা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় আছে—শিশুর মত খেয়ালী শিল্পী তাঁর গড়ার কাজ আর শেষ করেন নি, প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর হয়নি শেষ পর্যন্ত। বঙ্কিমের অগ্রজ হয়েও উদ্বোধনের মন্ত্রে সঞ্জীব প্রায়ই উদ্বোধিত নন; সঞ্জীব সম্পর্কে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় আপসোষ।

কাহিনীরসে, ষ্টাইলে এবং চরিত্র সৃষ্টিতে মাধবীলতা নিঃসন্দেহে সঞ্জীবের সৃষ্টিশীল প্রতিভার ফসল। কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার উপন্যাসের ব্যাপকতর সংজ্ঞায় বলেছেন,

"সকল সাহিত্যিক সৃষ্টিই কাব্য। উপন্যাসের জাতি গোত্র যেমনই হউক তাহা যদি কাব্য না হইয়া থাকে তবে তাহা কিছুই হয় নাই। বাস্তব জীবনের লজিক

উপন্যাস নামক কাব্যের লক্ষিক নয়—কোনও লেখকই কবি দৃষ্টি হারাইয়া কেবল বাস্তবানুগামী হইয়া কোন প্রকার সাহিত্য সৃষ্টির গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই।"[৭৯]

আমরা মাধবীলতার আলোচনার অন্তে দেখলাম সঞ্জীবের কবি দৃষ্টির কোন অভাব নেই। যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের বাস্তবতার অভাবের জন্যে অনেকেই একে উপন্যাস বলেন নি। মোহিতলাল-এর দৃষ্টির আলোকে আমরা মাধবীলতার মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে উপন্যাসের গুণ দেখতে পাই। তিনি আরও বলেছেন

"উপন্যাস যদি মানুষের জীবনালেখ্য হয় তবে তাহা বহির্জগৎ ও মনোজগতের সামঞ্জস্যমূলক বা পরস্পর পরিপূরক একটি চিত্রলিপিই নয়—সেই দুই যেমন বাস্তব, তেমনি তাহারা মানুষের জীবন কাহিনীর একটা অংশমাত্র, এই দুই জগতের উপরে আর একটা বৃহত্তর জগতের ছায়া সর্বদা ব্যাপ্ত হইয়া আছে—তাহারই যাদুশক্তির প্রভাবে বাস্তব ও অবাস্তব দুই-ই সমান মূল্যবান হইয়া উঠে।"[৮০]

সন্দেহ নেই মাধবীলতার মধ্যে বাস্তবাস্তব দুই সমান মূল্যবান হয়ে উঠেছে। তাই বাস্তবতার অভাবের অভিযোগে মাধবীলতাকে উপন্যাস পদবাচ্যতা থেকে বাতিল করে দেবার মত যুক্তি খুব শক্তিশালী নয়। উপন্যাসের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রোমান্স ফ্যান্সি এবং ইমাজিনেসন প্রভৃতিকে ব্যাপকার্থে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যার মধ্যে কোলরিজের বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া (চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের) গ্রন্থের সুবিখ্যাত মন্তব্য—

"...to transfer from our inward nature a human interest and a substance of truth sufficient to procure for the shadows of imagination that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith."

মাধবীলতার মধ্যে মোটেই অপ্রতুল নয়। ফলে সঞ্জীবের এই কবিকীর্ত্তি তাঁর চরিত্রে ও কাহিনীর মধ্যে সচেতন ভাবেই willing suspension of disbelief for the moment এর মাধ্যমে একটি Poetic Faith সৃষ্টি করেছে। তার মূলে তাঁর ভাষারীতি বা স্টাইল তাঁর রচনাকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দান করেছে। এই প্রসঙ্গে কবি সমালোচক মোহিতলালের মন্তব্য স্মর্তব্য,—

"স্টাইল অর্থে যে ব্যক্তিগত বাকভঙ্গি বা idiosyncracy of expression ও বুঝায় তাহা কেবল ভাষাতেই প্রকট নহে—ভাবে ও ভাষায় মিলিয়া তাহা এমন হইয়া আছে যে দুয়েরই অন্তর্গত সে যেন একটা তৃতীয় বস্তু এবং ইহাকেই নির্দেশ করিয়া চলা যাইতে পারে—Style is the man himself."[৮১]

সঞ্জীবচন্দ্রের মাধবীলতায় ভাব ও ভাষা কি ভাবে একাকার হয়েছে তার অনেক উদাহরণ প্রাক উদ্ধৃতির মাধ্যমে পেয়েছি, এখানে আরও কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে :—

ক। চরিত্রের সাধারণী করণ :—

"সুখীরা হাসিতে জানে। সরল ও উদার ব্যক্তিরা বিলক্ষণ হাসিতে পারে, প্রণয়ীরা চমৎকার হাসে। শোকাকুল ব্যক্তিরা ম্লান হাসি হাসে, যেন অন্ধকার ঝড় বৃষ্টিতে দীপালোক পড়ে, কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা হাসিতে পারে না।"

খ। পাগলের প্রলাপোক্তি :—

"রাজা—বল দেখি। তুমি কি সত্যই পাগল ?

পিতম—হাঁ, আমি পাগল। আমি পিতম পাগল।

রাজা—তুমি জানো, কাহাকে পাগল বলে ?

পিতম—জানি, আমাকে বলে।

রাজা—পাগলের অর্থ কি ?

পিতম—অর্থ পিতম—অর্থাৎ আমি।"

গ। বিশ্লেষণাত্মক প্রাবন্ধিকের ভাষা :—

"দশ সহস্র বৎসর পূর্বে হয়তো একেবারে জ্ঞানের সামঞ্জস্য ছিল না। তৎকালিক সেই অসাঞ্জস্য কেহ আপনাদের মধ্যে জানিতে পারিত না। কেহ কাহাকেও পাগল বলিত না।...এক্ষণে আমরা সে সময়ের লোক দেখিলে, তাহাকে পাগল ভাবিবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ আমাদের আশ্চর্য হইবার সম্ভাবনা।"

ঘ। প্রবচনমূলক সুভাষিতাবলী :—

"নিন্দা এ সংসারে পরম সুখ। ২। মনুষ্যমাত্রেই ছদ্মবেশী। আত্মার ছদ্মবেশ এই দেহ। দেহের মিথ্যা বেশ এই বস্ত্র। ৩। যেখানে স্ত্রী পুরুষে অসদ্‌ভাব। সেখানে মঙ্গল নাই। ৪। লম্পট লোকের কি দয়া থাকে না ? না, স্নেহ থাকে না ? লাম্পট্য দোষে দয়ার কার্য কি কখন কলুষিত হয় ? ৫। সৎপ্রবৃত্তি মনে প্রবল থাকিলে মুখ সুশ্রী হয়। ৬। স্থান মাহাত্ম্য অতি আশ্চর্য, এই জন্যই তীর্থ। ভয় ভক্তি বিলাস, বৈরাগ্য এসকলই স্থানের গুণে আপনই মনে উদয় হয়।

ঙ। পশুর মাধ্যমে বাৎসল্য চিত্র :—

"হস্তীর শাবকটি মাতৃক্রোড়ের নিম্নে দাঁড়াইয়া পিতমকে দেখিতেছে। কোমল ক্ষুদ্র শুণ্ডটি পিতমের দিকে বাড়াইয়া আঘ্রাণ লইবার নিমিত্ত শুণ্ডাগ্র বিস্ফরিত করিতেছে, একবার একবার দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছে। আবার পিছাইতেছে। পিতম নানাস্বরে তাহাকে অভয় দিতেছে। শেষে করি শাবক ক্রীড়া লুব্ধ হইয়া পিতমের সম্মুখে আসিয়া মুখ তুলিয়া শুণ্ডাগ্র বিস্ফারিত করিতে লাগিল, সাহস করিয়া একবার পিতমের অঙ্গ স্পর্শ করিল; স্পর্শমাত্রেই পলাইয়া আবার মাতৃউদরের নিম্নে দাঁড়াইল।"

সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষা নির্মাণ ক্ষমতা সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য যথার্থ—

"সঞ্জীববাবুর ভাষাও সঞ্জীববাবুর ধাত। তাঁহার ন্যায় সরল ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা বালকের ন্যায় ভাষা, সঞ্জীববাবু

ইহাতে তাঁহার সামান্য কথাও যেমন লিখিয়াছেন, তাঁহার বড় বড় কথাও তেমনি লিখিয়াছেন।”৮২

: আনার বল্লী :

আনার বল্লী গল্পটি ভ্রমর নূতন পর্যায়ের ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যার আশ্বিন (১২৮৫) ৪১—৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। নূতন পর্যায়ের ভ্রমরের সম্ভবত কোন প্রচার হয় নি। ফলে আনার বল্লী গল্পটি অপরিচয়ের অন্ধকারে এযাবৎকাল তলিয়ে পড়েছিল। গল্পটিকে অসমাপ্ত রচনার মধ্যে গণ্য করা যায়। কারণ কাহিনী যেখানে শেষ হয়েছে তারপর তাকে আরও বহুতর ঘটনায় আকর্ষণ করার সুযোগ রয়ে গেছে। কিন্তু ভ্রমরের ঐ অপ্রচারিত সংখ্যাটির পর আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত না হওয়ায় কাহিনীটিকে সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্র নতুন করে আর কিছু ভাববার সুযোগ পান নি। যদিও সঞ্জীবচন্দ্র গল্পটির শেষে ‘ক্রমশ’ বলে কোন নির্দেশ করেন নি। অবশ্য প্রায়ই কোন রচনায় থাকতো না। কণ্ঠমালা, দামিনী, মাধবীলতা ইত্যাদিতে ‘ক্রমশঃ’ লেখা নেই। সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শতঞ্জীবচন্দ্র আনার বল্লী গল্পটিকে সঞ্জীবের রচনা বলে নির্দেশ করেছেন সে সম্পর্কে আমরা সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। তাছাড়া গল্পটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য যুক্তিযুক্তভাবে প্রমাণ করে আনারবল্লী সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা। আনারবল্লী রচনার আগে ঐ জাতীয় কাহিনী দামিনী (১২৮২) রচনা করেছিলেন। দামিনী বা রামেশ্বরের অদৃষ্টের তুলনায় আনারবল্লী অনেক সাধারণ ধরণের লেখা। পত্রিকার পৃষ্ঠাপূরণের জন্যেই যেন তিনি গল্পটি রচনা করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে ভাবেই তিনি গল্পটি রচনা করুন না কেন তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য কাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। আনারবল্লী গল্পটি বিশ্লেষণ করলে আমরা তা সহজেই বুঝতে পারবো।

কাহিনীর কথামুখ নিম্নরূপ—

“নাগপুরের পশ্চিমাঞ্চলে লীনা নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তথায় কতকগুলি রাজপুত পুরুষানুক্রমে বাস করে। পশুহনন আর সামান্য চাষ এই দুই তাহাদের জীবানবলম্বন। জীবিকানুযায়ী তাহাদের প্রকৃতি। নিকটে পর্বত, পুরুষেরা সর্বদা শিকার করিয়া বেড়ায়। সর্বদা পশুহত্যা যাহার বৃত্তি, নিষ্ঠুরতা তাহার প্রকৃতি। কর্ষণোপযোগী ভূমি অল্প, যাহা আছে, তাহাতে প্রায় স্ত্রীলোকেরাই লিপ্ত থাকে। পুরুষেরা নৃশংস। স্ত্রীলোকেরা তত নহে।”

একদিকে কথামুখ রচনাভঙ্গী যেমন সঞ্জীবচন্দ্রের বিশিষ্ট রচনারীতির পরিচয় বহন করছে তেমনি কাহিনীর প্রাথমিক পরিচয়েও আমরা বুঝতে পারি এটি সঞ্জীবেরই রচনা। মাধবীলতা, পালামৌ, কণ্ঠমালা, বৈজিক তত্ত্ব ইত্যাদি রচনায় তিনি বারবার বলেছেন বৃত্তি অনুযায়ী মানুষের প্রকৃতি এমন কি আকৃতিও হয়। তাছাড়া পালামৌতে তিনি পালামৌ ছোটনাগপুর অঞ্চলে রাজপুত গোষ্ঠীর বসবাস ও তাদের বৃত্তি ও

প্রকৃতির কথাও বলেছেন। কাহিনীর সূচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের গবেষক প্রকৃতির পরিচয়ও সুস্পষ্ট।

আনার বল্লী গল্পটির দুটি পরিচ্ছেদ মাত্র ছাপা হয়েছিল। আমরা আগেই বলেছি সম্ভবত লেখক এটিকে উপন্যাসে রূপ দেবার কথা ভেবে ছিলেন। কারণ ছোটগল্পের দ্রুততা এখানে অনুপস্থিত। অথচ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে গল্পের ছেদ টেনে দিলেও আমাদের মনে এমন কিছু ক্ষোভ থাকে না।

আনারবল্লী কাহিনীর পরিচয় গ্রহণ করলে আমরা দেখব লেখক বেশ ধীরে স্বচ্ছে এগিয়ে চলেছেন প্রকৃতি বর্ণনা কাহিনীর অন্যতম আকর্ষণ ছবি রচনায় সঞ্জীবের প্রবণতার কথা আমরা অন্যান্য রচনা প্রসঙ্গে বলেছি। বিশেষ করে ছোটনাগপুরের প্রকৃতি সম্পর্কে সঞ্জীবের ব্যক্তি অভিজ্ঞতা এই রচনাটিতে অত্যন্ত স্পষ্ট।—

> "গ্রামের চারিদিকে তেপান্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত আছে। পর্বত ও গ্রাম এতদুভয়ের মধ্যবর্তী প্রান্তরে স্থানে স্থানে শস্য উৎপন্ন হয়, অন্যত্র কেবল বৃহৎ বৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তর পড়িয়া আছে। গ্রামখানি কূর্মপৃষ্ঠবৎ স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। প্রান্তর হইতে দেখিলে গ্রামের মধ্যস্থানের কুটির পর্যন্ত দেখা যায়। অতি দূরবর্ত্তী পথে বালকেরা ক্রীড়া করিতেছে, গৃহদ্বারে গৃহিনী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে মহিষ আহার করিতেছে, গৃহচালে শ্বেত কপোতেরা বসিতেছে উড়িতেছে, সকলই প্রান্তর হইতে দেখা যায়। গ্রামের ভূমি ক্রমে ক্রমে নিম্ন হইয়া দুই দিক একটি ক্ষুদ্র নদী পার্শ্বে মিশিয়াছে। অপর দুই দিক প্রান্তরে মিশিয়াছে।"

এই পটভূমি রচনা করে লেখক কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এই পরিবেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ যুবক পর্বত পার্শ্বে একাগ্রমনে কিছু লক্ষ্য করছিল। পরিবেশের সঙ্গে সে খুব মিলে গিয়েছে। এই মন্তব্যটি পালামৌয়ের সঙ্গে হুবুহু এক—

> কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে আর কৃষ্ণবর্ণের মহিষ মনুষ্যেরা তদুপযোগী, প্রস্তরবৎ কাল, প্রস্তরবৎ কঠিন, হয় তো আবার মহিষের ন্যায় কর্কশ বা সাদৃশ্য বুঝি নৈসর্গিক।"

অন্যপক্ষ পালামৌতে (দ্বিতীয় প্রবন্ধ) আছে—

> "যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল, চারিদিকে কাল পাথর পশুও পাথুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ।"

কাহিনী সূচনায় তিনি লিখছেন যে আঠার বছরের এই বলিষ্ঠ সুদেহী—

> "যুবা গৃহে প্রত্যাগমন করিবে মনে করিতেছে এমত সময় পশ্চাৎ হইতে একটি বালিকা আসিয়া বলিল—দাদা, এখানে বসিয়া একাকী কী করিতেছ। যুবা মস্তক ফিরাইয়া বলিল—কে ? আনার।"

এই আনার বল্লীর বয়স এখন নয় বৎসর। কুঁড়ি সবে পাতার আড়ালে মাথা তুলেছে। কিশোর প্রেমের যে চিত্রটি বাৎসল্যরসে পরিষিক্ত করে সঞ্জীব এঁকে চলেছেন তা এক কথায় সুন্দর। কিশোর প্রেমের চিত্রাঙ্কনে এ গল্পটি যেন রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাষ্টার গল্পের প্রাক্‌রূপ। আনার বল্লী যুবকটিকে শিকার করতে বারণ করছে। তার ধনুক

জলে ফেলে দিতে বলছে। কিন্তু যুবক যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলে তীর ধনুক জলে দিলে সে বাঘ মারবে কি করে, আর তাছাড়া সে আগে তাকে বাঘ মেরে আনতে বলত। তার উত্তরে আনার জানাল আগে সে ছেলেমানুষ ছিল তাই বলত কিন্তু এখন আর বলে না। কিন্তু শিকারী যুবা ইতিমধ্যে একপাল হরিণ দেখতে পেয়েছে। সে আনারকে বলল যে সে বালিকা ন বছর বয়সে বাঘ মারতে বারণ করে সে হরিণ মারতে কি বারণ করে? এই কথা বলেই সে সেই মৃগ যূথের দিকে তীর ছুঁড়ল। তাদের মধ্যে একটি নব প্রসূতা স্থূলাঙ্গী সুন্দরী হরিণীর গলায় তীর বিঁধলো। সে কিছু দূরে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। কিন্তু তার শাবক দুটি তাদের মায়ের এই মৃত্যু বুঝল না। মৃত মায়ের কোলে তারা নিশ্চিন্তে শুয়ে রইল। এইখানে সঞ্জীবের স্বাভাবিক বাৎসল্য রস আপন পথে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। অন্যপক্ষে করুণার মূর্তি আনারের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনরোল পাঠকের হৃদয়কে করুণ রসে আর্দ্র করে তোলে। অন্যপক্ষে শিকারের গর্বে ও আনন্দে এবং আনারের কান্না দেখে—

"যুবা হাসিয়া উঠিল। হাসি শুনিয়া মাত্র আনার লাফাইয়া এক উচ্চ শিলাখণ্ডে দাঁড়াইয়া যুবার দিকে মাথা বাঁকাইয়া দম্ভভাবে বলিল, মাতৃ ঘাতক।"

এই কথায় মাতৃহীন যুবকের মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। সে আনারের অনুরোধে হরিনীকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে গেল এবং চেষ্টাও করে কিন্তু হরিনী বাঁচল না। বীরভদ্র নামে সেই যুবক শাবকদুটিকে নিয়ে আনারের সঙ্গে গ্রামে ফিরে এলো।

এরপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রবেশ করে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বাস্তবানুগামিতার পরিচয় রেখেছেন। কাহিনী ক্রমশঃ গতিলাভ করছে।

"গ্রামের প্রান্তভাগেই আনারের মতিমাসি বাস করে, বীরভদ্র তথায় গিয়া ক্রোড হইতে শাবকদিগকে নামাইয়া দিল।"

হরিণ শিশুকে ঘিরে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর সহজ বাৎসল্যটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, যদিও কাহিনীর মধ্যে এই সব অংশ অপ্রাসঙ্গিক যা সঞ্জীবের বিশেষ প্রবণতার পরিচয় বাহী।

শাবক দুটিকে আনারের হাতে অর্পণ করে বীরভদ্র যখন ফিরে যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে আনারের সম্পর্কের ইঙ্গিতটি সঞ্জীবচন্দ্র একটি রঙ্গিনী যুবতীর শ্লেষের মধ্যে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন।...

"পথিপার্শ্বে একটি বৃক্ষে বসিয়া দুইটি কাক ডাকিতে ছিল। বীরভদ্র তৎপ্রতি একবার কটাক্ষ করিল মাত্র। পূর্ব অভ্যাসমত তীরধনু তুলিল না। তাহা দেখিয়া একজন যুবতী হাসিয়া বলিল, এ যে নূতন দেখি, আর ত কখন দেখি নাই, তবে বুঝি বীরভদ্রের হাতে ব্যথা হইয়াছে। বীরভদ্র ঈষৎ হাসিয়া আপন ধনুর প্রতি চাহিল। আর কোন উত্তর করিল না।"

এই ধরণের ইঙ্গিতময়তা সঞ্জীবের রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

আনার হরিণ শিশু দুটিকে যখন অত্যন্ত যত্নে দুধ খাওয়াচ্ছিল সেই সময় তার

মতি মাসী তাকে দুধ নষ্ট করার জন্যে কঠিন ভাষায় গঞ্জনা দিতে লাগল। এই মতিমাসীর গঞ্জনার ভাষাতেই আমরা জানলাম আনারবল্লী শৈশবে মাতৃহারা। এই কটূভাষী দূর সম্পর্কের মাসীই তাকে লালন করছে। ক্রোধবশে মাসী তাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলল। কারুণ্যময় চিত্র রচনায় সঞ্জীবের ক্ষমতার পরিচয় এখানে আছে—

"মাতার উল্লেখ হইবামাত্র আনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তদ্বারা মুখ আবরণ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পার্শ্ব স্ফীত হইতে লাগিল, সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কণ্ঠ দমনের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। কিন্তু কণ্ঠ দমন হইল না। শেষে আনার কাঁদিয়া ফেলিল।"

এই অবস্থায় অবোধ হরিণশিশু যখন মাসীর কাছে এসে দাঁড়াল তিনি দ্বিগুণ রাগ ভরে তাদের মুখে আঘাত করলেন। তারা প্রাণভয়ে মহিষীর কাছে ছুটে গেল।

"মহিষী মহাভয়ে ঘটমট করিয়া উঠিয়া সিং নামাইয়া দাঁড়াইল।"

এই অবস্থায় মাসী হরিণ শিশু দুটিকে তাড়িয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে আনারও চলে গেল।

সন্ধ্যা অতীত হলেও আনার যখন আর ফিরলো না মাসী তাকে ঘরে ফিরে আসবার জন্যে ডাকতে লাগলো, তখনও সে ফিরলো না। আনারের জন্যে মাসীর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রতিবেশীদেরও উৎকণ্ঠিত করে তুলল। সকলে আলোহাতে আনারকে খুঁজতে লাগলো। এক গাছ তলায় হরিণশিশু দুটিকে পাওয়া গেল। কিন্তু আনারকে আর পাওয়া গেল না। মাসী তাদের নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে এলো। কিন্তু সকলে মনে করলে আনারকে বাঘে খেয়েছে।

আনার বল্লী কাহিনীর এই স্বল্প পরিসরে যদিও উপন্যাসের অসমাপ্ততা বর্তমান, তবুও এর মধ্যে ছোটগল্পের প্রতীতিরে আভাস আছে যাতে এক ধরণের শেষ না হওয়ার অতৃপ্তি রয়ে যায়, যদিও কাহিনীর প্রস্তাবনায় এক ধরণের উপন্যাসোচিত ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা গেছে। তবু কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা, মুহূর্তের চমক, চরিত্রের বিদ্যুতি আভাস, ইঙ্গিতময়তা আনারবল্লীকে মূলত ছোটগল্পের সম্মান দান করতে পারে।

এই গল্পের মানব চরিত্র মূলত তিনটি, আনার বল্লী, বীরভঞ্জ ও মতিমাসী, কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষ প্রধান চরিত্র প্রকৃতি। তা একদিকে যেমন ছোট নাগপুরের বন্ধুর নিসর্গ, অন্যপক্ষে হরিণ শিশু এবং মূক প্রকৃতি সঞ্জীবের প্রতিভার স্পর্শে এই কাহিনীর মূল নিয়ন্ত্রনী শক্তি হয়েছে। অন্যপক্ষে আনারবল্লী ও বীরভঞ্জ চরিত্র দুটি দামিনী ও রমেশের (দামিনী) চরিত্রের প্রতিকল্প—কোমল কিশোর প্রেমের সার্থক ধারক। এই কিশোর কিশোরী দুইটিই ফ্ল্যাট চরিত্র। কোন পরিণতিও নেই। মতিমাসী চরিত্রের আপাত কঠিনতার অন্তরালে একটি কোমল মাতৃ হৃদয় স্বতঃই প্রকাশিত হয়েছে আনারবল্লী হারিয়ে যাবার পর।

প্রকৃতি ও মানুষে সঞ্জীবের সহানুভূতি ও রসবোধকে আনারবল্লী গল্পে যে ভাবে ঐ যুগে একটি রসজগৎ গড়ে তুলেছিল, তা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের রবীন্দ্রনাথের

ছোটগল্পের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

: ভূতের সংসার :

ভ্রমর পত্রিকায় (নতুন পর্যায়) ভাদ্র (১২৮৫) মাসের সংখ্যায় ১৮—২৩ পৃষ্ঠায় ভূতের সংসার রচনাটি প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা ছোট গল্পের ইতিহাসে ভূতের সংসার একটি অপরিজ্ঞাত রচনা। সত্যকারের হাসির গল্প বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। আধুনিক কালে পরশুরামের হাতে হাসির গল্পের যে পরিণতি আমরা দেখলাম, উনিশ শতকে তারই বীজ উপ্ত হয়েছিল সঞ্জীবের হাতে। গল্পের মূল রস হাস্য হলেও তার অন্তরালে যে সামাজিক ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল তার সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' এবং 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী' (অসমাপ্ত) কাহিনীতেই হয়ে ছিল। এর মধ্যে নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী সঞ্জীবচন্দ্রের ভূতের সংসার রচনার অনেক পরে রচিত এবং মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত প্রত্যক্ষত সামাজিক ব্যঙ্গ কাহিনী। ভূতের সংসার গল্পটি পড়লে প্রথমে আমাদের পরশুরামের 'ভুসণ্ডির মাঠে' গল্পটির কথা মনে পড়ে যায়। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ থাকলেও কাহিনীর পরিবেশে গল্পটির ভৌতিকতা কোথাও ব্যহত হয় নি। চরিত্র বিচারে গল্পটি ভূতের গল্পই। এখানে ছোট গল্পের বাক্‌ভঙ্গীর দ্রুততা এবং ঘটনা সংস্থাপনের পটুত্ব সঞ্জীবচন্দ্রের অন্যতর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করছে। কাহিনীর সূচনায় সঞ্জীবের রচনার বৈশিষ্ট্য-গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,—

> "প্রায় তিন শতাধিক বৎসর হইল—এক মহারণ্যে ভৈরব নামে এক ভয়ঙ্কর ভূত বহুকালাবধি বাস করিত। কিন্তু একাকী বাস করা ভূতের অসাধ্য, অতএব সে সঙ্গী অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা করিল। বনের মধ্যে আর ভূত ছিল না।"

কণ্ঠমালা উপন্যাসে সঞ্জীবচন্দ্র লিখছিলেন—

> "একা অসহ্য অস্বাভাবিক। পশুগণও একা থাকিতে পারে না।"

এখানে ভূত সম্পর্কে সেই একই কথা বলা হয়েছে। অস্বাক্ষরিত রচনা সহজেই এইসব মিলগুলি প্রমান করে রচনাগুলি একই লেখকের।

ভূতের সংসার কাহিনীটিকে তিনি স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।—অতএব ভৈরব ভূত সংসার করবার মানসে বনের বাইরে গেল। তার বাসনা হল প্রেতিনী বিবাহ না করে মানবী বিবাহ করবে। কারণ—

> "মনুষ্য কন্যা বিবাহ করা আরও ভাল, ইহারা পাক পটু। বিশেষতঃ স্বামীকে না দিয়া আপনারা খায় না।"

ভৈরবের মতো মানব সমাজের প্রেতরাও যে আক্কেলহীন হয়ে অকাতরে বিবাহ করে এবং তাতে বহু মানবকন্যার সর্বনাশ সাধন হয়—সঞ্জীব তাঁর অকাতর বিবাহ প্রবন্ধে আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু মানব কন্যা বিবাহ করতে যাওয়ার মাকে

মাঝে যে বিপত্তি ঘটে না এমন নয়। তাই বিবাহেচ্ছু ভৈরব লোকালয়ে যখন ঘোরাঘুরি করছে এমন সময় এক সন্ধ্যায় সে এক সুন্দরী যুবতী কন্যাকে প্রদীপ হাতে রান্না ঘর থেকে শোবার ঘরে আসতে দেখল। প্রদীপের আলোয় সুন্দরীর মুখ কত সুন্দর দেখায় তা লেখকের চিত্র নির্মাণ ক্ষমতার প্রকাশ করেছে। সেই সুন্দরীর সামনে ভূত বর দেখা দিল। তাকে দেখে সুন্দরী ভয়ে মূর্চ্ছা গেল। আত্মীয় স্বজন ছুটে এলো। 'ভূত কিছু অপ্রতিভ হইল, কিন্তু নিরাশ হইল না, ভাবিল আমার রূপ দেখিয়া যুবতী মোহিত হইয়া থাকিবে। ভূতের মধ্যে ভৈরবের রূপ কিছু প্রশংসার ছিল।" আমাদের সমাজের ভূতেদেরও এমন ধারণা আছে। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসতে যখন বিয়ের কোন কথা বললো না, ভৈরব মনের দুঃখে অন্য পাত্রীর সন্ধানে গেল। এখনো পর্যন্ত সে মানব কন্যা বিবাহ করার বাসনা ত্যাগ করেনি। তাই অন্য এক রান্না ঘরের মধ্যে স্ত্রীকণ্ঠ শুনে তাকে দেখার আশায় যেই উঁকি দিয়েছে সেই মুহূর্তেই সেই স্ত্রীলোকটি বাইরে ভাতের গরম ফেন ফেলছিল। সেই ফেন ভূতের গায়ে পড়তে—

"ভৈরব বিকট চিৎকার করিয়া পালাইল। পরে জ্বালা থামিলে বিবেচনা করিল যে মানবীরা প্রেমিকা নহে। তপ্ত ফেন দিয়া তাহারা প্রেম সম্ভাষণ করে, আমি বিবাহ করিব মাত্র ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাকে জলিতে হইল, না জানি বিবাহ করিলে কি জ্বালাতন হইতে হইত। অতএব মানবী বিবাহ করা হইবে না, স্বজাতি কন্যা বিবাহ ভাল। শেষ অনেক চেষ্টা করিতে করিতে ভৈরবের অদৃষ্টে এক প্রেতিনী জুটিল।"

বিয়ে পাগলদের অদৃষ্টে যে শেষ পর্যন্ত অনেক সময়ই প্রেতিনী জোটে তার ইঙ্গিতটি এখানে স্পষ্ট। আর এই প্রেতিনীকে নিয়ে সমস্যারও অন্ত থাকে না। ভৈরবের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ভৈরব যা কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে আনে প্রেতিনী তাই খেয়ে ফেলে। আবার কোনদিন দুজনে আহার সন্ধানে বেরিয়ে সমস্যা আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

"ভৈরব যাহা পায় তাহাই প্রেতিনী লইয়া আহার করে, ক্ষুধার্ত ভৈরব স্ত্রীকে আহার করাইয়া চরিতার্থ হইতে লাগিল, কিন্তু ভৈরবের উদর জলিতেছিল, শান্ত করিবার জন্য একবার সভয়ে ভৈরব একখণ্ড অস্থি আপনি মুখে ফেলিয়া দিল। প্রেতিনী তাহা জানিতে পারিয়া মুখে মুখ দিয়া সাদরে অস্থি লইল, আহ্লাদে ভৈরব গলিয়া গেল। ভৈরব অনাহারে কিন্তু প্রেমালাপে কাটাইল, শেষ আর তাহার দিন কাটে না।"

ভৌতিক চরিত্র এমন বাস্তব সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তির্যক ভঙ্গীতে আঁকার ক্ষমতা অতি অল্প লেখকেরই আছে। পরশুরাম সেই সব ক্ষমতাবানদের অন্যতম ছিলেন। এমন অবস্থায় ভৈরবের মুক্তির উপায় কি? উপায়?—

"শেষে এক সন্ধ্যায় এক শশ্মানে দগ্ধ কাষ্ঠাগ্রে অল্প ক্লেদ লাগিয়া রহিয়াছে দেখিয়া

প্রেতিনী তাহা খুঁজিতে গেল। ভূত সেই অবসরে পালাইল।"
কিন্তু বৌকে ভয় করে না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। সৈয়দ মুজতবা আলি এ সম্পর্কে মজার গল্প বলেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র তার থেকে আরও একটু বেশী এগিয়ে গিয়েছেন—মানুষ কোন ছার, ভূতও তার স্ত্রীকে ভয় করে।

স্ত্রীর ভয় পালাতে পালাতে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ভৈরব বনের মধ্যে এক গাছতলায় এসে যখন বসেছে তখন একটি জীবিত মানুষকে দেখে সে খুব ভয় পেয়ে গেল। লোকটি কিন্তু তাকে দেখে কোন ভয় না পেয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে জানাল যে সেও তার স্ত্রীর জ্বালায় সংসার ছেড়ে পালিয়ে এসেছে—কারণ তার স্ত্রীর বায়নার শেষ নেই, কিন্তু সঙ্গতিহীন সামান্য অবস্থার মানুষটির সেই অর্থ নেই যা দিয়ে সে তার স্ত্রীর বায়না মেটাতে পারে। ভৈরব সমব্যথী পেয়ে তার নিজের অবস্থা জানাল এবং পরামর্শ হল অর্থই স্ত্রীদের মন রাখার একমাত্র উপায়। অতএব আগে অর্থ উপার্জন করা চাই। এখানেও সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের তিক্ততা বোধ কৌতুকহাস্যে পরিণত হয়েছে।

ভৈরব লোকটিকে বলল—'আমার পরামর্শ শুন, নিকটবর্তী গ্রামে আমি যাহাদিগকে পাইব তুমি ভিন্ন আর রোজা আসিলে আমি তাহাকে ত্যাগ করিব না।' ফলে সেই লোকটিও একমাত্র ভূত ছাড়াবার রোজা হয়ে অনেকটাকা উপার্জন করবে। তাতে যে টাকা উপার্জিত হবে ভৈরব তার অর্ধেক ভাগ পাবে। লোকটি তাতে রাজী হলে তারা গ্রামে গেল এবং পরামর্শ অনুসারে কাজ শুরু হল। লোক উৎস থেকে কাহিনীর এ অংশ সঙ্কলিত সন্দেহ নেই। দলে দলে লোক ভূত গ্রস্থ হল এবং সেই লোকটি ছাড়া আর কেউ ভূত ছাড়াতে পারলো না। প্রচুর অর্থাগম হল। কিন্তু ভূতের থেকে মানুষ চালাক। লোকটি ভৈরবকে ফাঁকি দিতে লাগল। ভৈরব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল যে সে আর পূর্ব চুক্তি অনুসারে তার ওঝাগিরিতে সাহায্য করবে না, অর্থাৎ কেউ ভূতগ্রস্থ হলে তার মন্ত্রে তন্ত্রে ভৈরব ছেড়ে যাবে না, ফলে সে অপদস্ত হবে এবং তার রোজগারও বন্ধ হবে। এমন সময় এক গ্রাম থেকে এক ধনী এসে লোকটিকে ধরে পড়লো যে তার কন্যাকে ভূতে পেয়েছে, তাকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। এর জন্যে প্রচুর টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। লোভের বশবর্তী হয়ে ভূতের বারণ সত্ত্বেও সে নানান চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে খুব অপমানিত হল। শেষে সে হাত জোড় করে ভৈরবের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করলো। অনেক দয়া ভিক্ষা করলো, কিন্তু ভৈরব কিছুতেই ধনীকন্যাকে ছাড়তে রাজী হল না। তখন লোকটি সেই স্থান ত্যাগ করে কোথায় গেল, খানিক বাদে ফিরে এসে জানাল যে ভৈরবের স্ত্রী কাছেই আছে, ভৈরব ধনী কন্যাকে না ছেড়ে গেলে সে এখনি সেই প্রেতনীকে ডেকে নিয়ে আসবে। ভৈরব স্ত্রীর ভয়ে তখুনি তাকে সাহায্য করতে রাজী হল। অচিরেই ভূত ছেড়ে গেল এবং সেই থেকে আর কাউকে কোন দিন ভূতে পায়নি।

অদৃশ্য ভূতের সঙ্গে লোকটির কথাবার্তা উপস্থিত লোকেদের কাছে যে হেঁয়ালী

বলে মনে হয়েছিল সেই বাস্তব চিত্রটি আঁকতে কিন্তু লেখক ভুলে যান নি। ফলে গল্পের মধ্যে ভূত কেবল মানুষের রূপক মাত্রই হয়ে থাকেনি। অথচ কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে পাঠকের উদ্বেলিত অট্টহাস্য উচ্চকিত হয়ে ওঠে। ছোট গল্পের গুণ অপেক্ষা বৃত্তান্ত বা কাহিনীর গুণ এখানে সমধিক প্রকাশ পেলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন একটি নিটোল হাসির গল্প অল্পই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সামাজিক অসঙ্গতি এমন রসাত্মক ভঙ্গীতে অথচ এমন সুরুচি সংযমের মাধ্যমে প্রকাশ অল্পই ঘটেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

: ভ্রমণকথাকার সঞ্জীবচন্দ্র :

পালামৌ

বাঙ্গলা সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের অন্যান্য রচনা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেও পালামৌ রচয়িতা হিসাবে তাঁর আসন অক্ষয় হয়ে থাকবে। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই অতি বিখ্যাত ভ্রমণ চিত্রটি প্রথমে বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষের (১২৮৭) দুইটি সংখ্যায়, অষ্টম বর্ষের (১২৮৮) তিনটি সংখ্যায় এবং নবম বর্ষের (১২৮৯) একটি সংখ্যায় মোট ছটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে গ্রন্থাকারে পালামৌ প্রকাশিত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পরে (১৮৯৩) বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত সঞ্জীবনী সুধায় 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট, দামিনী ও পালামৌ' একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় পালামৌ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় বলে সম্পাদকদ্বয়ের দাবি। এই সম্পর্কে সম্পাদকদ্বয়ের বিবরণ উদ্ধৃত হল—

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বঙ্গভারতীর একজন কৃতী অথচ অলস অসাধারণ সাধক বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের অন্যতম সার্থক ও সুসামঞ্জস্য রচনা পালামৌ। বস্তুতঃ আধুনিককাল পর্যন্ত তাঁহার সাহিত্য কীর্তি এই পালামৌকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কারণে সঞ্জীবচন্দ্রের এই রচনাটিই আমরা পুনঃ প্রকাশিত করিলাম।
>
> পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' সর্বপ্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। লেখকের আসল নাম ছিল না,—প্রঃ নাঃ বঃ এই ছদ্মনাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ আরম্ভ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে বঙ্গদর্শনে ইহা সমাপ্ত হয়। প্রকাশের ক্রম এইরূপ : ১২৮৭। পৌষ ৪১২-১৯ পৃঃ, ফাল্গুন ৫১৩-১৯ পৃঃ ১২৮৮, আষাঢ় ১৩৫-৩৯ পৃঃ, শ্রাবণ ১৬৫-৭১ পৃঃ। আশ্বিন ২৮১-৮৬ পৃঃ, ১২৮৯, ফাল্গুন ৫১৪-১৭ পৃঃ। পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্রের জীবৎকালে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' নাম দিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার যে সঙ্কলন প্রকাশ করেন তাহাতেই পালামৌ সর্বপ্রথম পুস্তাকারে মুদ্রণ গৌরব লাভ করে, দুঃখের বিষয় অসাবধানতা বশতঃ 'সঞ্জীবনী সুধাতে' অনেক মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়া স্থানে স্থানে অর্থ বৈকল্য ঘটাইয়াছে এবং যে কোন কারণেই হউক বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সর্বশেষ অংশ স্থান পায় নাই।

বসুমতী সংস্করণ আষাঢ় ১৩১২ সঞ্জীব গ্রন্থাবলীতে সঞ্জীবনী সুধার পাঠই অনুসৃত হইয়াছে। সুতরাং আমরাই সর্ব প্রথম সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম ইহা বলা চলে। আমরা বঙ্গদর্শনের পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।"

এখানে সম্পাদকদ্বয়ের দাবি তাঁরাই সর্বপ্রথম পালামৌর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমরা জানি সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে পালামৌ স্বতন্ত্র পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও তাতে শেষ ষষ্ঠ প্রবন্ধটি সংযুক্ত হয়নি। কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক রূপে পালামৌ দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। এই সুবাদে পালামৌ শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই গোচরে এসেছে। অবশ্য একথা সত্য পাঠ্য তালিকাভুক্ত না হলে যে পালামৌ বাঙ্গালীর কাছে সমাদৃত হত না তা ভাবা মোটেই সঙ্গত হবে না, কারণ এই পালামৌ রচনারসে যে কি অনবদ্য ভ্রমণকাহিনী তা আমরা আলোচনাক্রমে দেখতে পাব।

প্রাগুক্ত সম্পাদকদ্বয়ের বিবরণ থেকে আমরা দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই। ১। সঞ্জীবচন্দ্র কেন নিজের নামে অথবা ঐ যুগের রীতি অনুসারে বিনা নামে রচনাটি প্রকাশ না করে প্রঃ নাঃ বঃ এই ছদ্মনামে ব্যবহার করেছেন? ২। বঙ্কিমচন্দ্র কেন শেষ পরিচ্ছেদটি সঙ্কলনে গ্রহণ করেন নি? সঞ্জীবচন্দ্রের পরিচয়দান প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবনী সুধার (১৮৯৩) ভূমিকায় লিখেছেন,—

"পালামৌ শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে, তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। প্রমথনাথ বসু ইতি কাল্পনিক নামের আত্মক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এগুলি যে তাঁহার রচনা তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

একটি ব্যাপারে এখানে আমরা প্রায় নিশ্চিত যে পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা। বঙ্কিম অবশ্যই অপরের লেখাকে সঞ্জীবের বলে চালিয়ে দেন নি। কিন্তু প্রমথনাথ বসু (প্রঃ নাঃ বঃ) ছদ্মনাম ব্যবহার করার পিছনে কি কি যুক্তি থাকতে পারে? প্রথমতঃ আমরা জানি সঞ্জীবচন্দ্র নিজে ছিলেন অত্যন্ত কৌতুকপ্রবণও ব্যঙ্গ প্রিয়। এই দিকটি সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করে গেছেন, তা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এই কৌতুক প্রবণতাবশেই সঞ্জীবচন্দ্র নিজের নামের বদলে প্রমথনাথ বসু ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ পালামৌয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে কিছু তিক্ত মধুর তির্যক মন্তব্য আছে, তার কোন প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় সঞ্জীব ছদ্মনাম আশ্রয় করতে পারেন। অবশ্য লেখকের এই মনোভাব এখানে বিশেষ কার্যকরী নয় বলেই মনে হয়। কারণ 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে তিনি যেভাবে ইংরেজ শাসনের অপকীর্তির বিরুদ্ধে ও তৎকালীন সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, এখানে সেই ধরনের কোন ভয়ে ভীত

হবার মত মন্তব্য নেই। তৃতীয়তঃ বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসাবে স্বনামে একটি রচনা প্রকাশের চেয়ে বেনামে রচনা প্রকাশ করার প্রবণতা প্রবল হতে পারে। চতুর্থতঃ বহরমপুরে বঙ্কিম সুহৃদমণ্ডলীর মধ্যে প্রমথনাথ বসু নামে একজন ছিলেন। বন্ধুর নামে রচনা প্রকাশ করে সঞ্জীবচন্দ্র কি বন্ধুবৎসলতা অথবা বন্ধুর সঙ্গে কৌতুক করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন? অথচ আমরা জানি প্রমথনাথ বসু নামে ঐ সময় স্বল্প খ্যাত একাধিক লেখক ছিলেন। একজন প্রমথনাথ বসু প্রখ্যাত নট ও চিত্র পরিচালক মধু বসুর পিতা—এঁর সঙ্গে রমেশ চন্দ্র দত্তের কন্যা কমলার বিবাহ (২৪শে জুলাই ১৮৮২) হয়। সেই বিবাহ বাসরে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের গলার মালা রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দেন।[১] সম্ভবত সঞ্জীবচন্দ্রও সেই বিবাহ বাসরে উপস্থিত ছিলেন। পালামৌ এর রচনাকালও এই সময়ে ১৮৮০-৮২। নবীন বরের সঙ্গে রসিকতা করার কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা আমাদের জানা নেই। আমরা আর একজন নাট্যকার প্রমথনাথ বসুর নাম পেয়েছি। এঁর নাটক 'অমর সিংহ' (১৮৭৪, হ্যামলেটের অনুবাদ), 'অপূর্ব মিলন' (১৮৭৮) ছদ্ম ঐতিহাসিক মনোহর নাটক ঐ যুগেরই রচনা।[২] এই নাট্যকার ও প্রাগুক্ত প্রমথনাথ বসু কি একই ব্যক্তি?

আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য বঙ্কিমচন্দ্র কেন পালামৌয়ের ষষ্ঠ প্রবন্ধ বা শেষ অংশটি বঙ্গদর্শন থেকে সঞ্জীবনী সুধায় গ্রহণ করেন নি? নিশ্চয়ই বঙ্কিম যে ভুলবশতঃ ঐ অংশটুকু সঙ্কলনে স্থান দেন নি তা নয়। সম্ভবত এই অংশটি বঙ্কিমের ভালো লাগেনি, অর্থাৎ পূর্ব প্রবন্ধগুলি অপেক্ষা এই অংশটি তেমনভাবে রসোত্তীর্ণ হয়নি বলে তাঁর মনে হয়েছিল, অথবা গোঁড়া প্রকৃতির বঙ্কিম সঞ্জীবের মৌয়া থেকে ব্রাণ্ডি মদ তৈরীর তত্ত্ব ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। অবশ্য এই সব যুক্তি আমাদের অনুমান মাত্র। অন্য কোন গূঢ় কারণও থাকতে পারে, হয়তো অংশটি আদৌ সঞ্জীবের রচনা নয়, যেমন কমলাকান্তের দপ্তরের সব প্রবন্ধ বঙ্কিমের নিজের লেখা নয়। বর্ত্তমানে সে সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

এই সব যুক্তি তর্ক ছাড়া আমাদের মনে আরও কতকগুলি প্রশ্ন দেখা দেয়। ১। পালামৌয়ের লেখকের নাম ছিল প্রঃ নাঃ বঃ—এই প্রঃ নাঃ বঃ-এর সম্পূর্ণ নাম প্রমথনাথ বসু এমন কথা বলার কি যুক্তি বা তথ্য ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের? ২। তবে কি প্রমথনাথ বসু নামে অন্য কোন লেখক পালামৌ রচনা করেছিলেন? ৩। অথবা সঞ্জীবচন্দ্র মধু বসুর পিতা প্রমথনাথ বসুর তথ্য বিবরণ থেকে তাঁর পালামৌ প্রবন্ধ সমূহের সাহিত্যিক রূপ দান করেছিলেন কি? কারণ প্রমথনাথ বসু বিহারের পালামৌ অঞ্চলে ছিলেন ও তাঁরও গবেষণার ও অনুসন্ধানে পরে জামসেদপুরে টাটা ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। ৪। আমাদের মধ্যে এমন সন্দেহও জাগে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র প্রমথনাথ বসু প্রেরিত পালামৌ প্রবন্ধ সমূহকে এমনভাবে মাজা ঘষা করে ছিলেন যে তা শেষ পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্রের নিজস্ব রচনায় দাঁড়ায়। ৫। এই সন্দেহ আরও প্রবল হয় যখন দেখি বঙ্কিমচন্দ্র শেষ (ষষ্ঠ) প্রবন্ধটি সংকলনের

অন্তর্ভুক্ত করেন নি—কারণ ঐ রচনাটির উপর হতোৎসাহ সঞ্জীবচন্দ্র হয়তো কোন কলম চালান নি। তবু আলোচনাক্রমে আভ্যন্তরীণ সমস্ত পরিচয় নিয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি যে পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা।

* * * *

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৫ খৃঃ অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দের পৌষমাসের সাধনায় 'সঞ্জীবচন্দ্র—পালামৌ' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, তাতে যে পরিমাণে রাজহস্তের ছাপ পড়েছে তার উপর নতুন কথা বলা মানে কিছু অসম্ভব কথা বলার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেই প্রধান মানদণ্ডের সামনেই আমাদের রস গ্রহণের আলোচনা উপস্থিত করবো।

আর্ট বা শিল্প শব্দটির সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক তর্ক চলতে পারে, কিন্তু একথা ঠিক যা আপন প্রকাশে অস্তিত্বময় তাই শিল্প। তাই কোন রচনা শিল্প হয়ে উঠলো কিনা তার বিচারক কোন তাৎক্ষণিক বিচারক নয়, তার বিচারক মহাকাল। এই মহাকালের বিচারে যে কোন ধরণের রচনাই শিল্প হয়ে উঠতে পারে, যদি তা চিরত্ব লাভ করে। সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে আমরা ভ্রমণ সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবো। এই আলোচনার আলোকে দেখবো সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠরচনা পালামৌ কি পরিমাণে ভ্রমণ সাহিত্য হয়ে উঠেছে? আমাদের কালের শতাব্দীর প্রান্তোত্তর হয়েও যে রচনাটি আমাদের অস্তিত্ববোধ বা রসবোধকে আজও চঞ্চল করে তোলে তার থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমাদের পাঁচ পুরুষের ব্যবধানে যার অস্তিত্ব উদ্ধত, তা যে নিঃসন্দেহে শিল্প তাকে কে অস্বীকার করবে?

ভ্রমণ সাহিত্যকে মূলত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—১। বস্তুনিষ্ঠ বা তথ্যনিষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী—যাতে আছে স্থান ও কালের সঠিক বৃত্তান্ত—অর্থাৎ যাত্রার সময় ভৌগোলিক বিবরণ, স্থানের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য কীর্তন, জনপ্রবাদ, জনজীবন ধারার খুঁটিনাটি বর্ণনা, পথের নির্দেশিকা—এক কথায় সরকারের ভ্রমণ বিভাগ প্রকাশিত 'ট্যুরিষ্ট গাইডে' যে সব জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে, তা সব থেকেও বর্ণনার গুণে যা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এই তথ্যনিষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনীর প্রধান আনন্দ 'কত অজানারে জানাইলে তুমি'। আবিষ্কারক বা পর্যটকদের ডাইরীগুলি সাধারণতঃ এই আনন্দের খনি। ভূগোল ও ইতিহাসের গবেষকদের কাছে তার মূল্য অপরিসীম ২। আত্মনিষ্ঠ বা ব্যক্তিরসনিষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী। এই পর্যায়ের ভ্রমণকাহিনীগুলিতে ভ্রমণকারীর একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আপন হৃদয় রসে পরিসিক্ত হয়ে তাঁর বিশেষ দৃষ্টির আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। এস্থলে ভ্রমণটি আলম্বনমাত্র। আর বিভাব সেখানে ব্যক্তিরস অর্থাৎ ভ্রমণকারীর ভাব ভাবনা মনন চিন্তন। ফলে রচনাটিতে বিজ্ঞানের সত্য না থাকতে পারে, কিন্তু কাব্যের সত্য তার মধ্যে বড় হয়ে দেখা দেয়। তবে কবিতা গল্প উপন্যাসের মত লেখকের কল্পনামাত্র

ঐতিহাসিক উপন্যাস, পত্র সাহিত্য ও ভ্রমণ সাহিত্যের একমাত্র উপাদান হতে পারে না। বাস্তবসত্যের সঙ্গে ব্যক্তির কল্পনার সংমিশ্রণ অবশ্যই ভ্রমণ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান হওয়া চাই। ভ্রমণকারী লেখকের মন কল্পনার পক্ষীরাজে চড়ে যে তেপান্তরের মাঠ পার হবে তা যেন বস্তুবিশ্বের একটি সত্যকারের মাঠ হয়। নয় তো কাল্পনিক রচনা হিসেবে তা মূল্যবান হতে পারে, ভ্রমণসাহিত্য হবে না।

এখন প্রশ্ন বস্তুনিষ্ঠ এবং আত্মনিষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে কোনটি সাহিত্য পদ বাচ্য ? বলা চলে এর যে কোনটিই সাহিত্য শিল্প হতে পারে, যেটি রসাত্মক অর্থাৎ আনন্দধারাবর্ষী। তবে সাধারণত কেবলমাত্র তথ্যনিষ্ঠা সাহিত্য হতে পারে না, আবার কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিক রচনাও সাহিত্য নয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে পত্র সাহিত্যে যেমন পত্র লেখক আছেন, তেমনি পত্রপ্রাপকও আছেন। অনুরূপভাবে ভ্রমণ সাহিত্যেও দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য দুই সমানভাবে বর্তমান। আর এইখানেই আত্মা ও বস্তুর হরগৌরী মিলনে ভ্রমণকথা শিল্প হয়ে ওঠে। কারণ কৌতূহল নিবৃত্তি ভ্রমণ সাহিত্যের একমাত্র কাজ নয়। ভ্রমণকারীর শিক্ষিত মার্জিত পরিশীলিত নিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রভাব ভ্রমণ কথার বস্তুভার সাহিত্যের চিরন্তনত্ব লাভ করে। কিন্তু দেখা যায় নিরপেক্ষতা অন্যান্য সাহিত্য শাখার মূল কথা হলেও লিরিক কবিতা, পত্র সাহিত্য ও ভ্রমণ সাহিত্যের পক্ষে তা অপরিহার্য গুণ নয়, বরং দেখা যায় বিশ্বসাহিত্যে Travel Literature বা ইংরেজীতে যাকে Travellogue বলা হয়েছে তা যে সব সময় নিরপেক্ষ হয়েছে তা বলা চলে না—আর ঐ সব Travellogue সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ হয়নি বলেই তারা সাহিত্য হয়েছে। অবশ্য বহু অভিযাত্রী তাঁদের ডাইরীতে যে সব অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন, তা অজানাকে জানার আনন্দ যতই দিক না কেন, তা সাহিত্য পাঠকের কাছে বৃত্তান্তমাত্র—ইতিহাসবেত্তার ও ভৌগোলিকের কাছে পরম লোভনীয় তথ্য বটে এমন কি বিজ্ঞান রসিকের তত্ত্বের উৎস বা আকারও হতে পারে। তবু তা সাহিত্য পাঠকের কাছে রস সমৃদ্ধ রচনা নয়।

বিশ্ব সাহিত্যে বিশেষ করে ইংরাজী সাহিত্য-এ ভ্রমণ কাহিনী সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে। কিন্তু আমাদের চিরকালের বদনাম আমরা ঘর ছেড়ে এক পা বেরোই না। অবশ্য এর সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ যে ছিল না তা নয়।

বাংলা দেশে মুসলমান অধিকারের আগে হিন্দুবৌদ্ধ যুগের সাহিত্যের যে নিদর্শন আমরা পেয়েছি তাতে নানা পথের নানা নির্দেশ পাওয়া যায়—যদিও সে পথ রূপকার্থে সাধন মার্গ। 'উজুবাট', 'জানাবাটা', 'সাক্কমত্ত' ইত্যাদি শব্দে পথেরই নির্দেশ আছে। তবে যত্রতত্র সকলের গতায়তের যে বাধা ছিল তার প্রমাণও চর্যাপদে রয়ে গেছে। শবরী ডোম্বীর পাহাড়িয়া ঝোপড়িতে ব্রাহ্মণের যাওয়া যে নিন্দনীয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২৮ সংখ্যক পদে। অর্থাৎ বাংলাদেশে কে

তখন থেকেই কুসংস্কারের জাতিভেদের বাধা নিষেধ গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ স্পষ্ট। তবে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে যে তিব্বত নেপাল ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাণমান নিয়ে সরে যেতে পেরেছিলেন, তার কারণ হিন্দুদের থেকে সংস্কার গত পথের বাধাগুলি ছিল তাঁদের কম। অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন কাব্যে আমরা ছোট গ্রামের ক্ষুদ্র পরিসরে গ্রাম্য প্রেম-লীলার চিত্রমাত্রই পাই। অথচ তুর্কী আক্রমণের কোন প্রভাবই সেখানে দেখা যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে একদিকে বাঙ্গালীর নিজস্ব স্বভাব ধর্ম এবং অন্যদিকে গোষ্ঠীবদ্ধ পর্দা আব্রু টানা জীবন বাঙ্গালী জাতিকে পথ বিমুখ করে তুলেছিল। আর একটি ঘটনাও বাঙ্গালীকে বিদেশ বিমুখ করার পক্ষে বিশেষ প্রভাবশালী। তুর্কী আক্রমণের (১২০৩ খৃঃ) পর থেকে ইংরেজ আগমনের (১৭৫৭) পূর্ব পর্যন্ত কেবল বাংলা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অরাজকতামুক্ত ছিল না—ডাকাতি, রাহাজানি, বোম্বেটে, ঠগী বর্গীর উপদ্রব তো ছিলই, তার উপর ছিল তীর্থকর বা জিজিয়া করের উৎপাত, এক কথায় তীর্থ করা, যা সেই যুগে বাঙ্গালীর ভ্রমণের প্রধান লক্ষ্য ও আনন্দ, তাই পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে ভ্রমণ সাহিত্য নেই।

আমরা পূর্বে ভ্রমণ সাহিত্যের যে দুটি ধারার কথা বলেছি নিছক সেই দুই ধারার একটি মাত্র অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ ভ্রমণ সাহিত্য অথবা ভাবনিষ্ঠ ভ্রমণসাহিত্য মধ্য-যুগের বাঙলা সাহিত্যে নির্ভেজাল ভাবে না থাকলেও বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' কাব্য (মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের আদেশে ১১৭৭ বাঙ্গালা সনে) ঘোষাল মহাশয়ের আসরে সর্বজন সমক্ষে পঠিত বা গীত হয়।

অষ্টাদশ শতকের ভ্রমণের একটি বৃত্তান্ত। তীর্থমঙ্গল কাব্যের ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন—

"এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত জনসাধারণের বিশ্বাস যে ইংরাজী ভ্রমণ কাহিনী (Travels) পাঠ করিয়া তাহারই আদর্শে বাংলায় ভ্রমণ কাহিনী লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় বুঝিয়াছি তাহাদের এই বিশ্বাস অমূলক।"

সঞ্জীবচন্দ্রের ভ্রমণ কথা পালামৌ রচনার পশ্চাতেও কোন পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তীর্থমঙ্গল সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য সমর্থনে আমরা এইটুকু বলতে পারি বাংলা সাহিত্য ভ্রমণ কথা অতি অল্প থাকলেও তা যে একান্তই বাঙ্গালা সাহিত্যের নিজস্ব সম্পদ তা আমাদের বুঝতে ভুল হয় না। শ্রী বসুর আলোচনা সূত্রানুসারে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভ্রমণকথার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু আরও বলেছেন—

"সুদূর অতীত কাল হইতে ভারতে এই সনাতন প্রথা (তীর্থ ভ্রমণ) চলিয়া

আসিতেছে—রামায়ণ মহাভারতে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নানা গ্রন্থে তীর্থভ্রমণের পুণ্যকথা লিপিবদ্ধ দেখিতেছি। সংস্কৃত প্রাকৃত প্রাচীন গ্রন্থের কথা ছাড়িয়া দিন। আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এবং তাঁহার মতানুবর্তী মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করুন, দেশ ভ্রমণ বা তীর্থ ভ্রমণের অনেক কথা দেখিবেন। তাঁহারা কোথায় কি করিয়াছেন, কোথায় কি পাইয়াছেন, কি ভাবে দেখিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই পাইবেন। আমাদের আলোচ্য 'তীর্থমঙ্গল' ও সেইরূপ উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে। কবি বিজয়রাম বিশারদ সৌভাগ্য ক্রমে মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের (জমিদার) শুভদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন।"

তীর্থমঙ্গল এবং পালামৌ-এর কাল সীমার ব্যবধান শতাব্দীরও অধিক। একটির ভাষা সরল পয়ার পদ্য, অপরটির ভাষা সরস গদ্য। সাধারণভাবে উভয় গ্রন্থের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রাবল্য বিজয়রামের কাব্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আর প্রধান পার্থক্য পালামৌ মূলত ভ্রমণের সুখস্মৃতি, সাহিত্য হিসাবে রম্য রচনা বা উপন্যাসধর্মী প্রবন্ধরূপেও পালামৌ চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু তীর্থমঙ্গল ভ্রমণের কড়চা। তীর্থমঙ্গল কাব্যে আমরা জানতে পেরেছি জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল রাহা খরচ দিয়ে স্বগ্রামের এবং পথের বহুলোককে সহযাত্রী করে নিয়েছিলেন। তার দুটি কারণ বিজয়রাম ব্যক্ত করেছেন—১। নিজের সঙ্গে অপরের পুণ্য সঞ্চয়ে সাহায্য করা, ২। সঙ্গীদের কাছ থেকে ঐ সব স্থানের ভিতরকার অবস্থা সংগ্রহ করা। সম্পাদক বলেছেন—"

"এই প্রসঙ্গে আমরা গঙ্গাতীরবর্তী বাঙ্গালা বেহার ও কাশী প্রদেশের সমৃদ্ধিশালী জনপদ সমূহের সন্ধান পাইতেছি।·· গ্রন্থখানি আদ্যপ্রান্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাই কেবল তীর্থের কথা নহে ইহাতে সে সময়কার বাঙ্গালীর সমাজচিত্র দেশের অবস্থা, লোকের মনের অবস্থা এবং ইংরাজাধিকারের সর্বপ্রথম অবস্থার চিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এই তীর্থমঙ্গল কেবল তীর্থ যাত্রীর পক্ষে নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের একটি উপাদেয় অধ্যায় বলিয়া সর্বজন সমাদৃত হইবে।"

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু যতই বলুন আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ভ্রমণ সাহিত্য ছিল তা স্বীকার করা কঠিন। তবে প্রসঙ্গত কাহিনীর গতিতে চরিত্রের ভ্রমণ-প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। সেজন্যে সেই সব মঙ্গলকাব্য, চরিতকাব্য অথবা অন্য কোন আখ্যান কাব্যকে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বাস্তব চিহ্ন বিদ্যমান। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের নাম ও পারম্পর্যহীন ও কাল্পনিক বা ব্যক্তি অভিজ্ঞতা রহিত। ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাবের কথাও প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যায়।

মধ্যযুগের বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে প্রবেশ করলে আমরা প্রায়ই অল্পবিস্তর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাই, যদিও চৈতন্য পূর্ব যুগের মঙ্গল সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারতে বা ভাগবতের অনুবাদে অথবা পুরাণানুবাদে কশ্চিৎ কখন কোন বাস্তব স্থানের নাম

পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস পিপিলাই প্রভৃতির বর্ণনায় কোথাও বাংলাদেশের কোন স্থানের নাম পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসেও তাঁর আত্ম পরিচয় বর্ণনাকালে (যদি তা অকৃত্রিম বলে মেনে নেওয়া হয়) কয়েকটি স্থানের নাম করেছেন। বলাই বাহুল্য এদের কোনটিতেই ভ্রমণ সাহিত্যের লেশমাত্র রস নেই।

দেববাদী যুগের অবসানে দেবকল্প মানব শ্রীচৈতন্য জীবনী সাহিত্যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত যেমন পাওয়া যায়, তেমন পরবর্তীকালের অন্যান্য কাব্য শাখাতেও ভ্রমণ সাহিত্যের আভাষ ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠেছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে মহাপ্রভু যখন যে ভক্তমণ্ডলীর কাছে যে যে তীর্থ ভ্রমণ বর্ণনা করেছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তারই তথ্য থেকে ঐ সব স্থানের নাম করেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে কবিরাজ গোস্বামীর তীর্থ বর্ণনা যতই মনোহর হোক না কেন তা মধ্যযুগের আর সব কাব্যে প্রচলিত ও পরিচিত স্থানের নাম মাত্র। বিবরণগুলি মোটামুটি তথ্যনিষ্ঠ। ভ্রমণ সাহিত্য হিসাবে এই সব অংশের বিশেষ কোন মূল্য দেওয়া যায় না। তবে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত তা বেশ বোঝা যায়।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (রচনাকাল আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দী) বাংলাদেশের যে যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায়, তা ভ্রমণকাহিনী মূলক না হলেও তারা কবির বঙ্গদেশ সম্পর্কে সঠিক ভৌগোলিক ধারণার প্রকাশক নিশ্চিতভাবে বলা যায়। অথচ জয়ানন্দের উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎস কি সে সম্পর্কে সঠিক কোন নির্দেশ না পাওয়া গেলেও বর্ণনার মধ্যে কবির ব্যক্তি অভিজ্ঞতার চিহ্ন বর্তমান। গোবিন্দদাসের চৈতন্য কড়চার মৌলিকতা নিয়ে যদিও যথেষ্ট মতভেদ দেখা দিয়েছে, তবু এর মধ্যে ভ্রমণ কাহিনীমূলক বর্ণনা যথেষ্ট পরিমানে আছে। চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বর্ণনায় যেন লেখকের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। মহাপ্রভুর সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মিলন দৃশ্যটি আমাদের পালামৌ এর সম্পন্ন গৃহস্বামীর সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার দৃশ্যটি মনে করিয়ে দেয়। ত্রিবাঙ্কুরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। এই অঞ্চলের বহুস্থানের নাম এই কাব্যে পাওয়া যায়, যেমন যোগা, চোরানন্দী, পুণা, পাটন, প্রভৃতি।

পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত কাব্যগুলিতেও পরিচিত অপরিচিত বহুস্থানের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে কোন কোন স্থানে লেখকের নিজস্ব ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও স্পষ্ট।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং কবি দ্বিজমাধব বা মাধবচার্য তাঁদের কাব্যে আকবর বাদসাহের সমকালের বঙ্গদেশের বহু স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন।

আমরা জানি ব্যক্তি-জীবনে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মধ্যযুগের কবি কুলের মধ্যে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সবচেয়ে বেশী ছিল। তারই আভাষ পাই অন্নদামঙ্গলকাব্যে।

কবি রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিভিন্ন অঞ্চলের নাম কম হলেও যে সব স্থানের বর্ণনা আছে তার পুংখানুপুংখতা ভ্রমণরসিকের দৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

দেশের ও পথের বৃত্তান্ত উনিশ শতকের আগে রচিত যে সব কাব্য পাওয়া যায় তাদের মধ্যে গঙ্গারামদাসের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ ও ভাস্কর পরাভব' কাব্যখানিতে আলিবর্দিখাঁর সময়ের স্থান কালের কিছু পরিচয় আছে এবং সে পরিচয়ের মধ্যে কবিত্ব বস্তুনিষ্ঠ ভ্রমণকারীর ডাইরীর সমগোত্রীয়। উনবিংশ শতাব্দীরত যে কয়খানি ভ্রমণকাহিনী পালামৌ রচনার আগে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হয়েছিল সংখ্যায় তারা খুবই কম। বাঙ্গালীর রচিত কাহিনীর মধ্যে কবি শ্রীমধুসূদনের ইংরাজী ভ্রমণ কাহিনীটি (১৮৬২) Indian Field পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। য়ুরোপযাত্রা-পথের বিবরণ সম্বলিত এই ভ্রমণ কথাটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।[৩] আমরা Travels of a Hindu নামে ভোলানাথচন্দ্র লিখিত একখানি ইংরাজী ভ্রমণ কাহিনী পেয়েছি। বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম ভ্রমণ কাহিনী সম্ভবত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচিত 'দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৮)। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের একটি মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সঞ্জীবের পালামৌয়ের আদর্শের একটি ধারণা করা যেতে পারে যে সঞ্জীব সম্ভবতঃ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের "দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ" নামে গ্রন্থখানির ভাষা অর্থাৎ রচনা রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিচের উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারবো সূক্ষ্মব্যঙ্গাত্মক বাচনভঙ্গী যা সঞ্জীবের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক, তারই পূর্বাভাস রয়ে গেছে দুরাকাঙ্ক্ষার বৃথা ভ্রমণে।—

> "আমাদের জাহাজে সপ্তদশবর্ষ বয়স্কা ফরাশি যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া—তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপা। তাহার অলকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোল দেশে পতিত হইত যে দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়ন যুগল উজ্জল, বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোলতল এরূপ স্বচ্ছ যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুবাজনসুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্ভয় ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি অতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তথাপি তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথনে স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা এদেশের মত, যুবতী পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না।"[৪]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় সঞ্জীবচন্দ্রের আত্মকথন ভঙ্গী, প্রসঙ্গত দৃশ্য বস্তুর চিত্র অঙ্কন, নরনারীর চিত্রও চরিত্রের ছোট ছোট স্কেচ আঁকা, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক তীর্যক ভাষা ব্যবহার, সব কয়টি গুণই যেন উপরের উদ্ধৃতিতে দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য

সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের সবচেয়ে বড় পার্থক্য—কৃষ্ণকমল যেখানে গল্প বানিয়ে তুলেছেন ভ্রমণের ছলে, সঞ্জীব সেখানে ভ্রমণের সুখস্মৃতিমন্থন করে অমৃতের পাত্রখানি আমাদের উপহার দিয়েছেন। তবে একথা মনে করলে অন্যায় হবে না সঞ্জীব কৃষ্ণকমলের অবাস্তব ভ্রমণকথার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

পালামৌ রচনার আগে আমরা যে সমস্ত ভ্রমণকথা পেয়েছি তার মধ্যে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী' কাব্যটি অন্যতম। কাব্যটির রচনাকাল প্রথম সর্গ হতে অষ্টম সর্গ পর্যন্ত ১৮৭১ সালে এবং নবম সর্গ ১৮৭৬ সালে। অর্থাৎ পালামৌ রচনার প্রায় দশ বৎসর আগে। মূল আখ্যায়িকা পৌরাণিক লৌকিক ও কল্পিত কাহিনীর সংমিশ্রনে গঠিত। তবে কাব্যটিতে কবির ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় তথা ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে গঙ্গার প্রবাহ ধরে। এককথায় ভ্রমণ কাহিনী কাব্যের রূপকে রচিত। তবু গ্রন্থটির কাব্য মূল্য যৎসামান্য। মাঝে মাঝে কবির ভৌগোলিক জ্ঞানের বেশ অভাব লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ ব্যক্তি অভিজ্ঞতার অভাব। আবার অন্যান্য স্থলে কবির ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

হরিদ্বার থেকে কানপুর পর্যন্ত কাটা খাল এবং তা সম্পর্কে সংস্কার ইত্যাদি কোন কিছুই কবি কাব্যখানিতে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন নি। কাব্য হলেও দীনবন্ধুর বস্তুনিষ্ঠা এই গ্রন্থটিতে ভালভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তবু কবির স্মৃতিচারণ মাঝে মাঝে কাব্য কথা হয়ে উঠেছে—পালামৌয়ের সঙ্গে এইটুকুই যা মিল দেখতে পাওয়া যায়। তীর্থমঙ্গলের পর সুরধনী কাব্য সম্ভবত শেষ ভ্রমণ কাব্য।

উনিশ শতকে পালামৌ ছাড়া আর যে সব ভ্রমণ কথা পাওয়া গেল সেগুলির রচনাকাল পালামৌয়ের পরে। তাদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (১৮৯৮) (পূজ্যপাদ শ্রীমান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন চরিত)-এর ঘটনাকাল উনিশ শতকের পাঁচ ছয় দশকের হলেও রচনাকাল পালামৌ রচনার পরে। মহর্ষির ভ্রমণকথা এই জীবনচরিতে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভ্রমণ সাহিত্যে পালামৌয়ের সঙ্গে বোধ করি দেবেন্দ্রনাথের রচনারই একমাত্র তুলনা চলে। বস্তু বর্ণনার সঙ্গে হৃদয় রসের এমন সংযোগ বোধ হয় একমাত্র পালামৌতেই দেখতে পেয়েছি। এই শতকের অন্যান্য ভ্রমণ কথার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বোম্বাই চিত্র' (১২৯৫ সন) এবং কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) সুখ পাঠ্য রচনা। নানাস্থানের টুকরো টুকরো বর্ণনা আছে এবং তা সরসও বটে, কিন্তু তাকে পালামৌয়ের সমগোত্রীয় বা সমকক্ষ করে দেখা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণ কাহিনী চরম সার্থকতা লাভ করলো রবীন্দ্রনাথের হাতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সঞ্জীবের পালামৌ ভ্রমণসাহিত্য হিসাবে একমাত্র সার্থক রচনা বললে ভুল হবে না।

পালামৌ রচনার উৎস কি? বাংলা সাহিত্যে যে ধরণের সাহিত্য ছিল না, সেই বিশেষ রীতি বৈশিষ্ট্যযুক্ত সাহিত্যের পথিকৃৎ পালামৌর সৃষ্টির পশ্চাতে কি

কোন গূঢ় প্রেরণা ছিল? লেখক স্বয়ং বলেছেন বুড়ো বয়সের কথা বলার অভ্যাসে পালামৌ স্মৃতিচারণা করেছেন। পরে প্রসঙ্গত দেখবো পালামৌ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ভ্রমণ কথা মাত্র নয়, একে আধুনিককালের সাহিত্যিক নিবন্ধ রচনার অন্যতম পূর্বসূরী বলেও গ্রহণ করা যায়। যদিও তৎপূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত লোকরহস্য ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তবু পালামৌ ভিন্ন স্বাদের অন্য জাতের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীব-এর জীবনী প্রসঙ্গে যে মন্তব্যটি করেছিলেন এখানে তা স্মরণযোগ্য।—

"দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসভূমি, বন্যপ্রদেশ মাত্র। সুহৃদপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন, বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামৌ পৌঁছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়-এ চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে, এবং সেকালেও এরূপ কাজ করিয়া চাকরী থাকে না। কিন্তু তাঁহার চাকরী রহিয়া গেল, আবার বিদায় পাইলেন। আর পালামৌয়ে গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নবাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। পালামৌ শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

বলাবাহুল্য দ্বিতীয়বার পালামৌ গমনের দুঃখকর স্মৃতি তিনি পালামৌ রচনায় উল্লেখ মাত্র করেন নি। পালামৌ রচনাটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্য জীবনের মধ্যাহ্নকাল। গল্প উপন্যাসে যে সমস্ত দোষ সম্পর্কে তিনি সমালোচিত হচ্ছিলেন পালামৌ রচনায় তিনি যেন আপন স্বভাবের মুক্তির পথটি খুঁজে পেয়েছিলেন। ঢিলে ঢালা মজলিসি স্বভাবের বিরাট দেহের বিরাট হৃদয়ের মানুষটি গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে বন্ধনের মধ্যে যেখানে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, তারই গাল গল্পের মেজাজটি যে সাহিত্যের রসরূপ লাভ করছে পালামৌয়ে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। সুরুচি সম্পন্ন বন্ধুমণ্ডলী ও স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে যে এই নতুন ধরণের রচনাটি সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিলেন তা অনুমান করতে আমাদের অসুবিধা হয় না। ফলে সঞ্জীবচন্দ্র আপন স্বভাবের গভীরতম রসবোধ উজাড় করে দিতে পেরেছিলেন পালামৌয়ে।

সঞ্জীবচন্দ্র পালামৌয়ে গিয়েছিলেন (১৮৬৬ খৃঃ) যৌবনে। তখন তাঁর বয়স তেত্রিশের কাছে। পালামৌ রচনা করেছেন (১৮৮২) তাঁর ৪৬ বছর বয়সে। শেষ চাকুরী থেকে বিদায় নিয়ে এসেছেন। ১৫ই এপ্রিল ১৮৮১ সালের ডাইরীতে লিখছেন—

"From this day I am no longer in service. My leave expired

yesterday and sent in my resignation on that day."

অর্থাৎ কর্ম বন্ধন ভীরু সঞ্জীবচন্দ্র পালামৌ রচনা কালে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। চাকরী থেকে মুক্তিলাভ করার পর চাকরী জীবনের স্মৃতি তখন অম্লমধুর। নির্বাসনের তিক্ততা মনের মধ্যে স্মৃতির মাধুর্য সঞ্চয় করছে। তাই পালামৌর প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন—

"বহুকাল হইল আমি একবার পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম। প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই একজন বন্ধু-বান্ধব আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য্য বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।"

এখানে লেখক স্বয়ং তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রথম ভালো চোখে দেখেন নি। না দেখাই স্বাভাবিক কারণ তিক্ত অভিজ্ঞতা কালের হস্তাবলেপে যখন স্মৃতিতে পরিণত হয়, তাই হয়ে ওঠে মধুর—তখন 'সেই আমি' আর 'এই আমি' ভিন্ন সত্তা। একটি সত্তা অন্য সত্তাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম হয়। আর দৃষ্টির নিরপেক্ষতা না এলে কোন রচনাই সাহিত্য হয়ে ওঠে না। আর এই নিরপেক্ষ দৃষ্টি হয়েছে বলেই সঞ্জীবচন্দ্র মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে নিজেকে বৃদ্ধ বলে কল্পনা করতে পেরেছেন। যদিও তখন তাঁর একমাত্র পুত্র জ্যোতিষচন্দ্রের বিবাহ (১২৮১ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ) হয়ে গিয়েছে।

উপন্যাসে যেমন লেখক কোন চরিত্রের মধ্যে নিজের অভিন্নত্ব (Identity) খুজে পেলে তাকে অত্যন্ত আন্তরিক করে গড়ে তুলতে পারেন, তেমনি স্মৃতি কথায় আত্ম-অভিন্নত্ব অপেক্ষা আত্ম নিরপেক্ষতা রচনাকে সর্বজনীন করে তোলে। সঞ্জীবচন্দ্র তাই অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে বৃদ্ধ ও যুবার দৃষ্টির পার্থক্য ঐ প্রারম্ভেই দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তবে একটা কথা আমাদের স্মরণরাখা প্রয়োজন, তিনি নিজের সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা যে তাঁর বিনয় সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহের অবকাশ থাকবে না, পরবর্ত্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব। তিনি বলেছেন—

"যাহারা বয়োগুণে কেবল শোভা সৌন্দর্য প্রভৃতি ভালোবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হবে না।"—

এ উক্তি মোটেই সত্য বলে গ্রহণ করতে পারা যায় না।

সেকালের রীতি অনুযায়ী সঞ্জীবচন্দ্র ইনল্যাণ্ড ট্রাঞ্জিট কোম্পানীর ডাকগাড়ীতে করে রানীগঞ্জে থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সম্ভবত তিনি রানীগঞ্জ বা আসানসোল পর্যন্ত ট্রেনে গিয়েছিলেন। বাংলা বিহারের সীমারেখা বরাকর নদীর উপর দিয়ে গাড়ী (ঘোড়ায় টানা) ঠেলে পার হতে হয়। রবীন্দ্রনাথও ছোটনাগপুর রচনায় একই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বর্ষা ছাড়া বছরের অন্যসময় বরাকর ক্ষীণতোয়া।

লেখকের পালামৌ রচনায় যদি আমরা স্থানকালের খুঁটিনাটি বিবরণ চাই তবে অবশ্যই আমাদের হতাশ হতে হবে—তাই এখানে একটি প্রশ্নের জবাব অজানা থেকে যায়, এটি বছরের কোন সময় ? সময়টি যে বর্ষা বা শীত নয়, তা আনুষঙ্গিক বর্ণনা থেকে অনুমান করা সম্ভব। (জীবনকথা প্রসঙ্গে কালের একটি পরিচয় দিয়েছি।) পালামৌয়ে সঞ্জীবচন্দ্র প্রকৃতির চেয়ে মানুষকে দেখেছেন বেশী সহানুভূতির সঙ্গে। তাই তাঁর স্মৃতিকে অধিকার করে আছে সেখানকার বন্য মানুষের দল। লেখকের শিশুসুলভ কৌতূহলী দৃষ্টি সহজেই দেখতে পায় কিভাবে নদীর ঘাটের জমাদার সাহেব বাঙ্গালায় বসে পাইপ টানছে আর তার চাপরাসী পারার্থীদের বাহুতে গৈরিক মাটি দিয়ে অঙ্কপাত করছে। দ্রষ্টার নিরপেক্ষতা স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ তুচ্ছ করলেও তা যে লেখকের হৃদয়রসে সাহিত্য হয়ে ওঠে তার প্রমাণ পালামৌর এই সব অংশ।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় বিশেষ করে প্রকৃতি অথবা ভূগোলের খুঁটিনাটি বেশী ভিড় না করে জীবন এসে দাঁড়িয়েছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে অথচ তাঁর প্রকৃতিপ্রেমী কবির দৃষ্টির অপ্রতুলতাও কিছু মাত্র দেখা যায় না। উপন্যাসিকের জীবনপ্রীতি এবং কবি ও চিত্রশিল্পীর প্রকৃতি প্রীতির এক হরিহর সম্মিলন ঘটেছে পালামৌর ছত্রে ছত্রে। ফলে পালামৌ উপন্যাসের স্বাদ গন্ধ সমস্ত বহন করেও একখানি কাব্য অথবা একখানি বহুবর্ণের চিত্র। জীবনকে সঞ্জীব কি ভাবে ঔপন্যাসিকের চোখে দেখেছেন তার একটা উদাহরণ দিলেই পালামৌর স্বাদগ্রহণ আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে,—লেখকের গাড়ী যখন বরাকর পার হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সেই সময় কুলিদের ছেলে মেয়ের দল তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল,

"সাহেব একটি পয়সা, সাহেব একটি পয়সা।"

সঞ্জীবের আশ্চর্য রসবোধ, কেন ছেলেমেয়ের দল তাঁকে ধুতি চাদর পরিহিত বাঙ্গালী দেখেও সাহেব বলছে তার কারণ জিজ্ঞাসা করায়—

"একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, হাঁ তুমি সাহেব। আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি কি ? আমি বলিলাম আমি বাঙ্গালী। সে বিশ্বাস করিল না। বলিল না তুমি সাহেব, তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ী চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।"

শুধু চিত্র নয়, এখানে চরিত্রও যেন আভাসিত হয়েছে। ঠিক এর পরের অংশটি সেই বিখ্যাত অংশ যা সমালোচক মাত্রেরই আলোচ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও চন্দ্রনাথ বসু ভিন্নমত পোষণ করলেও এই অংশটিও চিত্র সৌন্দর্য কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি। ডঃ সুকুমার সেনের মতে বাঙ্গালা সাহিত্যে শিশুচিত্রের অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে এই অংশে,—

"এই সময় দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখে তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না। সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম।

শিশু তাহা ফেলিয়া আবার হাত পাতিল। অন্ত বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ী অপর পারে গিয়া উঠিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অদ্বিতীয় শিশুপ্রেমী সাহিত্যিক পালামৌর স্মৃতিচারণ কালের শিশু ভোলানাথের এই চিত্রখানি আপন স্মরণ পটে অমর করে রেখেছেন। আসলকথা অপরে যা দেখে না তাকে দেখানোর প্রবণতা অথবা যা আছে বা অপরে অবহেলা ভরে দেখে তাকে দেখানোর প্রবণতা সঞ্জীবের মধ্যে বেশী কার্যকরী তা নয়, সঞ্জীবের যেখানে ভাললাগা, যেখানে প্রেম সেখানেই তিনি শিল্পী। সেখানেই তিনি মুখর। বহুকালের ব্যবধানে তিনি পালামৌর কথা কত কি ভুলেছেন, কিন্তু তিনি ভোলেন নি এই সব ছোট খাটো হৃদয় স্পর্শ করা ছবিগুলিকে। বোধ হয় তাঁর প্রবণতার অবচেতনায় স্থান কালের মহৎ বিবরণ বিপুলতা কোন স্থান লাভ করে না, সেখানে এই সব তুচ্ছতার ভিড়। অথচ লক্ষ্য করা যায় ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁর চলার কথাটি ভুলে যাননি। যদিও পালামৌয়ে এই ধরণের খণ্ডচিত্রের সমাবেশ, পদে পদে প্রসঙ্গচ্যুতি আছে, তবু তিনি যে ভ্রমণকারী এবং তাঁর দৃষ্টি যে চলমান তা তিনি একবারও আমাদের ভুলতে দেন নি। তিনি পথ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়েন, দেখেন প্রাণ ভরে—পাঠককেও দাঁড করিয়ে রাখেন।

পালামৌয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের কথায় মধুর রঙ্গ ব্যঙ্গের সহজ স্বাভাবিক প্রবণতা একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মাঝে মাঝে আমাদের সন্দেহ জাগে তিনি সম্ভবত কাউকেই ব্যঙ্গ করেন নি, বরং নিছক সহাস্য রঙ্গ প্রবণতা তাঁর রচনাকে একটি আশ্চর্য প্রাণশক্তি দান করেছে। ব্যক্তিগত আক্রমণ তাঁর লেখার মধ্যে আমরা কোথাও পাইনি, তবে সাধারণ ভাবে স্বজাতির ত্রুটীবিচ্যুতি অসঙ্গতি তিনি হাস্যমধুর করে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে ভ্রমণকথায় এই ধরণের পরিহাস প্রবণতার কোন বিশেষ স্থান আছে কি? আমাদের মনে হয়েছে—আছে—কারণ বিদেশগামী ভ্রমণকারী দেশের বাইরে পা বাড়িয়ে স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের পার্থক্যগুলি প্রথমেই দেখতে পান। ভ্রমণকথা মাত্রেই এই পার্থক্য নির্দেশ একটি সাধারণ লক্ষণ। তবে রচনাভঙ্গী কার কেমন হবে সেটা নির্ভর করে লেখকের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপর। শুধু বঙ্কিম-যুগেরই নয়, সর্বকালের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ তাঁর নিজস্বতা থেকে বঞ্চিত নয়।

সঞ্জীবচন্দ্র ধানবাদে পৌঁছিয়ে প্রথম পাহাড় দেখে কবিত্বময় ভাবরসে আপ্লুত না হয়ে, বাঙ্গালীর প্রথম পাহাড দেখার অভিজ্ঞতাটি একটি হাস্যোজ্জল তুলনায় তুলে ধরেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গ চ্যুতি তাঁর ঔপন্যাসিক চরিত্রের অন্যতম গুণ। ফলে উপন্যাসের ক্ষেত্রে যা দোষের হয়েছে পালামৌর ক্ষেত্রে তা গুণের। পথ চলতে পালামৌ ভ্রমণে সঞ্জীবচন্দ্র যেন সেই সঙ্গী যিনি তাঁর সহাস্য আসঙ্গে আমাদের পথের

সামান্যতম ক্লান্তিও অনুভব করতে দেন না। তিনি নিজে দেখেন ও দেখান। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে পথের পাথর আর গাছের আড়ালকে কখন দ্রষ্টব্য করে আমাদের চলার ছন্দে এগিয়ে নিয়ে চলেন তা আমরা বুঝতেই পারি না। অথচ তাঁর দেখা ও দেখানোর কৌতূহলের মধ্যে বালকের দৃষ্টির চাপল্যও বর্তমান। গুরুগম্ভীর কথাতে তিনি কখনও পাঠকের সঙ্গে আপন দূরত্বকে অনেক দূরে রাখতে পারেন না। একটি ভারি কথা, দার্শনিক মন্তব্য করেই পরক্ষণেই গাম্ভীর্য দূরে করে রঙ্গরসে মেতে ওঠেন। পাহাড়ের দূরত্ব দেখে তাঁর কি ভ্রম উপস্থিত হয়েছিল তাও তিনি বলতে ভুলে যান নি।

ধানবাদ থেকে যাত্রা করে পরদিন তিনি হাজারীবাগে পৌঁছিয়ে যাঁর অতিথি হলেন তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বাঙ্গালী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা বাংলা ভাষায় প্রবাদের মত প্রচলিত। এই ধরণের তির্যক মন্তব্যগুলির মাধ্যমে সঞ্জীবের গভীর আত্মচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য' প্রভৃতি রচনায় যে গভীর জীবনবোধ প্রকাশ পেয়েছে পালামৌয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সেই ধরণের জীবনবোধ প্রকাশ না পেলেও আত্মঅভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম রশ্মিপাত রচনাকে আশ্চর্য আন্তরিক করে তুলেছে। অথচ লক্ষ্য করার মত ভ্রমণকাহিনীর বৈশিষ্ট্যও এখানে ক্ষুণ্ণ হয়নি। পথক্লান্ত ক্ষুধাকাতর সঞ্জীবচন্দ্র যে ব্যক্তির অতিথি হয়েছিলেন তখন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারেন নি তাই যেন কিছু লজ্জিত। তাই বিদেশে বাঙ্গালীর 'সজ্জন' সুনাম তাঁকে দেশের মানুষের প্রতিবেশী বৈরিতা প্রথমে আকৃষ্ট করেনি। কারণ তাঁর মতে,—

"বঙ্গবাসীমাত্রেই সজ্জন, বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর। যাহাদের প্রতিবাসী নাই তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদের নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী পরিত্যাগী গৃহী।"

আত্ম অভিজ্ঞতার যে তিক্ততাবোধই থাকুক এখানে প্রকৃত পক্ষে সঞ্জীবের মধ্যে সমস্ত দুঃখজয়ী এমন একটি প্রসন্নতা ছিল যাতে তিনি আঘাত করতে গিয়ে সহাস্য কৌতুকে আঘাতের তীব্রতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন। তাই আলোচ্য উদ্ধৃতিতে যেটুকু ব্যঙ্গের ধার দেখলাম পরের অংশেই তার মধ্যে আত্মানুভূতির কারুণ্য মিশ্রিত হয়ে তাকে বৃষ্টিধোয়া শরৎ আকাশের মত উজ্জ্বল করে তুললো—

"ঋষির আশ্রমের পার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে। তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিনী আসিয়া ঋষি পত্নীকে অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতীর পরীক্ষা দিতে হইবে। নতুবা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।"

এখানে সঞ্জীবের ব্যক্তি জীবনের তিনটি অভিজ্ঞতার আভাস রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধার' ভূমিকায় বলেছেন—

ক। "কাঁটালপাড়ায় পুষ্প প্রিয় সৌন্দর্য প্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোত্থান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন যে পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোত্থান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিত প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল।"

খ। "তখন নূতন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়া ছিল, তাহার Law Class তখন নূতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবৃষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া, কেরানীগিরিটি পরিত্যাগ করাইয়া'ল' ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম।"

গ। "লেফটেনান্ট গবর্ণর সাহেব সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী পদ উপহার দিলেন। পত্র পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বলিলেন—ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়, আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না, সুতরাং এ চাকরী আমার থাকিবে না।"

বঙ্কিমের এই বিবরণ থেকে জানতে পারলাম সঞ্জীবচন্দ্র পুষ্পপ্রিয় সৌন্দর্যপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ওকালতি পড়তে ও ম্যাজিষ্ট্রেটী করতে হয়েছিল। অথচ এখানে লক্ষ্য করার বিষয় ব্যক্তি অভিজ্ঞতার তিক্ততা পালামৌ ভ্রমণকারীর লেখনীতে কিভাবে হাস্য সজল হয়ে উঠছে। সঞ্জীবচন্দ্র নিজেও বুঝতে পেরেছেন রচনাটিতে ব্যক্তিগত আসক্তির ছাপ বেশী পড়ে যাচ্ছে। তখন তার জন্যে কোন ক্ষমা প্রার্থনা না করে আবার সাহাস্যমুখেই প্রসঙ্গে ফিরে আসেন। বলেন—

"এক্ষণে সে সকল কথা যাক।"

রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের এই সব প্রসঙ্গচ্যুতিকে তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটী বলে উল্লেখ করেছেন। উপন্যাস ও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রসঙ্গচ্যুতি দোষাবহ, কিন্তু স্মৃতিচিত্রের ক্ষেত্রে এইগুলিই প্রধান আকর্ষণ। কারণ পালামৌ ভ্রমণ শুধুমাত্র ভ্রমণকাহিনীই নয়, প্রকৃতপক্ষে এই রচনাটি ভ্রমণের স্মৃতিচিত্র। স্মৃতি কথায় স্মৃতিচারণকারীর অস্তিত্বই প্রধান—তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা মনন প্রকাশই স্মৃতির অবলম্বন, এক্ষেত্রে অবশ্য ভ্রমণ-কথা স্মৃতি-কথার মুখ্য প্রেক্ষাপট। তাই প্রসঙ্গচ্যুতি স্মৃতিচারী মানুষের আত্মমগ্ন মানুষটির আত্মচারণের অঙ্গ। তবু সঞ্জীবচন্দ্র যে পায়ে পায়ে আমাদের নানা প্রসঙ্গের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তা আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না।

যে গৃহস্বামীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাননি তাঁর প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন। তাঁর সৌন্দর্যে মনে হয়েছে প্রৌঢ়ের সৌন্দর্যই প্রকৃত সৌন্দর্য। দৃষ্টিভঙ্গীর বৈর্তিকতা এখানে লক্ষনীয়—

"একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাহার ভূয়সী প্রশংসা করি।"

তাঁর বাড়ীর রান্নায় পিঁয়াজে আধিক্য দেখে 'পিঁয়াজ' আর 'পালাণ্ডু'র অর্থ পার্থক্যের প্রসঙ্গে লেখকের পাঞ্জাবী কোন রাজার গল্প মনে পড়েছে। এই সব সরস প্রসঙ্গ-চ্যুতিতে আমাদের মন পালামৌর স্বাদ গ্রহণে বরং প্রসঙ্গচ্যুতির খেয়ালী রসে এর একটি বিশিষ্টতার সন্ধান পায়। রস গ্রহণে করতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না।

সঞ্জীবের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও মানসিক ঔদার্য লক্ষ্য করার মত। যে বিত্তবান ভদ্রলোকটির বাড়ীতে তিনি অতিথি হয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে তাঁর, ঐই ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে।

সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম প্রবন্ধ শেষ করেছেন হাজারীবাগ থেকে ছোটনাগপুর হয়ে চার-দিনের মধ্যে পালামৌ পৌঁছবার খবরটি দিয়ে। তিনি পথের পরিচয় থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছেন, তার কারণ হিসেবে বার্ধক্যের দোহাই দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বুধের ছদ্মবেশে হলেও তার মধ্যে একান্তই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকেই আমরা দেখতে পাই। আর ঐ বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আছে বলেই সহস্র সন্দেহের কাঁটা থাকলেও আমাদের পালামৌ রচনাটি সঞ্জীবচন্দ্রের বলে চিনে নিতে ভুল হয় না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের সূচনায় তিনি নিজের ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় দিয়ে পালামৌর একটি সাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। পালামৌয়ে অসংখ্য পাহাড় দেখার বর্ণনাটি ও অভিজ্ঞতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গীর কথা মনে করিয়ে দেয়।—

"পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়, যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল।"

এখানকার উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার প্রয়োগটি একটি অপূর্ব কাব্যিক মোহ সৃষ্টি করেছে। অথচ 'অবনীর অন্তরগ্নি একদিন সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল' কথাটির মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যও নিহিত। একদিকে সঞ্জীবচন্দ্রের কবি দৃষ্টির সঙ্গে যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি যুক্ত হয়েছে তেমনি ভ্রমণকারীর ভৌগোলিক দৃষ্টির অভাবও ছিল না। তিনি ঐ দৃষ্টির বৈশিষ্টের সাহায্যে লক্ষ্য করেছিলেন সকল তরঙ্গ গুলি (পাহাড়ের) পূর্বদিক হইতে উঠিয়াছিল'। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় এর পরেই রয়েছে, তিনি যখন তাঁর কুকুরকে চীৎকার করে ডাকলেন, পাহাড়ের গায়ে শব্দ প্রতিহত হয়ে যে তরঙ্গ তুলেছিল, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন,—

শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়। সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেই সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে কিন্তু শব্দ দীর্ঘ কাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্যন্ত সেই স্তরটি আছে, ততদূর পর্যন্ত কেন যায় তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ কনডকটার (Conductor) যে পর্যন্ত ননকনডাকটারের সঙ্গে সংস্পর্শ না হয় সে পর্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।"

রবীন্দ্রনাথ পালামৌ সমালোচনায় বলেছেন—

"ইহা বিজ্ঞান এবং সম্ভবতঃ ভ্রান্ত বিজ্ঞান।"[৫]

কারণ রবীন্দ্রনাথ-এর সমালোচনাকালে আচার্য জগদীশচন্দ্রের শব্দ বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ফলে সঞ্জীবের ঐ মতবাদ তখন ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত। সে যাই হোক রবীন্দ্রনাথের একটি মত এখানে বিচার সাপেক্ষ, তিনি বলেছেন—

"ইহা নূতন হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কোন রসের অবতরনা করে না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি সাহিত্য কনডকটার আছে সে স্তরে ইহা প্রতিধ্বনিত হয় না।"[৬]

আমাদের প্রশ্ন সাহিত্য কি কেবলমাত্র আকর্ষণীয় ঘটনা ও বর্ণনায়? —এখানে তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার বিশেষ তৃপ্তির অবসর আছে, তার মাধ্যমেই আমাদের রসবোধ যে কোন জিজ্ঞাসায় ও আলোচনায় তৃপ্ত হতে পারে—কারণ জাগতিক ও পরাজাগতিক সকল জিজ্ঞাসার সহিত্বই সাহিত্যের বিশেষ রসলোক সৃষ্টি করেছে। তাই নানাকথার মধ্যে সঞ্জীবের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা যদি ভ্রান্তও হয় তবে কেন তা আমাদের মনের 'সাহিত্য কনডাকটারে' প্রতিধ্বনিত হবে না রবীন্দ্রনাথ তার কোন ব্যাখ্যা দেন নি।

তবে রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে সঞ্জীবচন্দ্রের দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন—

"পালামৌতে সঞ্জীবচন্দ্র যে বিশেষ কোন কৌতূহলজনক নূতন কিছু দেখিয়াছেন অথবা পুংখানুপুংখরূপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু সর্বত্রই ভাল-বাসিবার ও ভালো লাগিবার একট ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। পালামৌ দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মতো প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু যে সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে জগতে সর্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের সুধাভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিসটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয়ের সেই অনুরাগ পূর্ণ মমত্ববৃত্তির কল্যাণ কিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ কোন রমনীই হউক, বন সমাকীর্ণ পর্বত ভূমিই হউক, জড় হউক, চেতন হউক, ছোট হউক, বড়ো হউক—সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দয এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টির আলোকে পালামৌয়ের গৌরব আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। কোথায় একটি একশিলার পাহাড়, তার উপরে একটি বটগাছ যাকে দেখে কখনো তাকে রসিক কখনো শোষক বলে মনে হয়েছে আবার অবস্থানুসারে ভাগ্যজয়ের প্রচেষ্টার মধ্যে গভীর জীবন দর্শনের আভাস সঞ্জীব পেয়েছেন, তার সর্বত্রই লেখকের মমত্ব বৃত্তির প্রকাশ রয়েছে। এরই মধ্যে ভ্রমণ কাহিনীর ধারাটি ক্ষীণতোয়া পাহাড়ী নদীটির মত বয়ে চলেছে। কবে পালামৌয়ের বিশাল শাল বনে চলতে চলতে গৃহ পালিত জন্তুর গলার কাঠের ঘন্টা শুনেছিলেন তার বর্ণনাটি আমাদের অতি আধুনিক কালের গভীর মননধর্মী রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়।—

"কাষ্ঠ ঘন্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দ আরও যেন অবসন্ন করে।"

এই ধরণের গভীর অনুভূতি প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে একমাত্র সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যেই দেখেছি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের এই অংশে ভ্রমণকথা জমে উঠেছে। শালবনের ভিতর পালকীতে চলতে চলতে তিনি গলায় কাঠের ঘন্টা বাধা মহিষ দেখে বুঝলেন কাছেই গ্রাম আছে। বন আর তত ঘন নয়, তৃণাবৃত ছোট প্রান্তর, মৌয়া গাছ এবং রমণীয় পর্বত ছায়ায় মহিষপৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণের কোলবালকদের দেখে মনে হল তারা যেন এক একটি কৃষ্ণঠাকুর। কালো পাথর, কালো মহিষ ও কালো রংয়ের কোল বালকদের তিনি তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধে তাদেরও সুন্দর দেখলেন। কোলদের স্বদেশে দেখে তাঁর সেই বিখ্যাত কথাটি মনে এলো—"বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'।

সঞ্জীবের মধ্যে যে উপন্যাসিক সত্ত্বা বর্ত্তমান তারই আলোকে তিনি কেবলমাত্র বন পাহাড় না দেখে মানুষ সম্পর্কে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাই পালামৌয়ে প্রকৃতি অপেক্ষা তার সন্তানগুলির প্রতি লেখকের বেশী আকর্ষণ। তাঁর পালকী যখন কোলদের গ্রামে প্রবেশ করলো, তাদের বর্ণনা তাঁর লেখনীতে আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভ্রমণকাহিনী হিসেবে এইখানকার বর্ণনাও সার্থক।

কোল যুবতীর বর্ণনা দেবার পর তাঁর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সংস্কারে একটি সংকোচ জেগেছে, তাই কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেছেন—

> "পূর্বে কয়েকবার কেবল যুবতীর কথাই বলিয়াছি। ইচ্ছাপূর্বক বলিয়াছি এমন নহে।"

এই অংশের পরেই সঞ্জীবচন্দ্র স্বভাব অনুসন্ধিৎসাবলে জগতে কি ভাবে কোথায় কবে জাতি লোপ হয় তার তথ্যগত বিবরণ দিয়েছেন। তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করেছেন। আলোচনা যে দীর্ঘ ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে তা তিনি ভালই বুঝতে পেরেছেন। তাই যেন অপরাধ স্খালনের জন্য স্মিতহাস্তে বলেছেন—"এক্ষণে সে সকল কথা যাউক। অনেকের নিকট ইহা শিবের গীত বোধ হইবে।" রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবেই এইসব অনাবশ্যক বক্তৃতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'

> "এই সকল কচকচি গুলিকে সযত্নে বর্জন করিবার উপযোগী সতর্ক উদ্যম তাঁহার স্বভাবেই ছিল না। যে কথা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে অনাবশ্যক হইলেও সে কথা সেখানেই রহিয়া গিয়াছে।"৮

কারণ পালামৌতে অন্যান্য প্রসঙ্গচ্যুতি তাঁর খেয়ালীমনের আত্মনিষ্ঠা প্রকাশ করে তাকে রসসম্মত করলেও প্রাবন্ধিকের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা অবশ্যই দোষবহ।

পালামৌয়ের তৃতীয় প্রবন্ধটি ১২৮৮ আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনের ১৩৫-৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম দুটি প্রবন্ধ যে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রবন্ধটির সূচনায় সঞ্জীবের অতি আন্তরিক ঘনিষ্ট ভঙ্গীটির সঙ্গে কমলাকান্তের একা প্রবন্ধের আপাত মিল দেখতে পাওয়া গেলেও উভয় প্রবন্ধের পার্থক্যও অনেক।

বঙ্কিমের 'একা'র গভীরতা অনেক বেশী হলেও সঞ্জীব আরও ঘনিষ্ট, আরও আমাদের কাছের মানুষ। সঞ্জীবের মধ্যে আমরা দুই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব দেখি না, তিনি মানুষটি বাইরে ভিতরে একই। অন্তত পালামৌর মধ্যে বৃদ্ধের ছদ্মবেশের অন্তরালে আমরা যে চির পরিচিত কবিকে দেখলাম, তার অকৃত্রিমতাই গ্রন্থটিকে কাব্য করে তুলেছে। তাঁর পালামৌর মধ্যে একটি কথাই বারবার গানের সমের মত ফিরে ফিরে এসেছে—

"এই তো ভালো লেগেছিল, আলোর নাচন পাতায় পাতায়।"

চিরায়ত সাহিত্যের সেইটাই তো সবচেয়ে বড় কথা—শিল্পীর চোখ শিল্প দৃষ্টিতে যা যেমনভাবে দেখে তাকে তেমন করে দেখানোই সবচেয়ে বড় কীর্তি, যার মধ্যে শিল্পীর আপন আত্মার চিরন্তনত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। তা খবরের কাগজের সম্পাদকীয় নয়, সকালের পর বিকেলে যা বাসি হয়ে যায়। শিল্পীর চিরকালের বিনয়,—

"যদিও আমার গল্পে কাহার পুঁজি বাড়িবে না, কেন না আমার নিজের পুঁজি নাই। তথাপি গল্প করি, তোমরা শুনিয়া আমায় চির বাধিত কর,"

তবু যা শিল্প তাতে আমাদের চিরকালের পুঁজি বাড়ছে আর আমরাই ধন্য হচ্ছি সেই কালজয়ী শিল্পীকে পেয়ে।

তৃতীয় প্রবন্ধটিকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর পালামৌ সমালোচনায় যে সমালোচনা করেছিলেন তার মধ্যেই এই অংশের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে আশা করা যায়। চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন,—

"সচরাচর লোকে যাহা দেখে নাই, সঞ্জীব তাহাই দেখিতে এবং সেই রূপেই দেখাইতে ভালবাসিতেন, এবং তাহা সেইরূপ দেখিবার শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। অপরাহ্নে লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে বসিবার জন্য সঞ্জীববাবু ব্যস্ত হইতেন। সে ব্যস্ততা কেমন? না এরূপ—'যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া ওঠে, জল আনিতে হইবে, জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া আনিতে যাইবে'—ছোট ছোট সামান্য সামান্য নিত্যঘটনা বোধ হয়। অনেকে এমন করিয়া দেখে না—জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়—আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয়জন লক্ষ্য করে? সঞ্জীববাবু এইরূপ বিষয় সকল এমনি করিয়া লক্ষ্য করিতে জানিতেন। এইরূপ দর্শন কার্যে তাহার অসাধারণ আসক্তিও অভিনিবেশ ছিল।"[১]

রবীন্দ্রনাথ এই অংশের সমালোচনা করে বলেছেন—

"চন্দ্রনাথবাবু বলেন সচরাচর লোকে যাহা দেখে না সঞ্জীববাবু তাহাই দেখিতেন—ইহা তাঁহার একটি বিশেষত্ব। আমরা বলি, সঞ্জীববাবুর সেই বিশেষত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে সে বিশেষত্বের কোন আবশ্যকতা নাই।......চন্দ্রনাথবাবু বলেন, 'জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়, আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয়জন লক্ষ্য করে?' আমাদের বিবেচনায় সমালোচনায় এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া

থাকিবে। হয়তো নাও দেখিতে পারে। কুলবধূরা জল ফেলিয়াও জল আনিতে যায় সাধারণের স্থূল দৃষ্টির অগোচর এই নবাবিষ্কৃত তথ্যটির জন্য আমরা উপরি উদ্ধৃতি বর্ণনাটির প্রসংশা করি না। বাংলাদেশে অপরাহ্নে মেয়েদের জল আনিতে যাওয়া নামক সর্বসাধারণের সুগোচর একটি অত্যন্ত পুরাতন ব্যাপারকে সঞ্জীব নিজের কল্পনায় সৌন্দর্য কিরণদ্বারা মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া উক্তবর্ণনা আমাদের নিকট আদরের সামগ্রী। যাহা সুগোচর তাহা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা আমাদের পরম লাভ।[১০]

আমরা এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম কারণ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর কোন সুন্দরতর ব্যাখ্যায় এর সৌন্দর্য নিরূপণ হয় না। তবু একথা স্বীকার্য চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনার মধ্যেও কিছু সত্য নিশ্চয়ই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষে তা স্বীকার করে গেছেন। ফলে আমাদের অবশ্য লাভই হয়েছে। তবু আমাদেরও একটি বক্তব্য আছে।— সঞ্জীব বলেছেন—

"সেই নির্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনে সহিত ক্রীড়া করিতাম।"

অতি আধুনিক এক কবির কাব্যেও আমরা এই ধরণের প্রকাশ দেখেছি—

এই মনকে নিয়ে কত আর পারি
গল্পের বই সেও যেন রহস্যের শাড়ী।

(নরেশ গুহ—দুরন্ত দুপুর)

—আপন মনের এই অপার রহস্য অনুসন্ধান, তার মধ্যে এমন তলিয়ে গিয়ে অরূপ রতন সন্ধান করে নিয়ে আসা অতি আধুনিক কালের সামগ্রী—ঐ যুগে সঞ্জীবের মধ্যে সেই গীতিকবি সুলভ আত্মানুভবের চিত্রটি আমাদের সত্যই বিস্মিত করে। তৃতীয় প্রবন্ধের এই অংশের লিরিক অনুভূতি ভ্রমণকাহিনীকে কখন এক দূর ছায়াচ্ছন্ন পর্বতসানুদেশের রোমান্টিক আবহমণ্ডলে পরিণত করে আমাদের মনকে অতলচারী ভাবুকতার জগতে ডাক দিযে চুপি চুপি নিয়ে গিয়েছে তা আমরা জানতেও পারিনি। অথচ আশ্চর্য এই যে সঞ্জীবচন্দ্র ভাব জগতে ডুব দিয়েও ফিরে এসেছেন ভাবনার জগতে। রবীন্দ্রনাথ এই ভাব থেকে ভাবনার জগতে আসা যাওয়াকে রসাভাস বলে মনে করেছেন। বলেছেন—

"সঞ্জীবের প্রতিভা ভাবুকের নিকট সমাদরের তাহার কারণও যথেষ্ট আছে।"[১১]

তার কারণ সঞ্জীব যেখানে ভাবজগৎচারী কবি ও শিল্পী সেখানে তিনি চিরকালের আসনটি অধিকার করেছেন। কিন্তু যেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ভাবনা বা ক্ষণিক তত্ত্ব চিন্তা বা বিচ্ছিন্ন গবেষণায় মেতে উঠেছেন সেখানে তিনি ভাব ও ভাবনার সঙ্গে অনেক সময়েই সমতা রক্ষা করতে পারেন নি। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভা ছাড়া বাংলা সাহিত্যে ঐ দুই সত্তার সার্থক মিলন ঘটান আর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। তাই লতার ফুল ও ভ্রমরের প্রণয়রঙ্গ দেখে তিনি নিজে

যেমন ভাব রসে ডুবেছেন ও আমাদেরও ডুবিয়েছেন, তেমনি পরবর্তী অংশে পাখীর ডাকে—'রাধে মহ্যং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ম' ছন্দগুনে তার মধ্যে যখন ভাবনা জেগেছে—

"যদি এখানে কেহ ডারউইন সাহেবের ছাত্র থাকিতেন, তিনি ভাবিতেন নিশ্চয়ই এ পক্ষীটি রাধাকুঞ্জের শিক্ষিত পক্ষীর বংশ, বৈজিক কারণে পূর্বপুরুষের অভ্যস্ত শ্লোক ইহার কণ্ঠে আপনি আসিয়াছে।"

তখন যে সুন্দর রসলোকটি তৈরী হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে কোথায় যেন খুঁত রয়ে গেলো। আমাদের মন বললো, পাখীর স্বরে উদ্ধব দূতের কাহিনীতে যে মানসলোকের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে ডারউইন সাহেব ও বৈজিক তত্ত্ব না প্রবেশ করলেই ভাল হত। তবে স্বীকার করতেই হবে, এই পাখীর স্বরের মধ্যে সঞ্জীবের যে সব কিছুর উপর 'সৌন্দর্যের মায়া আবরণটি' দেখার ক্ষমতা ছিল তা স্পষ্টতই প্রকাশ পেয়েছে। এখানে সঞ্জীব এই ভ্রমণ কথার নায়ক—একটি বিশিষ্ট চরিত্র, যেমন চরিত্র রচিত হতে পারে নাটকে উপন্যাসে ছোট গল্পে।

ভ্রমণকাহিনীর বিশিষ্ট সংজ্ঞা নিয়ে যদিও আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তবু একথা সত্য কোন সংকীর্ণ সংজ্ঞার দ্বারা ভ্রমণ কাহিনীকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ভ্রমণকথার মধ্যে স্মৃতিচিত্র, ডায়েরী, পত্র, উপন্যাস, ছোট গল্প বা নাটকের মত কাহিনী ও চরিত্র, প্রবন্ধ নিবন্ধের তত্ত্বচিন্তা সবকিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব। তা সত্ত্বেও ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে স্থানের অস্তিত্বটি অবশ্যই থাকা চাই। কারণ স্থানটিই হচ্ছে ভ্রমণকাহিনীর ভিত্তিভূমি। যার উপর সাহিত্যের প্রতিটি শাখাই রসলোকে বাহু মেলতে পারে। আমাদের আলোচ্য পালামৌয়ের রসভূমিতে যে বৃক্ষটি বেড়ে উঠেছে তার নানা শাখায় নানা রসের ফল। ছোট গল্পের মুহূর্ত চমকের অভাব নেই এখানে। চমৎকার একটি গল্প—এক যুবক বীরদর্পে টাঙ্গি হাতে চলেছে, তাকে কয়েকটি স্ত্রীলোক অনুনয় বিনয় করছে। প্রথমে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত লেখকের মনে হল ভাতের উপর যুবক রাগ করেছে নিশ্চয়ই। পরে জানলেন সে বাঘ মারতে চলেছে। কারণ বাঘ তার গোরু মেরেছে এবং সে নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান। লেখকও তার সঙ্গী হলেন। এক পাহাড়ের উপর উঠে দেখলেন নিচের গুহায় অঙ্গনে বাঘ নিদ্রা যাচ্ছে। তাঁরা নিঃশব্দে একটি বিরাট পাথর উপর থেকে নিচে ফেলে দিলেন। তারই আঘাতে বাঘটি মারা গেল। গল্পটি বলার ভঙ্গীটি কোথাও ভ্রমণ কাহিনীকে ক্ষুন্ন করে নি। অথচ ঐ যুবক ও লেখকের চরিত্রটি এখানে মুহূর্তের আলোয় আভাসিত হয়েছে। সর্বোপরি সঞ্জীবের সৌন্দর্যবোধ ও ভাবুকতা একটি অপূর্ব সুন্দর রসরূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই অংশের আলোচনার দ্বারা 'সঞ্জীবচন্দ্র' প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন—

"অবশেষে গ্রন্থ হইতে একটি সরল বর্ণনার উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। গ্রন্থকার একটি নিদ্রিত বাঘের বর্ণনা করিতেছেন—প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র

নিরীহ ভালমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর সংযুক্ত একটি থাবা দর্পনের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল"—

"আহার পরিতৃপ্ত সুপ্ত ব্যাঘ্রটি ঐ যে মুখের সামনে একটি থাবা উলটাইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এই এক কথায় ঘুমন্ত বাঘের ছবিটি যেমন সুস্পষ্ট সত্য হইয়া উঠিয়াছে এমন আর কিছুতেই হইতে পারিত না।"[১২]

কেবলমাত্র উপমা ব্যবহার নয়, আমাদের মনে হয় এই কাহিনী ও চিত্রের মধ্যে সঞ্জীবের দেখার চোখ ও মনোভঙ্গির বিশেষ পরিচয়টিও প্রকাশ পেয়েছে। সেই পরিচয়ে লেখকের যে চরিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে তা কেবলমাত্র বালকের কৌতুহলী চরিত্রমাত্রই নয়, তার মধ্যে জীবনকে বিশিষ্ট দৃষ্টিতে দেখার দার্শনিক অনুভূতিটিও বর্তমান। তার সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সব কিছুকে সহাস্য মুখে দেখার ভঙ্গিটিও রীতিমত আস্বাদ্য—

"পর দিবস বাহক স্কন্ধে ব্যাঘ্রটি আমার তাঁবু পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি মহানিদ্রাচ্ছন্ন বলিযা বিশেষ কোন প্রকার আলাপ হইল না।"

চতুর্থ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের ১২৮৮ সনের শ্রাবণ মাসের সংখ্যার ১৬৫-৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। সঞ্জীব তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। ভাল রচনা সরবরাহ করা তাঁর একটি বড় দায়িত্ব। তাই যে লেখক লেখাকে নিজের পেশারূপে সম্পূর্ণত গ্রহণ করেন, যিনি সাধারণত ভাল লিখলেও নিজের খেয়ালখুসী মত লেখেন, তিনি সহজে ফরমায়সি লেখা লিখতে অস্বস্তি বোধ করেন। তবু যিনি প্রতিভাবান লেখক একবার কাগজ কলম নিয়ে বসতে পারলে তাঁর হাত দিয়ে যে লেখা প্রকাশ পাবে তাও তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সোনা হয়ে উঠবে। পালামৌর চতুর্থ প্রবন্ধটি সেই জাতীয় লেখা। ফলে এর মধ্যে প্রতিভাবান লেখকের ফরমায়সি লেখার দোষগুণ উভয়ই আছে।

তাই চতুর্থ প্রবন্ধটি রচনা করতে বসে তাঁকে ইতস্তত করতে হচ্ছে। অথচ লেখার প্রস্তাবনার সঙ্গে বাকী অংশের মিল খুঁজেও পাওয়া যায় না। এখানে তিনি পালামৌর কোন সৌন্দর্য—প্রকৃতি অথবা মানুষের কারুরই বর্ণনা করেন নি। তিনি এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যে লেখাটির ভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের মিল দেখতে পাওয়া যায়। শুধু বলা যায় ঘটনাটির স্থান পালামৌ এবং নায়ক লেখক স্বয়ং। এই রচনাটির তির্যক বঙ্কিমভঙ্গী এবং আপনার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি এর মধ্যে একটি করুণ হাস্য রস সৃষ্টি করেছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় লেখক যখন—"চিক পর্দা ফেলিয়া তাঁবুতে একা বসিয়া সাহেবী ঢঙ্গে কুকুরী লইয়া ক্রীড়া করিতেছি"লেন, সেই সময় বাইরে কে তাঁকে 'খাঁ সাহেব' বলে ডাকলো। শুনে তাঁর সমস্ত গা জ্বলে উঠলো, কারণ তিনি মান্য ব্যক্তি, তাঁকে ডাকার সাহস কার? তাও যদি তাঁকে 'খাঁ বাহাদুর' বলতো! অতএব কোন

কারণ অনুসন্ধান না করেই তিনি তাদের 'হারামজাদ্' 'বদজাত' প্রভৃতি সাহেব সুলভ গালি ব্যতীত আর কিছুই দেন নি। বাইরে দারুণ শীত, তাই রাগ থাকলেও তাঁবুর বাইরে তিনি গেলেন না। বোধ হয় তারা গালি শুনে চলে গেছে। এইখানে লেখকের তির্যক ভঙ্গীটি লক্ষ্য করার মত।

ঐ ঘটনার কিছুক্ষণ পরে লেখকের 'খানশামা বাবু' তামাক সেজে নিয়ে তাঁবুর দ্বারের কাছে দাঁড়াতে তার পিছনে দুটি মনুষ্য মূর্তি দেখা গেল। তারা সেলাম করে ভিতরে এলে লেখক দেখলেন একজন পাগড়ী পরিহিত শ্বেত শ্মশ্রু বৃদ্ধ এবং অন্যজন যুবতী। এইখানে লেখকের সৌন্দর্যবোধ যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের রীতিমত চমৎকৃত করে। সে যুবতীকে দেখে সঞ্জীবের মনে হল,—

> "সে যেন বড় ভয় পাইয়াছে অথচ তাহার ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি। তাহার ভ্রু দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি উর্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি অত্যন্ত যথাযথ হয়েছে—

> "এই উপমাটি পড়িবামাত্র মনে বড়ো একটি আনন্দের উদয় হয়। কেবলমাত্র উপমা সাদৃশ্য তাহার কারণ নহে, কিন্তু সেই সাদৃশ্যটুকুকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া একটা সৌন্দর্যের সহিত আর কতগুলি সৌন্দর্য জড়িত হইয়া যায়—সে একটা ইন্দ্রজালের মতো, ঠিক করিয়া বলা শক্ত যে অপরাহ্নের অতি দূর নির্মল নীলাকাশে ভাসমান স্থির পক্ষ স্থগিত গতি পাখিটিকে দেখিতেছি না, যুবতীর শুভ্র ললাটতলে অঙ্কিত একটি জোড়া ভুরু আমাদের চক্ষে পড়িতেছে। জানি না, কেমন করিয়া কি মন্ত্রবলে একটি ক্ষুদ্র ললাটের উপর সহসা আলোক ধৌত নীলাম্বরের অনন্ত বিস্তার আসিয়া পড়ে এবং মনে হয় যেন রমণীমুখের সেই ভ্রূযুগল দেখিতে স্থির দৃষ্টিকে বহু উচ্চ বহুদূরে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। এই উপমায় হঠাৎ এইরূপ একটা বিভ্রম উৎপন্ন করে, কিন্তু সেই ভ্রমের কুহকেই সৌন্দর্য ঘনীভূত হইয়া ওঠে।"[১৩]

প্রকৃতপক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র যে খুব ভেবে চিন্তে রয়ে বসে সৌন্দর্যের কুহক সৃষ্টি করেননি, তা তাঁর রচনার অসঙ্গতি দেখলে বোঝা যায়। সৌন্দর্য বোধের মেঘ ও রৌদ্রের মায়া আবরণটি তাঁর মনের মধ্যে সদা সর্বদা উদিত থাকতো না, সচেতন শিল্পী না হওয়ার ফলে নিজস্ব মেজাজটি তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আমরা সত্যিকারের খাঁটি জিনিসটি অনেক সময়ই পাই নি। আমাদের মনে হয় সঞ্জীব যখন তৈরী মেজাজটি নিয়ে লিখতে বসতেন তখন যে সব সৌন্দর্যের মনিমানিক্য পাঠককে উপহার দিতেন, একবার সেই লেখাটি ছেড়ে উঠলে পরের বারে সেই দান দেওয়া তাঁর পক্ষে অধিকাংশ সময়েই সম্ভব হত না। তখনই বোধ হয় তিনি ভাবের জগৎ হতে নির্বাসিত হয়ে ভাবনার তত্ত্ব জগতে কিছুক্ষণ পথ খুঁজে ফিরতেন। তাই এই অংশে লেখকের সৌন্দর্য ভাবুকতার একটি স্বচ্ছল প্রবাহ দেখে আমাদের মনে হয় এই অংশটি

তিনি একেবারেই লিখেছিলেন।

ইঙ্গিতময়তা ও কাব্যধর্মিতার এমন সংমিশ্রন রবীন্দ্র পূর্বে বঙ্কিমের কমলাকান্তের মধ্যে কিছু কিছু দেখা গেলেও সেখানে বঙ্কিম ছদ্মবেশী। কিন্তু এখানে সঞ্জীব স্বরূপে প্রকাশিত রূপবতী নারী ও পক্ষিণী কিভাগে লেখককে মুগ্ধ ও বিচলিত করেছিল, তারই আশ্চর্য কাব্যময় স্বীকারোক্তি। তাই এই রচনা এতখানি আত্মগত হয়েছে, যা আর কারও মধ্যেই দেখা যায় নি। এখানে লেখক স্পষ্টত একটি চরিত্র—লেখকের সত্তা কোন কিছু আবরণে আচ্ছাদিত নয়। এমন অকপট স্বগতোক্তি একান্ত ভাবেই আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ।

প্রাগুক্ত অংশের ঠিক পরবর্তী অংশের সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসু। মূলত রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করেছেন।[১৪]

চন্দ্রনাথ সঞ্জীবের পালামৌর যে রসাস্বাদ করেছিলেন তার মধ্যে দুটি ত্রুটী আমাদের কাছে কোনমতেই গ্রাহ্য নয়, কারণ সৌন্দর্য তত্ত্ব (Aesthatics) প্রচার করার মতো কোন দুরভিসন্ধি সঞ্জীবের ছিল বলে মনে হয় না। আর সঞ্জীবের লেখা আবেগ শূন্য ছিল একথা চন্দ্রনাথ কি ভাবে ভাবলেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। বরং বলা যায় পালামৌর মূল রসটি নিহিত রয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ ও আন্তরিকতায়। আমরা আগেই বলেছি ভাবের আবেগ যেখানে প্রবল সেখানেই সঞ্জীব আমাদের বেশী করে স্পর্শ করেছেন, অন্য পক্ষে ভাবনার (Thoughts) জ্ঞান তত্ত্বালোচনায় তিনি অধিকাংশ সময়েই আমাদের স্পর্শ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুকে যথার্থভাবেই সমালোচনা করেছেন—[১৫]

সৌন্দর্যতত্ত্বের অধিক তর্কে প্রবেশ না করে আমরা এটুকু বলতে পারি সঞ্জীবের মধ্যে যে সুগভীর সৌন্দর্যবোধ ছিল তার ব্যাপকতা অনায়াসে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারতো। তার প্রকাশ মাধ্যমটি সঞ্জীব যে খুব কাব্যসম্মত করতে পেরেছেন তা নয়—কারণ ভূত প্রেতের উদাহরণের মধ্যে বালকোচিত অপরিপাট্য বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে ব্যক্তি অনুভূতি বিশ্বনাথভূতিতে পরিণত হয়েছিল সঞ্জীবের রচনায় তারই বীজ ছিল নিহিত।

আবার আমরা সঞ্জীবের কাহিনীর মধ্যে ফিরে গিয়ে সেই সুন্দরী যুবতী ও বৃদ্ধের প্রসঙ্গে প্রবেশ করলে দেখতে পাব তাঁর সহানুভূতিটি আমাদের অনায়াসে স্পর্শ করে।—

> আমি তাহাকে উদ্ধার করিলাম না, তাড়াইয়া দিলাম, এ নিষ্ঠুরতার ফল একদিন আমায় অবশ্য পাইতে হইবে, এরূপ কথা আমার সর্বদা মনে হইত।"

পালামৌ রচনাকালে সঞ্জীব তাঁর জীবনের সুখের কাল পার হয়ে এসেছেন। দুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতি তাঁর আত্মানুভূতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। আমরাও কত সময় আমাদের পূর্ব অপরাধের জন্য অনুশোচনা করি। এখানে সঞ্জীবের হৃদয়ের প্রশস্ততা দেখে আমরা এক মহাপ্রাণের আসঙ্গলাভের আনন্দলাভ করি। পরে সঞ্জীব যখন

শুনলেন যে তারা জঙ্গলে অতিক্রম করতে পারে নি, পথেই মারা গিয়েছ। লেখক বলেছেন—

"একথা সত্যিই হউক বা মিথ্যাই হউক, আমার বড় কষ্ট হইল, আমি কেবল অহঙ্কারের চাতুরীতে পড়িয়া খাঁ সাহেব কথায় চটিয়াছিলাম। তখন কেবল জানিতাম না যে আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব।"

পালামৌ ভ্রমণ কাহিনীরও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশে এর পরেই আমরা পৌঁছে যাব। যে অংশ দেখে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—

"প্রকাশ ভঙ্গিতেও সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। নৃত্যরতা কোল তরুণীর 'দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল'—এই উৎপ্রেক্ষা রবীন্দ্রনাথের রচনা ছাড়া অন্যত্র অনপেক্ষিত।"[১৬]

চন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কালের অনেক সমালোচক সকলেই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন এই অংশে সঞ্জীবচন্দ্র কি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কাল পেরিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে ভাষা ও ভাবের সঞ্চয় রেখে গেছেন। এই অংশ সম্পর্কে আরও বলা চলে এইখানে ভ্রমণ কথা সার্থক হয়ে উঠেছে, কারণ স্থান কাল প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে আমাদের মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আগের অংশে আমরা প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষের প্রসঙ্গ প্রাধান্য লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এখানে 'পালামৌ' কোলদের আরণ্য আবির্ভাবে তার সমস্ত আদিমতা নিয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে—তার মূলে আছে সঞ্জীবের গভীর ও অন্তস্তলচারী সহানুভূতি। এই সহানুভূতি ও রস-বোধ পাঠকের (বিশেষ করে ভবিষ্যৎ পাঠকের) মনে সঞ্চারিত করবার মন্ত্রটি অর্থাৎ ভাষাটি তাঁর জানা ছিল।

সংক্ষেপে প্রসঙ্গটি আলোচনা করে বিভিন্ন সমালোচকের দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করবো। একদিন অপরাহ্নে যখন তিনি' ঐ 'বাইয়ের' কথা ভাবতে ভাবতে বেড়াচ্ছিলেন তখন পথে কয়েকটি কোলকন্যা তাঁকে রাত্রে তাদের নাচ দেখতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলো। সন্ধ্যার পর তিনি তাদের নাচ দেখতে গেলেন। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা উদ্ধৃত করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। চন্দ্রনাথ বসু লিখছেন,—

"তিনি পালামৌর সেই বাইজীতে গেঙ্গো খালির মোহনার সেই পাখীটির রূপরাশি দেখিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি কোল কামিনীদিগের দেহে কোলাহল দেখিয়াছিলেন।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"গ্রন্থকার কোল যুবতীদের নৃত্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি—'এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল, তাহারা আসিয়াই যুবকদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড়ো হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে,

যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা—যুবক দশ বারোটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলণ্ডের পণ্টন ঠকে। হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড়ো চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম উচ্চ। সকলগুলিই পাথুরে কালো, সকলেরই অনাবৃত দেহ, সকলেরই সেই অনাবৃত বক্ষে আরশি ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বন পুষ্প, কর্ণে বন পুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল—যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃন্ময় মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে তবে যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল।'

এই বর্ণনাটি সুন্দর, ইহা ছাড়া আর কি বলিবার আছে? এবং ইহা অপেক্ষা প্রসংশার বিষয়ই বা কী হইতে পারে? নৃত্যের পূর্বে আহ্লাদে চঞ্চল যুবতীগণ তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় দেহবেগ সংযত করিয়া আছে, এ কথায় যে চিত্র আমাদের মনে উদয় হয় সে আমাদের কল্পনা শক্তি প্রভাবে হয়। কোন তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা হয় না। যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল একথা বলিলে আমাদের মনে ত্বরিত একটা ভাবের উদয় হয়, যে কথাটি সহজে বর্ণনা করা দুরূহ তাহা ঐ উপমা দ্বারা এক পলকে আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। নৃত্যের বাদ্য বাজিবামাত্র চিরাভ্যাসক্রমে কোল রমণীদের সর্বাঙ্গে একটা উত্তম উৎসাহ চাঞ্চল্য তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন একটা জানাজানি কানাকানি, একটা সচকিত উদ্যম, একটা উৎসবের আয়োজন পড়িয়া গেল। যদি আমাদের দিব্যকর্ণ থাকিত তবে যেন আমরা তাহাদের নৃত্যবেগে উল্লসিত দেহের কলকোলাহল শুনিতে পাইতাম। নৃত্য বাদ্যের প্রথম আঘাতমাত্রই যৌবন সন্নদ্ধ কোলাঙ্গনাগণের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বিভঙ্গিত এই যে একটা হিল্লোল ইহা যেমন সূক্ষ্ম ইহার একটা কেবল আমাদের অনুমান বোধ্য এবং ভাবগম্য যে, তাহা বর্ণনায় পরিস্ফুট করিতে হইলে কোলাহলের উপমা অবলম্বন করিতে হয়—এতদ্‌ব্যতীত ইহার মধ্যে আর কোন গূঢ়তত্ত্ব নাই। যদি উপমা দ্বারা লেখকের মনোগত ভাব পরিস্ফুট না হইয়া থাকে, তবে ইহার অন্য কোন সার্থকতা নাই, তবে তাহা প্রলাপোক্তি মাত্র।"[১৮]

সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষা কারুকৃতি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—

"তখনকার দিনের পাঠকদের কাছে এইরূপ বাক্য অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিতে পারে এই বোধ সঞ্জীবচন্দ্রের ছিল। কিন্তু সমসাময়িক পাঠকবর্গের মুখ চাহিয়া

ভবিষ্যতের পাঠকদের প্রতি ইনি অবিচার করিতে পারেন নাই। সঞ্জীবচন্দ্র কোল যুবক যুবতীর নৃত্যগীতের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন, সুর কখন পাহাড়ের মূল পর্যন্ত, কখন পাহাড়ের বক্ষ পর্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। তাল পাহাড়ে ঠেকা অনেকের নিকট রহস্যের কথা। কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপবাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।"
বলা বাহুল্য সঞ্জীব যে প্রলাপোক্তি করেন নি রবীন্দ্রনাথ তা ভালোভাবেই বুঝিয়ে বলেছেন। সেই জন্যেই তিনি সহজেই নানা দোষ ক্রটী সম্পন্ন রচনা লিখেও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধও কবিমনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কোল যুবক যুবতীদের নৃত্যগীতের যে বর্ণনাটি তিনি দিয়েছেন তাতে শতাব্দী অন্তে সেই চিত্র আজও সেদিনের মত তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি প্রাণবন্ত রয়েছে—মনে হয় সেদিন যেমন তাদের আদিম নৃত্যগীত দেখে আকাশে চন্দ্র ও বটমূলের অন্ধকারে লেখক হেসে ছিলেন, সেদিনের সেই স্মিত হাস্য আজও আমাদের সমস্ত হৃদয় ও আননকে আনন্দরসে পরিপ্লুত করছে।

পালামৌর পঞ্চম প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের ১২৮৮ সনের আশ্বিন মাসের সংখ্যায় ২৮১-৮৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই অংশ প্রকাশের আগে সঞ্জীবের ব্যক্তি-জীবনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করার প্রয়োজন। এই সময় কর্মহীন সঞ্জীবের প্রধান অবলম্বন বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা। এদিকে সংসারের দায় দায়িত্বও অনেক বেড়েছে। একমাত্র পুত্র জ্যোতিষচন্দ্রের তখনও চাকুরী হয়নি। তা সত্বেও সঞ্জীব ১২৮১ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ সালিখার জমিদারের সুন্দরী কন্যার সঙ্গে খুব ধুমধাম করে বিবাহ দিয়েছেন। এই বিবাহের ২৫ দিন আগে অর্থাৎ ১৫ই নভেম্বর ১৮৭৪ সাল, (বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বিবাহের সংবাদ জানিয়ে নিশ্চয়ই সঞ্জীব ১৬০০ টাকা ঋণ জোগাড় করে দেবার জন্যে চিঠি দিয়েছিলেন) বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবকে চিঠিতে লেখেন, "আপনি যদি এই ঋণ বৃদ্ধি করেন তবে যতীশের যাবজ্জীবনের জন্য যে কি গুরুতর অনিষ্ট করিবেন তাহা বলা যায় না। যতীশ সে সবেরই দায়ি। ...এমন সর্বনাশ যাহাতে ঘটিবার সম্ভাবনা সে ঋণ কেন করিবেন? ইহা জানেন যে, ডিক্রি হইলে একখানি ওয়ারেন্ট বাহির হইলেই আপনার চাকুরিটি যাইবে এরূপ নিয়ম হইয়াছে। যতীশের বিবাহে আপনি বা শ্রীযুক্ত (যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) এক পয়সাও ঋণ করিতে পারিবেন না।'

বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের এইরকম কড়া নির্দ্দেশ থাকা সত্বেও সঞ্জীব অনেক টাকা কর্জ্জ করেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি তা শোধ করে যেতে পারেন নি। পালামৌ রচনাকালে সঞ্জীবের বেকার অবস্থা ও ঋণভার নিশ্চয়ই খুব পীড়িত করেছিল। পঞ্চম পরিচ্ছেদে কোলদের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সঞ্জীবের আপনার তিক্ত অভিজ্ঞতাই প্রধানতঃ প্রতিফলিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের

আরম্ভে তিনি বলেছেন—

"কোলের নৃত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

প্রসঙ্গত তিনি কোলের উপজাতিগুলির পরিচয় দিয়েছেন, ফলে ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণিত অচেনা জগৎকে চেনার যে আগ্রহ আমাদের থাকে তা এই পর্বে অনেক পরিমাণে তৃপ্ত হয়েছে।

সঞ্জীবচন্দ্র একবার সেই উপজাতিদের একটি বিবাহ উৎসবে রবাহুত হয়ে গিয়েছিলেন। বিকেলে বর দেখার অভিপ্রায়ে যখন তিনি পথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন বরযাত্রী পুরুষরা তাঁকে না ডাকলেও স্ত্রীলোকেরা তাঁকে তাদের সঙ্গে যেতে আহ্বান করলো। লেখকের বর্ণনায় বরযাত্রার ছবিটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোল বরযাত্রীদের বীরদর্পে গমনের মধ্যে তাদের দৈহিক উদ্দীপনা সম্যকভাবে রূপ লাভ করেছে—

"তাহারা যেরূপ বুক ফুলাইয়া, মুখ তুলিয়া বায়ু ঠেলিয়া মহাদম্ভে চলিতেছিল, আমি দুর্বল বাঙ্গালী, আমার সে দম্ভ, সে শক্তি কোথায় ?"

নিজের দিকে তাকিয়ে বাঙ্গালীর শক্তিহীনতার আর একটি কাহিনী তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—সব মিলিয়ে ভ্রমণ কাহিনীর মৃদুমন্দ গতিটি আমাদের সহজেই আকর্ষণ করে—সেই আকর্ষণে লেখকের সঙ্গে আমাদের পথে বিপথে ঘুরতে কিছুমাত্র ক্লান্তি আসে না। সঞ্জীব নিজেও জানেন তাঁর রচনা প্রায়ই পথছেড়ে বিপথে নেমে যায়। তাই প্রসঙ্গে ফিরে আসতে এখানে তাঁকে বলতে হয়—

"সে সকল রাগের কথা এখন থাক, যে হারে সেই রাগে। কোলের কথা হইতেছিল। তাহাদের সকল জাতির মধ্যে একরূপ বিবাহ নহে।"

এইখানে তিনি বিশুদ্ধ ভ্রমণ রসিকের কত অজানারে জানবার ভঙ্গীতে আদিম জাতির বিবাহ ব্যবস্থা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা যে সঞ্জীবের পুঁথিগত বিদ্যা নয় তা যে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তা বোঝাবার জন্যে তাঁর বিবিধ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন পাদটীকায় তিনি বলেন—

"যে আসুরিক বিবাহের পরিচয় দিলাম তাহা Exogamy নহে। কেন না ইহা স্বজাতি বিবাহ।"

কোল উপজাতির (উরভিদের সম্ভবত) যে বিবাহ বর্ণনা করেছেন তা এখানে রীতিমত উপভোগ্য।

"তাহাদের বিবাহপ্রথা অতি পুরাতন। তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামের সমুদয় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্যা হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রিযাপন করিতে পারে না। সকলে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিলে গ্রামের অবিবাহিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সকলে সেই ঘরের নিকট আসিয়া

রসিকতা আরম্ভ করে, কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ বা রহস্য করে। যে কুমারীর বিবাহের সময় হয় নাই, সে অবাধে নিদ্রা যায়। কিন্তু যাহাদের সময় উপস্থিত তাহারা বসন্তকালের পক্ষিনীর ন্যায় অনিমেষলোচনে সেই নৃত্য দেখিতে থাকে, একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে থাকে। হয়তো না পারিয়া শেষে ঠাট্টার উত্তর দেয়, কেহ বা গালি পর্যন্ত দেয়। গালি আর ঠাট্টা উভয়ের প্রভেদ অল্প, বিশেষ যুবতীর মুখবিনির্গত হইলে যুবারা কর্ণে উভয়ই সুধাবর্ষণ করে। কুমারীরা গালি আরম্ভ করিলে কুমারেরা আনন্দে মাতিয়া উঠে।"

রসিক লেখকের বর্ণনার মধ্যে এক দিকে যেমন তির্যকতা রয়েছে। অন্যপক্ষে তিনি কোথাও তাঁর রুচি মার্জিত মনটিকে সংযমের বাইরে যেতে দেননি। অথচ আধুনিক কালের অনেক লেখকের হাতেই এমন ক্ষেত্রে নর-নারীর মিলনের বর্ণনাগুলি সাধারণ সংযমের বাইরে চলে যায়। আদিম জাতির বিবাহ বর্ণনা হ্যাবলক এলিস যেভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে বর্ণনা করেছিলেন, তারও উর্ধে উঠে অর্থাৎ সাহিত্য সম্মত রস সৃষ্টি করেও সঞ্জীবের অসাধারণ মার্জিত ও রসিক মন কখনও তাকে আবরণহীন নগ্ন বাস্তবে পরিণত করে নি। অথচ সঞ্জীবচন্দ্রের বাস্তব দৃষ্টির কিছুমাত্র অভাবও দেখি না।

অনেক আদিম জাতির বিবাহ ব্যবসা সাধারণত অপহরণ বিবাহ। উরাও উপজাতির বিবাহ ব্যবসাও তাই। একদিন কন্যা যখন গাগরী ভরণে যায় পথে পাত্র এসে তাকে অপহরণ করে। তারপর উভয়পক্ষে, বর পক্ষ ও কন্যাপক্ষ এর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। সঞ্জীবের স্ফুরিত হাস্যময় অধরের সুন্দর হাসিটি আমরা এখানে দেখতে পাই—

"যুদ্ধ রুক্মিনী হরণের যাত্রার মত, সকলের তীর আকাশমুখী। কিন্তু শুনিয়াছি, দুই একবার নাকি সত্য সত্যই মাথা ফাটাফাটিও হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, শেষ যুদ্ধের পর আপোষ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ উভয়পক্ষ একত্র আহার করিতে বসে।"

এরপর সঞ্জীবের তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক মন এইখানেই থেমে থাকেনি। অবলীলাক্রমে তিনি আধুনিক সভ্য সমাজের বিবাহ ব্যবস্থার মধ্যে আদিম বিবাহ ব্যবস্থার কোন কোন বিষয় আজও স্ত্রী আচার অথবা বিভিন্ন বিবাহ আচারে আচারিত হচ্ছে তার উল্লেখ করতে ভুলে যান নি। জ্ঞানের এমন সহজ প্রকাশ সহজে আমাদের চোখে পড়ে না। এর পরেই সঞ্জীব যখন কোলদের বিবাহ উপলক্ষে মহাজনদের কাছে যে ঋণ করেও তার ফলে তাদের কি দুর্দশা হয়, তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনার মধ্যে তাঁর ব্যক্তি জীবনের দুঃখ প্রকাশ পাওয়ায় রচনার আন্তরিকতা লক্ষ্য করার মত। কোলরা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে হিন্দুস্থানী মহাজনদের কাছে আট দশ টাকা কর্জ করে, সেই কর্জ জীবনেও তারা শোধ করতে পারে না। এই সহজ সরল গ্রাম্যমানুষগুলি নিরক্ষর, তারা হিসেব বোঝে না, ফলে এদের যথাসর্বস্ব মহাজনেরা নেয়।

সঞ্জীব আগে (দ্বিতীয় অধ্যায়) আদিম জাতিগুলি লোপের যে সমস্ত কারণ নির্দেশ করেছেন মহাজনদের অত্যাচার তাদের অন্যতম প্রধান কারণ।

গভীর আন্তরিকতার স্পর্শে পালামৌর এই সব অংশ বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন আসনটি অধিকারে করে রয়েছে। এই আন্তরিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের ভাবনা, অর্থাৎ সমাজতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা। এই সব জিজ্ঞাসা অবান্তরও নয়। তবু মনে হয় এই সব জায়গায় পৌঁছিয়ে সঞ্জীব এরপরে 'কি লিখি, কি লিখি' এরকম একটি চিন্তার মধ্যে ডুবেছেন। তাই ভাব থেকে ভাবের জগতে পৌঁছতে তাঁকে কিছুক্ষণ সময় ভাবনার জগতে বিচরণ করতে হয়েছে। ফলে এই সব ক্ষেত্রে তাঁর ভাবরসধর্মী রচনার মধ্যে ক্ষণিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সেই দুর্বলতা তিনি অচিরেই কাটিয়ে উঠে আবার সহজেই ভাবের জগতে পৌঁছিয়ে গেছেন।

কোল জাতির বিবাহের কথা বলতে গিয়ে তিনি নানা প্রসঙ্গ পায় হয়ে বলেছেন,

"কোলের নববধূ আমি কখন দেখি নাই। কুমারী এক রাত্রের মধ্যে নববধূ। দেখিতে আশ্চর্য। বাঙ্গালায় দুরন্ত ছুঁড়িয়া ধূলা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গোরুকে গাল দিতেছে, পাড়ার ভাল থাকীদের সঙ্গে কোঁদল করিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে ছুড়ী গালি দিয়া পালাইতেছে। তাহার পর এক রাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পরদিন প্রাতে আর সে পূর্বমত দুরন্ত ছুঁড়ী নাই। এক রাত্রে তার আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটি নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।"

এই যে নববধূর পরিচয় এর পরবর্তী অংশে দিয়েছেন তার মধ্যে তিনি তাঁর অন্তরের স্নেহটি উজাড় করে ঢেলেছেন। সঞ্জীবের বাৎসল্য রসসিক্ত অন্তরটির পরিচয় তাঁর অন্যান্য রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও বোধ করি নিচের উদ্ধৃতির মধ্যে তার যে প্রকাশ ঘটেছে তা তুলনাহীন। এমন দৃষ্টির গভীরতা, এমন সহানুভূতি বোধ করি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসু উভয়েই এই অংশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। উদ্ধৃতিটি দিয়ে পরে উভয়ের মতামত আলোচনা করা যাবে। সঞ্জীব লিখছেন—

"বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মার মুখের প্রতি একবার চাহিল, মার চক্ষে জল আসিল, নববধূ মুখাবনত করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্ক দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে দৃষ্টি গেল, উঠানের এখানে সেখানে পূর্বরাত্রের উচ্ছিষ্টপত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল, কত আলো, কত বাদ্য কত লোক কত কলরব যেন স্বপ্ন। এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা। নববধূর সেই দিকে দৃষ্টি গেল। একটি দুর্বলা কুকুরী—নব প্রসূতি—

পেটের জ্বালায় শুষ্ক পত্রে ভগ্ন ভাণ্ডে আহার খুঁজিতেছে, নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুকুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুকুরী ভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন, নববধূ আর পূর্বমত দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিলেন, 'ব্রাহ্মণভোজনের পর কুকুরী ভোজনই হইয়া থাকে, রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছে, অদ্য আবার এ কেন মা'? নববধূ কথা কহিল না। কহিলে হয় তো বলিত, 'এই কুকুরী সংসারী'।"

সঞ্জীবের অনুভূতির গভীরতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাঁর সহজ কাব্যধর্মিতা। এই কাব্যধর্মিতা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে কত চিত্রধর্মী হয়েছে, পঞ্চম প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে।

"নববধূর পরিবর্ত্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অনুধাবন করিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরিবর্তন অতি আশ্চর্য। একরাত্রের পরিবর্ত্তন বলিয়া আশ্চর্য। নববধূর মুখশ্রী একেবারে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাসও থাকে। তদ্ব্যতীত সে একটু সাবধান, একটু নম্র একটু সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম। বালিকা কি বুঝিল যে মনের এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধায়' পালামৌ সঙ্কলনের সময় পালামৌর ভাবচিত্রের সার্থকতা এই অংশটুকুর মধ্যে পেয়েছিলেন বলেই বোধহয়, এর পরের প্রবন্ধটি 'সঞ্জীবনী সুধায়' স্থান দেন নি। অবশ্য অন্য কারণও থাকতে পারে তার আলোচনা আমরা প্রথমেই করেছি।

এই নববধূর কথা বলতে গিয়ে চন্দ্রনাথ বসু 'সঞ্জীবনী সুধার' সমালোচনায় বলেছেন—

"এইরূপ দর্শন কার্যে তাঁহার অসাধারণ আসক্তি ও অভিনিবেশ ছিল। পালামৌতে যে নব বিবাহিতা মেয়েটির কথা আছে—যাহার কথা, অতি সামান্য হইলেও পড়িতে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে—বোধ হয়, সঞ্জীববাবু না লিখিলে সে মেয়েটিকে আমরা পাইতাম না। এইরূপ কত ক্ষুদ্র কথা সঞ্জীববাবু লিখিয়া গিয়াছেন, এমনি করিয়া দেখায় যে ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি সূচিত হয়, সঞ্জীববাবুতে তাহা যত দেখি অন্য কোন বাঙ্গালা লেখকে তত দেখি না। এইরূপ দেখা সঞ্জীববাবুর হাত এবং ধাত, সঞ্জীববাবুর নিজস্ব।"

চন্দ্রনাথের মন্তব্য যথার্থই সত্য, কেবলমাত্র একটি কথায় আমাদের আপত্তি, 'সঞ্জীববাবু না লিখিলে মেয়েটিকে আমরা পাইতাম না' একথা সাহিত্যিক মাত্রেরই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কেই তা গ্রাহ্য নয়। এই আলোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"চন্দ্রনাথবাবু বলেন, সচরাচর লোকে যাহা দেখে না সঞ্জীববাবু তাহাই দেখিতেন

ইহা তাঁহার বিশেষত্ব। আমরা বলি, সঞ্জীববাবুর বিশেষত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে সে বিশেষত্বের কোন আবশ্যকতা নাই।"[২০]

সত্যই তাই বিশেষত্ব দেখাবার অভিপ্রায়ে অনেক ক্ষুদ্র প্রতিভার লেখক সাহিত্যে অনেক অঘটন ও উৎপাত করেছেন, প্রকৃত শিল্প নিহিত রয়েছে শিল্পীর রস দৃষ্টির মধ্যে—নিঃসন্দেহে সঞ্জীবের তা ছিল, এবং তা ছিল বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেন এই দিকটি উল্লেখ করে বলেছেন—

"সঞ্জীবচন্দ্রের লেখার প্রধান লক্ষনীয় হইতেছে নির্মল রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং আপাত তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়ে আনুবীক্ষণিক লক্ষ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের মত গভীর রসবোধ ও সহানুভূতি ইতি পূর্বে অন্য কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের লেখায় দেখি নাই।"[২১]

উদাহরণ স্বরূপ ডঃ সেন নববধূর প্রসঙ্গটি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন।

পালামৌর ষষ্ঠ বা শেষ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের ১২৮৯ সনের ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় ৫১৪-১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে সাহিত্য সাধক চরিতমালার সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমালার ৩য় খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় (সঞ্জীবচন্দ্র) বলেছেন—

"১২৮৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সর্বশেষ অংশ কি কারণে বলিতে পারি না—সঞ্জীবনী সুধায় বা বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে পুনঃমুদ্রিত হয় নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র কি কারণে শেষ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে গ্রহণ করেননি তা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি না। তবে সে সম্পর্কে কিছু কিছু অনুমান আমরা আগেই করেছি।

আমরা আগেই বলেছি শেষ প্রবন্ধটির রচনা সৌন্দর্য পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলির মত ততখানি গভীর নয়। কিন্তু একথা সত্য এই অংশের মধ্যেও সঞ্জীবের রচনার রসবোধ সহানুভূতি ভাব থেকে ভাবনায় যাতায়াত, অপ্রাসঙ্গিকতা ও প্রসঙ্গচ্যুতি দোষ সব কিছুই লক্ষ্য করা যায়। ফলে আমাদের সন্দেহ যাই থাকুক না কেন, আমরা ধরে নেব শেষ প্রবন্ধটি সঞ্জীবেরই রচনা।

গানের ধুয়ার মত তিনি প্রথম প্রবন্ধে যেমন পালামৌ স্মৃতি রচনায় বৃদ্ধ বয়সের কথা কওয়ার দোষকেই রচনার কারণ বলেছেন, শেষেও সেই কথাটি আবার বলেছেন। তবে প্রথম প্রবন্ধের সঙ্গে শেষ প্রবন্ধের পার্থক্য এই, শুরু করতে গিয়ে এই প্রবন্ধে রচনায় তাঁর অনিচ্ছার কথা বলেছেন, আর এখানে তিনি বলছেন—

"যদি কেহ পালামৌ পড়িতে অনিচ্ছুক হন, আমি বলিব যে তা কেমন করে হবে এখনও যে পালামৌর অনেক কথা বাকি।"

এই অংশে তিনি মজলিসী আড্ডার ঢংটি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখেছেন। বধির

গন্ধবাজ ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে তিনি যে রসিকতা করলেন তার মধ্যে তাঁর পূর্ণ রসবোধের পরিচয় পাওয়া গেলো। কিন্তু তার পরেই মৌয়াগাছের প্রসঙ্গে হঠাৎ চলে যাওয়া ব্যাপারটা এতই আকস্মিক হয়েছে তা আমাদের মনে কোন প্রস্তুতি জাগিয়ে তোলে না। এই ধরণের অসঙ্গতি সঞ্জীবের রচনার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।

মৌয়া প্রসঙ্গে তিনি লঘু তরল হয়ে উঠেছেন। ব্যঙ্গরসিকতার সুরে যে মৃদু ঝঙ্কার তিনি তুলেছেন, তা যেন সুর যন্ত্রে আঘাত দেবার মতই।

সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রিয়তার অন্তরালে যে কোন গভীর উদ্দেশ্য নেই (একমাত্র নিজের ভাষা ভঙ্গীর সমর্থন ছাড়া) তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। অথচ অপ্রাসঙ্গিকতা থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণের সূত্রটি তিনি হারিয়ে ফেলেন নি। একথা ঠিক ভ্রমণের স্থানটি অপেক্ষা ভ্রমণকারীর ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ অস্তিত্ব এখানে সমধিক প্রকাশিত। আসল কথা সঞ্জীবচন্দ্র মানুষটির প্রচলিত অর্থে অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এমনই স্বতন্ত্র যে তিনি তাঁর আত্মপ্রকাশের সামান্যতম পরিসরে সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। সহস্রের মধ্যে তাঁর এককত্বকে চিনে নিতে আমাদের মুহূর্তমাত্র সময় লাগে না। কিন্তু মাঝে মাঝে তথ্যানুসন্ধিৎসার বাড়াবাড়ি রসের হানি ঘটিয়েছে। মৌয়াফুলে পালামৌ অঞ্চলের লোকের বর্ষাকালে কি উপকার হয় অথবা মৌয়া থেকে ব্রাণ্ডি তৈরী করা যায় কি না এই সব তথ্য আমাদের ততখানি আকর্ষণ করে না, কিন্তু যখন দেখি স্মৃতি বিস্মৃতির আলোছায়া আমাদের মনে মাঝে মাঝে রহস্য লোক গড়ে তোলে তখন তারই হাওয়ায় আমাদের মনে কোন এক মায়াজগতের মেঘ-মেদুরতা অন্যজগতের ছায়াখানি দুলিয়ে দিয়ে যায়। সেই অধরা স্মৃতির বাণীরূপটি এমন—

"একদিন ভোরে নিদ্রাভঙ্গে সেই শব্দে (অর্থাৎ মৌয়ার উপর ভ্রমরের গুঞ্জন) যেন স্বপ্নবৎ কি একটা অস্পষ্ট সুখ আমার স্মরণ হইতে হইতে আর হইল না। কোন বয়সের কোন সুখের স্মৃতি, তাহা প্রথমে কিছুই অনুভব হয় নাই, সে দিকে মনও যায় নাই। পরে তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল।...সেই সুর আমার অন্তরে কোথায় লুকান ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। কেবল সুর নহে, লতা পল্লব শোভিত সেই পল্লীগ্রাম, নিজের সেই অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গিগণ' সেই প্রাতঃকাল, কুসুমাবাসিত সেই প্রাতবায়ু তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হইল। সকলগুলি একত্রে বলিয়া সেই সুখ, নতুবা মৌমাছির শব্দে সুখ নহে।"

আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় যাকে 'অনুষঙ্গ' স্মৃতি বলা হয় তারই অপূর্ব রস রূপ আমরা পাচ্ছি। এই অংশ পড়তে পড়তে আমাদের স্বাভাবিক ভাবে মনে হয়, এই অংশটুকু সঞ্জীব ছাড়া আর কারও হাত দিয়ে বোধ করি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল না।

প্রবন্ধের প্রধান গুণ সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

"স্বচ্ছ সত্যবোধ এবং বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় প্রবন্ধ রচনায় যত বড় গুণ, তথ্যজ্ঞান

ততবড় গুণ নহে।”[৫২]

এই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় সঞ্জীবের ছিল, তাই তাঁর পালামৌয়ে তথ্য বিবরণ সত্য হোক বা না হোক সাহিত্যের পক্ষে তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ব্যক্তির ভাব ভাবনার এমন সাবলীল সংমিশ্রণ আমাদের সাহিত্যে সহজে চোখে পড়ে না। যেমন সঞ্জীব লিখছেন,—

“নিত্য মুহূর্তে এক একখানি নূতন পট আমাদের অন্তরে ফটোগ্রাফ হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহা সমুদয় অবিকল সেই পটে থাকিতেছে। সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়। কিন্তু যে পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ, স্পর্শ সকলেই থাকে। ইহা বুঝাইবার নহে, সুতরাং সে কথা থাক। প্রত্যেক পটের এক একটা করিয়া বন্ধনী থাকে, সেই বন্ধনী স্পর্শ মাত্রেই পটখানি এলাইয়া পড়ে বহুকালের বিস্মৃত বিলুপ্ত সুখ যেন নূতন হইয়া দেখা দেয়।”

এই রচনা পড়তে পড়তে আমাদের সন্দেহ জাগে ঊনবিংশ শতকে কি এইটি লেখা হয়েছিল না বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ অথবা বিভূতিভূষণের হাতে এই রচনা সম্ভব হয়েছে? ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষার ক্লাসিক গাঢ়তার স্থলে রবীন্দ্রপ্রভাবিত বিংশ শতাব্দীর ভাষার রোমান্টিক এলায়িত রূপটি এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব সঞ্জীবচন্দ্র আমাদের মাঝে মাঝে জীবনের গভীরতর রহস্যে এমন ভাবে আহ্বান করেছেন যে আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি কেন তাঁর সমগ্র রচনায় এই রকম রসস্রোত অবিশ্রান্ত হতে দেখলাম না? এই সব গভীর কথার পরেই যখন তিনি মৌয়া থেকে ব্রাণ্ডি তৈরীর কথা বলে বলেন—

“আমাদের দেশী মদ একবার বিলাতে পাঠাইতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, অনেক অন্তর জ্বালা নিবারণ হয়।”—তা অবশ্যই তখন আমাদের পীড়িত করে।

ভ্রমণকাহিনী হিসাবে পালামৌয়ের সার্থকতা কতখানি তার পরিচয় আমরা পেলাম বটে, কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, পালামৌ কি বিশুদ্ধ ভ্রমণ সাহিত্য? পালামৌয়ে এমন অনেক বিষয়, এমন অনেক প্রসঙ্গ এসেছে যাকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে কোনমতেই ভ্রমণ সাহিত্য বলতে পারি না। তবে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি ভ্রমণ কাহিনী এমন একটি সাহিত্য যার মধ্যে সাহিত্যের সব কিছুই আসতে পারে। শুধুমাত্র লক্ষ্য রাখতে হবে, লেখক তাঁর রচনায় যে রসলোকটি গড়ে তুলেছেন, তাতে ভ্রমণ নামক ব্যাপারটি আছে কিনা? অর্থাৎ ভ্রমণের স্থানটি ও ভ্রমণকারী (লেখক স্বয়ং অথবা অন্য কোন ভ্রমণকারী চরিত্র) আছে কিনা? অবশ্যই স্থান কাল ও ভ্রমণকারীর অস্তিত্ব কেবলমাত্র কল্পনা নির্ভর হবে না, তাকে বাস্তব হতেই হবে। তাই বাস্তব সত্য ভ্রমণ সাহিত্যের প্রাণ। এই সত্যকে কেন্দ্র করে লেখকের ভাব ও ভাবনা অবাধে আপন পথে আপন বৈশিষ্ট্যে বিবর্তিত হতে পারে। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে রচয়িতার ভাব ও ভাবনা সেই সত্যের কেন্দ্র হতে বিচ্যুত

হয়েছে কিনা। প্রসঙ্গচ্যুতি ও ভাবচ্যুতি এক ব্যাপার নয়। তাই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমাদের কোন অসুবিধে হয় না, সঞ্জীবের পালামৌয়ে পদে পদে প্রসঙ্গ চ্যুতি আছে, কিন্তু পালামৌয়ের প্রকৃতি ও মানুষ নামক ভাব কেন্দ্র থেকে তিনি কখনই চ্যুত হয়ে পড়েন নি। আর সেই কারণেই পালামৌ স্বাদে গন্ধে বৈচিত্র্যে একটি অপূর্ব রসরূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। চন্দ্রনাথ বসু তাই যথার্থই বলেছেন—

"পালামৌ এই প্রণালীতে (নানা প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গ চ্যুতিতে) লিখিত। কিন্তু উপন্যাস না হইয়াও পালামৌর উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়। পালামৌর ন্যায় ভ্রমণকাহিনী বাঙ্গলা সাহিত্যে আর নাই। আমি জানি, উহার সকল কথাই প্রকৃত। কোন কথাই কল্পিত নয়, কিন্তু মিষ্টতা মনোহারিত্বে উহা সুরচিত উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত ও সমতুল্য।"[২৩]

এখানে চন্দ্রনাথের কথায় আমরা জানলাম পালামৌ কোন কল্পিত কাহিনী নয়। বাস্তব সত্যের কেন্দ্রভূমি যেমন এখানে সঞ্জীবের রচনায় প্রমাণিত, তেমন সেই সত্যের সমর্থনে চন্দ্রনাথ ও বঙ্কিম উভয়েই সাক্ষ্য দান করেছেন।

পালামৌ যে ভ্রমণকাহিনী তার প্রমান পেলেও তা কোন জাতীয় ভ্রমণকাহিনী এই প্রশ্নটি আমাদের মনে থেকে যাচ্ছে। পালামৌ যে তথ্যনির্ভর ভ্রমণকাহিনী নয়, সে সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের 'ছোটনাগপুর' রচনাটিতে ছোটনাগপুরের প্রকৃতির যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন। ছোটনাগপুর ভ্রমণকারীর কাছে ঐ বিবরণ পথের সহায়ক কিন্তু তাতে ভাষার অত্যুচ্চ কারুকৃতি থাকা সত্ত্বেও মানুষের উপস্থিতির অভাব লক্ষ্য করার মত। ছোটনাগপুরের প্রকৃতিই সেখানে প্রধান। সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌয়ে প্রকৃতি থাকলেও মানুষের কথা দিয়ে শুরু এবং মানুষের কথা দিয়েই শেষ। ফলে উপন্যাসের প্রধান যে রস মানুষকে ঘিরে গড়ে উঠে পালামৌয়ে তার সুপ্রচুর পরিবেশন লক্ষণীয়। এই দিক গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেছেন—

"পালামৌ ভ্রমণোপন্যাস।...পালামৌর মধ্যেও জীবন এবং প্রকৃতি এক সঙ্গে ভৌগোলিক তথ্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পালামৌ সম্পর্কে এই বিষয়টি একটু গভীর ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে যে, লেখক পালামৌএ ভৌগোলিক তথ্য পরিবেশন করিবার সঙ্কল্প লইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই।...তথ্যের ভার অপেক্ষা আত্মোপলব্ধির গভীরতায়ই প্রবন্ধের সার্থকতা অকিতর প্রকাশ পায়, সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ যদি একান্ত তথ্যনির্ভর রচনা হইত, তবে তাহা ভূগোলের পাঠ্য হইত। কিন্তু তাহা যে তথ্যের ভার যথাসম্ভব পরিহার করিয়া লেখকের বিশিষ্ট জীবন ও সৌন্দর্যবোধকই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছে, সেইজন্যই ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইতে পারিয়াছে।...কমলাকান্তের দপ্তর এবং পালামৌর মত প্রবন্ধ ধর্মী উপন্যাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক রচিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনোপলব্ধি তাহাদের কাহারও মধ্যে প্রকাশ

পায় নাই বলিয়া ইহাদের একাংশ কেবলমাত্র তথ্যসর্বস্ব রচনা এবং আর অংশ উপন্যাস মাত্রই হইয়াছে—যথার্থ প্রবন্ধ ধর্মী উপন্যাস হইতে পারে নাই।… কমলাকান্তের দপ্তর এবং পালামৌ উভয়ের মধ্যেই প্রবন্ধের এক একটি বিশেষ গুণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইজন্য ইহারা উপন্যাস হইয়াও প্রবন্ধ হইয়াছে।"[২৪]

আমরা দেখলাম ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য পালামৌকে উপন্যাস ধর্মী প্রবন্ধ বলেছেন। চন্দ্রনাথ বসুও প্রায় একই ধরণের কথা বলেছেন—

"উপন্যাস না হইয়া পালামৌ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়।"[২৫]

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ভিন্নতর শ্রেণী নির্দেশ করে বলেছেন—

"পালামৌ সঞ্জীবের রচিত একটি রমনীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত।"[২৬]

অন্য পক্ষে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"বস্তুতঃ তাঁহার উপন্যাস রচনার মৌলিক বীজ পালামৌয়ের মধ্যেই নিহিত আছে।"[২৭]

অর্থাৎ ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনা' ও 'মন্তব্যপ্রকাশের অবসর' যেমন পালামৌয়ের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হয়েছে উপন্যাসের মধ্যে ও তার প্রকাশ লক্ষণীয়, যদিও সেখানে তা অবাঞ্ছনীয়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে—

"ভ্রমণকাহিনীকে উপলক্ষ করিয়া কোন আখ্যান ব্যতিরেকেও যে কাব্য উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক রচনা সৃষ্টি করা যাইতে পারে বাঙলা সাহিত্যে তাহার একটি মধুর নিদর্শন হইতেছে পালামৌ।"[২৮]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পালামৌকে প্রবন্ধ, উপন্যাস অথবা ভ্রমণকাহিনী কিছু না বলে স্বতন্ত্র একটি সংজ্ঞায় ভূষিত করেছেন—

"পালামৌ একটি তুলনাহীন ভ্রমণস্মৃতি।"[২৯]

সুধীজনের প্রাগুক্ত মতামত গুলিকে থেকে আমরা এটুকু বুঝলাম, পালামৌকে কেউই নির্দ্দিষ্ট কোন সজ্ঞায় চিহ্নিত করতে পারেন নি। প্রবন্ধধর্মী উপন্যাস অথবা উপন্যাসধর্মী প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী অথবা ভ্রমণের সুখস্মৃতি যাই বলা যাক না কেন আধুনিক সাহিত্যের সংজ্ঞায় পালামৌ প্রকৃতপক্ষে উপভোগ্য সাহিত্যিক নিবন্ধ। রচনা রসসম্ভোগেই এর প্রকৃত সংজ্ঞা নিহিত। পালামৌর মধ্যে একাদিকে যেমন প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট বন্ধন নেই অন্যপক্ষে উপন্যাসের কাহিনীচরিত্র দ্বন্দ্ব ইত্যাদিও কোথাও পরিণতিতে পৌঁছায়নি। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বাজে কথা' বলেছেন সঞ্জীব তাকেই বলেছেন 'কচকচি', আর এই কচকচি গুলি ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়ে অনর্গল আমাদের শুনিয়ে গেছেন, সেখানে স্মৃতি থাকলেও সবটাই স্মৃতি নয়, প্রজ্ঞা থাকলেও দর্শন নেই, মজলিসে বক্তা আসর জমিয়েছেন বটে, কিন্তু আমারও তাঁর পাশে বসে নানা কথা বলছি ও শুনছি। বাজে কথায় মানুষটির আপিসের সাজ ঘুচে গিয়ে আসল মানুষটি আমাদের সামনে আদুড় গায়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন —চরিত্র যদি কিছু থাকে তবে লেখক স্বয়ংই একমাত্র চরিত্র, পাঠক তার দোহারকি।

এই রচনার পালামৌ নামক পার্বত্য অরণ্য প্রদেশে এবং তার অধিবাসী আরণ্য-মানুষেরা এই ব্যক্তিগত রসদোহনের কাজেই লেগেছে। এর প্রধান রস ব্যক্তিগত রস। আবার এই ব্যক্তিগত রসটি সর্বজনীন অহংশূন্য, সংযত ও রুচি মার্জিত। আপনাকে নিয়ে তিনি যে রসিকতা করেন, তার উপরের হাসির ছটার আড়ালে কান্নার মন্দাকিনী প্রবাহিত। ভ্রমণ এখানে আলম্বন মাত্র, এর সমগ্রে বিভাব ব্যক্তিরসে উদ্বোধিত।

পালামৌয়ের ভাষারীতি ও রচনারীতির রহস্যভেদ করলে এর আরও কিছু স্বাদ গ্রহণে আমরা সক্ষম হব। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষারীতি বাংলা ভাষাকে দান করলেন সঞ্জীবচন্দ্র যে তার দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন তা মনে হয় না। তাঁর ভাষারীতিটি একান্তভাবে তাঁরই। তাঁর ভাষাটি কিছুটা অমার্জিত হলেও তার সহজ সৌন্দর্য দ্রুতগতি এবং প্রাণবন্ত। কাব্য সৌন্দর্য পালামৌয়ে আপন বৈশিষ্ট্য সরল ও ভাববহক্ষম হয়ে উঠেছে। এই সরলতাই তাঁর অসাধারণত্ব ও ব্যক্তিত্বমুদ্রাঙ্কিত স্টাইল। তাঁর পালামৌয়ের ভাষারীতি সম্পর্কে সুধীজনের মতামতগুলি লক্ষ্য করলে আমরা সহজেই তাঁর ভাষারীতির ও রচনারীতির রহস্যভেদ করতে সক্ষম হব। চন্দ্রনাথ বসু বলেছেন—

> "সঞ্জীববাবুর ভাষাও সঞ্জীববাবুর ধাত। তাঁহার ন্যায় সরল ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা বালকের কথার ন্যায় সহজ সরল মিষ্ট, কারুকার্যহীন। আর এই যে বালকের ন্যায় ভাষা, সঞ্জীববাবু ইহাতে তাঁহার সামান্য কথাও যেমন লিখিয়াছেন তাঁহার বড় বড় কথাও তেমনি লিখিয়াছেন।"[৩০]

সঞ্জীবের রচনারীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিস কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রধান চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।"[৩১]

'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সমগ্রভাবে সঞ্জীবের রচনারীতি সম্পর্কে যে কথা বলেছেন পালামৌ সম্পর্কেই তা সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য,

> "যাহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা কাহার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত, ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া—এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।"[৩২]

ডঃ সুকুমার সেন বলেন,

> "প্রকাশভঙ্গিতেও সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। নৃত্যরতা কোল তরুনীর দেহে কোলাহল পরিয়া গেল' এই উৎপ্রেক্ষা রবীন্দ্রনাথের

রচনা ছাড়া অন্যত্র অনপেক্ষিত। তখনকার দিনের পাঠকদের কাছে এইরূপ বাক্য অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিতে পারে এই বোধ সঞ্জীবচন্দ্রের ছিল, কিন্তু সমসাময়িক পাঠকবর্গের মুখ চাহিয়া ভবিষ্যতের পাঠকদের প্রতি ইনি অবিচার করিতে পারেন নাই।"৩৩

ডঃ সেন সার্থকভাবেই লক্ষ্য করেছেন সঞ্জীবের ভাষারীতির অগ্রগতি তাঁর নিজস্ব-কালকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পটভূমিতে পদক্ষেপ করেছিল। ভাষারীতিতে এমন ক্রান্তদর্শিতা নিঃসন্দেহে একটি দুর্লভ ক্ষমতা।

পালামৌয়ের ভাষার প্রধানতম গুণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবির মালা গাঁথা। যেখানে ছবির মধ্যে ভাবুকের আবেগ আর্তি দেখা দিয়েছে সেখানে রেখায় রং-এ সঞ্জীবের অন্তর্লোকের কবি মানুষটি আপন সুরে রবীন্দ্রনাথের মত গেয়ে উঠেছেন— 'আমার মন কেমন করে'। এমন মন কেমন করা ভাবুকতা বোধ করি ঐ যুগে সঞ্জীব ছাড়া অন্য কোন গদ্য শিল্পীর রচনায় দেখতে পাওয়া যায় নি। যেমন—

(খ) "কাষ্ঠঘন্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে যে শব্দ আরও যেন অবসন্ন করে।" (২য় প্রবন্ধ)

(খ) "দূরে চারিদিকে পাহাড়ের পরিখা, যেন সেইখানে পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পরিখার নিম্নে গাঢ় ছায়া। অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল। জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই একটি গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে, কোন গ্রাম হইতে হয়তো বিষন্নভাবে মাদল বাজিতেছে, তাহার পর আমার তাঁবু যেন একটি শ্বেত কপোতী, জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে। আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম, আর ভাবিতাম এই আমার দুনিয়া।" (৩য় প্রবন্ধ)

(গ) "বাল্যকালে আমি যে পল্লীগ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি তথায় নিত্য প্রাতে বিস্তর ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল বাঁধাইত। সেই সঙ্গে ঘরে বাহিরে ঘাটে পথে হরিনাম—অস্ফুট স্বরে, নানা বয়সের নানা কণ্ঠে। গুণ গুণ শব্দে হরিনাম মিশিয়া কেমন একটা গম্ভীর স্বর নিত্য প্রাতে জমিত, তাহা তখন ভাল লাগিত কিনা স্মরণ নাই, এখনও ভাল লাগে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সেই স্বর আমার অন্তরের অন্তরে কোথায় লুকান ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। কেবল স্বর নহে। লতা পল্লবশোভিত সেই পল্লীগ্রাম, নিজের সেই অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গিগণ, সেই প্রাতঃকাল, কুসুমবাসিত সেই প্রাতঃবায়ু, তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হইল। সকলগুলি একত্রে একত্র বলিয়া এই সুখ। নতুবা কেবল মৌমাছির শব্দে সুখ নহে।" (ষষ্ঠ প্রবন্ধ)।

আবার ব্যঙ্গ রচনায় সঞ্জীব যে স্মিতহাস্যের চাবুক আস্ফালন করলেন তাতে কষাঘাতের তীব্রতা হারিয়ে গিয়ে তার পরিবর্তে লেখকের ব্যক্তিজীবনের দুঃখবোধ

মিশ্রিত হয়ে জীবনরসের একটি আন্তরিক দিককে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত উচ্ছ্বসিত করে তুলল। তাঁর দৃষ্টির বক্রতা নিজের সাহেবী পোষাকের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, ওকালতি পরীক্ষার প্রতি, ভাতের উপর রাগ সম্বল বঙ্গযুবকের প্রতি আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে শাসনের রক্ত চক্ষু অথবা অপমানের কটু কাটব্য নেই—সেখানে নির্মল পরিহাসের সহাস্য আন্তরিকতাই কিভাবে বর্ত্তমান ছিল তার উদাহরণ আমরা পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি। একথা ঠিক, সচেতন ভাবে সঞ্জীবচন্দ্র পালামৌয়ে ভাষার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু তাঁর রসবোধ ও স্বভাব বৈশিষ্ট্য পালামৌকে তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের এক চির অমলিন জ্যোতি বিম্বিত দর্পণ রূপে প্রতিফলিত করে তুলেছে। আর সেই ব্যক্তি রসই পালামৌকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বকালের অমর সাহিত্যরূপে চিহ্নিত করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

: প্রাবন্ধিক সঞ্জীবচন্দ্র :

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে সাহিত্যগুণান্বিত প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তার আগে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হয় প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত গদ্যের বিকাশ মূলতঃ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। কিন্তু প্রবন্ধ মূলতঃ ছিল বিষয় গৌরবী—অর্থাৎ বাঙ্গালীর নবজাগরণের যুগে নবতর চেতনায় জাগরণে জ্ঞানের সম্ভার বয়ে নিয়ে এসেছিলেন রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরগুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশ বরেণ্য রথীবৃন্দ। এঁদের রচনার মধ্যে যে তাঁদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু জ্ঞানের অর্থাৎ তথ্য ও তত্ত্বের ভার এঁদের প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাধারণত এমনই বিপুল পরিমানে ছিল যে তার মধ্যে প্রাবন্ধিকের আত্মস্বরূপের পরিচয়টি সহজে আবিষ্কার করা ছিল কঠিন, অপর পক্ষে প্রবন্ধগুলি মূলত দার্শনিক ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের উপর রচিত হয়েছিল। সাহিত্য বিজ্ঞান অথবা বিচিত্র বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হয় প্রধানত বঙ্গদর্শন পত্রিকায়।

যদিও সংবাদ প্রভাকর, বিবিধার্থ সংগ্রহ, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে কখনো কখনো সাহিত্য বিজ্ঞান বা অন্য কোন বিষয় নির্ভর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা যাকে সম্পূর্ণত সাহিত্যিক প্রবন্ধ বলি তার নির্ভেজাল নিদর্শন দেখা যায় নি। বঙ্গদর্শন সাহিত্যিক গোষ্ঠী সেই সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনা করে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ণ ভাণ্ডারটিকে পরিপূর্ণ করে তুললেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ রচনায় কৌতুক রসধারার নির্মল ধারা প্রবাহিত করলেন। তাঁর লোকরহস্য, কমলাকান্ত ঐ জাতীয় রচনা। বিবিধ প্রবন্ধ (২টি ভাগ), ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত, বিজ্ঞান রহস্য ইত্যাদি গ্রন্থ জ্ঞান গর্ভ প্রবন্ধের হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্যকে বিষয় গৌরব থেকে বিষয়ী গৌরবের সম্মান দান করলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮৬৪ সালে সঞ্জীবচন্দ্র ইংরাজী প্রবন্ধ পুস্তক 'বেঙ্গল রায়ত' রচনার মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান চর্চার নিদর্শন রেখেছিলেন। তারপর দীর্ঘ আট বছর জীবিকার সন্ধানে তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হতে অনুপস্থিত। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র

তাঁর প্রতিভাকে উৎসাহিত করার জন্যে আহ্বান করলেন। তিনি ১৮৭২ সালের শেষের দিকে 'যাত্রা' প্রবন্ধ রচনা করলেন বঙ্গদর্শনে। ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ব্যক্তিত্বের রসে জারিত হয়ে যা সৃষ্টি করলো তা তাঁর প্রথম বাঙ্গালা রচনা হলেও আমাদের রীতিমত চমকিত করে। এরপর বঙ্কিমের উৎসাহে তিনি 'ভ্রমর' পত্রিকা সৃষ্টি করলেন এবং তার সমস্ত লেখাই একাই তিনি রচনা করতে লাগলেন। প্রতিভার উৎস অনর্গল হল—ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করে তিনি আপন ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। প্রবন্ধ রচনায় তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য যে সাহিত্যিক রূপ লাভ করলো তার পরিচয় আমরা এই অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছি।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করছি। ১। বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ—সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস ও কৌতুক হাস্য বা রম্য প্রবন্ধ ইত্যাদি সব বিষয়েই তাঁর রচনা প্রতিভা প্রসারিত হয়েছে। ২। রচনারীতির মধ্যে শ্লেষাত্মক ভঙ্গী থাকলেও তা তীব্র আক্রমণাত্মক নয় বরং আত্মরসের কারণ্য মিশ্রিত এবং কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল। ৩। সাহিত্য সমালোচনায় মাঝে মাঝেই যুক্তি ও চিন্তার সাম্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ৪। ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধের যুক্তির প্রখরতা অপেক্ষা হৃদয় ধর্মের প্রাবল্য এবং ভাবালুতা লক্ষণীয়। ৫। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে ভ্রান্ত মত ও রক্ষণশীলতার প্রকাশ মাঝে মাঝে থাকলেও প্রধানত মুক্তমন ও গবেষক চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সবচেয়ে বেশী ঘটেছে। ৬। সাহিত্য সমালোচনা ও সামাজিক বিষয় আলোচনায় যেমন তাঁর গভীর রসবোধ ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ আছে, তেমনি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ৭। উদাহরণ, উপমা, কাহিনী কথন প্রবন্ধগুলিকে কোথাও বিন্দুমাত্র ক্লান্তিকর হতে দেয়নি। ৮। প্রবন্ধগুলিতে সর্বত্র তাঁর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ৯। কৌতুক হাস্য রচনায় কোথাও তাঁর রুচিবোধ অমার্জিত বা গ্রাম্যতা দোষ দুষ্ট নয়। ১০। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য থাকলেও কোথাও পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকট নয়, তাঁর অহংবোধ সাহিত্যিক নিরপেক্ষতায় নিরভিমান।

প্রাবন্ধিক সঞ্জীবচন্দ্রের অন্যান্য গুণ আমরা প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের স্বাক্ষরিত বা তাঁর বলে পরিচিত প্রবন্ধ 'যাত্রা সমালোচনা' 'সৎকার', 'বাল্য বিবাহ', 'বৃত্রসংহার' এবং 'বৈজিকতত্ত্ব' আলোচনা করা হয়েছে এছাড়া অস্বাক্ষরিত রচনাগুলির সবকটিই ভ্রমরের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে গ্রহণ করে আলোচনা করা হয়েছে। কি কারণে ভ্রমরের প্রবন্ধগুলি আমরা সঞ্জীবচন্দ্রের বলে গ্রহণ করবো, তা সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছি এবং অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিচারে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তা বলা হয়েছে। অস্বাক্ষরিত রচনার মধ্যে আছে মোট ১০টি প্রবন্ধ—১। ভ্রমর, ২। স্ত্রীজাতি বন্দনা, ৩। নূতন জীবের সৃষ্টি, ৪। ভারত ভাণ্ডারী, ৫। এক ঘরে, ৬। অনন্তা, ৭। দুর্গাপূজা, ৮। বঙ্গে দেব পূজা,

৯। খাদ্যাখাদ্য, ১০। বাহুবল, ১১। সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর আপস, ১২। বাঙ্গালার শূদ্র বংশ, ১৩। ভ্রমরের আত্মকথা, ১৪। বঙ্গে পাঠক সংখ্যা, ১৫। কীর্তন, ১৬। আমি, ১৭। আর্যজাতির চিত্রপট, ১৮। নবাব পিঁপড়ে, ১৯। অকাতরে বিবাহ।

: যাত্রা সমালোচনা :

সঞ্জীবচন্দ্রের 'যাত্রা' প্রবন্ধ দুটি বঙ্গদর্শনের ১ম ও ২য় বর্ষে দুবারে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধ দুটির প্রকাশ কাল ১২৭৯ ও ১২৮০ সন (১৮৭২-৭৪ খৃঃ) দ্বিতীয় প্রবন্ধটি যে প্রথম প্রবন্ধের পরিপূরক ছিল তা পরবর্তী কালে প্রকাশিত 'যাত্রা সমালোচনা' নামে পুস্তিকাটি প্রমান করেছে। অবশ্য যাত্রা সমালোচনা পুস্তিকাটি বঙ্গদর্শনের দুটি প্রবন্ধ এবং 'ভ্রমর' পত্রিকার 'কীর্ত্তন' নামের দুটি প্রবন্ধের (ভ্রমর ১৪ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ এবং ১৫ খণ্ড আষাঢ় ১২৮২ সন) সামগ্রিক পরিমার্জিত রূপ। 'যাত্রা সমালোচনা' ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাই কাঁটালপাড়ার 'বঙ্গদর্শন' যন্ত্রে শ্রী হারানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

এই যাত্রা সমালোচনা প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> সঞ্জীবচন্দ্র যাত্রা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন একখানি ইংরাজী গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে। ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যাত্রার উপরে (প্রধানত কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাগুলির সমালোচনা) গবেষণা করে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। তাঁর উক্ত গবেষণা ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে The yatras or the popular Dramas of Bengal নামে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। সেটি সমালোচনার জন্য বঙ্গদর্শনে প্রেরিত হলে সঞ্জীবচন্দ্র সমালোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা, কালিয়া দমন ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সম্বন্ধে বেশ তথ্যবহ আলোচনা করেন"।[১]

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে তথ্য দিয়েছেন যাত্রা সমালোচনার রচনাকালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখবো তা ঠিক নয়। কারণ যাত্রা সমালোচনা পরিমার্জিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। আর ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের The yatras or the Popular Drama of Bengal প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যাত্রা সমালোচনার সাত বছর পরে। যদিবা ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে সঞ্জীবচন্দ্রের তথ্য গ্রহণযোগ্য তবু সঞ্জীবচন্দ্র কোনক্রমেই নিশিকান্তের আলোচনা থেকে প্রবন্ধের সূত্রপাত করেন নি। এই যাত্রা সমালোচনা সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পূর্ণতই নিজস্ব মৌলিক চিন্তা। তাছাড়া সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কোথাও নামোল্লেখ করেন নি।

মনে রাখতে হবে এই গ্রন্থ রচনার আগে সঞ্জীবচন্দ্র বাংলা সাহিত্য রচনার জন্যে তেমন ভাবে কলম ধরেন নি। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে—'শশধর' পত্রিকায় নাকি তাঁর কৈশোরের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'বেঙ্গল রায়ত' (ইংরাজী) নামে গবেষণা গ্রন্থ ছাড়া সঞ্জীবচন্দ্র অন্য কিছু রচনা করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র উপযুক্ত লোককেই 'বঙ্গদর্শনে' উপযুক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আহ্বান করেছিলেন। বহু বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহী সঞ্জীবচন্দ্র যাত্রা সমালোচনায় তাঁর সেই গবেষণা বৃত্তিকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছিলেন। প্রবন্ধগুলি পত্রিকায় স্বাক্ষরহীন হলেও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হবার সময় গ্রন্থে লেখকের নাম ছিল।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আরো বলেছেন—

"সঞ্জীবচন্দ্রই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যাত্রার ইতিহাস ও স্বরূপ নির্ধারণের কিছু চেষ্টা করেছিলেন।"[২]

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য সর্বাংশে মেনে নেওয়া চলে না। কারণ সঞ্জীবচন্দ্রের আগে বাঙ্গলা এবং ইংরেজীতে যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা তখনকার পত্র পত্রিকাগুলিতে কখনো পত্রাকারে কখনো প্রবন্ধাকারে আবার কখনো বা সংবাদাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে The Hindu Pioneer Vol. 1 No 3. November 1835 ভুবন মোহন মিত্র The Native Theatre নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার বিষয় বস্তু ছিল তৎকালীন নাটক ও যাত্রা। যাত্রা প্রসঙ্গে তিনি বিদ্যাসুন্দর যাত্রার কথা বলেছেন। কালীয়দমন যাত্রা প্রসঙ্গে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় কস্যচিৎ পাঠকস্য ছদ্মনামে যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল তাও যাত্রা অভিনয়ের ইতিহাসের পক্ষে স্মরণীয়—

কালীয়াদমনের ছোঁড়াগুলো সর্বদাই টাকা পয়সা চাহে। তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গভঙ্গ করে সম্মুখে হইতে যায় না। সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয়।"[৩]

সঞ্জীবচন্দ্র প্রায় অনুরূপ মন্তব্য আরো কৌতুক ছলে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে করেছেন।

যাত্রাগানের রুচিহীনতা সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে বহুপূর্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন—

"খেউড় ও কবি যে কি পর্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতা রক্ষা করিয়া বর্ণনা করাও দুষ্কর, যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই। এই সরল বিনোদে (তৎকালের নবীন নাটক) দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেউড় প্রভৃতি দৃশ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—

ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদার্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি।"*

যাত্রা সম্পর্কে এই ধরণের বিক্ষিপ্ত আলোচনা বহু পত্রিকায় নানা ভাবে প্রকাশিত হলেও একথা ঠিক যে সঞ্জীবচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় যাত্রা সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সরস আলোচনা করেন। তবে যাত্রার ইতিহাস বলতে যা বোঝায় সঞ্জীবচন্দ্র তা মোটেই রচনা করেন নি। তিনি নিজে ছিলেন আমোদ-প্রিয় মজলিস মানুষ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এবং তাঁর বিশ্লেষণী প্রতিভা নিয়ে যাত্রার স্বরূপ নির্ধারনের চেষ্টা করেছিলেন।

প্রবন্ধের মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে সঞ্জীবচন্দ্র যে উপন্যাসটি রচনা করলেন তাতে তাঁর প্রাবন্ধিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক বিষয়ের অবতারণার পূর্বে সমাজ প্রকৃতি আলোচনা করলে তবেই সে বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়। সঞ্জীবচন্দ্রের যে সেই দৃষ্টির স্বচ্ছতা ছিল তা প্রবন্ধটির উপস্থাপনায় স্পষ্ট। যাত্রার আসরের অবস্থা, শ্রোতাদের অবস্থা ও রুচিবোধের মান প্রভৃতিও যে এই শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ের রসসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে সে দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার রস ও রুচিবোধের অভাব সঞ্জীবচন্দ্রের বিদগ্ধ রসিক দৃষ্টিতে যে সহজে ধরা পডবে তা বলাই বাহুল্য—

"বিদ্যার সামান্য বিরহে বিদ্যাও কাঁদে না, দর্শকও অশ্রুপাত করে না।"

কিন্তু যখন সুন্দরকে মস্তকচ্ছেদ করার জন্যে মশানে নিয়ে যাওয়া হয় তখন চিরবিচ্ছেদ আশঙ্কায় বিদ্যা কি করে ?

> "বিদ্যা তখন উঠিয়া কঙ্কাল দোলাইয়া নয়ন ঠারিয়া নাচিতে নাচিতে আড়খেমটায় শোক করিতে থাকে। নৃত্য দেখিয়া দর্শক মণ্ডলীতে রসের স্রোত বহিতে থাকে। অমনি বাহবার ঘটা পড়িয়া যায়। বিদ্যা আরও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকে।"

এই সব অংশের আলোচনায় রচনার কৌতুক ক্রমশঃ তিক্ততায় পর্যবেসিত হয়।

এর পর সঞ্জীবচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রার তুলনা করেছেন। কৃষ্ণযাত্রার বিরুদ্ধবাদীরা বলে যারা কৃষ্ণযাত্রা বা কীর্তন শোনে প্রকৃতপক্ষে তারা সুখের জন্যে শোনে না তারা ধর্মার্থে কালীয়দমন যাত্রা শোনে। আমাদের সমাজে কৃষ্ণের যে সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা বলেছেন তা যেন বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের পূর্ব ধ্বনি। যদিও কৃষ্ণচরিত্র এই প্রবন্ধরচনার অনেকদিন পরে রচিত।

বিরহের গভীরতায় রাধার আর্তি যে বিদ্যার থেকে অনেক গভীর তা একটিমাত্র গীতের উদাহরণ দিয়েই সঞ্জীব আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা কৃষ্ণলীলা কেন শ্রেয়তর তা বোঝাতে সঞ্জীবচন্দ্র লিখছেন—

> "উহার (কৃষ্ণলীলা) প্রণেতৃগণ কবি ছিলেন এবং শ্রোতাগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন।"

কিন্তু লেখকের কালে কৃষ্ণযাত্রারও অবনতি হয়েছে কেন তার কারণ নির্ণয় করে তিনি লিখছেন—

"পূর্বে যাত্রার যে স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য ঋষি সাজা হইত, এক্ষনে সেইস্থলে মেথর মেথরানী দ্বারা শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করা হয়।"

এই প্রসঙ্গে মনে হতে পারে সঞ্জীবচন্দ্র হয়তো সাধারণ সংস্কারের দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন বলে ঐ সব কথা বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী অংশে লেখক প্রতিভা ও অপ্রতিভার পার্থক্য সুন্দর নির্দেশ করেছেন।

সমকালীন যাত্রার চরিত্র প্রকটনের স্বরূপটি যে তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা যাত্রা গানের বির্বতনের স্বরূপটি সঞ্জীবচন্দ্র সংক্ষিপ্ত অথচ সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। ভারতচন্দ্রের পরে মধুসূদনের আগে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে অন্ধকার যুগ অতিবাহিত হয়েছিল তার তৎকালীন রুচি বিকৃতির স্বরূপটি সঞ্জীবচন্দ্রের এই মন্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর সময়ে বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তার কারণ সম্পর্কে বলেছেন যে এই যাত্রার প্রধান আকর্ষণ এর গানগুলি, তাদের পরিপাট্য এবং সরলতা। কিন্তু সমাজনীতির দিক দিয়ে বিচার করলে— 'বিদ্যাসুন্দর হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে তাহা অপকৃষ্ট ব্যতীত আর কি হইবে?' কলাকৈব্যল্যবাদীদের মত খণ্ডন করে বলেছেন যেহেতু যাত্রা নাটকের রস সাধারণের মনে সহজে সঞ্চারিত হয়, সেইজন্যে তার মধ্যে সমাজ গ্রাহ্য কোন একটি আদর্শ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। প্রসঙ্গত তিনি বিদ্যার সঙ্গে শেকসপীয়ারের ওথেলো নাটকের ডেসডিমোনার তুলনা করেছেন।

আমাদের দেশে লোকশিক্ষার প্রধান উপায় ছিল দুটি— (এক), পুরাণ কথক, (দুই), যাত্রা। সঞ্জীবের সময়ে পুরাণ ব্যবসায়ীদের দল লুপ্ত প্রায়। যাত্রাওয়ালারাই তখনকার প্রধান শিক্ষক। সেইকারণে—'তথাকার শিক্ষা কত উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা একপ্রকার অনুভূত হইতে পারে।' বিদ্যাসুন্দর যাত্রার শিক্ষা পল্লীর অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত যুবক যুবতীর মধ্যে কি কুফল বিস্তার করেছে তার উদাহরণ তুলে ধরতে তিনি কুণ্ঠিত নন। বিদ্যাসুন্দরের আদিরসাত্মক একটি গীত উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন—

"আশ্চর্যের বিষয় যে এইরূপ গীত পিতা পুত্র লইয়া মাতা কন্যা লইয়া শুনেন, লজ্জা করেন না, সেই পুত্র কন্যা জ্ঞানবান হইলে পিতামাতাকে কিরূপ ভাবিবেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।"

সঞ্জীবচন্দ্রের ঔচিত্যবোধ আজকের কালাকৈবল্যবাদীদের সমালোচনার বিষয় হতে পারে। কিন্তু উনিশ শতকের নবজাগরণের যুগে বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী কলাকৈবল্য-বাদের প্রচারক ছিল না, তাদের সামাজিক কর্ত্তব্য বোধ আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও রুচিহীনতা হতে রক্ষা করেছিল। যাত্রা প্রবন্ধটি তারই উদাহরণ। সঞ্জীবচন্দ্রের রসবোধের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধের যে বিরোধ

ছিল না এই প্রবন্ধটি তার উদাহরণ। তিনি কোথাও রক্ষণশীল বা নীতিবাগীশ হয়ে ওঠেন নি, কিন্তু অশ্লীল গ্রাম্যতা ও রুচিহীনতা তাঁর কাছে নিন্দনীয় বলে মনে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব তাঁর রচনাকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল। যাত্রা প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের নাম 'নৃত্য'। এই অংশের সূচনায় সঞ্জীবচন্দ্র এমন একটি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন যা প্রবন্ধটিকে রীতিমত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। লেখকের কালে যাত্রায় নাচের যে আধিক্য লক্ষ্য করেছেন তার উপস্থাপনাটি চমৎকার—

"এক্ষণকার যাত্রায় নৃত্যই প্রচল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহতর কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা, সকলেই নৃত্য করে। কৃষ্ণনৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন, বোধ হয় বৃদ্ধ রাজা দশরথও নৃত্য করিতেন কিন্তু তিনি প্রায় সকল যাত্রার দলে 'বিহালাওয়ালা' নৃত্য করিতে গেলে বিহালা বন্ধ হয়, নতুবা তাহার ত্রুটি ছিল না।"

সত্যকে রসাত্মক ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবন্ধকার কিন্তু সেকালের যাত্রা পালার বাস্তব ছবি আঁকতে ভোলেন নি।

সঞ্জীবচন্দ্রের নৃত্য সম্পর্কে আপত্তি নেই। কিন্তু তার কদর্যতা তাঁকে আহত করে।

বাঙ্গালার অশিক্ষিত রসজ্ঞানহীন যাত্রাওয়ালাদের হাতে পড়ে যাত্রা যে কোন পথে উপস্থিত হয়েছে তার পর্যায়ক্রমিক আলোচনা সঞ্জীবচন্দ্র করেছেন। প্রথমে তিনি যাত্রার বিষয় ও অভিনয় আলোচনা করেছেন, পরে নৃত্য ও গীতের আঙ্গিক ও অবস্থার আলোচনা করেছেন।

রাগ রাগিনী সৃষ্টির ইতিহাস তাদের স্বরূপ ও মানবমনের উপর তার প্রতিক্রিয়া কেমন তাও তিনি আলোচনা করেছেন।

পশ্চিমী গায়কদের সুর তালের মারপ্যাঁচ নিয়ে ওস্তাদী কসরৎ দেখানোর রীতি আজও দেখা যায়, নিধুবাবুর আবির্ভাবের পর বাঙ্গালার গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ ধরণের আচার আচরণের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল তার সাক্ষ্য আছে সঞ্জীবচন্দ্রের যাত্রা প্রবন্ধে। তেমনি সঞ্জীবচন্দ্রের মতন সত্যকারের রসিকদের সমালোচনা বাঙ্গালার গুণীজনকে সঙ্গীতের সত্যকারের রসসৃষ্টির পথে যে আকর্ষণ করেছিল তাও অস্বীকার করা যায় না।

সংস্কৃতি সম্পর্কে সঞ্জীবের রসদৃষ্টি যে যথেষ্ট পরিমাণে স্বচ্ছ ছিল তার প্রমাণ এই প্রবন্ধে আছে। সংস্কৃতির মাধ্যমে যে জাতির স্বভাব প্রকাশ পায় সঞ্জীবচন্দ্র এই কথাও জানিয়েছেন। কিন্তু রসিকগুণী কেবলমাত্র ত্রুটিটুকু দেখিয়েই ক্ষান্ত হন না, সত্য কোথায়, কি ভাবে তার প্রকাশ, তাও তিনি দেখিয়ে দেন।

রসিক প্রতিভা সঞ্জীবচন্দ্র প্রতিভার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের রূপকগুলি থেকে। যেখানে মহাদেব গায়ক সেখানে তাঁর গানের শ্রোতা

সর্বলোক। মহাকালের কণ্ঠ হতে যে গান ধ্বনিত হয় তাতে সেই মহাপ্লাবিত সুরের স্বরূপ কি ?—

"দূরে কোটি কোটি সূর্য মহাসুরে প্লাবিত, কম্পিত, মহাসুর তথাপি প্রধাবিত। অনন্ত আকাশে মহাদেবের মহাসুর প্রধাবিত। সময় অনন্ত, আকাশ অনন্ত, সুর অনন্ত! অনন্ত! অনন্তের অর্থ অনুভব হয় না। মনুষ্যের সাধ্যাতীত।"

সঞ্জীবচন্দ্রের এই প্রথম বাংলা প্রবন্ধ—এই প্রথম আলোচনা। আলোচনার বর্ণনা প্রাধান্য একালের সমালোচনার ঠিক উপযোগী নয়, কিন্তু এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমকালীন যাত্রার নিজস্ব রূপটি জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। তাছাড়া এই বর্ণনা লেখকের মন্তব্যের ফ্রেমে আঁটা এবং ব্যঙ্গাত্মক সুরে প্রকাশিত। ফলে এর একটা মূল্যায়নও সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে। সেই মূল্যায়নের যাথার্থ্য আজকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এখানেই প্রবন্ধটির সার্থকতা।

: ভ্রমর :

ভ্রমর পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় ১ম পৃষ্ঠায় রচনাটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয় রূপে রচনাটি গ্রহণ করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের অস্বাক্ষরিত রচনাগুলির মধ্যে ভ্রমর একটি ক্ষুদ্র রচনা হলেও সঞ্জীবের রচনাভঙ্গীর স্বাক্ষর বহন করছে। সঞ্জীবের ভঙ্গীর তির্যকতা রচনাটির মধ্যে সুস্পষ্ট।

এই রচনাটিতে প্রকৃতি চিত্রের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক রূপক ইঙ্গিতময়তা সৃষ্টির বিশিষ্ট সঞ্জীবী ঢং অত্যন্ত সুপরিস্ফুট—

"ভ্রমর একবার গুণ গুণ কর।...যেখানে দেখিবে, বঙ্গদেশের মহিরুহগণ বিষয় রৌদ্রে তপ্ত হইয়া, ফল ভারে অবনত হইয়া বিমনা হইয়া আছেন, সেইখানে গিয়া তাঁহাদের ছায়ায় উড়িয়া গুণ গুণ করিয়া তাঁহাদের গুণ গাহিয়া আসিবে। আর যখন দেখিবে যে বঙ্গ সমাজের কেতকী, ঘন প্রাবৃট মেঘাচ্ছন্ন আকাশ তলে সাত পুরু চিকন কাপড়ের ঘোমটা দিয়া, অথচ গ্রীবা উন্নত করিয়া সেই ঘোমটা ঠেলিয়া ঈষৎ কটাক্ষ ক্ষেপন করিতে করিতে কন্টকময় জঙ্গলরূপ ধর্মসমাজে বসিয়া কাহার ধ্যান করিতেছেন, তখন ভ্রমর, তুমি তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিও না।"

এমন নতুন ধরণের সম্পাদকীয় বঙ্কিম প্রভাবিত সঞ্জীবের সুরসিক লেখনীতেই সম্ভব।

: নিদ্রা :

ভ্রমরের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার ২৪-২৮ পৃষ্ঠায় রচনাটি প্রকাশিত হয়। এটি যে সঞ্জীবের তা এর রচনারীতি ও বিষয় নির্বাচন থেকে বোঝা যায়। বিজ্ঞান, আইন, ও ইতিহাসের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের আকর্ষণ কতখানি গভীর ছিল তা তাঁর নামে চিহ্নিত রচনাগুলি থেকে আমরা আগেই জানতে পেরেছি।

নিদ্রা প্রবন্ধটি একটি শরীর ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। সঞ্জীবের বহুশাস্ত্রে জ্ঞান এই রচনায় প্রকটিত। রচনার আরম্ভেই তিনি লিখেছেন—

"আলেকজাণ্ডার বেশ বলেন, আমাদিগের যতগুলি শারীরিক বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে নিদ্রা সর্বাপেক্ষা বলবতী।"

এরপর প্রবন্ধকে আকর্ষণীয় করার জন্যে তিনি কখনো কাহিনীর উদাহরণ, কখনো সরস মন্তব্য কখনো জ্ঞানীজনের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মূল বক্তব্য থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি।— ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ যে সব কৌতুকবহ আচার আচরণ করে তার বর্ণনা দিয়েছেন সঞ্জীব। লেখকের ব্যক্তি অভিজ্ঞতাও এখানে রচনাটি তাঁর বলে প্রমাণ করছে—

"আমরাও শুনিয়াছি যে বহরমপুরে কোন আদালতে একজন আমলা ছিলেন। তিনিও এইরূপ নিদ্রায় পটু। তিনি আহারান্তে আপিসে যাত্রা করিতেন, রাস্তায় পদার্পণ করার পরেই তাঁহার নিদ্রারম্ভ হইত, কাছারীর নিকট তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। কিন্তু এ বিষয়ের সত্যতা আমরা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না।"

বিষয়ের সরস আলোচনা বহু বিষয়ের জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকাশ করে রীতিমত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়ের সারাংশের হিসাব নিয়ে প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করেছেন—

"অতএব নিদ্রা সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা নিশ্চিত বোধ হয়,—

১। নিদ্রাকালে সচরাচর সর্বাঙ্গ ও মন নিশ্চেষ্ট হয়। ইহাই সম্পূর্ণ নিদ্রা।

২। কখনো কেবল সর্বাঙ্গ নিদ্রিত হয়, মন জাগ্রত থাকে।

৩। কখন কোন কোন অঙ্গ নিদ্রিত, কোন কোন অঙ্গ জাগ্রত থাকে।

৪। নিদ্রিতাবস্থায় মন জাগ্রত থাকিলেও মনের সকল শক্তি জাগ্রত থাকে না। নিদ্রিতাবস্থায় যাহা লেখা যায় বা পড়া যায়, নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার কিছুই মনে থাকে না।

৫। কোন কোন অঙ্গ অগ্রে কোন কোন অঙ্গ পরে নিদ্রিত হয়। দেখা যায়, সচরাচর সর্বাগ্রে চক্ষু মুদ্রিত হয়।

: স্ত্রী জাতি বন্দনা :

ভ্রমরের ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় ৩০ পৃষ্ঠায় এই ব্যঙ্গস্তুতিটি প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের "লোকরহস্যের" ব্যঙ্গ বন্দনা জাতীয় রচনার প্রভাব আছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার গভীরতা এখানে অনুপস্থিত। ব্যঙ্গ অপেক্ষা সঞ্জীবের কৌতুক প্রবণতাই এখানে অধিক মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। স্তুতির মধ্যে রসাভাস ঘটিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন—

"তুমি সর্বব্যাপিনী, কেননা সকল ঘরে আছো। তুমি অন্নপূর্ণা, কেননা তুমি আপনার উদর অন্নে পূর্ণ করিয়া থাক, তুমি অভয়া, কেননা তুমি পতির বাবাকেও ভয় কর না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির মানদণ্ড যে রুচিবোধ, এখানেও তা লঙ্ঘিত হয় নি। ব্যঙ্গের সঙ্গে সঞ্জীবের সরস কৌতুক হাস্য এখানে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।—

"হে দেবী। তুমি মনে করিলে সকলের মুণ্ড ঘুরাইতে পার—কথায়। পৃথিবী ভাসাইয়া দিতে পার—রোদনে। পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইতে পার—কলহে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির প্রভাব এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

: নূতন জীবের সৃষ্টি :

ভ্রমরের ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় ৫৬—৬০ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বৈজিকতত্ত্বের লেখকের যে মনোভাব ঐ প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই একই মনোভাব নূতন জীবের সৃষ্টি প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। ডারউইনের মতবাদে বিশ্বাসী সঞ্জীবচন্দ্র জগতে জীবের সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্র স্বীকার না করে মনে করেছেন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের মিলনই জগতে বহু বিচিত্র জীবকুলের সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের জ্ঞানের বাইরে এমন কত জীব আজও সৃষ্টি হয়ে চলেছে। প্রাচীন মতবাদের উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রবন্ধের সূচনা করে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর যুক্তিগুলি প্রতিযুক্তি খণ্ডনের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বৈজিকতত্ত্ব রচনার বেশ কিছুদিন আগেই যে এই মতবাদের উপর প্রবন্ধ রচনার ইচ্ছা তাঁর ছিল তার প্রমাণ এই নূতন জীবের সৃষ্টি প্রবন্ধটি। রচনায় তাঁর শ্লেষাত্মক ভঙ্গীটিও স্পষ্ট। তিনি লিখছেন—

"যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা বোধ হয় এক প্রকার স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রথম প্রথম পরমেশ্বর পাঁচ সাতদিন এই পৃথিবীতে বসিয়া স্বহস্তে নানা জীব জন্তু সৃজন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আর তিনি পৃথিবীতে আইসেন না। কাজেই আর কোন নূতন প্রকারের জীব সৃজন হয় না।"

বঙ্গদর্শনে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার যে সূত্রপাত হয়েছিল, তারই আভাস এখানে স্পষ্ট। প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে সঞ্জীবের তির্যক মনোভঙ্গী আমরা অন্যান্য রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করেছি।

সঞ্জীবচন্দ্রই পুরাণের অবতারবাদের সঙ্গে ডারউইনের বিবর্তনবাদের মিল দেখতে পেয়েছিলেন। উনিশ শতকের চিন্তার মুক্তির ক্ষেত্রে ঐ মতবাদ সঞ্জীবচন্দ্রের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ডারউইন বলেছিলেন পৃথিবীর আদি জীবের সৃষ্টি জলে, ক্রমে অবস্থার পরিবর্তনে ও অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে তারা তারপর ক্রমে উভচর স্থলচর ও খেচর হয়েছে। আমাদের অবতারবাদেও তাই আছে—প্রথমে মীন (জলচর), তারপর কূর্ম (উভচর), বরাহ (স্থলচর), নরসিংহ (পশু ও মানবের মধ্যবর্তী স্তর) ইত্যাদি। অবতারবাদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানবজাতির ক্রমবিকাশের তত্ত্বটি তিনি মনোগ্রাহী ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। পাণ্ডিত্য জাহির করার দুশ্চেষ্টা যেমন তাঁর অন্য রচনায় দেখা যায় না, এখানেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। দৃষ্টির প্রসারতাও এখানে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তিনি প্রবন্ধের শেষে লিখছেন—

"এক্ষণে মনুষ্যের তুলনায় মৎস্য যেরূপ হীন এক সময়ে মনুষ্য আবার কোন ভাবী জীবের তুলনায় সেইরূপ হীন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ক্রমেই যে উন্নত গঠনের জীব সৃষ্টি হইবে এমত বিজ্ঞানবিদেরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে উন্নতি অধোগতি এতদুভয়ই সম্ভব।"

রচনাটির বিষয়, রচনাভঙ্গী ও প্রবণতা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এটি সঞ্জীবচন্দ্রের হওয়াই স্বাভাবিক।

: ভারত ভাণ্ডারি :

ভ্রমরের ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় এবং ৪র্থ সংখ্যার শেষ লেখা ভারত ভাণ্ডারি (৬০ পৃঃ এবং ১০৭—১০৮ পৃঃ।) রচনাটি একটি অতি ক্ষুদ্র কৌতুক রচনা। প্রকৃত পক্ষে ভ্রমর পত্রিকার এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠাটিতে সামান্য জায়গা ফাঁক পড়ে ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র পৃষ্ঠা পূরণের জন্যে এই কৌতুকহাস্যটি রচনা করেন। আধুনিক পত্রিকাকে মনোগ্রাহী করার জন্যে এবং পৃষ্ঠা পূরাণের জন্যে ছোট ছোট খবর, মজার কথা বা

গল্প, বা ছবি, নকসা ইত্যাদি যেমন দেওয়া হয়, ঐ যুগের সাময়িক পত্রগুলিতে ঐ ধরণের কিছু বড় একটা দেখতে পাওয়া যেত না। সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র এই ধরণের পৃষ্ঠাপূরণ করেছেন ভারত ভাণ্ডারির মত কৌতুকহাস্য রচনা করে। এই ধরণের 'ফিচার' ব্যবহার করা সে যুগের পক্ষে সত্যই অভিনব। রচনাটিতে দুটি কৌতুকাহাস্য আছে। প্রথমটিতে লিখেছেন—

"এক দিবস ভারত ভাণ্ডারি নদীতীরে বসিয়া নৌকা গণিতেছেন এমত সময় একজন আসিয়া বলিল, তুমি এখানে বসিয়া কি করিতেছ ? শীঘ্র যাও তোমার মুনিবের সর্বনাশ হইল। তাঁহার ধান্যের গোলায় আগুন লাগিয়াছে। ভারত ভাণ্ডারি আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেমন করে আগুন লাগিল ? গোলার চাবি যে আমার কাছে।"

বিপুল ওজনের নামের মানুষটির ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের অসঙ্গতি হাস্যরস সৃষ্টির মূল প্রেরণা এখানে। সঞ্জীবের রচনার এই গুণটি অন্যত্রও দেখা যায়।

: এক ঘরে :

এক ঘরে প্রবন্ধটি ভ্রমর পত্রিকার ১ম বর্ষের ৪র্থ খণ্ডের ৯৮—১০৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। এই অস্বাক্ষরিত রচনাটিকে আমাদের সঞ্জীবচন্দ্রের বলে গ্রহণ করার যুক্তি সম্পর্কে সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র' প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও রচনাটির আভ্যন্তরীণ এমন সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দেখে রচনাটিকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সঞ্জীবের বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয়।

রচনাটির বিষয়বস্তু বঙ্গ সমাজে একতার অভাব। প্রবন্ধ সূচনায় সঞ্জীব লিখছেন—

"যিনি যাহাই বলুন, বাঙ্গালি মাত্রই এক ঘরে, সহস্র ঘর একত্রে বাস করিলেও আমরা এক ঘরে। একত্রে বাস করার ফল কি আমরা জানি না। এইজন্য তাহা ভোগ করিতে পারি না।"

এই বিষয়টিকেই লেখক আমাদের সমাজভিত্তিতে স্থাপন করে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি এমন কয়েকটি কথা বলেছেন যা তাঁর দামিনী গল্পের কিছু অংশের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। তাত্ত্বিক প্রবন্ধকার সঞ্জীব গল্প উপন্যাসে ক্ষণিক তাত্ত্বিকতা প্রচার করে মাঝে মাঝে কাহিনীর গতিকে ব্যহত করেছেন। তার কারণ খুঁজলে দেখবো একটি প্রবন্ধের চিন্তা যখন তাঁর মাথায় ঘুরতো সেই সময়েই যে উপন্যাস বা গল্প রচনা করেছেন তার প্রভাব সেখানেই রয়েছে। একঘরে প্রবন্ধ ও দামিনী গল্পের রচনাকাল প্রায় একই সময়ে। একঘরে প্রবন্ধে লিখছেন—

"মনে ভাবি, আমাদের উপর ত কোন পীড়ন হয় নাই, তবে অন্যের নিমিত্ত আমরা কেন কথা কহিব, যাহার বিপদ সেই একা ভোগ করুক, আমরা অন্যের নিমিত্ত কথা কহিয়া কেন অনর্থক দোষী হইব। পীড়ন যদি কেবল সেই প্রতিবাসীর উপর শেষ হইত তাহা হইলে এই পরামর্শ বিজ্ঞের মত হইয়াছে বলিতাম। কিন্তু দমন হইতে পীড়ন, সমাজে ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, অন্যের উপর পীড়ন অবাধে সম্পন্ন হইল, কল্য তোমার উপর হইবে।"

অনুরূপভাবে দামিনী গল্প লিখেছেন—

"বিপদ অদ্য আমার কল্য তোমার, অত্যাচার এক ঘরে প্রবেশ করিতে পাইলে সকল ঘরে পথ পায়। অগ্নি এক ঘরে লাগিলে সকল ঘর আক্রমন করে।"

সভ্যতার মূলে যে একতার শক্তি নানা উদাহরণের মধ্য দিয়ে প্রবন্ধটিতে তা চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরেছেন। বাঙ্গালীর সভ্যতার অগ্রগতির মূলে যেমন তার কিছু কিছু বিষয়ে একতা, তেমনি অধোগতির মূলে যে ঐক্যের অভাব তা জানাতেও তিনি ভোলেন নি। পূর্বে যে আমাদের মধ্যে একতা ছিল তা মূলত লোকশিক্ষার মাধ্যমে সাধিত হত। বর্ত্তমানে সংবাদপত্র লোক শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে বটে, কিন্তু সংবাদপত্র পাঠ করার মত পাঠকের সংখ্যা অতি অল্প। সাধারণ অত্যাচার যে অনেক সময় ঐক্যের কারণ তা নীলকর অত্যাচারের উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আধুনিক কাল ও প্রাচীন কালের একতার কারণগুলি দৃষ্টান্ত সহযোগে বর্ণনার ফলে প্রবন্ধের মধ্যে একটি সহজ সরসতার স্পর্শ লেগেছে—যা সঞ্জীবচন্দ্রের অন্যান্য লেখায় স্বতঃই প্রকাশ পেয়েছে। 'বেঙ্গল রায়তের' লেখকের আইন জ্ঞান এই প্রবন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ চিহ্নগুলি প্রমাণ বহন করছে যে এক ঘরে প্রবন্ধট সঞ্জীবচন্দ্রেব হওযাই স্বাভাবিক।

ঃ অনন্তা ঃ

অনন্তা প্রবন্ধটি ভ্রমরের ১ম বর্ষের ৫ম সংখ্যায় ১২৯-১৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিকে আমরা সঞ্জীবচন্দ্রের বলে গ্রহণ করছি। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর সারাংশ তাঁর ভাষাতেই প্রবন্ধের সূচনায় আছে।—

"পৃথিবীর একটি নাম অনন্তা। যখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী অনন্তা, তখন নামটি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কেহ এই পুরাতন নামটি কাড়িয়া লইতে চাহেন। তাঁহারা বলেন যে পৃথিবী মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে এই নামটি লইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার অন্ত পাওয়া গিয়াছে, কতকটা তাঁহার চরিত্র জানা গিয়াছে, আর তাঁহাকে আমরা মিথ্যা নাম ধরিয়া ডাকিব না।"

এই মতবাদের বিরোধীরা সঞ্জীবের মতে মর্ত্য প্রেমী। কারণ—

"পৃথিবী অনন্ত এ বিশ্বাসটি বড় সুখের। যাহাদের এ বিশ্বাস আছে তাঁহারা ভাবেন যেদিকে হউক যতদূর যাইতে ইচ্ছা ততদূর যাওয়া যায় তথাপি পৃথিবীর শেষ হয় না। বাস্তবিক এই কথা ভাবিয়া দেখিতে পারিলে চমৎকার বোধ হইবে।

এই ধরণের কাব্যিক বোধ সঞ্জীবচন্দ্রের অন্যান্য রচনায় আমরা অনেক পরিমাণে লক্ষ্য করেছি। অনন্তা প্রবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে কবি সঞ্জীবের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা মোটেই অপ্রতুল নয়। তবে তাঁর বিজ্ঞান চর্চা মাঝে মাঝে যে ভ্রান্ত বিজ্ঞান চর্চা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ্য করেছিলেন। অনন্তার মধ্যেও সেই ভ্রান্ত বিজ্ঞান চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কোথাও কোথাও তা হাস্যোদ্দীপকও বটে।

প্রাচীন মতামতের আসরে আধুনিক মুক্তমনের সঞ্জীবচন্দ্রের স্ফুরিত অধরের বঙ্কিম হাস্য রেখাটি এখানে আমাদের কাছে সুপরিচিত। প্রবন্ধের শেষে তিনি তাঁর আধুনিক মনটির সুস্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরেছেন—

"সূর্য সিদ্ধান্তের মতে পৃথিবী কদম কুসুমাকার, সূর্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। বিলাতীয় বিজ্ঞান বিদেরাও এই মত অবলম্বন করিয়া অন্য অনেক কথা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছেন।"

আধুনিকতম মতবাদ এই মতবাদটি ভ্রান্ত বলে মনে করলেও ঐ যুগের ঐ মতবাদ ছিল আধুনিকতম।

: দুর্গাপূজা :

ভ্রমরের ১ম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় দুর্গাপূজা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৫১—১৫৩ পৃষ্ঠায়। রচনাটি ছোট হলেও বিশেষত্ব মণ্ডিত। আপাত দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট বলে মনে হলেও রচনাটির মৌলিকতা লক্ষণীয়।—

"আশ্বিন মাসে, মাটিতে প্রতিমা গড়িয়া কি পূজা করি?' দুর্গা। কিন্তু দুর্গা কে? এবিষয়ে নানা মত আছে।" এই সব মতের মধ্যে লেখক বৈদিক, জ্যোতিষ, পৌরাণিক ও সংখ্য প্রভৃতি মত বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

হয়তো সকল মতই মিশাইয়া এই দশভূজা দাঁড়াইয়াছে।" আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে যে সন্তানদলের পরিকল্পনা গভীর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বঙ্কিম করেছিলেন, তার আগেই সঞ্জীবচন্দ্র কণ্ঠমালায় মহাকুলীন সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা করেন। যদিও সেখানে সেই পরিকল্পনা একটি অলীক কল্পনা মাত্র হয়েছে। এখানে দুর্গার যে পরিকল্পনার খসড়া মাত্র সঞ্জীবচন্দ্র করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে তাকেই সম্ভবতঃ— 'মা যাহা ছিলেন, মা যাহা হইয়াছেন এবং মা যাহা হইবেন'—এই গভীর বোধে

রূপায়িত করেছেন। ভাবের আদান প্রদান উভয় ভ্রাতার মধ্যে যে ছিল তার প্রমাণ আমরা উভয়ের রচনার সাদৃশ্য থেকে দেখেছি। তবে বঙ্কিমের বোধের গভীরতা, মনন চিন্তনের সাম্য সঞ্জীবের উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি একথা সত্য। বঙ্কিমের কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' রচনার মধ্যেও আমরা এমনি ভিন্নমুখী ভাবকল্পনার বিস্তার দেখছি। এই রচনাটি কমলাকান্তের রচনার আগে রচিত।

প্রচলিত ধর্মবোধকে সঞ্জীব অথবা বঙ্কিম কেউই নস্যাৎ করে দিতে চান নি, উপরন্তু তাঁরা প্রচলিত ধর্ম ও আচারকে যুক্তিবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি সেই যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর আরও অনেক লেখকের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই রচনাটির মধ্যেও আমরা প্রাচীন সংস্কারগুলির নবরূপায়ণ লক্ষ্য করি। প্রবচনের মত সঞ্জীবচন্দ্র যে সমস্ত মন্তব্য অন্যান্য রচনায় করে গেছেন, এখানেও তার আভাস বর্তমান। দুর্গার সঙ্গে অন্যান্য পূজ্য দেবীর সম্পর্ক কি তারও আলোচনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন—

> "স্থুল চক্ষে যাহারা দেখে, তাহারা সংসারে তিনটি শক্তি দেখে বল, ঐশ্বর্য এবং বিদ্যা —দুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। শক্তি ভাগ্য এবং জ্ঞান।
>
> যে দিকে দেখা যায়, সেই দিকে এ পূজা সাধারণ প্রবৃত্তির অনুকারিণী বলিয়াই লোকের ইহাতে এত অনুরাগ দেখা যায়।"

এই আলোচনা থেকে আর একটি বিসয় আমাদের চোখে পড়ে, সঞ্জীবের বহু বিষয়ে জ্ঞান ও আগ্রহ। বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন-ধর্ম কোন বিষয়ই তিনি স্পর্শ না করে রাখেন নি। সেই সময় নিরাকারবাদী ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে বঙ্কিম যে লেখনী ধারণ করেছিলেন ভ্রমরের ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যায় 'বঙ্গে দেব পূজা' প্রবন্ধটি তার প্রমাণ বহন করছে। সঞ্জীবচন্দ্র দুর্গাপূজা প্রবন্ধে সেই সাকারবাদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন।

: বঙ্গে দেবপূজা :

বঙ্গে দেব পূজা—'শ্রী' স্বাক্ষরে প্রবন্ধটি ভ্রমর ১ম বর্ষ (১২৮১) ৭ম সংখ্যায় ১৫৭-১৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। পরের সংখ্যায় বঙ্গে দেবপূজা (প্রতিবাদ) 'বঃ' স্বাক্ষরে ১৮১-১৮৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হবার পরেই তার পরের সংখ্যায় (৯ম) 'বঙ্গে দেবপূজা' (প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর) প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল সাহিত্য সংসদ থেকে যে বঙ্কিম রচনাবলী প্রকাশ করেন তাতে পুস্তকাকারে অগ্রথিত কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে 'বঃ' স্বাক্ষরিত 'বঙ্গে দেবপূজা' (প্রতিবাদ) প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের বলে

চিহ্নিত করে স্থান দিয়েছেন। অতএব শ্রীযুক্ত বাগলের অনুসরণে প্রতিবাদ প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের বলে নিঃসন্দেহে ধরে নিতে আমাদের আপত্তি নেই। এখন প্রশ্ন 'বঙ্গে দেব পূজা' ও 'বঙ্গে দেব পূজা (প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর)' প্রবন্ধ দুটি কার রচনা? বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধায়' বলেছেন—'প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন।' বিশেষ নামে চিহ্নিত রচনা ছাড়া বাকী সব প্রবন্ধই একা সঞ্জীবচন্দ্রের বলে আমরা ধরে নিতে পারি। বিশেষ করে 'শ্রী' স্বাক্ষর ভ্রমরের সর্বেসর্বা সঞ্জীবচন্দ্রের আত্মঘোষণাই প্রচার করে। প্রবন্ধগুলি আলোচনা করে আমরা দেখবো, সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই যে উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ তিনটির অবতারণা করেছিলেন তাতে ছদ্ম সাহিত্যদ্বন্দ্ব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মধর্মের নিরাকারবাদের বিরুদ্ধে সাকারবাদের প্রতিষ্ঠাই হল মূল লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র সম্ভবত উভয়েই ঐ ছদ্ম লড়াইয়ের পরামর্শ করে নিয়ে তাদের মতবাদ প্রচারে ব্রতী হন। কারণ প্রবন্ধ তিনটি একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাই, পৌত্তলিকতার সপক্ষে কোন মতই খণ্ডিত করেন নি, বরং তিনটি আলোচনায় প্রকাশিত মতবাদের ত্রুটি গুলি দূর করে সামগ্রিকভাবে রচনাগুলির মধ্যে একটি সাম্য আনা হয়েছে।

'বঙ্গে দেব পূজা' এবং 'বঙ্গে দেবপূজা (প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর)' প্রবন্ধ দুটির ভাষাশৈলী আপাত দৃষ্টিতে পৃথক বলে মনে হলেও, প্রকৃত পক্ষে লেখক একইজন, যদিও 'প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে' 'শ্রী' স্বাক্ষর ছিল না। প্রতিবাদের প্রত্যুত্তব যে একই জনের লেখা তা আলোচনার সূত্রপাতেই লেখক জানিয়েছেন। এ বিষয়ে লেখকের অভিন্নত্ব নিয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না।

'বঙ্গে দেব পূজা' প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র সূচনায় বলেছেন—

"দেব মূর্তি বাঙ্গালায় বহুকাল পূজ্য ছিল, এক্ষণে তাহার অন্যথা আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রদায় বিশেষের দেব পূজায় দ্বেষ জন্মিযাছে, এমন কি যাহারা মৎস্য হিংসা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন তাঁহারাও দেবহিংসায় প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় দেবতা প্রায় জড পদার্থ কাহারও অনিষ্ট করেন না। এমন শান্ত দেবতার উপর রাগ কেন?"

এই সূচনার ভাষায সঞ্জীবচন্দ্রের রচনারীতির অতি পরিচিত ভঙ্গীটি আমরা সহজেই চিনতে পারছি। রচনার উদ্দেশ্য ব্রাহ্মদের নিরাকারবাদের উপর কটাক্ষ। যদিও তার মধ্যে যুক্তির ধার অপেক্ষা বিশ্বাসের ভারটিই অধিক। আন্তরিকতা রচনাকে প্রাণবন্ত করছে বটে, কিন্তু ব্যঙ্গের কশাঘাত তাতে নেই বললেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুক্তিবাদী তাই প্রতিবাদের মাধ্যমে সঞ্জীবের যুক্তির অপূর্ণতা দূর করবার চেষ্টা করেছেন। পৌত্তলিক হিন্দু ভাল খায়, ও গৃহ মার্জিত এবং রুচি সম্পন্ন রাখে এটা যে যুক্তি হতে পারে না বঙ্কিমচন্দ্র সেই খানেই প্রথম দৃষ্টিপাত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমের কিছু যুক্তি খণ্ডন করেছেন বললে ভুল হবে, বরং তাঁর ব্যাখ্যায় অপূর্ণতার পরিপূরণ করেছেন। এক্ষেত্রে বাঙ্গালার

ধর্মের বিবর্তন, সংহিতা ও স্মায়ের মাধ্যমে যেভাবে হয়েছে তার সার্থক চিত্র তুলে ধরেছেন। বহু শাস্ত্রে জ্ঞান ও আগ্রহ সঞ্জীবের কতখানি ছিল তার পরিচয় এই প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে আছে। তিনি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'ইউটিলিটি অব রিলিজিয়ান' বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য সমর্থন করেছেন। এ প্রবন্ধে ভাববাদ থেকে তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদে নেমে এসেছেন। পর্যায়ক্রমে একে একে তিনি বঙ্কিমের মতগুলি খণ্ডন করেছেন অথবা সমর্থন করেছেন। আরও হয়তো তাঁর লেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত লিখছেন—

"ব: যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহার অনেকগুলির উত্তর দেওয়া হইল না।"
(দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে কোন স্বাক্ষর নেই)।

: সৎকার :

সৎকার প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের ব'লে স্বীকৃত। ১৮৮১ খ্রী: পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২। দাম ছিল এক আনা মাত্র। বঙ্গদর্শন প্রেসে লেখকের দ্বারা প্রকাশিত ও রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির প্রথমাংশটি ভ্রমরের ১ম বর্ষের ৯ম সংখ্যার ২১৩—২২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা আগেই বলেছি বহু বিচিত্র বিষয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা ছিল। সম্পাদক হিসাবে যখন পত্রিকার সমস্ত পৃষ্ঠা ভরাবার দায়িত্ব একজনের উপর এসে পড়ে, তখন যে ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন জাতীয় রচনার জন্যে লেখনী ধরতে হয় তাতে জ্ঞানের তারল্য প্রকট হবার কথা। কিন্তু এইখানেই সঞ্জীবচন্দ্রের অসাধারণ কৃতিত্ব। বহু বিচিত্র জাতীয় রচনায় তিনি মাঝে মাঝে রীতিমত চমকপ্রদ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। সৎকার প্রবন্ধটি সেই জাতীয়।

সৎকার বলতে মৃত্যুর পর মানবদেহের সৎকারের কথাই বলছেন। সঞ্জীবচন্দ্র একদিকে যেমন ভারতীয় শাস্ত্র দর্শন ইত্যাদি পড়েছিলেন তেমনি তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যদর্শন এবং সমকালের পত্র পত্রিকাও যে যথেষ্ট পরিমাণে পড়তেন তার প্রমাণ তাঁর রচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। তবে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্যে পঠিত গ্রন্থের রাশি রাশি উদ্ধৃতি তুলে রচনাকে অকারণে ভারাক্রান্ত করতেন না। সঞ্জীবচন্দ্র সমকালের বিদেশী পত্র পত্রিকা ও আলোচনা গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধের যে সব তথ্য সংগ্রহ করতেন তার চমকপ্রদ বর্ণনা তাঁর রচনায় দেখতে পাওয়া যায়।

বিষয়কে যতখানি সম্ভব তথ্য সমৃদ্ধ করা যায় সে সম্পর্কে তিনি কোথাও কোন ত্রুটি রাখেন নি। তিনি যেমন তথ্য সংগ্রহ করেছেন তেমনি প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে

যথেষ্ট গৃহিনীপনার পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়ের বিস্তার ও আকর্ষণীয়তার জন্যে যতখানি সম্ভব তিনি আপন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মজলিসী মেজাজে প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সৎকার প্রবন্ধটি ভ্রমর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। দ্বিতীয়াংশটি ভ্রমরের ১ম খণ্ড ১১শ সংখ্যায় ২৮০-২৮৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। যদিও রচনার শেষে ক্রমশ লেখা ছিল। অর্থাৎ সঞ্জীবচন্দ্রের এই বিষয়ে আরও কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল। পরে অবশ্য তিনি নিজেই পুস্তিকাকারে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন, তাই রচনাটিকে আমরা সম্পূর্ণ বলেই ধরে নেব।

: খাদ্যাখাদ্য :

প্রবন্ধটি ভ্রমরের ১ম খণ্ডের ১০ম সংখ্যায় ২৩৫-২৪৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞান আগ্রহ অনুসন্ধিৎসা যে সঞ্জীবচন্দ্রের তীব্র ভাবে ছিল তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। পত্রিকা সম্পাদনায় এইরূপ বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞান, মনন ও চিন্তন একটি মূল্যবান সম্পদরূপে গণ্য হতে পারে। সঞ্জীবচন্দ্র সেই সম্পদের অধিকারী ছিলেন। 'খাদ্যাখাদ্য' প্রবন্ধটি সেই জাতীয় একটি বিচিত্র বিষয়াবলম্বী প্রবন্ধ। নামটি থেকেই আমরা বুঝতে পারি মানুষের খাদ্যাখাদ্য বিচার, তার যুক্তি প্রতিযুক্তিই এই প্রবন্ধের বিষয়ে।

সঞ্জীবচন্দ্র খাদ্যাখাদ্য বিচারে শরীর বিদ্যার নিয়মগুলিকে লংঘন করতে নিষেধ করেছেন। দেশকাল ও প্রাণী ভেদে খাদ্যের যে মঙ্গলকর শক্তির তরতম ঘটে সে বিষয়ে সঞ্জীবের যুক্তিপূর্ণ আলোচনাটি সরস ও বুদ্ধি গ্রাহ্য। যদিও তিনি প্রচলিত ধারণাগুলিকে যুক্তির প্রথম সোপান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা সত্ত্বেও সাধারণ ধারণা থেকে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বুদ্ধির সোপানগুলিও তিনি অনায়াসে পার হয়ে গিয়েছেন। মাংস সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষের বলকারক আহার বলেই তিনি মাংসকে সর্বজনের গ্রাহ্য খাদ্য বলে গ্রহণ করেন নি।

1. Fruits and Farinaccea the Proper Food of Man by John Smith. 2. The Primitive Diet of Man by Dr. F. R. Lees. 3. The Scientific Basis of Vegetarianism by K. I. Trail.

: বাহুবল :

বাহুবল প্রবন্ধটি ভ্রমরের ১ম বর্ষের ১১শ সংখ্যায় ২৭৪-২৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র প্রসঙ্গে যে সমস্ত প্রবন্ধকে আমরা সঞ্জীবের রচনা বলে গ্রহণ করেছি তার মধ্যে বাহুবল প্রবন্ধটি অন্যতম। 'বাহুবল ও বাক্যবল' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ আছে, তবে সে প্রবন্ধের বক্তব্য ও রচনারীতির সঙ্গে এ প্রবন্ধের কোন মিল নেই। এই প্রবন্ধের বিষয় শক্তির স্বরূপ ও তার বিচার। কতকটা বৈজ্ঞানিক এবং কতকটা সামাজিক ভাবনা এর মধ্যে প্রকাশিত।

প্রাবন্ধিকের ভাষায় জগৎ শক্তিময় ও শক্তিচালিত। শক্তিহীনও বাহুশক্তি আশ্চর্যজনকভাবে ব্যয় করছে।—

> "আমাদের এই দুর্বল অবস্থায় নিত্য কত শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা অনুভব করিতে হইলে আশ্চর্য হইতে হইবে।"…

লৌকিক প্রসঙ্গের পর সঞ্জীবচন্দ্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-কোণ থেকে বিষয়ের আলোচনা করেছেন—

> "এত শক্তির ব্যয় হইয়া গিয়াছে—এত শক্তি নিত্য ব্যয়িত হইতেছে, তথাপি শক্তি ফুরায় না। শক্তি অনন্ত। তাহাই বুঝি আমাদের পূর্বপুরুষ শক্তির পূজা করিতেন।"

দেবদেবী মূর্তির বহুভূজ ও শাস্ত্রের কল্পনায় এই শক্তির তারতম্য প্রকাশিত হয়েছে। আদিম মানুষের কাছে বাহুবলই ছিল তার সর্বপ্রধান সম্পদ। সঞ্জীবচন্দ্র বাহুবলের বিবর্তনের মাধ্যমে যে সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে তারই আলোচনা করেছেন।

বিজ্ঞান প্রযুক্ত শক্তি যে আধুনিক জগতের প্রাধান্যের মাপকাঠি ঐ যুগে সঞ্জীবের পক্ষে অনুধাবন করা সহজ হলেও অন্যদের পক্ষে সহজ ছিল না।

: সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর আপস :

এই প্রবন্ধটি ভ্রমরের ১ম খণ্ড ১২শ সংখ্যায় ২৯০-২৯৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। রচনাটি সঞ্জীবচন্দ্রের না হওয়াই সম্ভব। কারণ সম্পাদক রচনাটির সূচনায় মন্তব্য করেছেন—

> "এই প্রবন্ধটি আমরা বহুদিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু যথাসময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই।"

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে রচনাটি কার ?

রচনাটি একটি রূপক রস রচনা। আধুনিক বৈকুণ্ঠে বাঙ্গালা পত্রিকা হাতে লক্ষীর অন্তঃপুরে নারায়ণ প্রবেশ করে দেশের দুর্ভিক্ষের খবর দিয়ে চিন্তিতভাবে দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য লক্ষীকে বঙ্গদেশে যাবার অনুরোধ করলে লক্ষী জানালেন যে তিনি সেখানে যাবেন না, কারণ বর্তমানে সরস্বতী বাঙ্গালায় যাতায়ত করছেন তাই তিনি সেখানে যাবেন না।

লক্ষী নারায়ণের কথোপকথনে বাঙ্গালীর পূজা পদ্ধতি ও তার মধ্যে প্রকাশিত মানসিকতার ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা রচনাটির প্রধান অবলম্বন। লক্ষীর বঙ্গভ্রমণের অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র বর্ণিত হয়েছে। বঙ্গবাসী লক্ষীছাড়া কিন্তু ম্লেচ্ছ ইংরেজই তখন লক্ষীমন্ত। লক্ষী ছাড়া বাঙ্গালীর অবস্থাবর্ণনা সত্যই মর্মস্পর্শী হয়েছে। বাঙ্গালীর অবস্থায় লক্ষীদেবী বুঝলেন বাঙ্গালীর সঙ্গে সরস্বতীরও কোন সম্পর্ক নেই। সেখানে তাঁরও যাওয়া দরকার। এই অবস্থা বর্ণনা করে লক্ষীদেবী বাঙ্গালার দুর্গতি দূর করার জন্যে সরস্বতীর সঙ্গে আপোষ করতে চাইলেন।

রচনাটির সম্পাদকীয় পরিচয় দেখে যদিও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এটি সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা নয়, তবে বঙ্কিমমণ্ডলীর কারও লেখা হওয়া স্বাভাবিক, যদিও অন্য কারও রচনা বলে আমাদের চোখে পড়েনি। তবে রচনারীতি সঞ্জীবচন্দ্রের বলেই বোধ হয়। এমনও হতে পারে সঞ্জীবচন্দ্র চাতুরী করে নিজের রচনাই ঐ ছলনায় প্রকাশ করেছেন। এই সব অনুমান করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় হাতে নেই।

: বাঙ্গালার শূর বংশ :

ভ্রমর পত্রিকার ১ম খণ্ডের ১২শ সংখ্যায় শেষ পৃষ্ঠায় ৩০৫—৩০৬ এই ক্ষুদ্র রচনাটি প্রকাশিত হয়। রচনাটির সূচনা—

"বিক্রমপুর অঞ্চলের কোন বিশেষ পণ্ডিত শূর বংশীয় রাজাদিগের নামাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। নামগুলি আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।"

১। কবিশূর থেকে ১২। বল্লাল সেন পর্যন্ত নামের তালিকা আছে। শূর বংশ থেকে কি ভাবে সেন বংশ শাসন ক্ষমতায় এল তার একটি কৌতূহলজনক বর্ণনা লেখাটিতে আছে—

"অনুশূরের পর বল্লাল সেনের পিতামহ হেমন্ত সেন রাজা হয়েন। পণ্ডিতবর লিখিয়া গিয়াছেন, অনুশূরের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার সন্তান কেহই ছিল না। বল্লাল সেন তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, রাজ্য তাঁহার হস্তেই ছিল অতএব মন্ত্রীর আসন

ত্যাগ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। শূর বংশ হইতে কি প্রকারে রাজ্য সেন বংশে সম্পর্কিত হইল তাহা এ পর্যন্ত জানা ছিল না।"

এই সব ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনের পক্ষে সঞ্জীবচন্দ্রের যে আকর্ষণ ছিল তাও এখানে কিছুটা তৃপ্ত হয়েছে মনে হয়। যদিও রচনাটিতে সঞ্জীবচন্দ্রের বিশিষ্ট রচনারীতির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে রচনার প্রবণতা প্রমাণ করে এটি সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যে যুক্তি ও প্রমাণ নিষ্ঠা বঙ্কিমের ঐ জাতীয় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য বা তার সদৃশ কিছু এই প্রবন্ধে মেলে না। একে যথার্থ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলে গ্রহণ করা কঠিন।

ঃ ভ্রমবেব আত্মকথা ঃ

১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা ভ্রমরের প্রথম রচনা ভ্রমরের আত্মকথা সম্পাদকীয় রচনা হিসাবে এটি আমরা নিঃসন্দেহে সঞ্জীবচন্দ্রের বলে গ্রহণ করতে পারি।

রচনাটির শ্লেষাত্মক ভঙ্গী নিঃসন্দেহে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনারীতি স্মরণ করিয়ে দেয়। ভ্রমরের দ্বিতীয় বর্ষে যে সম্পাদকের আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় ছিল তার প্রমাণ এই রচনাটিতে আছে।—

ভ্রমর পত্রিকার অন্যান্য ইচ্ছার কথা জানাতে গিয়ে বঙ্কিম প্রভাবিত সঞ্জীবচন্দ্র জানিয়েছেন—

"সুখ সাধনের সঙ্গে হিতসাধন করা ভ্রমরের আব একটি অভিলাষ। পুরাকালিক পুরোহিতের ন্যায় ভ্রমর গ্রাহকদিগের হিতসাধনের ব্রত গ্রহণ করিযাছে। হিতসাধন করিতে না পারে হিতাকাঙ্ক্ষী চিরকাল থাকিবে।"

সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র যে প্রতিশ্রুতি ভ্রমরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দিযেছিলেন, তা সম্পূর্ণত না হোক অংশত বঙ্গদর্শন সম্পাদনার মাধ্যমে রাখতে পেরেছিলেন তার আলোচনা সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র প্রসঙ্গে করেছি।

ঃ বঙ্গে পাঠক সংখ্যা ঃ

ভ্রমর ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যায ২-৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'বঙ্গে' পাঠক সংখ্যা' একটি অভিনব রচনা। এদেশে তৎকালে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা, অবস্থা ও তাদের

মনোবৃত্তি নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র একটি আলোচনা উপস্থিত করেছেন। রচনা মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট শ্লেষাত্মক ভঙ্গীটি স্পষ্ট। বাঙ্গালার জনসংখ্যা ও তার বিভিন্ন আনুপাতিক হার তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল। কারণ তিনি প্রথম লোক গণনার (১৮৭২) প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দেশে এত শিক্ষিত সে দেশে এক মাত্র পঞ্জিকা ছাড়া কোন গ্রন্থের তিন হাজার মুদ্রাঙ্কন দেখা যায় না। সাময়িক পত্র দুহাজারের বেশী ছাপা হয় না, যার মোট পাঠক সংখ্যা দশ হাজারের বেশী নয়। এর কারণ বাঙ্গালার ইংরাজী শিক্ষিত বা ইংরাজী সংস্কার সম্পন্ন লোকেরা বাঙ্গালা পড়তে অপমান বোধ করেন। অনেকে নিজ কর্মকে এত বড় করে দেখেন যে তাঁরা কিছুই পড়েন না। অবশিষ্ট লোক পাঠ্য-পুস্তক মাত্র পড়েন কারণ অন্য বই তাঁদের হাতে যায় না। যেটুকু সেই স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষদের হাতে যায় তা বটতলার অপাঠ্য বই। তবু বাঙ্গালার পাঠকের হাতে বটতলা যে সব বই তুলে দিয়েছে তাতেই বাঙ্গালার সাধারণ পাঠক সম্প্রদায় বেঁচে আছে। অন্যান্য ভাল বই সাধারণ পাঠকের হাতে যায় না তার কারণ ঐ সব বই দুর্মূল্য। তাই বাঙ্গালার মানুষকে শিক্ষিত ও রুচিবান করার জন্যে সঞ্জীবচন্দ্র যে সমস্ত বাস্তব পন্থা নির্দেশ করেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতিসম্ভাষণ' প্রবন্ধে অনেকটা অনুরূপ পথনির্দেশই করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র লিখছেন—

> "ক্ষুদ্র গ্রন্থ যেখানে যাইবে কালে তথায় বড় গ্রন্থ পথ পাইবে। ক্ষুদ্র সংবাদ পত্র যেখানে পঠিত হইবে কালে তথায় বড় বড় সংবাদপত্র পঠিত হইবে। অতএব গ্রন্থকার ও সংবাদপত্র লেখকমাত্রেরই এ বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত, এ বিষয়ে তাঁহারা সাহায্য করিলেই তাঁহাদের আপনার লাভ। সামান্য পত্রিকার গ্রাহক বাড়িলে প্রধান পত্রিকার গ্রাহক বাড়িবে। যে সকল সামান্য পত্রিকা পল্লীগ্রামে নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে লীলা সম্বরণ করিয়াছে তাহারা প্রধান পত্রিকার উপকার করিয়া গিয়াছে।"

সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রের এই বোধ যথার্থ। তাঁর বোধ ও ভাবনার অভাব আমরা বিশেষ দেখি না। কেবল অভাব ছিল নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের।

: কীর্ত্তন :

কীর্ত্তন প্রবন্ধটি ভ্রমর পত্রিকার ২য় বর্ষের ১২৮২, ১৪ সংখ্যার ২৫—৩৫ পৃষ্ঠায় এবং ৫৫—৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটি সঞ্জীবচন্দ্রের নামে যদিও প্রকাশিত

হয়নি তবু আমরা নানা আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে এটিকে সঞ্জীবচন্দ্রের বলেই গ্রহণ করবো। প্রথমতঃ, যাত্রা প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ যা ভ্রমরের ১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে ছিল, সেখানে প্রবন্ধের শেষ কথায় লেখক লিখেছিলেন—

"কথা বার্তায় এই একটি উদাহরণ লইয়া আমাদের এত সময় গেল। কাজেই এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইতে পারিল না।"

অর্থাৎ যাত্রায় বিদ্যাসুন্দর ও রামায়ণ পালার আলোচনা থাকলেও তিনি যে কৃষ্ণ-কীর্তনের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছিলেন তার আলোচনা করা হয়নি। যদিও তার বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। সেই প্রসঙ্গে কীর্তন প্রবন্ধটিকে যাত্রা প্রবন্ধের অন্যতম অংশ বলে ধরা যায়। দ্বিতীয়তঃ সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র প্রবন্ধে আমরা কীর্তন প্রভৃতি রচনা কি কারণে সঞ্জীবচন্দ্রের বলে গ্রহণ করতে পারি সে কথাও বলেছি। তৃতীয়তঃ ভাষারীতি নিঃসন্দেহে সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে।

কীর্তন প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ—যাত্রা প্রবন্ধের উপসংহার বলে আমরা এই প্রবন্ধটিকে গ্রহণ করতে পারি। হিন্দু পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী সঞ্জীবচন্দ্রের বিশ্বাস,

"পণ্ডিতরা বলিয়াছেন, পৌত্তলিক ধর্ম কাব্য রসোদ্দীপক।"

তিনি অবশ্য নিজের মত বলে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন নি। তবু তাঁর বিশ্লেষণ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। বৌদ্ধযুগে বাংলায় কাব্যের অভাব। হিন্দু অভ্যুত্থানে জয়দেব গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির আবির্ভাব দেখে তিনি লিখছেন—

"পৌত্তলিক ধর্ম যে রসোদ্দীপক ইহার প্রমাণ আমাদের দেশে কেবল বৈষ্ণব ধর্মে বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে।"

কীর্তনের সুরের গভীরতা স্বীকার করে যে পৌরাণিক উদাহরণ (মহাগায়ক মহাদেব) তিনি তুলে ধরেছেন তা 'যাত্রা' প্রবন্ধের সঙ্গে এক। প্রবন্ধটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের তার আরও একটি প্রমাণ এখানে রয়েছে। কীর্তনে তিনি লিখেছেন—

"আবার অনেকের কৃষ্ণবিষয়ক গীতে বিদ্বেষ আছে। তাঁহারা বলেন রাধা চরিত্র নীতি বিরুদ্ধ। রাধা একের পত্নী হইয়া অন্যকে ভালবাসিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার গল্প পবিত্র সংসারে অপাঠ্য অশ্রাব্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন পবিত্র সংসারে রাধাকলঙ্কিণী অপরিচিতা?"

অনুরূপভাবে তিনি যাত্রা প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

"কৃষ্ণযাত্রারও উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হই। কেননা কৃষ্ণযাত্রা নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি হইতে পারে।·যে দেশের লোকের হাড়ে হাড়ে কৃষ্ণলীলা ঢুকিয়াছে—যাহাদের কথায় রাধাকৃষ্ণ, চিন্তায় রাধাকৃষ্ণ, উৎসবে রাধাকৃষ্ণ, সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ···

একই লেখকের একই ধরণের রচনায় একই মনোভাব সহজে প্রকাশ পায়। কীর্তন প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে।

: আমি :

'আমি' প্রবন্ধটি ভ্রমরের ২য় বর্ষে ১৫ সংখ্যায় ৪৯-৫৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। কমলাকান্তের ঢংয়ে রচিত হলেও রচনাটিতে সঞ্জীবচন্দ্রের নিজস্ব ভঙ্গী ও মননশীলতা সুস্পষ্ট। রচনার সূচনাটি যদিও কমলাকান্তের বিড়াল প্রবন্ধটির কথা মনে করিয়ে দেয়, তবু তার থেকে এর প্রভেদও অনেক।

বক্তব্যের দিক দিয়ে কমলাকান্তের 'আমার মন' বা বিড়াল প্রবন্ধের সঙ্গে আমি প্রবন্ধে একটি আপাত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই রচনার মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের চিন্তার সামঞ্জস্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কৌতুকহাস্যের মধ্যে দিয়ে বক্তব্যকে গভীরতার দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাওয়া অনেক সময়েই সঞ্জীবের পক্ষে সম্ভব হত না। কখনো কখনো গভীর মনের ক্ষণিক উদ্‌ভাস তাঁর রচনার যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে কিন্তু সেই মননকে পরিণতিমুখী করার চেষ্টা সম্পূর্ণ রচনায় অল্পই পাওয়া গিয়েছে রচনাটির বক্তব্য কিভাবে এগিয়ে গিয়েছে তার পরিচয় নেওয়া যাক।

আমি অর্থাৎ সামান্য মানুষের অহংবোধ বড় থেকে ছোট পর্যন্ত সকলের মধ্যে কাজ করছে। অথচ এই অহংবোধ মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। সমাজ সচেতনা যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী অহংবোধের দ্বারা ব্যহত হয়, তা বঙ্কিমচন্দ্রও যেমন কমলাকান্তের নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন, সঞ্জীবচন্দ্রও একইভাবে আমাদের তাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

শেষ পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্রের লেখনীতে গায়ত্রীমন্ত্রের মত উচ্চারিত হয়েছে—

"একবার এই আমি কথার স্থলে আমরা উচ্চারণ করিয়া দেখ দেখি। দেখ দেখি কত সুখী হইবে। একবার উচ্চরবে বল দেখি আমরা বাঙ্গালী, আমরা বঙ্গদেশবাসী আমরা সাহসহীন, তেজোহীন, বিদ্যাহীন, আমরা বিদেশীদের উপহাস ভাজন, আইস আমরা আমাদিগের কলঙ্ক দূরীভূত করি, আইস বাঙ্গালী নাম পৃথিবীতে আদরনীয় করি, আইস ভাই ভাই জ্ঞান করিতে লিখি, আইস মায়ের সুপুত্র হই। আইস মায়ের মুখোজ্জ্বল করি, আইস আমি ছাড়িয়া সকলে একবার আমরা বলিতে শিখি।"

এই প্রবন্ধ রচিত হবার বেশ কিছু কাল পরে স্বামী বিবেকানন্দ 'বর্ত্তমান ভারত' প্রবন্ধে ঠিক যেন একই ভঙ্গীতে একই ভাষায় একই ভাব উচ্চারণ করেছিলেন।

: আর্য জাতির চিত্রপট :

ভ্রমরের দ্বিতীয় বর্ষের (১২৮২ সন) ১৫শ সংখ্যায় আর্য জাতির চিত্রপট প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ৬৯-৭১ পৃষ্ঠার মধ্যে। এই রচনাটি যদিও শ্রীলালমোহন শর্মার নামে প্রকাশিত হয় তবু এই রচনাটিকে আমরা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলেই ধরে নেব। সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই প্রবন্ধটি এবং অন্যান্য প্রবন্ধকে কেন সঞ্জীবচন্দ্রের বলে গ্রহণ করবো তার কারণ আলোচনা করেছি। লালমোহন শর্মা কোন লোকের নাম হতে যদিও আপত্তি নেই, তবু কৌতুকপ্রবণ সঞ্জীবচন্দ্র ঐ ধরণের একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করে তৎকালের পাঠকদের সঙ্গে একটু লুকোচুরি করেছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর ছদ্মনাম ব্যবহার করার প্রবণতা পালামৌ রচনায় সুপ্রকটিত।

তাছাড়া আর্যজাতির চিত্রপট প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার বিশেষ ঢং প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটি নাটকের মত কথোপকথনের মাধ্যমে লেখা। রচনাটি দুটি অংশে বিভক্ত ১। দেবীর বরণ ও ২। শান্তিজল গ্রহণ (চিত্রপট দর্শনে পিতৃভক্তির উদ্রেক)।

দেবীর বরণ অংশে লেখক বক্তব্য বিষয় প্রকাশে একটি কাহিনী বা নাটকীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। শ্রী দুর্গার বিসর্জনের দিন চণ্ডীমণ্ডপে পরিবারস্থ শাশুড়ী বধূকন্যারা দেবীর বিদায় বরণ করে দেবীর মূর্তি দেখছেন। নানা দেবদেবীর মূর্তির পরিচয় জানতে চাইছে কন্যা ও পুত্রবধূরা। জননী তাদের সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে একে একে দেবদেবীর পরিচয় দিচ্ছেন। ভাষার মধ্যে সাবলীল কথ্য ভাষার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের চিরপরিচিত চিত্রের নিখুঁত বর্ণনা এখানে লেখক করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র তৎকালের আধুনিক পাশ্চাত্য মনোভাবের বৈজ্ঞানিক প্রগতির দিকটি গ্রহণ করলেও প্রাচীন সংস্কার সংস্কৃতিও যে মনে প্রাণে ধরবার চেষ্টা করতেন তাঁর প্রাচ্য গবেষণায় যাত্রা, কীর্তন, সৎকার, বঙ্গদেবপূজা, বাল্যবিবাহ, অকাতরে বিবাহ, একঘরে, দুর্গাপূজা প্রভৃতি রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানেও তারই প্রকাশ ঘটেছে।

'আর্যজাতির চিত্রপট' নামকরণটিও এখানে সার্থক হয়েছে। আর্যজাতি কিভাবে তার চরিত্র দেবদেবী মূর্তি ও সাহিত্যের মধ্যে চিত্রিত করেছে লেখক নতুন ঢংয়ে তাই বলেছেন। এখানে ঢংটি অবশ্যই সঞ্জীবচন্দ্রের পরিচিত আকর্ষণীয় ভঙ্গী।

তবে এই প্রবন্ধের রচনা রীতি সঞ্জীবচন্দ্রের পরিচিত রচনারীতির থেকে পৃথক।

সরস তীর্যক মন্তব্য, ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গী বা মননের আকস্মিক গভীরতা দেখা যায় না। তাই বলে একই লেখক ভিন্ন মেজাজের রচনা লিখতে পারেন না এমন ভাবা যায় না। সামাজিক পারিবারিক অভিজ্ঞতা অবশ্য সঞ্জীবের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, তার প্রকাশ এ রচনায় অবশ্য আছে। তাছাড়া 'সম্পাদক সঞ্জীব' আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কি কি কারণে এগুলিকে সঞ্জীবচন্দ্রের বলে গ্রহণ করবো তার আলোচনা করেছি।

: বৈজ্ঞিক তত্ত্ব :

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই পশ্চিমের ভাবধারার প্রভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে বিজ্ঞান-ভাবনা দেখা দিতে শুরু হয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে আমরা বিজ্ঞান ভাবনার যে প্রকাশ দেখলাম পরবর্তী কালে বঙ্গদর্শন লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে তার যথেষ্ট সমুন্নতি লক্ষ্য করেছি। অবশ্য পরাধীন দেশে বিজ্ঞান চর্চা প্রধানত বিজ্ঞান আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতে বিজ্ঞানের প্রধান শাখা অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় এবং সরস আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুল তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ হয়েছে সমকালীন ইংরেজী প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুসরণে, অথচ সে প্রবন্ধগুলি নিছক অনুবাদও হয়নি। লেখকদের নিজস্ব ধ্যান ধারণা উপলব্ধি সেদিন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বন্ধ দ্বারদ্ঘাটন করেছিল। এই সব বিজ্ঞান আলোচনায় সর্বাধিক দান ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ও সঞ্জীবচন্দ্রের। সঞ্জীবচন্দ্রের বিজ্ঞানালোচনা কেবলমাত্র বঙ্গদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ভ্রমরের পাতায়ও স্থান লাভ করেছিল।

শতবর্ষ আগে যে বিজ্ঞান চর্চা ছিল অসাধারণ মনীষার ফল, আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সব তত্ত্ব ও তথ্য হয় সর্বজনের জন্য প্রাথমিক স্তরে নেমে এসেছে, নয় বাতিল হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাই সেদিনের বিজ্ঞানালোচনা অতি আধুনিক কালের নব আবিষ্কার ও চিন্তার আলোকে তুল্য মূল্য নয়। সেভাবে এ প্রবন্ধের বিচারও করা সঙ্গত নয়।

বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ড থেকে শুরু করে নবম খণ্ড পর্যন্ত যে সব প্রধান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার উল্লেখ করলে সমকালীন বিজ্ঞান আলোচনার প্রবণতা আমরা বুঝতে পারবো। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে 'আশ্চর্য সৌরোৎপাত'। এই প্রবন্ধে তিনি

সৌরজগতের কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর আকাশে কত তারা প্রবন্ধে জ্যোতি বিজ্ঞান চর্চা করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধূলা' প্রবন্ধে জল ও বাতাসের অসংখ্য অদৃশ্য বীজাণুর কথা আলোচিত হয়েছে। 'পর্যটন' প্রবন্ধে বেলুন বিমান ইত্যাদি বিষয়ে যে সব আলোচনা করা হয়েছিল, তার ভবিষ্যদ্বাণী আজও আমাদের বিস্মিত করে। 'কতকাল মনুষ্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র পৃথিবী ও মানুষের বয়স সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আলোচনা মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'মানব ও যৌন নির্বাচন' প্রবন্ধে ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যৌন নির্বাচনের আলোচনা করেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালে যে সমস্ত প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে দুটি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সমালোচনা হরিমোহন সেন গুপ্তের 'বিশ্ববিষ চিকিৎসা' গ্রন্থের সমালোচনা 'সর্পবিষ চিকিৎসা' নামে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি আকারে ছোট ছিল না। সর্পবিষ চিকিৎসা সম্পর্কে সমালোচকের জ্ঞান বড় স্বল্প ছিল না। সমালোচক মূলত J. Fayver এর Thanatophidio of India (1872) গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। ১২৮৪ সনের ভাদ্রের সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই সমালোচনায় সমালোচকের নাম জানা যায় নি। এই প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের হওয়া বিচিত্র নয়। প্রবন্ধটির ভাষা থেকে নিঃসন্দেহে কিছু প্রমাণ করা যায় না। যদিও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতে সঞ্জীবচন্দ্র যে যুক্তি নিষ্ঠা দেখিয়েছেন, তার সমতুল্য নিদর্শন ঐ প্রবন্ধের মধ্যেও আছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনা কালে ১২৮৭ সালের আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পদার্থ বিদ্যা গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন শ্রীঃ যোঃ গঃ। এই সমালোচক যে কে তা আমাদের জানা নেই। সমালোচক নির্ভীক ভাষায় ছাত্রবৃত্তির পাঠপুস্তক পদার্থবিদ্যার সমালোচনা করেছেন। সমালোচকের পদার্থ বিজ্ঞানে জ্ঞান সমালোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মিছিলে যে প্রবন্ধটির নাম আমাদের সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে, সেটির নাম 'বৈজিক তত্ত্ব'। প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের ১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র এবং ১২৮৫ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ এই মোট পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় প্রায় শত পৃষ্ঠার এই পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটিতে লেখকের নামোল্লেখ ছিল না। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবৎকালে প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয় নি। এই প্রবন্ধটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের তার একমাত্র সাক্ষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষ্যটি। 'সঞ্জীবনী সুধায়' বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া জাল প্রতাপচাঁদ পালামৌ বৈজিকতত্ত্ব প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।"

বৈজিকতত্ত্ব বা বংশগতিতত্ত্বের অথবা Heridity-এর মূল সূত্রগুলি আবিষ্কারের

প্রথম চেষ্টা করেন গ্রেগর মেণ্ডল (১৮২২-১৮৮৪ খৃঃ)। অপর তিনজন বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলের সূত্রের উপর ১৯০০ সালের আলোচনা করার পর বৈজ্ঞানিক জগতে সূত্রটির পরিচয় ঘটে। অথচ সঞ্জীবচন্দ্র বৈজিকতত্ত্ব রচনা করেন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে মেণ্ডেলের সূত্র নিশ্চয়ই অজানা ছিল। তাই তিনি তাঁর বৈজিকতত্ত্বের সমস্যার সূত্রগুলি মূলত ডারউইন ও হার্বার্ট স্পেন্সারের রচনা থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এই বৈজিকতত্ত্ব বা উত্তরাধিকার তত্ত্ব আজও কোন স্থায়ী সূত্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অতি আধুনিক কালে নোবেল লরিয়েট ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা বৈজিকতত্ত্বের উপর নতুন আলোকপাত করলেও তা এ সমস্যা সমাধানের শেষ কথা নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে সঞ্জীবচন্দ্রের বৈজিকতত্ত্বের আলোচনায় সিদ্ধির গৌরব না থাকলেও বাঙ্গালা ভাষায় তার সূত্রপাতের গৌরব সম্পূর্ণত তাঁরই প্রাপ্য।

বৈজিকতত্ত্ব কি তা বোঝাতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র প্রবন্ধের আরম্ভে বলেছেন—

"জনকের ন্যায় পুত্র হয়, জননীর ন্যায় কন্যা হয় একথা বাঙ্গালার সবত্র রাষ্ট্র। অনেক সময় সন্তানরা কিয়দংশে মাতার ন্যায় হইয়া থাকে একথাও ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ।"

সঞ্জীবচন্দ্র বৈজিকতত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় অত্যন্ত সহজ উদাহরণ গ্রহণ করেছেন। বাঙ্গালার গবাদি পশুর উন্নতি অবনতি কিছু লক্ষ্য না করে বলেছেন যে ঐ সব পশুর আকৃতির উন্নতির জন্যে বৈজিকতত্ত্বের অনুশীলন করা হয় নি তাই তাদের কোন পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গৃহপালিত পশুর যে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার কারণ বৈজিক পরিবর্তন। মানুষ যে ইচ্ছা করলেই গৃহপালিত পশুর আকার আয়তন পরিবর্তন করতে পারে তার উদাহরণ তিনি ডারউইনের Origin of Species (1859) এবং হার্বার্ট স্পেন্সরের Biology Vol II বই থেকে পাদটীকায় উদ্ধৃতি গ্রহণ করে দেখিয়েছেন। কি ভাবে লর্ড সমরবিল মেষের আকার পরিবর্তন করেছেন অথবা কপোতের আকার পরিবর্তিত করেছেন সারজন সিব্রাইট, তার চমকপ্রদ কাহিনী সঞ্জীবচন্দ্র আমাদের শুনিয়েছেন। ভ্রমরে প্রকাশিত একটি অস্বাক্ষরিত রচনা—"নূতন জীবের সৃষ্টি" প্রবন্ধে সঞ্জীব অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয়কে তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কি ভাবে আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুর উন্নতিসাধন করা যায় সে সম্পর্কেও নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রবন্ধকে প্রযুক্তি বিদ্যার অন্যতম আলোচনা বলেও আমরা গ্রহণ করতে পারি।

তিনি ডারউইনের Variation of Animals গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন তা উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হন নি। অথচ তিনি কেবলমাত্র বিদেশী উদাহরণ গ্রহণ করেছেন তা নয়, তিনি নানান দেশীয় বিখ্যাত ব্যক্তির উদাহরণও গ্রহণ করেছেন।

বৈজিকতত্ত্ব প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সঞ্জীবচন্দ্র আলোচনা করেছেন বৈজিক সম্পর্কের ফলে যে কেবলমাত্র নিকট জ্ঞাতিদের মধ্যে আকৃতি প্রকৃতির মিল দেখতে

পাওয়া যায় তা নয়, কখনো কখনো জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক না থাকলেও দুটি মানুষের মধ্যে আকৃতি প্রকৃতিতে আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তাঁর মত, উভয় ব্যক্তিরই বহু পুরুষ আগে একই পূর্বপুরুষ ছিলেন। এর পর প্রাবন্ধিক নানা প্রকার জীবের বহুপুরুষান্তরে যে সাদৃশ্য ঘটে তার ভুরিভুরি উদাহরণ দিয়েছেন। বক্তব্য বিষয়কে প্রামানিক করার জন্যে যে ভুরি পরিমান উদাহরণ দেওয়া দরকার তা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যে অপরিহার্য, সে কথা সঞ্জীবচন্দ্র ভাল ভাবেই জানতেন।

নিখুঁত বিজ্ঞানী গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনার বিষয বিশ্লেষণ করে তৃতীয় পরিচ্ছেদের সুচনা করেছেন। প্রথমেই সঞ্জীবচন্দ্র একটি উদাহরণ গ্রহণ করেছেন। বিদেশে কোন কোন বিধবার দ্বিতীয় বিবাহের পর যে সন্তান হয়, দেখা গেছে বর্তমান স্বামীর মত সন্তান না হয়ে সেই সন্তান মৃত স্বামীর মত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় যেখানে গবেষণাগারে প্রতিষ্ঠিত সত্য পরীক্ষার সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত যে পর্যালোচনার প্রয়োজন, সঞ্জীবচন্দ্র সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র ভারতীয় লোকমতের অনুবর্তী হয়েই বলেছেন—

"গর্ভবতীর চিন্তাস্বরূপ সন্তান হওয়া নিতান্ত অমূলক নহে।"

তবে সঞ্জীবচন্দ্র মূলত ডারউইনের মতভিত্তিতে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে জাতিবিশেষের বৈজিক প্রবলতা ও দুর্বলতার কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে জন্তুর কথা বলে, পরে এই পশুর বৈজিক প্রবলতার উল্লেখ করার পর স্বভাবতই তিনি মানুষের বৈজিক প্রবলতার আলোচনা করেছেন। উদাহরণ প্রসঙ্গে লেখক যে সমস্ত নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন সেগুলি অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছে। অপরপক্ষে বিদেশের মানুষ অথবা জন্তুর যে সব বর্ণনা দিয়েছেন তা তিনি Philosophical Trans. (1987) এবং ওয়াকারের গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে উল্লেখ করতে ভুলে যান নি।

স্ত্রী পুরুষের বৈজিক প্রবলতার প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র পুত্র অথবা কন্যা সন্তান জন্মের হার সম্পর্কে যে তর্ক উপস্থাপিত করেছেন তা যুক্তি সাপেক্ষ হয়েছে।

বৈজিকতত্ত্বের পঞ্চম পরিচ্ছেদে পূর্ব পরিচ্ছেদের আলোচিত সমস্যাগুলি পুনরালোচনা করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে একটি অতি যোগ্য পরিভাষা সৃষ্টি করে ব্যবহার করেছেন। যেমন Interbreeding বা In-and-in-breeding কে তিনি কুলবীজক বলেছেন। এই শব্দটির অর্থ অতি নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ সাধিত হওয়ার ফলে যে সন্তান হয় তারা ঐ বংশের আকৃতি প্রকৃতি যেমন সমজাতিত্ব লাভ করে তেমনি বংশের দোষগুণের সম অধিকারীও হয়। লেখকের মতে আদিম মানবজাতি কুল বীজক ছিল বলেই বিশেষ বিশেষ জাতির উৎপত্তি হয়েছে। এই কুল বীজক প্রথা ব্যবসায়ীরা যে পশুদের মধ্যে ঘটিয়ে একই আকৃতি প্রকৃতির সন্তান উৎপন্ন করেছে তা নয়, সঞ্জীবচন্দ্রের মতে কুলবীজক প্রথা স্বাভাবিক ভাবে বহুজীবের

রয়ে গেছে। সঞ্জীবের মতে কুলবীজক বিবাহের কারণ জনক জননীর মত সন্তান কামনায় নয়, এর কারণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক।

কুল বীজক প্রথা অর্থাৎ জ্ঞাতিগমন বা আত্মীয় বিবাহ সঞ্জীবচন্দ্র মোটেই সমর্থন করেন নি। এই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি যে সব উদাহরণ সংকলন করেছেন তা বেশ শক্তিশালী।

কিন্তু অনেকে একথা একেবারে স্বীকার করেন না। এই জ্ঞাতি গমন প্রথার সমর্থনকারীদের মত দেখবার জন্যে সঞ্জীবচন্দ্র পাদটীকায় লিখছেন—

(See Marriage of Near Kin by Mr. Huth—197S, Westminister Review WCI. See also M. W. Adam on Consangunity in Marriage in the Fortnightly Review—1865.)

এইসব পাদটীকা তাঁর গভীর অধ্যয়নের সাক্ষ্য বহণ করছে। কিন্তু তিনি জ্ঞাতি গমন প্রথার বিরুদ্ধে। তাই লিখছেন—

"আমরা ইহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি, তবে যাহারা ব্যবসা উপলক্ষে পুন: পুন: ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন আমরা তাঁহাদের কথা অবহেলা করিতে পারি না।"

প্রসঙ্গত তিনি অনেকগুলি বিদেশী পশুব্যবসায়ীর কুলবীজক প্রথায় কি ক্ষতি হয়েছে তার সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে ধরেছেন। জ্ঞাতিগমনের ফলে পশুর মূল গুণ রক্ষা হয় বটে কিন্তু শারীরিক দৌর্বল্য প্রভৃতি কয়েকটি দোষ বংশে উপস্থিত হয়। ডারউইনের সমর্থক সঞ্জীবচন্দ্র Variation of Animals গ্রন্থে কুলবীজক সন্তানদের ক্রমাবনতির সন্ধান পেয়েছেন এবং তা বহুতর উদ্ধৃতি সহযোগে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর একটি মত আজও আমাদের মধ্যে অনেকের কাছে গ্রহণ যোগ্য, তা হচ্ছে—

"জনক জননী ভিন্ন ভিন্ন বংশের হইলে একের রোগাংশ অপরের রক্ত দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে।"

বৈজিকতত্ত্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সঞ্জীবচন্দ্র আমাদের দেশে বিবাহ প্রথা কেমন ছিল এবং তার ফলাফল কি হয়েছে তার আলোচনা করেছেন। আলোচনার সূত্রপাতে তিনি কয়েকটি ভুল তথ্য সরবরাহ করেছেন। দোষ অবশ্য তাঁর নয়, কারণ তখনো পর্যন্ত জীববিদ্যা আজকের মত এতখানি উন্নত হয় নি। প্রচলিত ভুল ধারণা তিনি গ্রহণ করেছেন। আজকের প্রমাণিত সত্য পিতৃবীজ ছাড়া সন্তানদের জন্ম কোনমতেই সম্ভব নয়। যদিও তিনি এই মতের সমর্থনে ডারউইন এবং ইবিডের মতের উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন তবু আধুনিক জীববিদ্যা প্রমাণ করেছে পুরুষ প্রাণীর শুক্র ব্যতিরেকে সন্তানজন্ম সম্ভব নয়। বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে প্রথাগত সংস্কারকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের আত্মবিরোধটি অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কুলীনদের বিবাহ ব্যবস্থার উল্লেখ করে সঞ্জীবচন্দ্র ঐ বিবাহ বিধির প্রবর্তক দেবীবর ঘটকের সমালোচনা করেছেন। অথচ সঞ্জীবচন্দ্র বল্লালী কৌলীন্য প্রথার

সমর্থন করেছেন। আধুনিককালের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগে এই সব মত গ্রহণযোগ্য হয় না। যদিও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিবাহকে সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার কথা অনেকেই বলছেন।

শেষ পরিচ্ছেদে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত সন্তানের সঙ্গে জনক জননীর বৈসাদৃশ্যের কথা আলোচনা করেছেন।

যুক্তি তর্কের জাল ভেদ করে বৈজিক তত্ত্বের উপসংহারে আমাদের একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন। আধুনিক কৃষি গবেষণায় তা একটি মূল্যবান সহায় হতে পারে। আধুনিক কালের ধান কি ভাবে বন্য ঘাস থেকে বর্ত্তমান পর্যায়ে এসেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্র।

প্রবন্ধটির ভাষারীতির মধ্যে আমরা পরীক্ষিত সত্যগুলি উদাহরণ সহকারে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে দেখি। প্রবন্ধ রচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার গৃহিনীপণা সত্যই আমাদের বিস্মিত করে। তিনি পণ্ডিত কিন্তু পাণ্ডিত্য.ভিমান কোথাও প্রকট নয়, নিজস্ব বোধ উপলব্ধিগুলির সঙ্গে পাণ্ডিত্যের মানিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। উদাহরণ বর্ণনায় তাঁর গাল্পিক চরিত্রের প্রকাশ এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে প্রবন্ধটিকে কোথাও ক্লান্তিকর করেনি। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করেছিলেন তথ্যমূলক প্রবন্ধ 'বেঙ্গল রায়ত' রচনা ইংরেজিতে করে এবং সেই প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতার চরম প্রকাশ ঘটেছে 'বৈজিক তত্ত্ব' প্রবন্ধটির মধ্যে।

তাছাড়া এই প্রবন্ধটির মধ্যে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তাতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে 'ভ্রমরে' অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'নূতন জীবের সৃষ্টি', 'বাহুবল', 'খাদ্যাখাদ্য', প্রবন্ধগুলি তিনিই রচনা করেছেন। কারণ ঐ প্রবন্ধ তিনটির ভাষারীতি ও বিষয়বস্তু 'বৈজিক তত্ত্বের' অংশ বিশেষের সঙ্গে প্রায় এক।

: বৃত্রসংহার। ২য় খণ্ড। সমালোচনা :

বৃত্রসংহার সমালোচনা বঙ্গদর্শনে ১২৮১ সনে প্রথম খণ্ড ৪৫০ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১২৮৪ সনের বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এযাবৎ বহু সমালোচকই জানতেন যে বৃত্রসংহার সমালোচনা দুটিই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। কিন্তু আমরা কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' গ্রন্থ থেকে জানতে পেরেছি প্রথম খণ্ডের সমালোচনা বঙ্কিমকৃত, এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা সঞ্জীবচন্দ্রের দ্বারা লিখিত। প্রথম খণ্ডের সমালোচনা সম্পর্কে নবীনচন্দ্র লিখছেন—

"তাহার পর বহু সাহিত্যের কথা, পলাশীর যুদ্ধ, বৃত্রসংহার ইত্যাদির কথা, বঙ্গদর্শনে উহার প্রথমভাগের সমালোচনার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—

এ সমালোচনার জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। তোমার কাছে বৃত্রসংহার কেমন লাগিয়াছে? আমি বলিলাম—আমি হেমবাবুর শিষ্য স্থানীয়, আমার আবার মত কি? আমার বেশ লাগিয়াছে। অক্ষয়বাবু (অক্ষয়চন্দ্র সরকার) নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন মন্দ কাহারও লাগে নাই। তবে 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' এই লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব আছে অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া আমার কাছে আপীল করিলে, আমি তাঁহার মত সমর্থন করিয়া আপীল ডিক্রি দিলাম।"[৫]

নবীনচন্দ্রের এই স্মৃতিচারণে আমরা নিঃসন্দেহ হই যে বৃত্রসংহার প্রথম খণ্ডের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রই করেছিলেন। আবার দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা যে সঞ্জীবচন্দ্র করেছিলেন তারও প্রমাণ রয়েছে নবীনচন্দ্রের কথাতেই। 'আমার জীবনে' তিনি লিখছেন—

"শুনিয়াছিলাম, হেমবাবুর বিশেষ অনুরোধেও বঙ্কিমবাবু বৃত্রসংহারের দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা করেন নাই। সঞ্জীব বাবুই দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গদর্শনে উহার এক অতিরিক্ত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। উহাতে বৃত্রসংহারের সাহিত্যিক, আত্মিক, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সর্বশেষ বঙ্গদর্শনের ঘটকালিতে দর্শন বিজ্ঞানের বৈবাহিক কত প্রশংসাই ছিল। কিন্তু তাহাতেও সমালোচকের তৃপ্তি হইল না। সর্বশেষে লিখিলেন বৃত্রসংহার এক শ্রেণীর কাব্য, পলাশীর যুদ্ধ আর শ্রেণীর কাব্য। তবে বৃত্রসংহার পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা ভাল। কেহ কেহ বলিলেন এটি বান্ধবের পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনার উত্তর।"[৬]

অথচ আমরা লক্ষ্য করেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়'-এ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—

"বৃত্রসংহার দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্কিম পরিত্যক্ত আলোচনার সূত্র কুড়াইয়া লইয়া আবার প্রতিসর্গের ঘটনাধারা অনুসরণ করিয়াছেন ও উহার মধ্যে প্রশংসার স্থলগুলি চিহ্নিত করিয়াছেন।"[৭]

কিন্তু সাহিত্যসাধক চরিতমালায় সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলীর পরিচয় প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বৃত্রসংহার দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনাকে সঞ্জীবের বলে উল্লেখ করেন নি। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ভ্রান্তির মূলে রয়েছে সমালোচনায় সমালোচকের কোন নাম না থাকা। পরবর্তী কালের কোন কোন সমালোচক তাঁদের গভীর বীক্ষণশীলতার গুণে বৃত্রসংহার (দ্বিতীয় খণ্ড) সমালোচনাকে সঞ্জীবের বলে উল্লেখ করতে ত্রুটি করেন নি। যাই হোক, বৃত্রসংহার (দ্বিতীয় খণ্ড) সমালোচনা যে সঞ্জীবচন্দ্রের তা নিয়ে আমাদের কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সমালোচনার গুণাগুণ বিচার করবার আগে সমালোচনাটিতে সঞ্জীবচন্দ্র যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তার পরিচয় নেওয়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র যে পদ্ধতি প্রথম খণ্ডে বর্ণানুক্রমিক পরিচয়

দিয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্রও সেই ভাবে সমালোচনা করেছেন, তবে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও খুব স্পষ্ট।

সমালোচনার সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনার সূত্র কুড়িয়ে নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র লিখছেন—

"প্রলয়ের ঝড় বৃষ্টি মিটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের আবদার মিটে না। ঐন্দ্রিলা লেডি মেকবেথের মত স্বামীর আশংকা মুখ ঝামটায় উড়াইয়া দিলেন।"

দধীচির আত্মত্যাগ দৃশ্যটি সম্পর্কে সঞ্জীবের মন্তব্যটি সুসমালোচকের মতই হয়েছে—

"সুশীতল সাগরবৎ এই কাব্যাংশে মনকে মোহিত করে—ইহার অতলরস প্রবাহে মন ডুবিয়া যায়।"

কাব্যের চতুর্দশ সর্গ থেকে অষ্টাদশ সর্গ পর্যন্ত সমালোচক প্রায় কোন মন্তব্য না করে বিষয় বস্তুর পরিচয় দিয়েছেন। একটু মনোনিবেশ করে লক্ষ্য করলে আমরা সঞ্জীবের বর্ণনায় একটি সূক্ষ্ম বঙ্কিম হাস্য রেখা সর্বত্র প্রায় দেখতে পাবো। প্রশস্তি করতে বসে লেখক কাব্যখানির বহু দোষ ত্রুটি দেখা সত্ত্বেও কেবলমাত্র প্রশংসার অংশটি বেছে বেছে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে ত্রুটিগুলি এড়িয়ে যাবার সময় বক্রকটাক্ষটি একেবারে বর্জন করতে পারেন নি। আর সেই জন্যেই সেই সব অংশ সম্পর্কে কোন মন্তব্য সযত্নে বর্জন করে গেছেন। সমালোচক কেবল মাত্র সত্যকারের প্রশংসারযোগ্য অংশগুলি অতিরিক্ত প্রশংসা যুক্ত করে প্রকাশ করেছেন।

উপন্যাসকার ও ভ্রমণ কথাকার রূপে সঞ্জীবের যে পরিচয়টি আমরা পেয়েছি তার মধ্যে তাঁর ভাবুক চরিত্রের বিকাশটিই সর্বাপেক্ষা বেশী দেখেছি। অবশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সঞ্জীবের মনন চিন্তন ও ভাবনা প্রাধান্যের পরিচয় যে পাইনি তা নয়। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সঞ্জীব তাঁর সমস্ত ভাবকতার স্বপ্ন রাজ্য ছেড়ে প্রবেশ করেছেন। মননশীলতা ও সাহিত্যরস সম্ভোগের ক্ষমতা সঞ্জীবের কতদূর ছিল তার পরিচয় আমরা সামান্য দুই একটি প্রবন্ধে মাত্র পেয়েছি—তাতেই তাঁর কৃপণ প্রতিভার কণামাত্র দানে বুঝিতে পারি তিনি কত ধনী ছিলেন।

যদিও সঞ্জীবচন্দ্র বৃত্রসংহার কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, কিন্তু কোথাও পরিমিতি বোধকে তিনি লঙ্ঘন করে যান নি। নবীনচন্দ্রের কথায় জানতে পেরেছি হেমচন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই তিনি বৃত্রসংহারের সমালোচনা লেখেন। সেক্ষেত্রে স্তুতি ও উচ্ছ্বাস থাকা স্বাভাবিক। তাই বলে তিনি কখনও কোন প্রথম শ্রেণীর কাব্যের সঙ্গে বা কবির সঙ্গে হেমচন্দ্রের তুলনা করেন নি। তিনি তাঁর গভীর রসবোধ থেকে সম্ভবত এটা বুঝতেন মধুসূদনের সঙ্গে হেমচন্দ্রের শক্তির তুলনা চলে না, আবার তিনি মিলটনের বা সেকসপীয়রের শক্তির তুল্যমূল্য করে হেমচন্দ্রের ভরাডুবি করেন নি। তাঁর কাব্যকে কেবলমাত্র তাঁর শক্তিতেই বিচার করেছেন, বড়োজোর পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে একটি তুলনা করেছেন এবং এর জন্যে নবীনচন্দ্র বেশ ক্ষুন্নও হয়েছিলেন বোঝা যায়। তবু সেই তুলনার মধ্যে পলাশীর

যুদ্ধকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোনরূপ উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। প্রসঙ্গত তিনি লিখছেন—

"পলাশীর যুদ্ধ একটি উদাহরণ। একটি উৎকৃষ্ট কাব্য বটে, কিন্তু কতকগুলি সুমধুর, ওজস্বী গীতি কাব্যের সংকলন মাত্র। বৃত্রসংহারের লক্ষ্য মহত্তর সুতরাং উচ্চতর স্থান ইহার প্রাপ্য।"

এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একালের সমালোচকও একমত হবেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাহুবল বাক্যবল' প্রবন্ধে যেমন শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে বলেছেন বাক্যবল অর্থাৎ মানুষের শুভবুদ্ধিই সমস্ত শক্তির শেষ জয়স্থল, তেমনি সঞ্জীবচন্দ্রও তাঁর মীমাংসাকে সেই দিকেই নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন বৃত্রসংহার সমালোচনায়। তার মতে যেহেতু দর্শন ও বিজ্ঞান প্রমাণ নির্ভর শাস্ত্র তাই 'বাহুবলই বাহুবলের সীমা' এই সিদ্ধান্তই তাদের শেষ সিদ্ধান্ত।

লক্ষণীয় সৌন্দর্য সৃষ্টিই যে কাব্যের উদ্দেশ্য এরূপ সিদ্ধান্তে সমালোচক পৌঁছেছেন, কিন্তু এই সৌন্দর্য সৃষ্টির হেতু নির্ণয়ে তিনি বিবিধ নীতিতত্ত্বের দ্বারস্থ হয়েছেন, বঙ্কিমসমালোচনার আদর্শই তাঁর প্রধান অনুপ্রেরণা (দ্রঃ উত্তরচরিত)। আলোচনার সব শেষে সঞ্জীবচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন বৃত্র সংহার কাব্যে স্ত্রী চরিত্রের অমোঘ প্রাধান্য। অমানবিক হওয়া সত্ত্বেও প্রতি স্ত্রী চরিত্রে মানবিক ধর্ম সুন্দরভাবে আরোপিত হয়েছে তার প্রমাণ তিনি প্রধান স্ত্রী চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন।

সাহিত্য ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে সঞ্জীবচন্দ্র কোন গভীর গবেষণায় প্রবেশ না করলেও তাঁর চিন্তন মননের মূলে তাঁর গভীর সামাজিক দৃষ্টির প্রতিফলন আমরা দেখেছি বৃত্রসংহার (দ্বিতীয় খণ্ড) সমালোচনায়। আমরা জানি মেঘনাদবধ কাব্যের বিপুল সৃজনী শক্তি অনুধাবণ করার ক্ষমতা সে যুগের পাঠকের অল্পই ছিল। প্রচলিত সংস্কারও ধারণার উপর মধুসূদন যে অভিঘাত হেনেছিলেন তাতে সে যুগের পাঠক সমালোচক সকলেই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার সেই বিভ্রান্তির উপর সান্তনার মত দেখা দিয়েছিল। ফলে সে যুগের সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁর ভাগ্যের অযাচিত ভাবে জুটে গিয়েছিল। ১৮৭৩ সালে মধুসূদনের মৃত্যু উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের সোচ্ছ্বাস প্রশংসায় লিখেছিলেন—

"কিন্তু বঙ্গকবি সিংহাসন শূণ্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক।"

এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রভাব ও সঞ্জীব বঙ্কিমের সঙ্গে হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, হেমচন্দ্রের কাব্যকে শ্রেষ্ঠতর জয়মালা পরিয়ে ছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' (১২৮৯) পত্রিকায় 'মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনায় মধুসূদনের তুলনায় হেমচন্দ্রকেই বরমাল্য দিলেন। মধুসূদনের আপাত বিজাতীয় ভাব ভাবনাকে বরণ করে নেবার

মত ক্ষমতা সে যুগের পাঠকের ছিল না। সে যুগের নবজাগ্রত জাতীয়াবাদের উত্তেজনায়, বৃত্রসংহার কাব্যের অনাহত হিন্দুসংস্কার, অগভীর রসাবেদন এবং বিপুলতার মধ্যে অহিন্দু মধুসূদনের মুখের মত জবাব খুঁজে পেল সে যুগের পাঠক ও সমালোচক। এই যুগ প্রেক্ষাপটে সঞ্জীবের বৃত্রসংহার কাব্যের সমালোচনা যুগ ধর্মকে কোথাও অতিক্রম করেনি। বক্তব্য নির্মাণের ক্ষেত্রে সঞ্জীবের কোন নব নির্মিত ক্ষমতা আমরা দেখতে পাব না। সাহিত্য সমালোচনার কাঠামো বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে রচনা করেছিলেন তার বাইরে সঞ্জীব এক্ষেত্রে কোথাও ব্যতিক্রম ঘটান নি। ভাষার তির্যক ভঙ্গি অম্লমধুর কটাক্ষ ও কোথাও কোথাও সুললিত কাব্যিক ভাষার ছন্দোময় প্রকাশ বৃত্রসংহার (দ্বিতীয় খণ্ড) সমালোচনাকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। বর্ণনারীতি তো রীতিমত বঙ্কিমী ঢংয়ের, যার ফলে অনেক বিদগ্ধ সমালোচক বৃত্রসংহারের (দ্বিতীয় খণ্ড) সমালোচনাকে নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের রচনা বলেই ধরে নিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সাহিত্য সমালোচনার যে মাপকাঠিটি নির্দিষ্ট হয়েছিল সঞ্জীবচন্দ্র মূলত সে মান অনুসরণ করলেও সমালোচিত কাব্যের কবির সঙ্গে বাস্তব সম্বন্ধ থাকায় মাঝে মাঝে তা স্তুতি মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। হয়তো এই কারণেই কখনও কখনও প্রবন্ধটির মধ্যে দৃঢ় যুক্তির নিষ্ঠা অপেক্ষা অসংযত অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের প্রগলভতা লক্ষ্য করা যায়। অথচ অন্যান্য প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ত্রুটি বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না।

প্রাবন্ধিক সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন মূলত গবেষক ও জ্ঞানী। তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা মাঝে মাঝে প্রবচনের মত বিদ্যুৎ চমক সৃষ্টি করলেও তথ্য বিচারেই ছিল তাঁর দক্ষতা। তাই সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি রচনাকে মূলত তথ্য ভিত্তিক করে তুলেছিলেন। একদিকে যেমন সমালোচ্য গ্রন্থের পর্যানুক্রমিক আলোচনা বা রসবিচার করেছেন, তেমনি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনার তুলনামূলক আলোচনাও পাশাপাশি রেখে গেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র বৃত্রসংহার (দ্বিতীয় খণ্ড) সমালোচনায় যে সমালোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তাকে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির একটি মধ্যবর্তী পথ বলতে পারি। সঞ্জীবচন্দ্র বৃত্রসংহার সমালোচনায় প্রথমাংশে রসোপলব্ধিকে আলোচনার মুখ্যবিষয় করলেও শেষ অংশে কাব্যের সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাঁর রক্ষণশীলতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। সাহিত্য রচনা ও রসগ্রাহীতায় সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা ও দক্ষতার অভাব না থাকলেও বঙ্কিমের পদ্ধতি অনুসারী হয়েও তাঁর মধ্যে চিন্তার সুনির্দ্দিষ্টতা সম্পূর্ণত কার্যকরী হয়নি। সাহিত্য সমালোচনায় জ্ঞান বুদ্ধি মনন চিন্তনের যে সাম্যবোধ থাকা আবশ্যক সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে তার কিছুটা অভাব লক্ষ্য করা যায়।

সদ্য প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের সমালোচনায় যে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় সেখানে শাশ্বত কালের বিচারের চরম রায় দান করতে পারে একমাত্র বিপুল প্রতিভাধর

লেখকের বহুদর্শিতা। মহাকালের কিছু হস্তাবলেপ ছাড়া সে বিচারও অনেক সময় সঠিক হয় না। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা কি দাঁড়ায় সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—

> "কবির রন্ধনশালায় প্রস্তুত খাদ্য সদ্যসদ্যই সমালোচকের পাত্রে পরিবেশিত হইয়াছে ও সমালোচকও ভোজন ব্যাপারে মহূর্তমাত্র বিলম্ব করেন নাই। কাজেই সমালোচনার মধ্য দিয়ে ভোজন রসিকের প্রথম স্বাদুতা বোধই অভিব্যক্ত হইয়াছে।"[৮]

সঞ্জীবচন্দ্রের বৃত্রসংহার সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ফলে যে সব স্তুতিবাচন উচ্চারিত হয়েছে তা যে সমকালের মনোভাবেরই প্রকাশ, একথা শতাব্দীর প্রান্তরেখায় পৌঁছিয়ে আমরা সহজে বুঝতে পারি, কারণ মহাকালের বিচারক তাতে চরম রায় দান করার সময় পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই।

: বাল্য বিবাহ :

বাল্য বিবাহ প্রবন্ধটি ভ্রমর নূতন পর্যায়ে ১ম খণ্ড ভাদ্র ১২৮৫ ১ম সংখ্যা—৬-১৮ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১৮৮২ সালে কলকাতার জনসন প্রেস থেকে রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্যে সঞ্জীবচন্দ্র স্বলভ মূল্যে যে পুস্তিকা প্রচারের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই সিরিজে প্রথম গ্রন্থ ছিল 'সংকার' ও দ্বিতীয় গ্রন্থ ছিল 'বাল্য বিবাহ'। কিন্তু এই পরিকল্পনা বেশীদূর কার্যকরী হয়নি। এই গ্রন্থগুলি 'গ্রাম্য পাঠ' নামে পরিচিত ছিল। বাল্যবিবাহ প্রবন্ধটি গ্রাম্যপাঠ ২নং মূল্য এক আনা মাত্র। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী লোক শিক্ষা সিরিজে এই ধরণের স্বল্প মূল্যের প্রবন্ধ পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন।

বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি বিবাহ সমস্যা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বহু আলোচিত সামাজিক সমস্যার অন্তর্গত ছিল। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে শিক্ষিত সমাজ যে ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল তার বহুল নিদর্শন ঐ যুগের সাহিত্যে গানে নাটকে আজও দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিধবা বিবাহ সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র বাল্য বিবাহ প্রবন্ধ রচনা করে তৎকালের সামাজিক তর্ক বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন তা নয়, বরং বলা যায় সমস্যাটি তাঁর কৌতূহলী মনের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসাকে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছেন। তবে বলা বাহুল্য যেটুকু মতামত এই প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে তা নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি। তা সত্ত্বেও এখানে লক্ষণীয় সঞ্জীবচন্দ্র যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য বিচারসহ প্রবন্ধের আলোচনাকে এগিয়ে

নিয়ে গেছেন। লেখকের এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর প্রবন্ধের সূত্রপাতেই আভাসিত হয়েছে।

"বিবাহ লইয়া ইদানিং কিছু মতান্তর দাঁড়াইয়াছে। কেহ বলেন বাল্য বিবাহ মহাপাপ। কেহ বলেন মহাপুণ্য, ইহাতে গৌরীদানের ফল হয়। কেহ বলেন বিবাহ সম্বন্ধে আত্মীয়দিগের হস্তক্ষেপ করা অতি অন্যায়। কেহ বলেন তাহা নিতান্ত ন্যায় সঙ্গত। এক্ষণে এইরূপ বিপরীত মত প্রচারিত হওয়ায় একপ্রকার দলাদলি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইংরেজি বিবাহের সহিত তুলনাই এই দলাদলির মূল বলিয়া বোধ হয়।"

সঞ্জীবচন্দ্র ইংরেজদের অধিক বয়সে বিবাহের যে মঙ্গলকর ফলাফল এ দেশে দেখেছেন তার কারণ—

"এদেশে বিবাহিত ইংরেজের সংখ্যা অতি অল্প তাঁহারা প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত, সদ্বংশজাত এবং উচ্চ পদস্থ। সেই জন্যে লেখকের মত তাঁহাদের সহিত আমাদের অপর সাধারণ ভদ্র অভদ্র সকলেরই তুলনা করিলে যথার্থ মীমাংসা হয় না। যাঁহারা সেই কয়েকটি বিবাহিত সাহেব বিবির সাংসারিক সুখ দেখিয়া বিবেচনা করেন যে ইংরেজ মাত্রই ঐরূপ সুখী তাঁহারা কতক ভ্রান্ত, যাঁহারা ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া এ বিষয়ের সীমা করিতে চাহেন, তাঁহারা আরও ভ্রান্ত।"

সন্দেহ নেই সঞ্জীবচন্দ্র তৎকালের ব্রাহ্ম সমাজের উদারনৈতিক মতামতের বিপক্ষতা করেছেন। স্ত্রী শিক্ষা, স্বনির্বাচনের বিবাহ ও অধিক বয়সে মেয়েদের বিবাহ শিক্ষিত ব্রাহ্মরা বাংলা দেশে যখন প্রচলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন, সেই সামাজিক নারীমুক্তি আন্দোলনের অতিরেক শিক্ষিত রক্ষণশীল বাঙ্গালীদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া করেছিল তারই কিছু আভাস এই প্রবন্ধে আছে। তবে সঞ্জীবচন্দ্রের মতের মধ্যে একটি সত্যও আছে, তা হচ্ছে, শিক্ষিত ইংরেজ সমাজের মধ্যে যে সামাজিক প্রথা মঙ্গলকর, অশিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে তা মঙ্গলকর নয়। বিশেষ করে অধিক বয়সে বিবাহ ইংরাজেদের বহু পুরাতন সামাজিক প্রথা যা আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত। তাই ইংরেজের বিবাহব্যবস্থা সঞ্জীবচন্দ্রের মতে—

"ইহা এক্ষণকার বিজ্ঞানশাস্ত্র বা সৎ শিক্ষার ফল নয়।"

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বিশেষ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার সূত্রপাত করতে চলেছেন। কোন সামাজিক বা ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়াই তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের অধিক বয়সে বিবাহের মতবাদের বিরুদ্ধে মতামত রেখেছেন।

নারীর শরীরের পূর্ণতা অনুসারে কোন বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্র আলোচনা করেছেন। বাঙ্গালী মেয়েদের সঠিক বিবাহের কোন বয়স নির্দেশ না করে সঞ্জীবচন্দ্র বিচারের ভার পাঠকের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন—

"তবে এক্ষণে বাঙ্গালি কন্যার পক্ষে কোন বয়স উচিত কাল বলিয়া ধরিতে হইবে?

বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন যে যৌবনেই বিবাহের উচিত কাল।"
যেহেতু গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশের কন্যাদের তের চৌদ্দ বছর বয়সে যৌবন আরম্ভ হয়, তাই তাদের বিবাহের বয়স ঐ সময়েই হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলিও খণ্ডন করে গেছেন। যাঁরা মনে করেন তের চৌদ্দ বছর বয়সে মেয়েদের শরীরের পরিপুষ্টি হয় না বলে সন্তান জন্মালে তারা বাঁচে না, তাঁদের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি মনুর সময় থেকে বর্তমান কালে পর্যন্ত নানা তথ্যের প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন ঐ মত ভ্রান্ত। সাধারণ ভাবে বাঙ্গালীরা দুর্বল বলে তার বাল্যবিবাহকে দায়ী করা যায় না, কারণ পশ্চিম ভারতে বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকলেও সাধারণভাবে তাদের স্বাস্থ্য ভাল, আবার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, যদিও তাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নেই কেবল মানুষ কেন বাঙ্গালার জন্তু জানোয়ারদের স্বাস্থ্য অন্যান্য দেশের সেই সব জন্তুর চেয়ে খর্বকায়। এই সব দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে সঞ্জীবচন্দ্র প্রমাণ করতে চেয়েছেন বাল্যবিবাহ স্বাস্থ্যহীনতার কারণ নয়। তিনি তর্ক সৃষ্টি করে মেয়েদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সংস্কৃত অথবা ইংরাজী কোন মতই সরাসরি সমর্থন করেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র শরীর বিজ্ঞান ও যৌন বিজ্ঞানের মতামত অনুসরণ করেছেন।

বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আজকের পৃথিবীর সব সভ্যদেশে দৃঢ়মত প্রচারিত, যদিও তার সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণই প্রধান তবু এদেশের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করতে সঞ্জীবচন্দ্রের ঐতিহ্যবাদী মন সায় দেয় নি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও নিজের ছেলের বিয়েও দিয়েছিলেন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে। হয়তো বঙ্কিমের সঙ্গে বাল্যবিবাহে মত পার্থক্যই এই প্রবন্ধ রচনার বীজ। নিজের মতের সমর্থনে তিনি যে সমস্ত যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন প্রকৃত পক্ষে বাল্যবিবাহের সপক্ষে সেগুলি জোরালো যুক্তি বলে একালে মনে হয় না।

আধুনিক কালের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে তিনি এই প্রবন্ধে রচনা করে তৎকালের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধাবাদীদের মত খণ্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন। যে বিরুদ্ধবাদীর দল পাশ্চাত্যমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদেরই তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিত কেমস এবং বাফ্‌নের মতামত উদ্ধৃত করে শেষ বারের মত আক্রমণ করেছেন। তাই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন,

"বফন—(Buffon) সাহেব বলেন যে, "Marriage is man's natural state after puberty".

মতামত যাই হোক এই প্রবন্ধের ভাষারীতিতে সঞ্জীবচন্দ্র যুক্তিনিষ্ঠ ও ঋজু, বিষয়বস্তুকে লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সচেতন। শব্দের পরিমিত ব্যবহার এই প্রবন্ধের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

: নবাব পিঁপড়ে :

নবাব পিঁপড়ে একটি ছোট প্রবন্ধ। জীববিদ্যা সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞানমূলক এই প্রবন্ধটি ভ্রমর পত্রিকা নূতন পর্যায়ের ভাদ্র ১২৮৫ সন ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। প্রাণী জগতের বিচিত্র খবরের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের আগ্রহ ছিল গভীর। 'বৈজিক তত্ত্ব,' 'নূতন জীবের সৃষ্টি' প্রভৃতি প্রবন্ধে অথবা পালামৌয়ে 'রাধে মহ্যং গান রত বিচিত্র পাখীর প্রসঙ্গে যেমন সঞ্জীবচন্দ্রের এই আগ্রহের খবর আছে তেমনি নবাব পি পড়ে প্রবন্ধের মধ্যেও সেই ধরণের বিশিষ্টতা দেখা যায়। রচনারীতিতেও সঞ্জীবচন্দ্রের নিজস্বতাও অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রবন্ধটির সূচনায় তিনি লিখছেন—

"সকলেই জানেন পিপিলিকার অনেক জাতি আছে, তাহার মধ্যে এক জাতিকে আমরা নবাব বলিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। ইহারা নবাবের ন্যায় অক্ষম ও অপুট। দাস দাসী ভিন্ন ইহাদের সংসার একদিনও চলে না। আর জাতি কৃষ্ণবর্ণ পিপিলিকা ইহাদের গোলাম।"

এই ভাবে সূচনায় সঞ্জীবের রচনার দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। ১। জ্ঞান-মূলক প্রবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও একধরণের শ্লেষাত্মক বঙ্কিমভঙ্গী। ২। জ্ঞানমূলক প্রবন্ধ রচনায় তিনি নিজের ধ্যান ধারণা সরাসরি পাঠকের উপর চাপিয়ে দেন না পঠিত গ্রন্থ, লেখকের নাম অথবা বিষয়ের সূত্র তিনি আলোচনা মধ্যে অথবা পাদটীকায় ব্যবহার করতে ভুলে যান না। এখানেও তাঁর সেই গবেষক বৃত্তির যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। পাদটীকায়, 'নবাব পিঁপড়ে' এবং কৃষ্ণ বর্ণের পিপিলিকাকে যথাক্রমে Formica Refeseens এবং Formica Fusca এই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।

প্রবন্ধকে সরস করে তুলবার জন্যে প্রায়ই তিনি তাঁর গাল্পিক বৃত্তির ব্যবহার করেছেন। ফলে কাহিনীর আকর্ষণে পাঠক সহজেই বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে—জ্ঞান গর্ভ দুরূহ বিষয়ও সহজ প্রাঞ্জল মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। এখানেও তেমনি কাহিনীর ছোঁয়া আছে, যদিও বিষয়ের বাইরে তা চলে যায়নি।

"একবার হুবার (Huber) সাহেব ত্রিশটি নবাব পিপিলিকা ধরিয়া একস্থানে আবদ্ধ রাখেন এবং যথেষ্ট উপাদেয় আহার দেন। কিন্তু কেহ আহার করে না, আহার আছে কিন্তু দাস দাসী নাই, কে আহার করায়।"

এমন অবস্থায় যখন পিঁপড়েগুলি মৃত প্রায় সেই সময় হুবার সাহেব কয়েকটি দাস বা কৃষ্ণবর্ণের পিপড়ে এনে সেখানে রাখলে তারা যখন তাদের মুখে আহার তুলে দিল, তখনই তারা প্রাণ ফিরে পেল। এই রকম বর্ণনায় সঞ্জীবের সহাস্য ব্যঙ্গটি জীব জগৎ ত্যাগ করে মানব জগতের দিকেও যেন হেলে পড়েছে। তার প্রমাণ প্রবন্ধের

বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন যে যৌবনেই বিবাহের উচিত কাল।"

যেহেতু গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশের কন্যাদের তের চৌদ্দ বছর বয়সে যৌবন আরম্ভ হয়, তাই তাদের বিবাহের বয়স ঐ সময়েই হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলিও খণ্ডন করে গেছেন। যাঁরা মনে করেন তের চৌদ্দ বছর বয়সে মেয়েদের শরীরের পরিপুষ্টি হয় না বলে সন্তান জন্মালে তারা বাঁচে না, তাঁদের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি মনুর সময় থেকে বর্তমান কালে পর্যন্ত নানা তথ্যের প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন ঐ মত ভ্রান্ত। সাধারণ ভাবে বাঙ্গালীরা দুর্বল বলে তার বাল্যবিবাহকে দায়ী করা যায় না, কারণ পশ্চিম ভারতে বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকলেও সাধারণভাবে তাদের স্বাস্থ্য ভাল, আবার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, যদিও তাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নেই কেবল মানুষ কেন বাঙ্গালার জন্তু জানোয়ারদের স্বাস্থ্য অন্যান্য দেশের সেই সব জন্তুর চেয়ে খর্বকায়। এই সব দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে সঞ্জীবচন্দ্র প্রমাণ করতে চেয়েছেন বাল্যবিবাহ স্বাস্থ্যহীনতার কারণ নয়। তিনি তর্ক সৃষ্টি করে মেয়েদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সংস্কৃত অথবা ইংরাজী কোন মতই সরাসরি সমর্থন করেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র শরীর বিজ্ঞান ও যৌন বিজ্ঞানের মতামত অনুসরণ করেছেন।

বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আজকের পৃথিবীর সব সভ্যদেশে দৃঢ়মত প্রচারিত, যদিও তার সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণই প্রধান তবু এদেশের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করতে সঞ্জীবচন্দ্রের ঐতিহ্যবাদী মন সায় দেয় নি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও নিজের ছেলের বিয়েও দিয়েছিলেন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে। হয়তো বঙ্কিমের সঙ্গে বাল্যবিবাহে মত পার্থক্যই এই প্রবন্ধ রচনার বীজ। নিজের মতের সমর্থনে তিনি যে সমস্ত যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন প্রকৃত পক্ষে বাল্যবিবাহের সপক্ষে সেগুলি জোরালো যুক্তি বলে একালে মনে হয় না।

আধুনিক কালের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে তিনি এই প্রবন্ধে রচনা করে তৎকালেব বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধাবাদীদের মত খন্তন করার চেষ্টা করেছিলেন। যে বিরুদ্ধবাদীর দল পাশ্চাত্যমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদেরই তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিত কেমস এবং বাফ্‌নের মতামত উদ্ধৃত করে শেষ বারের মত আক্রমণ করেছেন। তাই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন,

"বফন—(Buffon) সাহেব বলেন যে, "Marriage is man's natural state after puberty".

মতামত যাই হোক এই প্রবন্ধের ভাষারীতিতে সঞ্জীবচন্দ্র যুক্তিনিষ্ঠ ও ঋজু, বিষয়বস্তুকে লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সচেতন। শব্দের পরিমিত ব্যবহার এই প্রবন্ধের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

: নবাব পিঁপড়ে :

নবাব পিঁপড়ে একটি ছোট প্রবন্ধ। জীববিদ্যা সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞানমূলক এই প্রবন্ধটি ভ্রমর পত্রিকা নূতন পর্যায়ের ভাদ্র ১২৮৫ সন ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। প্রাণী জগতের বিচিত্র খবরের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের আগ্রহ ছিল গভীর। 'বৈজিক তত্ত্ব,' 'নূতন জীবের সৃষ্টি' প্রভৃতি প্রবন্ধে অথবা পালামৌয়ে 'ব্যাধে মনুষ্যং গান রত বিচিত্র পাখীর প্রসঙ্গে যেমন সঞ্জীবচন্দ্রের এই আগ্রহের খবর আছে তেমনি নবাব পি পড়ে প্রবন্ধের মধ্যেও সেই ধরণের বিশিষ্টতা দেখা যায়। রচনারীতিতেও সঞ্জীবচন্দ্রের নিজস্বতাও অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রবন্ধটির সূচনায় তিনি লিখছেন—

"সকলেই জানেন পিপিলিকার অনেক জাতি আছে, তাহার মধ্যে এক জাতিকে আমরা নবাব বলিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। ইহারা নবাবের ন্যায় অক্ষম ও অপুট। দাস দাসী ভিন্ন ইহাদের সংসার একদিনও চলে না। আর জাতি কৃষ্ণবর্ণ পিপিলিকা ইহাদের গোলাম।"

এই ভাবে সূচনায় সঞ্জীবের রচনার দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। ১। জ্ঞান-মূলক প্রবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও একধরণের শ্লেষাত্মক বঙ্কিমভঙ্গী। ২। জ্ঞানমূলক প্রবন্ধ রচনায় তিনি নিজের ধ্যান ধারণা সরাসরি পাঠকের উপর চাপিয়ে দেন না পঠিত গ্রন্থ, লেখকের নাম অথবা বিষয়ের সূত্র তিনি আলোচনা মধ্যে অথবা পাদটীকায় ব্যবহার করতে ভুলে যান না। এখানেও তাঁর সেই গবেষক বৃত্তির যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। পাদটীকায়, 'নবাব পিঁপড়ে' এবং কৃষ্ণ বর্ণের পিঁপিলিকাকে যথাক্রমে Formica Refeseens এবং Formica Fusca এই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।

প্রবন্ধকে সরস করে তুলবার জন্যে প্রায়ই তিনি তাঁর গাল্পিক বৃত্তির ব্যবহার করেছেন। ফলে কাহিনীর আকর্ষণে পাঠক সহজেই বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে—জ্ঞান গর্ভ দুরূহ বিষয়ও সহজ প্রাঞ্জল মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। এখানেও তেমনি কাহিনীর ছোঁয়া আছে, যদিও বিষয়ের বাইরে তা চলে যায়নি।

"একবার হুবার (Huber) সাহেব ত্রিশটি নবাব পিপিলিকা ধরিয়া একস্থানে আবদ্ধ রাখেন এবং যথেষ্ট উপাদেয় আহার দেন। কিন্তু কেহ আহার করে না, আহার আছে কিন্তু দাস দাসী নাই, কে আহার করায়।"

এমন অবস্থায় যখন পিঁপড়েগুলি মৃত প্রায় সেই সময় হুবার সাহেব কয়েকটি দাস বা কৃষ্ণবর্ণের পিপড়ে এনে সেখানে রাখলে তারা যখন তাদের মুখে আহার তুলে দিল, তখনই তারা প্রাণ ফিরে পেল। এই রকম বর্ণনায় সঞ্জীবের সহাস্য ব্যঙ্গটি জীব জগৎ ত্যাগ করে মানব জগতের দিকেও যেন হেলে পড়েছে। তার প্রমাণ প্রবন্ধের

শেষ অংশটুকুতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"এখানে জিজ্ঞাসা, যে পিপিলিকারা এই নবাবী কোথা হইতে শিখিল? বুঝি ভারতবর্ষ হইতে, কেন না ভারতবর্ষ নবাবী স্থান, অনেকে ভারতবর্ষ হইতে নবাবি শিখিয়া গেল।

এই পিপিলিকা সুইস আর ইংরেজদের দেশেই অধিক। অন্যত্র আছে কিনা জানি না।"

: অকাতরে বিবাহ :

ভ্রমর পত্রিকার নূতন পর্যায়ের আশ্বিন (১২৮৫) মাসের সংখ্যার শেষ প্রবন্ধ অকাতরে বিবাহ ২৫-৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। অতি আধুনিক কালের পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ও তার প্রতিকার পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সকলে উচ্চকণ্ঠ। উনিশ শতকে সে সম্পর্কে কেউ ভেবেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। তবে বিচিত্র মননের অধিকারী সঞ্জীবচন্দ্রের চিন্তার মধ্যে এমন সব বিষয় প্রবেশ করেছে যাতে আমরা বার বার চমকিত হয়ে উঠেছি। অকাতরে বিবাহ সেই জাতীয় প্রবন্ধ যার মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণের উদ্দেশ্য ও কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অস্বাক্ষরিত এই রচনাটির সর্বাঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনারীতির ছাপ বর্তমান।

লেখকের বিবেচনায় বাল্য বিবাহ আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নয়। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে অকাতরে বিবাহ অর্থাৎ আক্কেল শূন্য হয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে বিবাহ করা বা সন্তানদের বিবাহ দেওয়া। 'ভারত সংস্কারকদের' প্রতি তাঁর জিজ্ঞাসা—

"তাঁহারা কি ত্রিশ কোটি লোকের আক্কেল দিতে পারিবেন?· ···অতএব দোষ বাল্য বিবাহের নহে দোষ আক্কেলের।"

আজও আমরা বুঝতে পারি পরিবার পরিকল্পনার প্রচার ও ব্যবস্থা সহস্রবার করলেও এই অশিক্ষিত দরিদ্র ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হবে না, যদি না শিক্ষা বিবেক বিবেচনার উদয় হয়। একেই সঞ্জীবচন্দ্র সহজভাষায় আক্কেল বলেছেন।

আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে একদিকে যেমন একটি সংস্কার-মুক্ত আধুনিক মন ছিল, তেমনি একটি রক্ষণশীল ঐতিহ্যগত মনও ছিল। ফলে মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। অবশ্য তিনি স্ববিরোধগুলির একধরণের সমাধানও করেছিলেন। তিনি ভারতে অকাতরে বিবাহের মূলে আর্য-সভ্যতার দান স্মরণ করেছেন। প্রাচীন আর্যরা সন্তান বৃদ্ধির জন্যে বিবাহ করতে

উৎসাহিত করতেন, কারণ প্রতিকূল পরিবেশে সংঘ শক্তি বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বেশী করে বোধ করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালে সেই ধরণের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সেই জন্যে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে বিবাহের যোগ্যতা সম্পর্কে নানা আইন রচিত হয়েছে। স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণ পোষণের ক্ষমতার প্রমাণ অর্থাৎ আয় না দেখাতে পারে তবে আইনত সে বিবাহের অনুমতি পায় না। বহু বিষয়ে জ্ঞানী সঞ্জীবচন্দ্র পাশ্চাত্যের এই সব আইনগুলি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও করেছেন। এই ধরণের বর্ণনায় তিনি তাঁর আকর্ষণীয় কাহিনী রচনার ক্ষমতাটি সহজেই প্রকাশ করেছেন। পাশ্চাত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতের দুর্দশার তুলনা করে বলেছেন—

"সকল জাতীয় লোকেরই আক্কেল আছে, এটুকু বুঝিবার ক্ষমতা আছে, নাই কেবল ভারতবাসীর। আমাদের সঙ্গে থাকিয়া ইংরেজদিগেরও এইরূপ ঘটিয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডের ছোটলোকেরাও অবিবেচনায় বিবাহ করিয়া নিরতিশয় কষ্ট ভোগ করে।"

প্রবন্ধকারের বিতর্কের সিদ্ধান্ত স্বদেশে অথবা বিদেশে লোকবৃদ্ধি ও দুঃখের কারণ অকাতরে বিবাহ। আর অকাতরে বিবাহের কারণ শিক্ষার অভাব, আক্কেলের অভাব, তাই এখন

"আমাদের উচিত আইন করিয়াই হউক, পাবলিক ওপিনিয়নে হউক, শিক্ষা দিয়াই হউক, প্রচার করিযাই হউক, এই কথাটি—এই আক্কেলের কথাটি—সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।"

কিন্তু লক্ষণীয় এই যে মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ ভারতবাসীর জন্যে তাঁর দরদেরও অভাব নেই। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বলেছেন যে এদেশের মানুষ অকাতরে বিবাহ করে কারণ তাদের অন্য কোন সুখের উপায় নেই—দাম্পত্য জীবনই তাদের একমাত্র সুখের উপায়। অনুরূপ মন্তব্য বাল্য বিবাহ প্রবন্ধেও তিনি করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষিত মার্জিত মন শেষ পর্যন্ত বলেছে—

"জগতে বিবাহ ভিন্ন আরও সুখ আছে, মনুষ্য জীবনে আরও উদ্দেশ্য আছে।"

কিন্তু তাঁর আক্ষেপ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই কথাটি বুঝেও দেশবাসীকে তা বোঝাবাব চেষ্টা করেন না।

অকাতরে বিবাহ প্রবন্ধে আমরা বাল্য বিবাহ প্রবন্ধের সুর ভিন্ন উপায়ে একই ভাবে ধ্বনিত হতে দেখি। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রাবন্ধিক চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে প্রকট।

: পরিশিষ্ট—১ :

সঞ্জীবচন্দ্রের আরও কিছু বাংলা রচনা

আলোচ্য প্রবন্ধগুলি ছাড়াও সঞ্জীবচন্দ্রের আরও কিছু অজানা রচনার সন্ধান দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপালচন্দ্র রায়। কাঁটালপাড়া নৈহাটী ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার দায়িত্বভার তাঁর উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি সঞ্জীবচন্দ্রের কয়েকটির লেখার প্রমাণসাপেক্ষ পরিচয় দিয়েছেন তাঁর "সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য (১৯৮০) গ্রন্থে। আমরা রচনাগুলির বিস্তৃত পরিচয় না দিয়ে এখানে তার উল্লেখ মাত্র করছি। রচনাগুলি হ'লো—(১) পদোন্নতির পন্থা, (২) ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম, (৩) গৃহ সন্ন্যাস, (৪) বিবাহের ঘটকালি, (৫) একটি ঘরের কথা, (৬) একটি পরের কথা, (৭) চাকরির পরীক্ষা, (৮) ভূতের জাতি। এই রচনাগুলি যে সঞ্জীবচন্দ্রের তার বিচার শ্রীরায় যেমন পাণ্ডুলিপি চিঠিপত্র বা অন্য কারও স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করে তথ্যগতভাবে প্রমাণ করেছেন, অন্য পক্ষে আমাদের মতো তিনি ভাবাগত চারিত্রিক লক্ষণ বিচার করে দেখিয়েছেন লেখাগুলি সঞ্জীবচন্দ্রেরই। আমরা তাই এই লেখাগুলির সাহিত্যিক চরিত্র বিশ্লেষণ করলাম না—অনুসন্ধিৎসু পাঠক শ্রীরায়ের গ্রন্থটি পাঠ করলে বিষদভাবে জানতে পারবেন।

: পরিশিষ্ট—২ :

সঞ্জীবচন্দ্রের ইংরাজী বচনা

BENGAL RYOT, THEIR RIGHTS AND LIABILITIES

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত 'শশধর' নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা প্রশংসিত হইয়াছিল।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়ে 'শশধর' পত্রিকায় কোন লেখকের নাম না থাকায় কৈশোর সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাকে চিহ্নিত করার কোন উপায় আমাদের হাতে নেই। তাই তাঁর

প্রথম রচনা বলে আমাদের বেঙ্গল রায়তকেই চিহ্নিত করতে হয়। ১৮৬৪ সালে বেঙ্গল রায়ত প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটিকে আমরা সঞ্জীবের একমাত্র ইংরাজী রচনা বলেই ধরে নেব। তাঁর কিছু ডাইরী ও চিঠি ছাড়া ইংরাজী রচনা আর কিছু নেই। কিন্তু পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন ইংরাজী ভাষায় সঞ্জীবের দক্ষতা বড় কম ছিল না। বেঙ্গল রায়ত বইটি যে সালে রচিত হয়েছিল সেই সালেই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা ছাপা হয়ে গিয়েছিল এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শাসক মহলে ও সুধীসমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বইটির একটি মাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বহু অনুসন্ধানের পর বইটির একটি মাত্র 'কপি' খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও এই রচনাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে।"

অর্থাৎ বঙ্কিমের ঐ প্রবন্ধ রচনার কালেই বইটি আর পাওয়া যেতনা। গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৪। কলকাতার ৮নং ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের ডিরোজিও এণ্ড কোং বইটি ছাপে। বইটির দাম জানা যায় নি, প্রকাশক সম্ভবত লেখক স্বয়ং ছিলেন। ইংরাজীতে লিখিত ভূমিকায় সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন যে বাংলা দেশের জমিদারও প্রজাদের সম্পর্কে আইন ও তাদের উপর বহুসুচিন্তিত রচনা থাকলেও সে সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক ইতিহাসে সেই আইন সমূহের উন্নতি ও পরিণতির কোন আলোচনা করা হয় নি। লেখক সেই বহু আকাঙ্খিত অভাব পূরণের চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থে। কারণ তাঁর মতে জমিদার ও রায়তদের সম্পর্কে আইনের ফলাফল বুঝতে হলে পূর্বসূত্রের কারণ সমূহ আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করেছেন এই গ্রন্থে যে বিস্তৃত তথ্য আলোচনা করা হয়েছে তাতে ব্যবহারজীবী, ছাত্র, অনুসন্ধিৎসু, জমিদার শ্রেণী এবং জনসাধারণ উপকৃত হবেন। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কী? সেই সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এদেশের জমি জায়গা সম্পর্কিত মূল আইনের উন্নতি ও পরিণতির ইতিহাসের মাধ্যমে সাধারণের মনকে এই দিকে আকৃষ্ট করা। শেষ পর্যন্ত তিনি কেন গ্রন্থটি ইংরাজীতে লিখেছেন তার উত্তর দিয়ে নিজের ইংরাজী ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে বিনয় প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে এই ধরণের কাজ ইংরাজী ভাষাতেই হওয়াই দরকার কারণ এর বিস্তৃত প্রয়োজন মাতৃভাষার অর্থাৎ বাংলা ভাষায় মেটান সম্ভব নয়। আজকের যুগে সঞ্জীবের এই মন্তব্য অনর্থক মনে হলেও আইন সংক্রান্ত আলোচনা সে যুগে ইংরাজী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাতে হলে সর্বজনগ্রাহ্য হত না। লেখক দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই গ্রন্থটি ইংরাজীতে রচনা করেছিলেন। খেয়ালী অসতর্ক প্রকৃতির মানুষ সঞ্জীবচন্দ্রের বহুবিষয়ে ছিল আশ্চর্য আগ্রহ। সেই সব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা অনেক সময় উপন্যাসের ক্ষেত্রে বালকোচিত হলেও গবেষণার ক্ষেত্রে ত তিনি আশ্চর্য পরিশ্রম ও বক্তব্যের সুপরিণতিকে সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। সঞ্জীবের প্রথম সুসম্পন্ন রচনা বেঙ্গল রায়ত এর মধ্যে আমরা সেই গবেষক মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। অন্যান্য

রচনায় সঞ্জীবের ব্যক্তি জীবনের যে অভীপ্সা ও আগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর বেঙ্গল রায়তেও তার কিছু সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন,

> "কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল তারপর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয় সৌন্দর্যপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন যে পিতৃদেব দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিত প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল বেঙ্গল রায়েত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের মধ্যে অবশ্যই সত্যতা আছে তা স্বীকার করে নিলেও একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। শুধুই কি বাইরের অভিঘাতটুকুই তাঁর এত পরিশ্রম বহুল রচনা গড়ে তোলার আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল? এটা একটা কারণ হিসেবে গ্রহণ করে নিলেও দেখবো দুঃখী নিপীড়িত মানুষের প্রতি সঞ্জীবের একটি আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। গ্রাম্য জীবনের মধ্যবিত্ত বন্ধু বৎসল মানুষ সঞ্জীবচন্দ্র রায়তদের অত্যাচার নিপীড়িত জীবনের কথা নিজের জীবনরসের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন—অপর পক্ষে তাঁর আইনের জ্ঞান এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সঞ্জীবচন্দ্র আইন পড়েছিলেন, পাস করেন নি। পরীক্ষার মাপকাঠি সর্বদা প্রতিভাবানদের জ্ঞানের মাপকাঠি যে নয় তার প্রমাণ সঞ্জীবের এই গ্রন্থটি যার মধ্যে জমির আইন সংক্রান্ত গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে।

বেঙ্গল রায়ত লেখার আগে জমিদার ও কৃষক সম্প্রদায়ের উপর যে সমস্ত রচনা বাংলাদেশের তৎকালীন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য দান করেছেন ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য্য তাঁর 'রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থের ২৩পৃঃ ৩৮ নং পাদটীকায় ডঃ ভট্টাচার্য লিখছেন যে প্যারীচাঁদ মিত্রের The zaminder and the Ryot (Calcutta Review) (1846) প্রবন্ধ পূর্বে প্রকাশিত হলেও লালবিহারী যে আবেগময় ভাষায় প্রজাদের দুঃখ কষ্টের কথা লিখেছেন ঐ প্রবন্ধটি ঠিক সে ধরনের নয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে কিশোরচাঁদ মিত্র (প্যারীচাঁদের ভ্রাতা) ইণ্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় (১৮৫৯) লিখেছিলেন The Ryot and the zaminder প্রবন্ধ। রেঃ লালবিহারী দে তাঁর Govinda Samanta গ্রন্থে কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলতে গিয়ে আবেগময় ভাষা ব্যবহার করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্রও একই আবেগে কখনো কখনো একই ধরণের কথা তাঁর বেঙ্গল রায়তে বলেছেন। তবে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার প্রধান প্রবণতা জমি সংক্রান্ত আইন সমূহের বিচার বিশ্লেষণ। তাই আবেগ উচ্ছ্বাসের চেয়ে গবেষকদের বিচারসহ সিদ্ধান্তই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। আর লালবিহারীর কৃষকচিন্তা তাঁর Govinda Samanta-এর কাহিনী কথনের অন্তরালে প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৭২খৃঃ

যে Bengal Peasant Life নামে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লালবিহারী রচনা করেছিলেন তার উপরে সঞ্জীবচন্দ্রের বেঙ্গল রায়তের প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হয় যে লালবিহারী তাঁর Bengal Peasant Life রচনা করার প্রেরণা পেয়েছিলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঘোষিত পাঁচশত টাকা পুরস্কার লাভের আশায়, যার বিষয় ছিল—

"Social and domestic life of Rural Population and working classes in Bengal."[১]

কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'বেঙ্গল রায়ত' রচনা করেন তাঁর একান্ত নিজস্ব আন্তর প্রেরণায়। তাই সঞ্জীবের অনুসন্ধিৎসা ও আবেগ লালবিহারী অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। বেঙ্গল রায়ত বইটি এইযুগে যাদের যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছিল তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে আমরা নাম করতে পারি রমেশচন্দ্র দত্তের। বেঙ্গল ম্যাগাজিনে রমেশচন্দ্র এদেশের তৎকালীন কৃষক সমাজ ও কৃষি অর্থনীতির কথা লেখেন তাঁর—

"The past and future of Bengal (Jan—1873) Indian Finance (Feb.—1873), Administration of Justice in Bengal (June—1873), The Bengal Zaminder and Ryot (Aug.—1873)

প্রবন্ধগুলিতে এই পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা The Bengal Peasant (বেঙ্গল ম্যাগাজিন—ফেব্রুয়ারী ১৮৮০) যে সঞ্জীবচন্দ্রের বেঙ্গল রায়তের দ্বারা প্রভাবিত ছিল তা স্বীকার করতেই হয়। কারণ আমরা দেখেছি যুগের পরিবেশ অনুকূল থাকলেও সঞ্জীবচন্দ্রের 'বেঙ্গল রায়তই (১৮৬৪) বাঙ্গালী রচিত সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এই সব গ্রন্থ রচনার পটভূমি তখন এদেশে সামাজিক পরিবেশই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষের দিকে এ দেশের জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সীমাহীন হয়ে উঠলে এদেশের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় এবং শাসক ইংরেজেও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ এই সময়কার পত্র পত্রিকাগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজ করছে। এই সময়ের নানান অসন্তোষের বহ্নির উপর ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ঘৃতাহুতি দিল। শাসক সম্প্রদায় রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল। হরিশ মুখার্জীর রচনা ও বক্তৃতা, নীলদর্পণের প্রকাশ এবং সংবাদ প্রভাকর, বিবিধার্থ সংগ্রহ, সোমপ্রকাশ, তত্ত্ববোধনী, বেঙ্গল স্পেক্টেটর সর্বশুভকরী পত্রিকা, সম্বাদ ভাস্কর, বিদ্যাদর্শন ইত্যাদি সাময়িক পত্রপত্রিকা গুলিতে প্রজাদের দুর্দ্দশা ও প্রজা আইনের ত্রুটী নিয়ে যথেষ্ট লেখালেখি চলছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহের মত বিক্ষিপ্ত ঘটনাও নতুন আইনের পরিবেশ অনুকূল করে তুলেছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী কোন লেখক সাহস করে এ বিষয়ে কিছু লিখতে এগিয়ে আসেন নি। যদিও এই গ্রন্থ রচনার বিশ বছর আগেই প্রজাদের দুঃখ দুর্দ্দশা ও তৎসংক্রান্ত আইন নিয়ে সংবাদ ও চিঠিপত্রে মতামত প্রকাশ পেয়েছিল। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় ১৮৪৩ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে 'কস্যচিত পাঠকস্য প্রেরিত'

পত্রে এ সম্পর্কে চিন্তার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল।

সঞ্জীবচন্দ্র বেঙ্গল রায়ত রচনা করতে বিপুল পরিশ্রম করেছিলেন তার উজ্জ্বল সাক্ষ্যবহন করছে উক্তগ্রন্থটি। তিনি কি পরিমাণ পরিশ্রম করেছিলেন সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

> "এই পুস্তকখানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়া রাশিরাশি পুস্তক ঘাঁটিয়া অভিলষিত তত্ত্ব সকল বাহির করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাটী যাইতেন। রাত্রে তাহা সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাতে আবার কলিকাতায় আসিতেন।"

সঞ্জীবচন্দ্র যে কি বিপুল পরিমাণ পরিশ্রম করেছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি এই গ্রন্থটির মূল আলোচনা মোট ১৭২ পৃষ্ঠায় তিনি মোট ১২৩টি পাদটীকা এবং পরিশিষ্টে ১০ পৃষ্ঠায় ৪টি পাদটিকা ব্যবহার করেছেন। মূল গ্রন্থটির আখ্যা পত্র সূচীপত্র ও পরিশিষ্ট সহ মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৪।

গ্রন্থটিতে লেখকের যে বিশিষ্ট মনোভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজে তা বোঝা যায়।

সুগভীর অধ্যয়নকারী গবেষকের মত তিনি তাঁর জ্ঞানের সমর্থনে গ্রন্থটির শুরু থেকেই তাঁর পঠিত বিভিন্ন গ্রন্থের উপযুক্ত উদ্ধৃতি ও পাদটীকায় তাদের নাম পৃষ্ঠা চিহ্ন দিতে কোথাও ভুলে যান নি। এই গবেষণায় তাঁর মনগড়া কোন ধারণা জোর করে পাঠকের উপর চাপিয়ে না দিয়ে তিনি সব সময় সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। পরিচায়িকায় (Introduction) ১ পৃষ্ঠা থেকে ১৮ পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি মোট ১৬টি পাদটীকা ব্যবহার করেছেন এছাড়া আলোচনা প্রসঙ্গে আরও বহুগ্রন্থ, সংবাদ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে রায়ত, জমিদার, তালুকদার এবং মৌরসদারদের সংজ্ঞা নির্দেশ করে তাদের পার্থক্য দেখিয়েছেন। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি সে সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। রায়তরা কি ভাবে জমির খাজনা দেয় তাও তিনি বিভিন্ন সময়ের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ফসলী (Fussulee) রায়ত, কুমার (Comar) রায়ত, খুদকস্ত (Khoodcasht) ও পাইকস্ত (Pycasht) রায়তদের সংজ্ঞাও দিয়েছেন। রায়তদের অধিকার অনুসারে জমি কয়ভাগে ভাগ করা হয় তারও পরিচয় দিয়েছেন। জমির প্রধান ভাগ দুটি, মৌরসী ও মেয়াদী। আবার মৌরসী জমির উপভাগগুলি যথাক্রমে খুদকস্তী, ভাগৎ, বাস্তু, ঘাঁটী ইত্যাদি এবং পাইকস্তী বা খানী জোৎ মেয়াদী জমির অন্তর্গত জমির স্থায়ীত্ব অনুসারে অথবা জমির ভাগ অনুসারে জমির আরও নাম আছে, যথা জলকর, ফলকর, তলকর (Tolkor), খাসকর, বনকর, ভাগজোৎকর বা বর্গাজোত বা ভাওয়ালী ইত্যাদি। জমির এই সব উপবিভাগ অনুসারে লর্ড বেণ্টিঙ্ক জমিদার রায়ত ইত্যাদিদের শ্রেণী বিভাগ করেছিলেন।

'১৮৫৯ সালের দশ আইন (Act X—1859) রায়তদের শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী যে অধিকার দান করেছে তার পরিচয় প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র লিখছেন— ১। রায়তদের নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে হয়। ২। রায়তদের জমি অধিকার করার ক্ষমতা থাকলেও খাজনা নির্দ্দিষ্ট করার ক্ষমতা নেই। ৩। যে সমস্ত রায়ত জমি দখল করার অধিকার পায়নি তারা ইচ্ছানুসারে প্রজা হতে পারে। সঞ্জীবচন্দ্র লিখছেন এই নিয়মগুলিই আমাদের কাছে সহজবোধ্য। তিনি গভীর অনুসন্ধানে জেনেছিলেন হিন্দু যুগে প্রজাদের অবস্থা সবচেয়ে ভালো ছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে প্রজাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। আর আধুনিক কালের প্রজাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর স্বভাব স্থলভ তির্যক মন্তব্য করতে কুণ্ঠীত হন নি।

* * * * *

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 'ঋজু অল্প বাক, দুরারাধ্য শুদ্ধ সাধক,' গবেষণা ঋদ্ধ কাজকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন তা খুবই স্বাভাবিক। তাই স্বল্প পরিসরে সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী প্রসঙ্গে তিনি বেঙ্গল রায়তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি বইটি সম্বন্ধে লিখেছেন—

"পুস্তকখানির বিষয়, —১। বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্বতন অবস্থা, ২। ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল বিচার, ৩। ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, ৪। প্রজাদিগের উন্নতির জন্য যাহা কর্তব্য।"

এই বইখানি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি ছিল সে সম্পর্কে তাঁর বারুইপুর অবস্থানে কালের সঙ্গী ও সহযোগী কর্মী কাশীনাথ দত্ত বঙ্কিম স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"ইহার অনেকদিন পূর্বে তাঁহার অপর জ্যেষ্ঠ মধ্যম ভ্রাতা বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে Rent Law সম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। লোকের মুখে শুনিতাম এখানি বঙ্কিমবাবুরই রচিত। বঙ্কিমবাবু এই পুস্তকের প্রশংসা শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। একবার হাইকোর্টের বিচারপতিদের Rent Law (১৮৫৯ সালের দশ আইন) সম্বন্ধে প্রত্যেকের সুবিস্তীর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া পুস্তিকা আকারে বাহির হয়। সেই মন্তব্য মধ্যে স্থানে স্থানে সঞ্জীববাবুর Bengal Ryot সম্বন্ধীয় পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত অংশ ছিল। বঙ্কিমবাবু হাইকোর্টের বিচারপতিদের মন্তব্য পুস্তিকা প্রাপ্তি মাত্রই তন্মধ্যে হইতে সঞ্জীববাবুর পুস্তিকা উদ্ধৃত অংশগুলি খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং আমাকে দেখাইলেন। এই যত্ন অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ হইতেও বিকশিত হইতে পারে।"[২]

বেঙ্গল রায়ত সম্পর্কেই এই উক্তি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা আলোচনাক্রমে বুঝেছি গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা—কাশীনাথ দত্তের সন্দেহ নিতান্তই অমূলক। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও গ্রন্থটির সমকালীন খ্যাতি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন—

"পুস্তকখানি প্রচারিত হইবামাত্র বড় বড় সাহেব মহলে বড় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

রেভিনিউ সেক্রেটারী চাপমান সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন যে ইংরেজ এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরানী দাসীর মোকর্দ্দমায় ১৫ জন জজ ফুলবেঞ্চে বসিয়া প্রজাপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তি দায়ক। গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফটেনান্ট গবর্ণর সাহেব সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ উপহার দিলেন।"[৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির মধ্যে কোথাও যে অতিশয়োক্তি নেই তার প্রমাণ আমরা বেঙ্গল সার্ভিস রেকর্ড থেকেই পেয়েছি। তবে কলিকাতা রিভিউতে চাপমানের যে সমালোচনার কথা তিনি লিখেছেন তাও আমরা পেড়ে দেখেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় চ্যাপম্যান সাহেব কোথাও তাঁর সুদীর্ঘ আলোচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের নাম করেন নি। তিনি যদিও বেঙ্গল রায়ত বইটির নাম করেছেন এবং অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। সম্ভবত প্রবন্ধটি যে বাঙ্গালী এক লেখকের বইয়ের সমালোচনা তার সোজাসুজি উল্লেখ তিনি সংকোচ বোধ করেছিলেন।

Calcutta Review. Nol—XLI 1865 No LXXXI Page 159—168 (Artirle VI) Ancient Rent Law.

প্রবন্ধের বিষয় পরিচায়িকাতে তিনি লিখছেন—

1. Act X 1859. 2. Rulings of Suddar Land High Court in Rent Suits.

3. Minute of Sir Parnes Peacock.

4. Unpublished Minutes of the Judges of the High Court.

5. Bengal Ryots, their rights and liabilities.

শেষ অংশের সমস্ত আলোচনাটি সঞ্জীবের গ্রন্থটির সারাংশ এবং কিছু কিছু উদ্ধৃতিও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত এই প্রবন্ধটির কথাই বলেছেন। তৎকালীন জমি সংক্রান্ত মামলায় প্রজাপক্ষে রায় সম্বন্ধে

Calcutta Review. (1865) Vol-XLI No. LXXXII The great Rent cases—Page—398-418 তে অনেকগুলি মামলার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে তাতে যে সঞ্জীবের গ্রন্থটি অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল পড়লেই বোঝা যায়। সমকালের এই প্রভাব পার হয়ে বেঙ্গল রায়তের যে আরও গভীর প্রভাব ঐ জাতীয় প্রবন্ধ রচনা অথবা গ্রন্থ রচনার উৎস হয়েছিল তা পরবর্ত্তীকালের বহু খ্যাত অখ্যাত লেখকের বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায়ের উপর লেখা রচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি। সেই সব লেখকের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত ইত্যাদি।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ছ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি রচনা করেন। নিঃসন্দেহে প্রবন্ধটির অন্যতম প্রেরণা ছিল সঞ্জীবের গ্রন্থখানি। তবে চিন্তার বিস্তার ও গভীরতা এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক বেন্থাম, মিল প্রভৃতির তত্ত্ববোধ তাঁর সঞ্জীব অপেক্ষা বেশী ছিল। তিনি যে সঞ্জীবের রচনার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তা তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের পুনর্লেখনের মুখবন্ধেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখছেন—১। ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যায়। ২। ইহার পর হইতে কৃষকদিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ৩। ইহাতে কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপরিবর্তিতই আছে। এই অংশগুলি সঞ্জীবচন্দ্রও আলোচনা করেছেন তা আমরা আগেই জেনেছি। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রবন্ধের 'আইন' অংশের পাদটীকায় লিখেছেন—

"এই সকল তত্ত্ব যাহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্তবাব সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বঙ্গীয় প্রজা (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমরা এ প্রবন্ধের এ অংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সংকলিত করিয়াছি।"[৬]

নির্দেশিকা

[এই নির্দেশিকাতে সঞ্জীবচন্দ্রের নাম, তাঁর কোন রচনার নাম, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম, ভ্রমর পত্রিকার নাম, বা তার সূচীতে ব্যবহৃত নাম, বঙ্গদর্শন পত্রিকার নাম বা তার সূচীতে ব্যবহৃত নাম এবং গ্রন্থপঞ্জীতে ব্যবহৃত নাম উল্লেখ করা হয়নি।]